বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নাট্যকার বিধায়ক

ডক্টর বাসন্তী চাকী

ইন্দিরা প্রকাশনী
১৯ডি/এইচ/১০, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক :
লক্ষ্মী রায়
১৯ ডি/এইচ/১০, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯০

প্রচ্ছদপট : চণ্ডী লাহিড়ী

মুদ্রাকর :
এস. ডি. অফসেট
১৩ ভি, আরিফ রোড
কলকাতা-৭০০ ০৬৭

প্রাপ্তিস্থান :
বিশ্বাস বুক স্টল, ৮৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
পি. এন. পুস্তকালয়, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
দে বুক স্টোর, ১৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
সুহৃৎ বুক স্টল, কলেজ স্কোয়ার (স্টল নং ১৬) কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

পরমপূজনীয় পিতা স্বর্গীয় হেমাঙ্গকুমার মজুমদার

এবং

পরমপূজনীয়া মাতা শ্রীমতী প্রীতিলতা মজুমদারকে

নিবেদিত

ভূমিকা

শ্রীমতী বাসন্তী চাকীর গবেষণা-নিবন্ধটির নাম 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নাট্যকার বিধায়ক'। বাংলার বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনীত বিধায়ক ভট্টাচার্যের মৌলিক পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকগুলির সমীক্ষামূলক আলোচনা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলিকে (ক) থিয়েটারী নাটক ও (খ) যাত্রানাটক—এই দুই ভাগে বিভক্ত করে এগুলির সমাগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর কারণ—প্রধানত শহরে দর্শকদের জন্য রচিত থিয়েটারী ও প্রধানত গ্রামীন দর্শকদের জন্য রচিত যাত্রা-নাটক বা লোকনাট্যের রীতি প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই গবেষণা-নিবন্ধের জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীমতী বাসন্তী চাকীকে পি. এইচ. ডি. উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

নিবন্ধটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বিধায়কের নাট্যরচনার কালসীমার প্রতি দৃষ্টি রেখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকার উপস্থাপনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, যে কোন কালে যে কোনো দেশের সাহিত্যিক—শিল্পীর মানসিকতা গড়ে ওঠে সে দেশের, সেকালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকার প্রভাবে। সেই মানসিকতাই স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মকে চালিত করে। সৃষ্টির বিষয়বস্তু নির্বাচন ও তার রূপায়ণও তদনুসারে যুগ সম্ভাব্যতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে। নাট্যসমীক্ষায় বিষয়টির প্রতি নিবন্ধকারের যে যথোচিত দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই অধ্যায়ে তারই সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। কালের পটভূমিকা তথা যুগ-প্রভাব বিধায়কের নাটকে কোথায়, কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তার কথা বলা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সেই সঙ্গে আছে প্রত্যেকটি নাটকের মূলভিত্তিরূপে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তবাক্য, কথাবস্তু ও নামকরণের প্রয়োজনীয় আলোচনা।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দেশে নাট্যগঠন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে নানা রীতি প্রচলিত হয়েছে। এই সব রীতির আলোচনা বাদ দিলে নাট্যসমীক্ষা অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে পূর্বে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী বহুমূল্যবান নাটক রচিত হয়েছে, এমনকি, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর মতো মহান নাটকও। কিন্তু আমাদের একালের নাটক দাঁড়িয়ে আছে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির ভিত্তির উপরে, একালের নাটকেও গোড়া থেকেই রূপ-শৈলীর (form) দিক থেকে প্রাচ্য নাট্যরীতির প্রভাব ছিল। তাই নাট্যগঠন প্রসঙ্গে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাট্যতত্ত্বের পরিচয় লওয়া একান্ত আবশ্যক। বিষয়টি স্থান পেয়েছে বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে। নাট্যগঠনে নাট্যক্রিয়ার বিভাগ (division of dramatic action) একটি বিশিষ্ট বিষয়। এ বিষয়ে গোলমাল থাকলে নাটকের কাহিনীও এলোমেলো হয়ে যায়, কাহিনী ঠিক পথে গতিলাভ করতে পারে না। এর ফলে নাট্যসংহতি (dramatic

compactness) বিনষ্ট হয়ে নাট্যঘটনা defused হয়ে যায়, অর্থাৎ ঘটনা লক্ষ্যহীন হয়ে একমুখীনতা হারিয়ে ফেলে নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাই কাহিনী পাঠক-দর্শকের কাছে আকর্ষণহীন হয়ে ওঠে। নাট্যক্রিয়ার বিভাগ সম্পর্কীয় আলোচনায় এই গবেষণা গ্রন্থে Gustav Freytag-এর পাঁচ পর্বের পিরামিড রীতি (exposition, rise, climax, fall catastrophe), W. H. Hudson-এর ছয় পর্বের রীতি (exposition, initial incident, growth, crisis, resolution, catastrophe), L. Campbell-এর অধিবৃত্ত রীতি (opening, climax, acme, sequel, close) এবং J. H. Lawson-এর ক্রমোর্ধমুখী সংঘাতমূলক চারপর্বের রীতি (exposition, rising action, clash, climax) যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় নাটকের পঞ্চপর্বের নাট্যকার্যরীতির (প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্তিসম্ভব, নিয়তফলপ্রাপ্তি, ফলযোগ) বিষয়টিও বাদ পড়েনি। আলোচনায় বিধায়কের থিয়েটারী নাটকের সঙ্গে যাত্রা-নাটকও গৃহীত হয়েছে। কারণ যাত্রাও বঙ্গীয় রঙ্গক্ষেত্রের এক বিশেষ ধরণের থিয়েটার। একে বলে, folk theatre অর্থাৎ লোকনাট্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে আছে চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। নাট্যচরিত্রে মানবজীবনেরই প্রতিফলন ঘটে। মানবজীবনই যে জটিল। সে জটিল আবরণ উন্মোচন করে ভেতর থেকে মনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা চরিত্র বিশ্লেষণের আসল কথা। এর পরিধি ব্যাপক। তাই বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থের সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে রয়েছে। মানবচরিত্র দাঁড়িয়ে থাকে তিনটি বিষয়ের উপর,—(ক) বংশগতি (heredity অর্থাৎ physiology), (খ) সামাজিক দিক (sociology) ও (গ) মনস্তাত্ত্বিক দিক (psychology) এই তিনটি দিয়ে মানবজীবনের অস্থি-সংগঠনের (bone structure) রূপকাঠামো তৈরী হয়। এসব নিয়েই ত্রৈমানিক চরিত্র (tridimensional) গড়ে ওঠে। নাটকের চরিত্র অবশ্যই ত্রৈমানিক হওয়া চাই। বিষয়টি গ্রন্থে যথাযথভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

নাট্য চরিত্রকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়। যে কোন রকমের চরিত্র হোক না কেন, তা এই পাঁচ ভাগের কোনো-না-কোন ভাগে পড়বেই। এই পাঁচটি ভাগ হল—(ক) প্রধান চরিত্র (protagonist), (খ) বিরোধী চরিত্র (antagonist), (গ) প্রধান ও বিরোধী চরিত্রের সহযোগী চরিত্র (allied agent), (ঘ) নাট্য ঘটনায় গতি সঞ্চারকারী চরিত্র (pivotal character) এবং (ঙ) পরিস্থিতি পরিবেশ সৃষ্টিকারী ছোট ছোট চরিত্র আর মঞ্চে অনুপস্থিত ছোট নেপথ্য চরিত্র (background agent)। চরিত্র ক্রমিক সঞ্চরণের ভিতর দিয়ে (transition) একটি বিশেষ পরিবর্তিত অবস্থায় পৌছয় (growth)। এই পরিবর্তনের পথে থাকে চরিত্রের অনুভূতি (feeling), মেজাজ (mood), আবেগ (emotion), ইচ্ছা (desire, wish), এবং উদ্দেশ্যকে পাওয়ার জন্য কর্মশক্তিযুক্ত গতিময়

তীব্র আকাঙ্ক্ষা (volition) এই volition-এর জন্যই অদম্য ক্রিয়াপ্রবণতা (persisting behaviour) নিয়ে মানুষের মনে যে প্রেরণা (motivation) সৃষ্ট হয়, তা-ই তাকে কর্মময় করে তুলে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। এর ফলেই নানা ঘটনা ঘটে, চরিত্র পরিবর্তিত হয়—ভালো থেকে মন্দে বা মন্দ থেকে ভালোয়।

এছাড়াও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বহির্মুখী (extrovert), অন্তর্মুখী (introvert) উভয়মুখী (ambivert) ভাব, চরিত্রের চেতন (conscious), প্রাক-চেতন (pre-conscious), অচেতন (unconscious) স্তর, চরিত্রে ইদম্ (id), অহম্ (ego), অধিসত্তা বা অধিশাস্তার (super ego) অস্তিত্ব-প্রভাব নিয়েও চরিত্রের ব্যক্তিসত্তা (character personality) সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। ব্যক্তিসত্তার এই তিনটি বিষয়ই মানুষের মনে বাসা বেঁধে থাকে। এদের যখন যেটি প্রবল হয়ে ওঠে, মানুষ তখন তদনুসারে কাজ করতে উদ্যত হয়। কাম-কামনা (eros) ও মৃত্যু (thanatos) সম্পর্কেও মানব মনে চিন্তা থাকে। জীবনে কামনা ও মৃত্যুর এই চিন্তা অর্থাৎ জীবনের অস্তি ও নাস্তির এই দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে জীবনপথে চলতে হবে। পারিবারিক শিক্ষা সংস্কৃতি, অনুশাসন, সামাজিক নিয়ম-কানুন, স্কুল-কলেজ, কর্মস্থল, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সহযোগিতার ভিতর দিয়ে অস্তি-নাস্তি সম্পর্কে প্রাক্ চেতন মনের এলোমেলোভাগ দূর করে তাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিয়ে মানুষকে জীবন-পথে এগুতে হয়। মানুষের কামনা-বাসনা সব সময় স্বাভাবিক পথ ধরে চলতে চায় না। কিন্তু বাস্তববোধ ও যুক্তিদ্বারা তাকে ঠিক পথে চালাতে হয়। এ না পারলে জীবনে অনর্থ ঘটে। চরিত্র আলোচনায় এসব সম্পর্কে W. Mc. Dougal, S. Freud, Alfred Adler, G. W. Allport, C. G. Jung প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকদের সাহায্য গ্রহণ করতেই হয়। বিষয়গুলির যথোচিত আলোচনায় গ্রন্থকার এ সম্পর্কে ত্রুটির অবকাশ রাখেননি। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় রীতি অনুযায়ী নায়ক-নায়িকা চরিত্রের স্বরূপও ব্যাখ্যাত হয়েছে। বিধায়ক মঞ্চের জন্য বিবাদান্ত ও মিলনান্ত দুই প্রকার নাটকই রচনা করেছেন। তাই নিবন্ধে tragedy ও comedy দুটি বিষয় সম্পর্কেই আলোকপাত করতে হয়েছে। এই আলোচনায় আছে tragedy-র সংজ্ঞা ও স্বরূপ, tragedy-র প্রকারভেদ simple tragedy, complex tragedy, pathetic tragedy, tragedy of spectacle, tragedy of character ; এ প্রসঙ্গে tragedy-র বিবর্তনে Aeschylus, Sophocles ও Euripides-এর গ্রীক classical tragedy, L. A. Seneca-র roman tragedy, english romantic tragedy (প্রধান প্রবক্তা Shakespeare), এবং শেষে Henrik Ibsen-র modern tragedy-র কথা এসে গেছে। Tragedy-তে সাধারণত মৃত্যু থাকেই। কিন্তু modern tragedy-তে মৃত্যু অপরিহার্য অঙ্গ নয়। বেঁচে থাকার মধ্যেও যে হাহাকার ও বিরাট শূন্যতায় মন ভরে ওঠে, এতে তাই দেখানো হয়। এ শূন্যতা সহ্য

করা যায় না, কোন কিছু দিয়ে একে ভরাট করাও অসাধ্য। তাই এ tragedy মৃত্যুর tragedy থেকে কোন অংশে কম নয়।

comedy-র প্রয়োজনীয় আলোচনায় humour, wit, satire, farce-এ সংলাপ, চরিত্র ও ঘটনা উপস্থাপনার বিচিত্রতা-কৃতিত্বের যে প্রয়োজন সে কথাও গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। উল্লিখিত তত্ত্বাদি প্রয়োগ করেই বিধায়কের সমস্ত নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে নিপুণভাবে। এতে যাত্রা-নাটকও বাদ পড়েনি।

পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয় নাট্য-সংলাপ। এ প্রসঙ্গেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে নানা রীতি প্রচলিত হয়েছে। এসব রীতি নাট্য-প্রথায় পরিণত হয়েছে। গবেষণা-নিবন্ধে সে প্রথার পরিচয় যেমন দেওয়া হয়েছে, তেমনি নাট্য-সংলাপের মূল কথা—সংলাপ চরিত্রানুগ হবে অর্থাৎ সংলাপের ভাষা হবে চরিত্রের language of own world, —বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। নাট্যসংলাপে গতিক্রম (tempo), এগিয়ে চলার ভাব (sense of moving forward), আর এর জন্য G.W.F. Hegel-এর thesis, antithesis ও synthesis নিয়ে dialectical পদ্ধতির অনুসরণ, নাট্যভাষায় কোথাও প্রয়োজনাতিরিক্ত জোর (overemphasis) না দেওয়া, দর্শকের পক্ষে দুর্বোধ্য অতিদীপ্তিময়তার (over brilliant) প্রয়োগ না করা, অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত শব্দের ব্যবহার না করা, সংলাপে প্রয়োজনীয় আবেগ (emotional load) আরোপ করা, ভাষায় আনন্দজনক উপকরণ (pleasurable accessories) সহ সাহিত্যগুণ আরোপ করার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা নাট্যকারের প্রয়োজনীয় ভাবনা। বিষয় ভেদে নাটকে পদ্যসংলাপে (verse dialogue), অলঙ্কৃত গদ্য সংলাপ (rhetorical prose), সহজ গদ্য সংলাপ (simple prose) এবং আঞ্চলিক ভাষা (dialect) ব্যবহৃত হতে পারে। সংলাপরীতিতে (ক) জনান্তিক (aside), (খ) নিজের সম্পর্কে স্বগতোক্তি বা আত্মকথন (soliloquy), (গ) ছদ্ম-স্বগতোক্তি (pseudosoliloquy) অর্থাৎ মঞ্চে দর্শক দ্বারা অ-দৃষ্ট কোন মৃত ব্যক্তি (dead) সম্পর্কে আত্মকথন, (ঘ) এককোক্তি (monologue), এতে বক্তার ভাবনা প্রকাশিত হয়ে তার অন্তরের চিত্রকে উদ্‌ভাসিত করে,—একে 'thinking aloud' ও বলা যায়, এবং (ঙ) ছদ্ম-এককোক্তি (pseudo-monologue) অর্থাৎ কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আত্মকথন—যা শুনে ঐ মৃত ব্যক্তি দর্শকের কাছে পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে—এ সবও থাকতে পারে। তাই বিষয়গুলির আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। এর পরে গীতি প্রসঙ্গের কথা।

নাটকে গীতি থাকবেই এমন কোন কথা নেই। আবার গীতির সঙ্গে নাটকের অহিনকুল সম্পর্কও নেই। নাটকে গান আসে নাট্যচরিত্রের প্রয়োজনে। সংলাপে যখন মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, তখনই সংলাপে সুরের সংযোগ ঘটিয়ে তাকে বেগবান ও গতিশীল করা হয়। গান-ও সংলাপ, সুরেলা সংলাপ। নাটকে নানাভাবে, নানা ধরণের

গীতি সংযোজিত হতে পারে। কিন্তু অবশ্য প্রয়োজন ছাড়া গান ব্যবহার করা ঠিক নয়। এতে নাট্য-সংহতি (dramatic economy) নষ্ট হয় এবং সাময়িকভাবে নাটকের গতিও রুদ্ধ হয়ে যায়। লোকনাট্যে অবশ্য খোলা মঞ্চে অভিনয়ের জন্য নানা ধরণের গান-সংযোজন প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এটা ঐ শ্রেণীর নাটকের রীতি-বৈশিষ্ট্য। যাত্রার বিশেষ বিশেষ গান আবেগের তীব্রতা ও গতি (tempo) বাড়িয়ে দিয়ে বহুদূর বিস্তৃত কয়েক হাজার দর্শকশ্রোতার মনে ভাবকে পৌছে দেয়। যাত্রাতো মূলত গানে ও নৃত্যেই রচিত হত; অভিনয় এসেছে অনেক পরে। যাত্রায় গান চাই-ই। এই অধ্যায়ে উদাহরণ সহযোগে যে নাট্যসংগীতের পর্যালোচনা করা হয়েছে তাতে একটু নূতনত্ব আছে। তা হল, থিয়েটারী নাটকের গান, এমন কি বিধায়কের যাত্রা-নাটকের গানেও কিছু কিছু ছন্দোবিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। .

একালের বহুল প্রচলিত একাঙ্ক নাটক নিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। পাশ্চাত্যে একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব, প্রচার, গঠনরীতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার পরে প্রাচীন ভারতীয় একাঙ্ক নাটকেরও পরিচয় লওয়া হয়েছে। একাঙ্ক নাটক যে এক অঙ্কে রচিত একটি ছোট নাটক বা নাটিকা নয়, একাঙ্ক যে আদি, মধ্য, অন্ত যুক্ত স্বল্প পরিসরে উপবৃত্তহীন একটি একক কাহিনী (single episode) বা একটি বিশেষ অবস্থা (single situation) নিয়ে রচিত এক শ্রেণীর নাটক, আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিধায়কের একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা তিন। এ নাটক তিনটিও রঙমহল ও বিশ্বরূপা রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়ে বাংলা থিয়েটাররের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাই নাটক তিনটি আলোচনার অঙ্গীভূত হয়েছে। এই একাঙ্ক নাটক তিনটির সুষ্ঠু বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে নাট্যরীতির বিশিষ্ঠতা অবলম্বন করেই।

বিধায়কের নাটকগুলি প্রধানত মঞ্চের প্রয়োজনেই রচিত, শুধু পাঠের জন্য নয়। তাই এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুটি দিকই গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যই সপ্তম অধ্যায়ে ব্যবহারিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের আলোচনায় প্রয়োগবিদ্ ও অভিনেতার ভূমিকা, নাট্যপরিচালনায় straight theatre ও motion master-এর রীতি, triangular theatre এবং Duke of Saxe-Meiningen ও Ludwig Chronegk, দৃশ্যবিন্যাস, আলোক পরিকল্পনা, অঙ্গরচনা, অলংকরণ, নাটকে গীতি-নৃত্য compositio, picturization, movement, rhythm ও business সহ পঞ্চাঙ্গ অভিনয়রীতি, সু-অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য, মহলা-পরিচালনা, নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের নাট্য প্রয়োগরীতি এবং থিয়েটারী ও যাত্রানাট্য প্রয়োগরীতির পার্থক্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

এরপরে বিধায়কের কয়েকটি মঞ্চ-সফল নাটকের প্রয়োগবিশিষ্টতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আছে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, flashback রীতি, একটি নাটকের মঞ্চায়নে

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা

যে কোনো শিল্পীর জীবনদর্শন পারিপার্শ্বিক জনজীবনকে স্পর্শ করে থাকে। কেননা শিল্পীর মনন ইতিহাস-নিরপেক্ষ হতে পারে না এবং এই ইতিহাস মূলতঃ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি অবলম্বনে গড়ে ওঠে। এর প্রেক্ষাপটেই প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে বিশিষ্ট জীবনধারা সৃষ্ট হয়। আবার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে দেশে দেশে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে এবং তার ছোঁয়া লাগে জীবনে। এই পরিবর্তিত বহতা-জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা শিল্পীকে শিল্পসাহিত্য রচনায় অনুপ্রেরণা দেয়। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁর নাটক রচনাকালে নিঃসন্দেহে সেই জীবনপ্রবাহ থেকে দূরে সরে থাকেননি। বিধায়কের প্রথম নাটক 'মেঘমুক্তি' ১৯৩৮ সালের ১৩ জুলাই প্রথম অভিনীত হয়। এরপর তাঁর কলম থামেনি। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি নাটক লিখে গেছেন। তাই তাঁর নাট্য রচনার উৎস সন্ধানে গেলে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকার কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে।

● রাজনৈতিক পটভূমিকা

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯২১ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর ভারত আগমন উপলক্ষে ১৯২১ সালে ২১ নভেম্বর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের একমাত্র অবলম্বন আত্মশক্তি ও প্রবল আত্মবিশ্বাস। সেদিন থেকে কিছুদিন ধরে বোম্বাই (মুম্বই) শহরে ভয়ঙ্কর রকমের দাঙ্গা চলে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রমুখ নেতা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী গোরক্ষপুর জেলায় পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে একদল লোক চৌরিচৌরা থানায় একুশজন কনস্টেবলসহ একজন দারোগাকে অগ্নিদগ্ধ করলে অহিংসায় বিশ্বাসী গান্ধীজি তখনকার মত কর বন্ধ ও অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখেন। ইতোমধ্যে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় বিপ্লবীদের একটি অংশের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাসবাদী দলের সৃষ্টি হয়। সন্তোষ মিত্র, গোপীনাথ সাহা, বারীন ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সূর্য্য সেন, অনন্ত সিংহ, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, ভগৎ সিং, বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত প্রমুখ সংগ্রামীরা সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশকে ইংরেজশাসন মুক্ত করতে চাইলেন। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' পত্রিকা ও 'অনুশীলন সমিতি' এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বিপ্লবকে সক্রিয় রাখার জন্য এই সন্ত্রাসবাদী

দল প্রয়োজনে ডাকাতি ও লুঠ করে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করতেন। ১৯২২ সালে ১৩ মার্চ মহাত্মাজিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সময় কিছু স্বার্থান্বেষী হিন্দু-মুসলমানের কার্যকলাপে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এরই ফলস্বরূপ সেই সালে মুলতানে মহরম উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরে সেই আগুন বাংলা ও পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর নানা জায়গায় নানা সময়ে সাম্প্রদায়িক সংঘাত চলতে থাকে। ১৯২৪ সালে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ ভারতের সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব রাখে। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মহম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে মসুলিম লীগ সেই সালে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি গ্রহণ করে। লীগের কার্যকলাপের ফলে হিন্দু-মহাসভায় (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৭) এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উভয় দল পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকেন।

১৯৩০ সাল এল। সেই সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাবরমতী আশ্রমে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে মহাত্মাজির আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং লবণ-আইন ভঙ্গ করা হবে বলে স্থির হয়। ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ সকাল ৬-৩০ টায় সাবরমতী আশ্রম থেকে ৭৮ জন অনুগামী নিয়ে দুইশত মাইল অতিক্রম করে ৫ এপ্রিল বেলা ৮-৩০ টায় ডাণ্ডিতে এক ক্ষুদ্র স্তূপ থেকে একতাল লবণ তুলে মহাত্মা গান্ধী ইংরেজকৃত লবণ-আইন ভাঙেন। এজন্য প্রচুর লোককে শাস্তি দেওয়া হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশে এই সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। এই আন্দোলনে নারীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। দীর্ঘদিনের পর্দা সরিয়ে তাঁরা পুরুষের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে আন্দোলনে যোগ দেন। শুধু তাই নয়, দলে দলে কারাবরণও করেন।[১] প্রায় পাঁচমাস ধরে আন্দোলন চলার পর আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু তার কিছু সুফল পাওয়া যায়নি। এর পূর্বে ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে 'পূর্ণস্বরাজ' মতবাদ গণচেতনার ফলস্বরূপ গৃহীত হয় এবং ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারী গৈরিক-সাদা-সবুজ পতাকা উত্তোলিত করে ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সেই সালে উর্দু কবি ইকবাল মুসলিম লীগে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্রদেশের কথা বলেন। এরপর চৌধুরী রহমত আলির নেতৃত্বে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য বিক্ষোভ শুরু হয়। এইভাবে হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদ তথা পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের চেতনা দৃঢ় হতে থাকে।[২]

১৯৩২ সালে ১৭ আগষ্ট ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার কথা বলেন। এর ফলে আইন সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এছাড়া হরিজনদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও আসনের ব্যবস্থা করে বর্ণহিন্দুদের থেকে তাঁদের আলাদা করার চক্রান্ত করা হয়। এর পেছনে ইংরেজদের 'devide et impera' নীতি কাজ করছিল।[৩] এইভাবে তাঁরা প্রথমে মুসলিম লীগ, তারপর শিখ ও হরিজনদের হিন্দুজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হলেন।[৪] গান্ধীজি এর প্রতিবাদে যেরবাদা জেলে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে অনশন শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে পুনায় উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন হয় এবং আইন সভায় হরিজনদের পৃথক আসন থাকলেও যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে বলে আইনসভায় একটি চুক্তিতে স্থির হয়। এই চুক্তি 'পুনাচুক্তি' নামে খ্যাত। গান্ধীজি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য হরিজন আন্দোলনকে আরো

শক্তিশালী করে তুললেন। 'হরিজন পত্রিকা', সব বর্ণের মানুষের এক পংক্তি ভোজন প্রভৃতি দ্বারা তিনি সেই আন্দোলনকে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন।

ইতঃপূর্বে শ্রমিকশ্রেণীর নানা ধরণেব দাবী নিয়ে কিছু ব্যক্তি, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা নানারকম চিন্তাভাবনা শুরু করেন।[৫] ১৯২০ সালে তাই সৃষ্ট হয় 'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (এ.আই.টি.ইউ.সি.)। সি.পি.আই. এই সংগঠনে নিজের দলের প্রভাব বিস্তার করে নিজস্ব শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলে। এদিকে মীরাট ষড়যন্ত্রে ধৃত কমিউনিষ্ট নেতারা যখন মুক্ত হলেন তখন তাঁরা নিজস্ব সংস্থা তৈরী করে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে চাইলেন। শুধু তাই নয়, ধীরে ধীরে তাঁরা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের (বোম্বাই [মুম্বই], দিল্লী, কলকাতা, এলাহাবাদ প্রভৃতি) শ্রমিক সংগঠনে বিশেষ স্থান কবে নিলেন। ১৯৩৪ সালে ২৩ এপ্রিল তাঁরা সব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের হরতাল ডাকলেন। এ ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। ফলে বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক সংগঠনের (ট্রেড ইউনিয়ন) সঙ্গে কমিউনিষ্ট দলকে বে-আইনী বলে ঘোষণা কবা হয়।[৬]

১৯৩৩ সালে কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন বসে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ব্রিটিশ সরকারের ক্ষুরধার কূটনীতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অনেক চেষ্টা করেও সেই অধিবেশন ভাঙতে পারেননি। সেই অধিবেশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ছাত্রকর্মীদের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ।[৭] চল্লিশের দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা গণনাট্য আন্দোলন। ১৯৩৫ সালের কাছাকাছি এই আন্দোলন দানা বাঁধে। ১৯৩৬ সালে লখনউ শহরে সর্বভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসে। ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে প্রথমদিকে এই সংঘ নিরপেক্ষ দল হিসেবে নিজেদের যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রাখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের গতি দেখে এই সংঘ 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক সংঘ' নাম নিয়ে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে শুরু করে।[৮] এই "ফ্যাসি বিরোধী লেখক সংঘ" থেকেই গণনাট্য আন্দোলনের শুরু হয়। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশী চেতনা, সমসাময়িক বাস্তব জীবনবোধকে সঞ্চারিত করাই গণনাট্য সংঘের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতের রাজনীতিতে শ্রমিক আন্দোলন বিশেষ গতিসঞ্চার করে। ১৯৪৫ সালে মাদ্রাজে (চেন্নাই) সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অধিবেশন হয়। সেখানে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়। সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্গত কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট উপলক্ষে প্রায়ই সেনাবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে সংঘাত লেগে থাকত। এদিকে ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের রাজকীয় নৌ-বাহিনীর নাবিকরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের ডাক দেন। ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সারাভারতের শ্রমিক ও জনসাধারণ সেই ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনে যেটুকু ইতঃস্তত ভাব ছিল সেই ধর্মঘটের ফলে তা অনেকটা দূর হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ত্বরান্বিত হয়।

১৯৩৯ সালে হিটলারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ভারতবর্ষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শুধু তাই নয়, প্রায় অভুক্ত থেকে ভারতবর্ষকে যুদ্ধের রসদ জোগাতে হয়। নানাভাবে দেশবাসী শোষিত হতে থাকে। বহু জিনিসের ওপর কর বসে, প্রাত্যহিক অন্ন জোটাতে সাধারণ মানুষ ঘরবাড়ী বিক্রি করতে থাকে। বঞ্চিত মানুষের মধ্যে সৃষ্ট হয় গণবিপ্লবের বীজ।[৯] এই জাতীয় সংকটে কংগ্রেস জনসাধারণের মুখপাত্র হয়ে সেই অবাঞ্ছিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে যোগদানের প্রতিবাদ করেন। সে সময় অনেক মার্কিণ প্রতিষ্ঠান, সংঘ ও ব্যক্তিরা এই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে থাকেন। তাঁদের সমর্থন দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে।[১০] ইতোমধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কংগ্রেসেও ঐক্য কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সুভাষচন্দ্র বসু 'ব্ল্যাকহোল' স্তম্ভ অপসারণ আন্দোলনে ধৃত হয়ে গৃহে নজরবন্দী হলেন। অবিলম্বে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের দাবী জানিয়ে ১৯৪০ সালের ৭ জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে সহযোগিতা দানের ইচ্ছা জানিয়ে এক প্রস্তাব দেন। কিন্তু তার সদুত্তর না পেয়ে কংগ্রেস ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাক্-স্বাধীনতা লাভের জন্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন করবেন বলে স্থির করেন।

১৯৪০ সালে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। ১৯৪১ সালে ২৬ জানুয়ারী বন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ থেকে পলায়ন করেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃত্ব দিয়ে পূর্ব সীমান্ত থেকে আক্রমণ করতে থাকেন। অক্ষশক্তির অন্যতম জাপান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। যুদ্ধ ভারতের দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে আসে। সে সময় ভারতবাসী বুঝলেন ইংরেজ দেশত্যাগ না করলে ভারতবাসীর মুক্তি নেই। মহাত্মা গান্ধী হরিজন পত্রিকায় 'ভারত ছাড়' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৪২ সালে ৮ আগষ্ট তারিখে এক প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে মহাত্মাজির 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে সমর্থন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেই প্রস্তাবে অবিলম্বে ইংরেজ শাসন অবসানের দাবী জানানো হয়। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মহাত্মাজিসহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনেক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১১] নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও তার শাখাসমূহকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হয়। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের আহ্বায়ক গান্ধীজির নীতি 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'কে মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে জনসাধারণ নেতৃবিহীন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। এ সময় কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী, ফরোয়ার্ডব্লকপন্থী, বিপ্লবীসমাজতন্ত্রী, ভারতের বিপ্লবীসাম্যবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোক জনসাধারণের সঙ্গে এই মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য এগিয়ে আসেন। ১০ আগষ্ট বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি ও তার শাখা-প্রশাখাসমূহ বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়। ১২ আগষ্ট শত শত ছাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এলেন। নেতাদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ১৩ আগষ্ট অসংখ্য ছাত্রসংগঠন শোভাযাত্রা বের করে। তার পরদিন ট্রামের দড়ি কেটে ও ডাস্টবিন রাস্তার মাঝখানে এনে গাড়ি চলাচল বন্ধ করা হয়। চিঠির বাক্স, ফায়ার এলার্ম, ইলেকট্রিক

ফিউজ বক্স ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কলকাতায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা হাজার চারেকের মত। আহত, নিহতের সংখ্যাও কম নয়। নানা শোভাযাত্রা বের হয়। সেই শোভাযাত্রার একটিতে ৭৩ বৎসর বয়স্কা অসীম সাহসী মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন। ধীরে ধীরে 'আগষ্ট বিপ্লব' অসম, বোম্বাই (মুম্বই), বিহার প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন, অন্যদিকে স্বতন্ত্র সরকার গঠনের চেষ্টা দুই-ই চলতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্র প্রভৃতি প্রদেশের মধ্যে দেশীয় সরকার এবং বাংলায় কাঁথি ও তমলুকে স্বতন্ত্র সরকার গঠিত হয়।

১৯৪৩ সালে ডিসেম্বর মাসে করাচীতে যে 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ সেসন' অনুষ্ঠিত হয় সেখানে আর একটি নূতন শ্লোগান শোনা যায়—'Divide and Quit'. এদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাপানের সাহায্যে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি' নিযে স্বদেশের দিকে অগ্রসর হলেন, 'কদম্ কদম্ বাড়ায়ে যা, খুশিকে গীত গায়ে যা' গান গেয়ে তাঁর অনুগামীবৃন্দ নূতন উদ্যম ও উৎসাহে ছুটে চললেন। ক্রমে তাঁরা ইম্ফলের কাছে উপস্থিত হয়ে ইংরেজ সৈনিকদের পরাস্ত করে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দিলেন। ইংরেজ সরকার বুঝলেন, ভারতে আর থাকা চলবে না। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অবসান হয়। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আঁতাত করে মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের জন্য 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনি তুলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে। ইস্পাহানি, আদমজী প্রমুখ মুসলমান শিল্পপতিরা পাকিস্তান সৃষ্টি করার দাবীতে মহম্মদ আলি জিন্নাহকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে থাকেন। ১৯৪৫ সালে সেই কারণে 'ফেড়ারেশন অব মুসলিম চেম্বারস্ অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রি' সৃষ্ট হয়। ফলে দেশে রক্তের স্রোত বয়ে যায়। বহুদূর থেকে সুভাষচন্দ্রের ব্যাকুলকণ্ঠে সাবধানবাণী ধ্বনিত হয়—ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে তার পতন অনিবার্য। কিন্তু দেশবিভাগ রোধ করা গেল না। প্রতিকূল পরিস্থিতি দেশবিচ্ছেদকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগের প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনতার চাপে তা কার্যকরী হয়নি। কিন্তু ১৯৪৬ সালে গণচেতনায় যে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তা-ই মূলতঃ দেশবিভাগকে অনিবার্য করে তোলে।[১২]

এই অবস্থায় লর্ড লুই মাউণ্টবেটেন ১৯৪৭ সালে মার্চ মাসের শেষে ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব নিয়ে ভারতবর্ষে বড়লাট হয়ে এলেন। কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ আগষ্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয় এবং এদের ওপর থেকে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কর্তৃত্ব লুপ্ত হয়। দেশ বিভাগ হল, ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেল। কিন্তু এর ফলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। দেশবিভাগের ফলে এক কোটির বেশি লোককে তাদের দীর্ঘজীবনের বাসগৃহ ত্যাগ করে ছিন্নমূল হতে হয়।[১৩]

স্বাধীন ভারতে প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা হল ১৯৫২ সালের খাদ্য আন্দোলন। সরকার নানা চেষ্টা করেও খাদ্যাভাব দূর করতে পারলেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরে দেশবিভাগের ফলে যে বিশৃংখলা দেখা দেয় তারই একটা বিশেষরূপ খাদ্য সমস্যা। শুরু হয় এর বিরুদ্ধে আন্দোলন। এজন্য নানাস্থানে ধর্মঘট পালিত হয়, অনেককে প্রাণ দিতে হয়। সরকার এ ব্যাপারে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও ক্রমবর্ধমান জনতার চাপ এবং কিছু ব্যক্তির অসাধুতার জন্য খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। এরপর ১৯৬২

সালে চৈনিক আক্রমণে অপ্রস্তুত ভারত আবার একটা আঘাত পায়। যুদ্ধে অজস্র তরুণ বীর প্রাণ দেয়। এ ঘটনার পর দেশ প্রতিরক্ষা ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়। ইতোমধ্যে দেশে নানা রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। মানুষ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতাদর্শ নিয়ে মাঝে মাঝে সংঘর্ষও হয়েছে। ১৯৬৫ সালে আবার বিদেশী আক্রমণ। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ভারতবর্ষের কিছু জায়গায় হানা দেয়। দেশ সব রকম রাজনৈতিক মতানৈক্য ভুলে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শক্তি, সাহস ও সামর্থ্যের জোরে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

● অর্থনৈতিক পটভূমিকা

রাজনীতি ও অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন লক্ষিত হয়। যুদ্ধের ফলে দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি হয়। আসলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই সারাবিশ্বে বিশেষতঃ পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই অর্থসংকট দেখা দেয়। ভারতেও তার প্রভাব পড়ে। অর্থনৈতিক জীবন ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়। কৃষিপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ায় চাষীরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা পেটের দায়ে জমি বিক্রি করে ক্ষেতমজুর হতে থাকে। সুবিধাবাদী জোতদার মহাজনের কাছে অনেকের সবকিছু বাঁধা পড়ে। সর্বস্বান্ত হয়ে তারা শহরে কারখানায় মজুর হতে শুরু করে। বিদেশীরা নিজের স্বার্থে তাদের পণ্যের বাজার তৈরি করার জন্য দেশের কুটির শিল্প ধ্বংস করে। কিন্তু পরিবর্তে বিকল্প শিল্প গড়ে ওঠে না।[১৪] ফলে গ্রামের শিল্পী কর্মহারা হয়ে কলকারখানায় শ্রমিক হবার জন্য শহরে ভিড় করতে থাকে। যুদ্ধশেষে সামরিক দ্রব্যের চাহিদা ভীষণভাবে কমে যাওয়ায় উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। ফলস্বরূপ অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায় ও বহুশ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বার্মা থেকে আগত জনস্রোত ও যুদ্ধ প্রত্যাগত মিত্রশক্তির সৈন্যদলের আগমনে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট চাপের সৃষ্টি হয়।[১৫] এর সঙ্গে রয়েছে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ও কালোবাজারী। সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় নিরন্ন কৃষক ছুটে আসতে থাকে শহরের বুকে।

১৯৪৩ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ও বাংলার মুখ্য মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সময় দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়, ক্ষতি হয় অপূরণীয়। ইংরেজ সরকার নিযুক্ত 'উডহেড কমিশন' এই দুর্ভিক্ষের একটি মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেন। কমিশনের বিবরণ থেকে জানা যায়, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দশ থেকে বিশ লাখ লোক মারা গেছে। এছাড়া অসংখ্য লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে, নানাভাবে রোগগ্রস্ত হয়েছে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ভেঙ্গে পড়েছে। প্রায় ষাট লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পঞ্চাশের চেয়ে একান্নতে মরণ অনেক বেশি। বাজার থেকে একটার পর একটা জিনিস উধাও হতে থাকে। চোরাকারবারীদের আবির্ভাবে দেশের নৈতিক ও মানসিক মান অনেক নেমে যায়। মানুষ লক্ষ্য করে, জিনিসের দাম বাড়ছে, দাম কমছে মনুষ্যত্বের, সম্মানবোধের। এ অবস্থায় অনেকে মরিয়া হয়ে লুটতরাজ শুরু করে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করে কেউ কেউ। বাঁচার প্রয়োজনে হাজার হাজার কৃষক সংগ্রামে নেমে পড়ে। চল্লিশের দশকের মধ্যবর্তীকাল থেকে ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৃষক আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের শক্তিকে আঘাত হেনেছিল। ১৯৪৫ সালে বোম্বাই (মুম্বই)-এর দহনু ও উমবার গাঁ তালুকে ভারলিস

আদিবাসীদের বিদ্রোহ, ১৯৪৬ সালে বাংলার চাষীদের তে-ভাগা আন্দোলন, উত্তর-দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের পুন্নাপ্রা ভায়লার অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহ এবং হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকদের সশস্ত্র বিপ্লব এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় তে-ভাগা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারী প্রথা লোপ ও বর্গাচাষীকে জমির মালিক করার দাবির কথাও যুক্ত হয়। প্রায় সত্তর লক্ষ কৃষক সেই আন্দোলনে যোগদান করে। এরই ফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালে জমিদারীপ্রথা বিলুপ্ত হয়।

দেশ বিভাগের ফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় অবর্ণনীয়। উদ্বাস্তু সমস্যায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা অকল্পনীয়। অসহায় সম্বলহীন অগণিত মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে এদেশে আসে। এদের ঘর, পরিবার, সমাজ কিছু নেই। এরা সমাজের ভারস্বরূপ হয়ে একটি ক্ষুদ্র অংশে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। সরকার ও রাজনৈতিক দলের পরিকল্পনাহীন কাজের জন্য শহরে ভিড় বাড়ে। ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপে শহরাঞ্চলে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। অনাহারে ক্লিষ্ট মানুষ দুমুঠো খাবারের জন্য যে কোন কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হয়। কেউ এই অবস্থাকে সামাল দিতে পারে, আবার কেউ বাঁচার তাগিদে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে অসামাজিক পথের আশ্রয় নেয়। কত নারী যে অসম্মানজনক বৃত্তি নিতে বাধ্য হয় তার সীমা পরিসীমা নেই। সেই সময় কলকাতায় পতিতালয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।[১৬] পাঞ্জাবে লোক বিনিময়ের ফলে সেখানে উদ্বাস্তু সমস্যার উদ্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলায় সে ব্যবস্থা না হওয়ায় এই সমস্যা সমাজদেহে বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, এটি সমাজের মূলকে পর্যন্ত প্রবলভাবে নাড়িয়ে দেয়।

স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা খাদ্য সমস্যা। ক্রমবর্ধমান মানুষের তুলনায় খাদ্যের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। আপাতদৃষ্টিতে দেশের আয় বাড়লেও দ্রব্য মূল্যের দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায় সাধারণ মানুষকে দারিদ্র্যের নিম্নতম সীমায় পৌঁছতে হয়েছে। গ্রামে কৃষির উন্নতি নেই, সেখানে কোন অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। প্রাণের দায়ে মানুষ চলে আসছে শিল্পাঞ্চলে। মানুষ বেড়ে চলেছে। স্বাধীন ভারতের মৌলিক সমস্যার অন্যতম হচ্ছে ক্রমবর্ধমান জনতা-নিয়ন্ত্রণ। কারণ জনসংখ্যা অনুসারে শিল্পসম্প্রসারণ ঘটেনি। এর মধ্যে মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তি গরীবদের দারিদ্র্য ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করছে।[১৭] অন্যদিকে শোষিত মানুষ ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। ফলে উভয়ের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য ও দূরত্ব।[১৮] এ অসাম্যের জন্য ব্রিটিশ কূটনীতিকে অনেকাংশে দায়ী করা যায়। এই রাজনীতির মূলকথা, —গরীবদের কোনক্রমে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাদের সচ্ছলভাবে চলতে দেওয়া হবে না। তাই গরীবদের প্রধান উপজীবিকা ও অবলম্বন কৃষির উন্নতির দিকে ইংরেজ সরকার কোনদিনই বিশেষ দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনবোধ করেনি। এ কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যে কুড়ি লক্ষ একর জমিকে কৃষিকার্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যুদ্ধের শেষে সেই জমি জঙ্গলে পরিণত হয় এবং ধনীসম্প্রদায়ের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।[১৯] ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক দূরত্ব বেড়েই চলে।

দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা জাতীয় চরিত্র-গঠন ও পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা নেয়।[২০] অথচ দেশে উৎপাদন নেই। এই অবস্থায় মানুষের নৈতিকমান অনেক সময় বজায় রাখা সম্ভব হয় না। ঘরে অন্ন নেই আবার বাইরেও কাজ নেই। জনসংখ্যা অনুপাতে কলকারখানা খুব সামান্য। উৎপাদন নেই, তাই কর্মসংস্থান নেই। কিন্তু কাজ না হলে সংসার চলে

না। ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক মেয়ে বেরিয়েছে কাজের সন্ধানে। কিছু ফল হয় না, শুধু বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলে। দেশের সীমিত আয়ে কলকাতার এক বিরাট জনগোষ্ঠীর কোনক্রমে দিন গুজরান হয়। ফলে দিনে দিনে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। শ্রমিকরা তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। গড়ে ওঠে ট্রেড ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় মুখপাত্র হওয়ায় দিনে দিনে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২১] আবার একদিকে রাজনৈতিক শক্তি ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে।[২২]

● সামাজিক পটভূমিকা

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সামাজিক জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দেশত্যাগের ফলে ভারতেব অথনীতিতে যেমন চাপের সৃষ্টি হল, সমাজ ও পরিবারের প্রাচীন মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যেও ফাটল ধরল। সে সময় নূতন শিক্ষার প্রভাব ও প্রবণতার জন্য পুরোনো ধারার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে।[২৩] ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প চাকুরীর আকর্ষণে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। আবার রেল প্রভৃতি দ্রুতগামী যানবাহনেব জন্য মানুষ দূরদেশে কাজ নিয়ে চলে যাওয়ায় যৌথপরিবার অপেক্ষা একক সংসার অনেকেব কাছে সুবিধাজনক বলে মনে হচ্ছে। এ কারণেও পুরোনো ব্যবস্থাকে ধরে রাখা যাচ্ছিল না। মানুষ এ সময় যুগপ্রবাহে নিজের সুখ সুবিধা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিল। তাই তখন যৌথস্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ বড় হয়ে দেখা দেয়। সে সময় ব্যক্তিচেতনা ও যৌথ ভাবনার দ্বন্দ্বে সমাজজীবন অশান্ত হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের প্রবল ব্যক্তিত্ববোধজনিত নিঃসঙ্গতা। আপোষহীন মানসিকতাও মানুষকে পরস্পরের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আত্মসুখসর্বস্ব মানুষ নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে অন্যের কথা ভাববার মত সময় বা মানসিকতা নেই। এই মনোভাব একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরিয়েছে। যৌথ পরিবারের অন্তত একটা ভাল দিক ছিল। একটি যৌথশক্তি সেই পরিবারকে সজীব করে রাখত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রবল হওয়ায় সেই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। অথচ কোন বিকল্প ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যৌথপরিবার ভেঙ্গে পড়লেও নূতনভাবে সেখানে একটা সংঘজীবন গড়ে উঠেছিল—কমিউনিজম্, সোস্যালিজম্ এর প্রমাণ। কিন্তু আমাদের দেশের সমাজ এই ধরণের আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে এই সমাজ শুষ্ক হতে হতে ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়ে।[২৪]

এদিকে নগর সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট মানুষের কাছে অনুন্নত গ্রামের আকর্ষণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। হতশ্রী গ্রামের কষ্টকর জীবন অপেক্ষা শহরের আদব-কায়দা তারা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে। পরিস্থিতি ও পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারা ও মানসিকতার পরিবর্তন হতে থাকে। পুরোনো কর্মসাধ্য উদ্যমী জীবনযাত্রার চেয়ে সহজসাধ্য জীবনযাত্রার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। বিদেশী ভাষা শিক্ষা অন্বেষণে স্বদেশী সংস্কৃতি লুপ্ত হতে শুরু করে। এইভাবে মানুষ জাতীয় ঐতিহ্য বিস্মৃত হতে থাকে। একদিকে নূতন সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার অক্ষমতা, অন্যদিকে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা থেকে সরে আসা—এদুটি মনোভাব মানুষকে বিভ্রান্ত করে তোলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়

নগরজীবনের নানারকম দুর্নীতি, নানাধরণের আসক্তি, মদ, বারবণিতাসঙ্গ, নারীধর্ষণ, হত্যা, জালিয়াতি, চুরি ইত্যাদি। বিদেশী শাসনের নিষ্পেষণে মানুষ জীবন সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের ভেতরের সুন্দর অনুভূতিগুলি মরে যাচ্ছিল, তারা বাঁচার জন্য নূতন আশা, উৎসাহের আলো দেখতে পারছিল না।[২৫]

এসময় নারীরা তাদের সীমিত গণ্ডী পেরিয়ে অনেকখানি এগিয়ে আসে। স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২৬] শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবিকা, স্বাধীনতা-সংগ্রাম সব দিক দিয়েই নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে এগিয়ে চলার চেষ্টা করে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৯২১ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে হাজার হাজার নারী স্বেচ্ছায় হাসিমুখে কারাবরণ করেছে। এদের মধ্যে সধবা, বিধবা, অবিবাহিতা নারীর অবদান কম নয়। এইসব রাজনৈতিক কাজকর্ম করার ফলে নারী নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে এবং তারা বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে।[২৭] দ্রুতহারে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা, কিছু কিছু কলেজে সহশিক্ষা এই ব্যাপারে অনেকখানি সহায়তা করেছে৷ অনেকসময় এর কুফলও দেখা গেছে৷ কারণ কখনো কখনো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক যুবতীর মেলামেশার ফলে ত্রিকোণ প্রেমের উদ্ভব হয়েছে এবং তার বিষময় ফলও ফলেছে। অবশ্য বিবাহ-পূর্ব প্রেমকে সমাজের অনেকে স্বীকার করে নিতে শুরু করেছে।

সেই সময় মেয়েরা শিক্ষার আলো পেয়ে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। সমাজে তাদের ভূমিকা, মর্যাদা সম্পর্কে নূতন করে তারা ভাবতে শিখেছে। আবার ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষিত মহিলাদের প্রভাব শিক্ষিত হিন্দু মেয়েদের আচার আচরণকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করেছিল। কুসংস্কারে ঘেরা সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে তারা পর্দা ঘোমটার বাধা ঠেলে নূতন জীবনের আস্বাদ পেতে চাইল। সেই সময় আর্থিক দুর্যোগ তাদের ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আসে। নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা অনেক আগেই অন্নসংস্থানের জন্য পুরাতন জীবন ছেড়ে পথে বেরিয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা এ পথে এল মহাযুদ্ধোত্তর কালে। তারা চিরাচরিত জীবন ত্যাগ করে পুরুষদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। তাদের অনেকের জীবনে আসে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তারা এর পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের গুরুত্ব সম্পর্কে নূতন করে ভাবতে শুরু করে। ফলে পারিবারিক জীবনে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। নারী তখন পুরুষের গড়া শাস্ত্র ও নীতিবাদকে অন্ধভাবে মেনে নিতে পারে না। সে অন্ধআনুগত্যহীন সুস্থ সুন্দর জীবনের মধ্যে নিজেকে বিকশিত করতে চায়। হিন্দু বিবাহ বিল (১৯৫৫), হিন্দু উত্তরাধিকার বিল (১৯৫৬), হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ বিল (১৯৫৬) প্রভৃতি নারীর চিন্তাভাবনাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। সে পুরুষে গড়া শাস্ত্র ও নীতিবাদকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে চায় না। শুধু তাই নয় কখন কখন প্রতিবাদও করে। ফলে শুরু হয় সংঘাত। পুরুষ শাসিত সমাজ এতদিন নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করত। নারীর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে যেকোন কাজ করতে দ্বিধাবোধ করত না। প্রয়োজনে নারীকে অসতীর বদনাম দিয়ে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করত। নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য ছিল না। অথচ নিজেরা স্বেচ্ছাচারী, দুশ্চরিত্র, পরনারীতে আসক্ত হলে কোন দোষ নেই। আবার কখনো যৌনচারিত্রিক স্খলনে

নরনারীর সম্মিলিত ইচ্ছা কাজ করলেও নারীকেই মূলতঃ তার বিষময় ফল ভোগ করতে হত। এর সঙ্গে রয়েছে পণপ্রথার মত সামাজিক ব্যাধি যা নারীকে অপমানের চরম সীমায় নিয়ে যায়। অধিকাংশ সময় পণের বাজারে নারীর মূল্য নির্ধারিত হয়। এই ব্যাপারে নারীর নিজস্ব মতামতের কোন গুরুত্ব নেই। ফলে শক্তিশালী পুরুষ সমাজের সঙ্গে মুক্তিকামী নারীর সংঘাতে অধিকাংশ সময় নারীকে অপমানজনক সর্তে সংসারে টিঁকে থাকতে হয়।

দেশ বিভাগের পর বহু উদ্বাস্তু উপযুক্ত কাজ না পেয়ে অতিসাধারণ শ্রমসাধ্য কাজ করতে বাধ্য হয়। সমাজে শ্রমিক, ফেরীওয়ালা, রিক্সাওয়ালা প্রমুখের সংখ্যা বেড়ে চলে। বঞ্চনা আর গভীর হতাশায় ভরা এদের জীবন। ফলে বিক্ষোভ ও অন্তর্সংঘাত বৃদ্ধি পায়। সমাজের নিরুদ্বিগ্নরূপ প্রায় দুর্লক্ষ্য হয়। একদা সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজজীবন যখন আকস্মিক আঘাতে খণ্ডিত হয়ে ভেঙে পড়ে তখন তার সামগ্রিক ঐক্যবোধ শুধু ব্যাহত হয় না, তার জীবনীশক্তিও ক্ষীণ হতে থাকে। বাংলার সমাজদেহ তাই মৃতপ্রায় হয়ে প্রাণের রসধারা থেকে অনেকদূরে সরে আসে।

সূত্র পরিচিতি

১. মেয়েরা বাঁধভাঙ্গা স্রোতের বেগে এগিয়ে আসতে লাগলেন এবং আইন অমান্য করে দলে দলে কারারুদ্ধ হলেন।

—স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কমলা দাশগুপ্ত।
পৃ. ২৪, কলকাতা, ১৩৭০, আশ্বিন।

২. The Political history of Pakistan really begins with the first suggestions of the Urdu poet Iqbal in his presidential address to the Muslim League in 1930, and the agitation for a seperate state begun about the same time by Chaudhury Rahamat Ali.

—The History of India, From the Earliest Times to the Present Day, Michael Edwards, P. 339, England, 1961.

৩. 'Divide et impera' should be the motto of our Indian administration, whether political civil or military.

—India's Fight For Freedom, Sardul Singh Caveeshar, (Second Edition), P. 427, Lahore, 1936.

৪. The seperation of the Harijans as a political group was doubtless the next logical step in the process of the application of the doctrine of 'divide et impera' which has seperated first the Mussalmans from the Hindu, then the Sikhs and then the Harijans.

—Socialism and Gandhism, Dr. B. Pattabhi Seetaramayya. P. 200, S. India, 1938, November.

৫. Intellectuals, such as, lawyers, refromers, editors, teachers and preachers readily came forward to organize and lead the workers.

—Political Involvement of India's Trade Unions, N. Pattabhi Raman, P. 2, Bombay, 1967.

৬. They called for a wide strike of all textile workers on 23 April, 1934, and it received overwhelming response all over the country. The Government of India took alarm and the Communist Party, along with some dozen Trade Union under its control, was declared illegal.

—History of Freedom Movement (Vol-3), R.C. Majumdar, P. 685, October 1963.

৭. The student workers played a vital role in this historic session They did all the detailed work of responsibility of the session to the point of submitting a report of their activities with the accounts of funds delivered to them for the work.

— Students Fight for Freedom, Amarendranath Roy, P. 197, Calcutta, 1967.

৮. সেদিনের প্রথম ও একামাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত দেশ যখন হিটলারের ফ্যাসিস্ত বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলো, ফাসিস্ত জাপানের সৈন্যরা যখন এশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের দেশগুলি একে একে গ্রাস কবতে লাগলো, কলকাতার বুকে যখন পড়লো জাপানী বোমা, তখন বাংলাদেশের প্রায় সর্বস্তরের প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীরা তাঁদের সমস্ত উদ্যম ও শিল্পকর্মকে নিয়োজিত করলেন মানবতার চরম শত্রু এই ফ্যাসিস্ত আপদের বিরুদ্ধে—কারণ শত্রু তখন প্রায় শিয়রে। এই চেতনা থেকেই তখন প্রগতি লেখক সংঘ ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘে রূপান্তরিত হয়.....।

—নাট্যচিন্তা : শিল্প জিজ্ঞাসা, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩৪৫, কলকাতা, ১৯৭৮

৯. প্রত্যেকটি জিনিসের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শুল্ক বসিল, ভারতবাসী তাহার প্রতিটি মুখের গ্রাসে মহাযুদ্ধের দক্ষিণা দিয়া চলিল। নিজের ক্ষুধার অন্ন হইতেও সে বঞ্চিত হইল অবাঞ্ছিত বিদেশী অতিথির রসদ জোগাইতে। শুধু তাহা নয়, নিজের ঘরবাড়ী জমি-জমা চাষ-আবাদ ছাড়িয়া তাহাকে সামরিক প্রয়োজনে পথে দাঁড়াইতে হইল। বেহুঁস সাম্রাজ্যবাদ এইখানেই গণবিপ্লবের বীজ বপন করিয়া রাখিল নিজের অগোচরে।

—মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস : চারু বিকাশ দত্ত, পৃ ১২৯-১৩০, কলকাতা, ১৯৫০

১০. ১৯৩৯ সনে সুরু হয়েছে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র। এই আবহাওয়ায়ও অনেক মার্কিণ ব্যক্তি, সংঘ, সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ভারতীয় স্বাধীনতার স্বপক্ষে রয়েছে।

—বিনয় সরকারের বৈঠকে, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৩৭, কলকাতা, ১৯৪২

১১. The session of the All India Congress Committee ended in the night of August 8 and before the night had ended Gandhiji and other Congress leaders were arrested.

—History of Modern Bengal, Dr. R.C. Majumdar, P. 339, Calcutta, 1981

১২. There was once an occasion (1905) on which the very proposed for the partition of Bengal was seriously objected to; but the year 1946 created such a catastrophic derangement of public brain as emphasised the necessity of the partition which according to the general suffrage proved to be the only means of escape from the clutches of hooliganism.

—Bengal Discovered, Gopen Datta, P. 134. Calcutta, November 20, 1975.

১৩. .....It uprooted more than ten million people, who had to leave their hearths and homes, where they had lived for centuries.

—Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar, Ed : Hariram Gupta, P. 103, Punjab, 1957.

১৪. স্বচ্ছল কৃষি অর্থনীতির সঙ্গী কুটির শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠল কিন্তু বিকল্প শিল্পায়নের কোন ব্যবস্থা ঘটেনি।

—অর্থনৈতিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়তোষ মৈত্রেয়, পৃ ৮৯ রণন, সম্পাদক-দেবকুমার বসু, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৬৭

১৫. Prices first went beyond control after the fall of Rangoon on March 8, 1942. The exodur of population from Burma and the arrival of alien troops in India changed the situation altogether. The price situation was immediately affected.

—Prices in India 1940-70, A.K. Sur, P. 59, Collected Essays on Economic Problems of India. Ed : Himansu Roy, Calcutta, 1978.

১৬. হাজার হাজার নারী যুদ্ধের ফলে আর্থিক দুর্দশায় নিপীড়িত হয়ে বারবণিতার পথ অবলম্বন করেছে।

—মাতৃভূমি, পৃ. ৩১, ১৩৫১, মাঘ।

১৭. .....Concentrated property in a few hands.

—Karl Marx on Colonialism and Modernization, Ed : Shlomo Avineri, P. 33, New York, 1968.

১৮. This disparity assumed the form of a vast economic and social distance between the landlords and the tenants and between the landed and the landless classes.

—Studies in Asian Social Development No. I, Ed : Ratna Datta, P.C. Joshi, P. 8, New Delhi, 1971.

১৯. While in the first world was two million acres of new land had been brought under the plough, immediately after the war the acres fell back into the forest condition's and became the happy hunting grounds for the Lords.

—Some Fundamentals of the Indian Problems, Dr. Pattabhi Sitaramayya, P. 87, Bombay, 1946, July.

২০. উৎপাদন প্রণালীই সামাজিক রাজনৈতিক মানসিক প্রগতির ধারা নিয়ন্ত্রিত করে।

—কার্ল মার্কস, মন্মথ সরকার, পৃ. ১০৪, কলকাতা, ১৯৫১

২১. In 1951-52 there were about 4, 600 registered trade unions in the country. Their number was only 700 in 1938-39.

—Indian Economics : An Introduction, A. N. Agarwala, P. 138, Allahabad, 1957.

২২. Political forces and increasing economic aspirations are much more responsible for the prevelence of urban and industrial unrests than any other cause.

—Dimension of poverty and progress in India.

—A Dualistic Approach, G.P. Mishra, Collected Essays on Economic Problems of India, Ed : Himansu Roy, P. 32, Calcutta, 1978.

২৩. The modern educational forces and tendencies in civilisation are breaking up this old order.

—Studies in Indian Social Polity, Bhupendranath Datta, P. 458, Calcutta, 1944.

২৪. হিন্দু সমাজ তাহার প্রাচীন সঙ্ঘজীবন ত্যাগ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে নবযুগের সঙ্ঘ জীবনের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, ইহা হিন্দু সমাজের পক্ষে একটা মর্মান্তিক সমস্যা।

—ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু, প্রফুল্ল কুমার সরকার, পৃ ৬৩, কলকাতা, ১৯৬৩

২৫. .....being under foreign domination, the people of the subsistence sector viewed life in an extremely callous manner so that it was very difficult to kindle new hopes and enthusiasm in their hearts.

—Indian Economy : Its Nature and Problems, Alok Ghosh, P. 38, Calcutta, 1977.

২৬. স্ত্রী স্বাধীনতা ও শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করে। ১৯৩২-৩৭ পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে দেখা যায় এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশে হিন্দুছাত্রীদের সংখ্যা কলেজে শতকরা ১১.১৬, স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে ১১.১৪, স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে ৮৪.৯ এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ৩০.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

—বাংলাদেশের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), রমেশচন্দ্র মজুমদার পৃ. ৫৫৯, কলকাতা, ১৯৭৫

২৭. মেয়েদের এইসব রাজনৈতিক কাজকর্মের ফলে নারীত্বের আন্দোলনটা নানাদিক থেকে শক্তি অর্জন করতে পেরেছে। ১৯৩১-৪৪ সনের ভেতর বংগনারীদের নানা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কাজকর্ম এই আন্দোলনকে আরও বড় করে তুলেছে।

—বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী, হরিদাস মুখোপাধ্যায় পৃ. ৪১. কলকাতা, ১৯৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

● নাটকের সিদ্ধান্ত বাক্য

নাটক হচ্ছে মানবজীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতযুক্ত, অঙ্কদৃশ্যসমন্বিত সংলাপময় দৃশ্য শ্রাব্য সাহিত্য। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

যো য: স্বভাবো লোকস্য নানাবস্থান্তরাত্মকঃ।
সোহঙ্গাভিনয়সংযুক্তো নাট্যমিত্যভিধীয়তে॥[১]

সুখ-দুঃখ সমন্বিত লোকজীবনকে অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদানের সহায়তায় ভাষাশিল্পের (সংলাপ) মাধ্যমে নাটকে রূপদান করা হয়। মূলত: অভিনয়ের জন্য মঞ্চে উপস্থাপিত করা হয় বলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নাটক সমাপ্ত হয়। এজন্য একে Time art বলে।

বিখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদরা মনে করেন, কোন নাটক লিখতে গেলে প্রথমে তার সিদ্ধান্তবাক্য স্থির করা প্রয়োজন। এজন্য নাট্যকাহিনীকে আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত একটিমাত্র সরলবাক্যে রচনা করা বাঞ্ছনীয়। সিদ্ধান্ত বাক্য ব্যতীত সার্থক নাটক রচনা করা সম্ভব নয়।[২] এর মধ্যে কার্যের অবস্থা (the condition of the action), কার্যের কারণ (the cause of the action) ও কার্যের ফল (the result of the action)-এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুদর্শনের মত। সিদ্ধান্ত বাক্যটি সুগ্রথিত ও ইঙ্গিতবাহী হবে। এর মধ্য দিয়ে নাটকের রূপ-রেখাটি সুন্দরভাবে ধরা পড়বে। এজন্য নাট্যকারকে মূলভাব (root idea) স্থির করে অগ্রসর হতে হয়। এর ফলে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের (definite goal) উপর ঘটনা কেন্দ্রীভূত হয়। এইভাবে নাটকে অখণ্ডগতির সৃষ্টি করা হয়। একেই নাটকের সত্তা (essence) বলা যায়।[৩] সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তবাক্য ব্যতীত কোন বিশেষ ভাবনা বা ঘটনা সার্থক রূপ পেতে পারে না। সিদ্ধান্তবাক্য নাট্যকারকে অভ্রান্তভাবে স্থির লক্ষ্যে নিয়ে যায়। যদি কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তবাক্য না থাকে তবে নাট্যকার প্রতিমুহূর্তে বিভ্রান্ত হবেন, কাহিনী-গ্রন্থনে শিথিলতা দেখা দেবে, বহু বিশৃঙ্খল ঘটনার সমাবেশে নাট্যসংহতি ও সুষ্ঠু নাট্যগতি ব্যাহত হবে, মূল বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে না ও প্রার্থিত রস সৃষ্ট হবে না। সিদ্ধান্তবাক্যের মধ্যে চরিত্রের বিশিষ্টতা, দ্বন্দ্ব ও পরিণতি—এই তিনটি বিষয় ধরা পড়ে। একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত বাক্য ব্যতীত এটি সম্ভব নয়।[৪] সিদ্ধান্তবাক্য হচ্ছে একটি বীজ। এই বীজ ধীরে ধীরে সুন্দর নাট্যবৃক্ষে পরিণত হয়। একে অবলম্বন করে নাটক সুষম ছন্দোবদ্ধ রূপাবয়ব লাভ করে।

● নাটকের কথাবস্তু

যে কোন নাটকে সিদ্ধান্ত বাক্যের পর কথাবস্তু (theme) স্থির করে নেওয়া প্রয়োজন। একে কাহিনীর নির্যাস বলা যেতে পারে। অর্থাৎ নাট্যকাহিনীর বিস্তৃতি কিভাবে হবে এটি তারই একটি সংক্ষিপ্তরূপ। একে গল্প গড়ে তোলার পথনির্দেশ (story line) রূপেও ধরা যেতে পারে। সমস্ত মহৎ বা ভাল নাটক একটি বিশেষ কথাবস্তু অবলম্বনে গড়ে ওঠে। একটি নির্দিষ্ট কথাবস্তু ব্যতীত সার্থক নাটক রচনা করা প্রায় অসম্ভব। যে লেখক মহৎ উদ্দেশ্য ও কথাবস্তুর স্পষ্ট ধারণা নিয়ে নাটক রচনা করেন তিনি সহজে বিপথগামী হন না।[৫] প্রকৃতপক্ষে নাট্য রচনার ক্ষেত্রে কথাবস্তুর ভূমিকা গভীর মহত্ত্বপূর্ণ। এটি ব্যতীত নাট্যদেহ সৃষ্ট হয় না। তাই কথাবস্তু নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের অন্যতম।[৬] কথাবস্তু নাট্যকাহিনী বা গল্পের (story) চুম্বক স্বরূপ।

কার্যকারণ সমন্বিত ঘটনার সমন্বয়ে একটি নাটকের কথাবস্তু গড়ে ওঠে। চরিত্রের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নাটকীয় ঘটনা অগ্রসর হয়। আবার ঘটনার মধ্য দিয়ে চরিত্রের মনোজগতের চিন্তা ভাবনা, আবেগ অনুভূতি, গতি-প্রকৃতি প্রকাশিত হয়। ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্রের বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের বিভিন্ন কার্যাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক কথাবস্তুর অবলম্বন। অনেক নাটকে অবশ্য কথাবস্তুকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় না। সেখানে ঘটনাবলীর মধ্যেও কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। বিশেষ কোন মনোভাব প্রকাশের জন্য কতকগুলি ঘটনার মালা গাঁথা হয় মাত্র। এ প্রসঙ্গে Bertolt Brecht (1898-1956)-এর Epic রীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ জাতীয় নাটকে কাহিনীর আকর্ষণ নেই। কতকগুলি ঘটে যাওয়া ঘটনার যেন সার্থক বিবৃতি দেওয়া হয়। এজন্য এ জাতীয় নাটকাভিনয়ে empathy-র স্থান নেই। এখানে প্রবল ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, অভিনেতাও চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যান না এবং এতে সর্বপ্রকার মায়ামোহকে (illusion) এড়িয়ে চলা হয়।

নাটকে কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। Aristotle নাটকে কাহিনীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, চরিত্র ঘটনার সহকারী হিসেবে আসবে।[৭] কারণ নাটকের বৃত্ত যদি দুর্বল হয়, তবে সুন্দর চরিত্র-চিত্রণ এবং নাটকে মানুষের জীবন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত হলেও সে নাটক উন্নতশ্রেণীর শিল্প বলে বিবেচিত হবে না এবং তা মঞ্চসাফল্যও লাভ করবে না। কিন্তু দুর্বল চরিত্র-চিত্রণ এবং মানবজীবন সম্পর্কে বিশেষ কোন বক্তব্য না থাকলেও নাটকের ঘটনাবলী আকর্ষণীয় হলে সে নাটক দর্শকমন জয় করতে পারে। অনেক তাত্ত্বিক এই বিষয়ে Aristotle-এর মতকেই মর্যাদা দিয়েছেন।[৮] কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে B. Bosanquet তাঁর 'History of Aesthetic' গ্রন্থে এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার রূপ নিয়েই বৃত্ত গড়ে ওঠে। তাই চরিত্র বৃত্তের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায়, একালের নাটকে চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে যে সব জটিলতা ও সূক্ষ্মতা দেখা দিয়েছে Aristotle-এর সময়কার নাটকে তা ছিল না। তখন মানুষের সহজ সরল গুণাবলী নিয়েই নাট্যচরিত্র গঠন করা হত। ফলে নাটকের চরিত্র ও ঘটনা দর্শকের পরিচিত ছিল এবং চরিত্রের পরিণতি দর্শক জানতেন। কেবল কৃতিত্বের সঙ্গে নানা ঘটনা সাজিয়ে চরিত্রের সেই পরিণতি নাট্যকার দর্শক সম্মুখে তুলে ধরতেন। তাই ঘটনা সাজানোর ওপরই জোর কিছু বেশী দেওয়া হত বলে মনে হয়।

আসলে নাটকে চরিত্র ও কাহিনীর সমান প্রাধান্য রয়েছে। কাহিনী না থাকলে চরিত্রের কথা প্রায় চিন্তা করা যায় না, আবার চরিত্রের বিভিন্ন প্রকার কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা, আবেগ অনুভূতি ব্যতীত কাহিনী গড়ে উঠতে পারে না। এক কথায় চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও নানা মানসিকতার মধ্য দিয়ে কাহিনী গড়ে ওঠে। আবার কাহিনীর মধ্য দিয়ে চরিত্র বিকশিত হয়। তাই নাটকে কোনটির মর্যাদা কম নয়। সার্থক নাটক রচনা করতে হলে নাট্যকারকে গল্প ও চরিত্র—এই দুটি বিষয়ের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিতে হবে।

● **নাটকের নামকরণ**

নাটক রচনার পর একে একটি বিশেষ নামে চিহ্নিত করতে হয়। নামকরণের মাধ্যমেই নাটকের মূল বক্তব্যকে অনেক সময় পাঠকমনে সঞ্চারিত করা যায়,—"নামকার্যং নাটকস্য গর্ভিতার্থ প্রকাশনম্।"[৯] যথা, ভাসের 'উরুভঙ্গ", 'অভিষেক', 'স্বপ্নবাসবদত্তা'। নামকরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষতা ও স্পষ্টতা প্রধানতঃ কাম্য। ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণও নাটকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'রাজা' (১৯১০), 'ডাকঘর' (১৯১২) 'রক্তকরবী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৫) প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেখনে ইঙ্গিতময়তা নামকরণকে প্রভাবিত করে। আবার নাটকের প্রকৃতি নামকরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক—এই ধরণের স্পষ্ট শ্রেণীবিভক্ত নাটকের নামকরণ প্রধানতঃ নায়ক নায়িকা বা কেন্দ্রীয় চরিত্র অনুসারে হয়ে থাকে—

"নায়িকা নায়কখ্যানাং সংজ্ঞা প্রকরণাদিষু"।[১০]

যথা, কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র', ভবভূতির 'মালতী মাধব'। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩), 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১), গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) 'জনা' (১৮৯৪), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মালিনী' (১৮৯৬)র উল্লেখ করা যায়। মূলভাব বা ঘটনা (মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ১৮৬০, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', ১৮৬০, গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' ১৯০৫, দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' ১৯০৮, রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ১৮৯০ ইত্যাদি) অবলম্বনে নামকরণ হতে পারে। অনেক সময় মূল দ্বন্দ্ববস্তুকে কেন্দ্র করে নামকরণ হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭) 'নরনারায়ণ' (১৯২৬) নাটক উল্লেখযোগ্য। এই নাটকের মূল দ্বন্দ্ববস্তু—পুরুষকার বড় না দৈব বড়। নাটকের প্রথম থেকে এই দ্বন্দ্বের শুরু ও নাটকের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান। কখনো কখনো বিশেষ বস্তুর নামানুসারে নামকরণ হয়। রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' (১৯৩২) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'রথের রশিকে' অবলম্বন করে সমাজের উচ্চনীচ শ্রেণীর ভেদাভেদ দূর করে এগিয়ে চলার কথা এই নাটকে বলা হয়েছে। তবে নাটক যে নামেই চিহ্নিত হোক না কেন নাটকের ভাব, চরিত্র, ঘটনার সঙ্গে নামকরণের অবশ্যই সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্চে অভিনীত বিধায়কের নাটকের সিদ্ধান্তবাক্য, কথাবস্তু, নামকরণ ও নাটকের মধ্যে যুগপ্রভাবেরর আলোচনার অবতারণা করা হচ্ছে।

।। থিয়েটারী নাটক ।।

মেঘমুক্তি

(প্রথম অভিনয় : ১৯৩৮, ১৩ জুলাই, রঙমহল)

সিদ্ধান্তবাক্য : স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝির অবসানে সংসারে শান্তি আসে।

কথাবস্তু : প্রদ্যোত নামে এক যুবক তার যুবতী পত্নী অণিমার অগোচরে তার সদ্য মৃত অধ্যাপকের যুবতী কন্যা গীতাকে দেখাশোনার দায়িত্ব নিলে পতি-পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির শুরু হয়। প্রদ্যোতের বন্ধু স্বপনের কুচক্রান্তে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ীর প্রচেষ্টায় স্বামী-স্ত্রীর অভিমানের মেঘ কেটে যায় এবং সংসার পুনরায় হাসি খুশিতে ভরে ওঠে। এই কথাবস্তু অবলম্বনে পরিবার-কেন্দ্রিক নাটকটি রচিত হয়েছে।

নামকরণ : পারিবারিক জীবনে যে মেঘ সঞ্চারিত হয়েছিল, নাটকের শেষে মেঘ সরে যাওয়ায় এই নাটকের নামকরণ হয়েছে 'মেঘমুক্তি'।

বর্তমান নাটকের পূর্বনাম ছিল 'দেহ-যমুনা'। নারীর দেহযমুনায় স্নান করে ডঃ স্বপন রায় তার কামনা চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। তাই এই ধরণের নামকরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কাহিনীর কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে 'মেঘমুক্তি' রাখা হয়।

যুগপ্রভাব : আমাদের দেশে নারীশিক্ষা প্রচলনের পূর্বে বিবাহিত জীবনে সাধারণতঃ স্ত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে স্বামী বিশেষ গুরুত্ব দিত না। অধিকাংশ সময় স্ত্রীকে আত্মঅবমাননাকর সর্ত মেনে নিতে হত। কিন্তু পরবর্তীকালে দ্রুত নারীশিক্ষা বিস্তার, ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল নারীজীবনের প্রভাবে এদেশে মেয়েদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। এই সামাজিক পটভূমিকায় নাটকের কথাবস্তু গড়ে উঠেছে।

মাটির ঘর

(প্রথম অভিনয় ১৯৩৯, ৯ সেপ্টেম্বর, রঙমহল)
এই নাটকটি পরে চলচ্চিত্ররূপে মুক্তি পায়।

সিদ্ধান্তবাক্য : সন্তানের জীবনের ব্যর্থতা স্নেহময় পিতার জীবনকে বিষাদময় করে তোলে।

কথাবস্তু : তন্দ্রা, নন্দা, ছন্দা—এই তিনকন্যাকে নিয়ে বিপত্নীক পিতা সত্যপ্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তির নীড় রচনা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই কন্যার (তন্দ্রা ও ছন্দা) ব্যর্থপ্রেম ও স্বামীনির্যাতিত অসুখী অন্য এক কন্যার (নন্দা) আত্মহত্যা স্নেহময় পিতাকে তীব্র আঘাত করে এবং সংসারের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে শোকগ্রস্ত উন্মাদ-প্রায় পিতা হাহাকারে ভেঙ্গে পড়েন।

সত্যপ্রসন্নর পরিবারকে কেন্দ্র করে নাট্য-কাহিনী গড়ে ওঠায় 'মাটির ঘর'কে পারিবারিক নাটক বলা যায়।

নামকরণ : মাটির ঘর প্রবল ঝড় ঝাপটায় সহজেই ভেঙ্গে যায়। এখানে বিপত্নীক স্নেহময় পিতার গড়ে তোলা স্নিগ্ধ সংসার মাটির ঘরের মত আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গে পড়ল। তাই এই নাটকের নাম 'মাটির ঘর'।

যুগপ্রভাব : বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা অনেক নারী শিক্ষার মূল আদর্শকে ঠিকমত গ্রহণ করতে পারেনি। তাই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তারা পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশাকে প্রশ্রয় দিত এবং অনেক সময় এর ভয়াবহ পরিণতি তাদের জীবনকে বিধ্বস্ত করত। আবার অর্থনৈতিক স্বাধীনতাহীন বিবাহিতা নারীদের অধিকাংশ সময় অপমানজনক সর্ত মেনে নিতে হত। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য নাটকের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে।

বিশ বছর আগে

(প্রথম অভিনয়-১৯৩৯, ২৭ ডিসেম্বর, রঙমহল)
উক্ত নাটক পরবর্তীকালে চলচ্চিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

সিদ্ধান্তবাক্য : প্রেমাবদ্ধ নরনারীর মধ্যে প্রেমিকরূপে অন্য ব্যক্তির অনুপ্রবেশ সর্বনাশ ঘটায়।

কথাবস্তু : প্রেমিক প্রেমিকা দীপক ও তমসার মধ্যে তমসার প্রতি অনুরক্ত প্রদীপের অনুপ্রবেশে তিনজনের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ঘটনাচক্রে গুলির আঘাতে প্রদীপ নিহত হলে হত্যাপরাধে ঘটনাস্থলে উপস্থিত দীপকের বিশ বছরের জন্য দ্বীপান্তর হয়। বিশ বছর আগে যে স্থানে এই শোকাবহ ঘটনা ঘটেছিল নায়কের সেখানে পুনরায় আগমন উপলক্ষে অতীত ঘটনার প্রতি আলোকপাত (flash back) প্রথায় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং প্রকৃত হত্যাকারী আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমেরিকান নাট্যকার Elmer Rice (1892) তাঁর On Trial (1914) নাটকে চলচ্চিত্র থেকে Flash back রীতি গ্রহণ করেন।[১১] আমাদের দেশে বিধায়ক ভট্টাচার্য এই নাটকের প্রভাবে 'বিশ বছর আগে' নাটকটিতে এই রীতি গ্রহণ করেছেন, নাট্যকার বিধায়ক-ই প্রথম বাংলা নাটকে এই রীতির প্রচলন করেন।

নামকরণ : বিশ বছর পূর্বের কাহিনী flash back রীতিতে প্রদর্শিত হয়েছে বলে এই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে 'বিশ বছর আগে'।

যুগপ্রভাব : বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে কলেজ স্তরে যে সহশিক্ষা শুরু হয় সেখানে ছাত্রছাত্রীদের মেলামেশার মধ্য দিয়ে কখন কখন ত্রিকোণ প্রেমের ক্ষেত্র তৈরী হয়.এবং অনেক সময় তার বিষময় ফলও ফলে। নাট্যকাহিনীতে তৎকালীন সামাজিক ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে।

'মেঘমুক্তি', 'মাটির ঘর' ও 'বিশ বছর আগে' নাটক তিনটির কথাবস্তু সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"তাঁর 'মাটির ঘর', 'মেঘমুক্তি' ও 'বিশ বছর আগে' প্রভৃতি অতিশয় মঞ্চ সফল নাটক এখনও অদ্ভুত জনপ্রিয়। শহর থেকে পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর নাটকের জয়জয়াকার। সে যুগের গিরিশচন্দ্র যেমন দর্শকের মন বুঝতে পারতেন—সাধারণে কি চায়, তেমনি আধুনিককালে এই নাট্যকার একালের জনসাধারণের মনের কথা জানেন.....।"[১২]

মালা রায়

(প্রথম অভিনয়-১৯৪০, ১৪ আগষ্ট, রঙমহল)

সিদ্ধান্তবাক্য : অবাঞ্ছিত গুপ্তকাহিনীর প্রকাশ সামাজিক মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে।

কথাবস্তু : রূপসী মালা ঘটনাচক্রে বারবার দুর্ভাগ্যের শিকার হয়। বিবাহের অল্পদিনের মধ্যে সে স্বামী সুবিনয়কে হারায়। পরে স্বামীর বিবাহিত বন্ধু অপরূপ তার প্রেমে উন্মাদ হয়ে উঠলে সে অপরূপের আশ্রয় ত্যাগ করে কিছুদিন বেদেনীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত যখন সে জানতে পারে, এক লালসার ফলে জন্ম হওয়ায় সমাজে সে অবাঞ্ছিত তখন গভীর দুঃখে আত্মহত্যা করে।

নামকরণ : কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামানুসারে এই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে 'মালা রায়'।

যুগপ্রভাব : লালসার বশবর্তী হয়ে লোলুপ নরনারী সমাজে যে নানা অঘটন ঘটায় তারই পটভূমিকায় এই নাটকের কাহিনী রচিত হয়েছে।

কুহকিনী

(প্রথম অভিনয়-১৯৪১, ২২ ফেব্রুয়ারী, মিনার্ভা)

সিদ্ধান্তবাক্য : প্রেমের শক্তি সব বাধা অতিক্রম করে সমাজকে বীভৎসতা মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

কথাবস্তু : অনার্য কামরূপ রাজ্যের রাণী রত্না সে দেশের তন্ত্রসিদ্ধ পুরোহিত বিপ্রদেবের নির্দেশে যাদুদণ্ডের সাহায্যে আর্যদেশের সভ্য মানুষকে পশুতে পরিণত করতেন। কিন্তু কামরূপে আগত কাশীরাজপুত্র জয়ন্তর রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে রাণী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। এদিকে পুরোহিত জয়ন্তকে পশুতে পরিণত করতে রাণীকে নির্দেশ দেন। রত্না সেই নির্দেশ অমান্য করলে ক্রুদ্ধ পুরোহিত উভয়কে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দেন। প্রিয় সহচরী লীলার সহায়তায় রাণী কাশীরাজপুত্রকে নিয়ে পলায়নে সক্ষম হন। স্বরাজ্যে ফিরে কাশীরাজপুত্র কামরূপের রাণীকে বিবাহ করেন। এদিকে রাণীর মধ্যে পুরোহিতের প্রভাব বর্তমান থাকলে রাজ্যের

অকল্যাণ হবে—জনসাধারণের মধ্যে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। রত্নাকে পুরোহিতের প্রভাব থেকে মুক্ত করার বাসনায় জয়ন্ত পুরোহিতকে হত্যা করতে কামরূপ গমন করেন। ইতোমধ্যে তাঁর প্রিয় সহচর সুন্দরের কৌশলে পুরোহিতের মৃত্যু হলে সব অশান্তির অবসান ঘটে।

নামকরণ : অনার্য কামরূপ রাজ্যের রাণী রত্না সেই রাজ্যের তন্ত্রসিদ্ধ পুরোহিতের অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবে কুহকশক্তির অধিকারিণী ছিলেন বলে তাকে কুহকিনী বলা হত। তাই এই নাটকের নাম 'কুহকিনী'।

যুগপ্রভাব : ধর্মীয় বিশ্বাসের নামে পুরোহিত সম্প্রদায়ের ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রতি আস্থা ও নানাপ্রকার বীভৎস ক্রিয়া-কলাপ তৎকালীন বাঙালী সমাজকে যে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করেছিল তারই প্রভাব এই নাটকে রয়েছে। এছাড়া এই নাটকে আর্যদের সম্পর্কে অনার্যদের মনোভাব প্রকাশের মধ্যে গান্ধীজির হরিজন আন্দোলনের ছায়াপাত ঘটেছে। এই সামাজিক পটভূমিকায় উক্ত নাটকটি চিত্রিত।

রক্তের ডাক

(প্রথম অভিনয় রজনী : ১৯৪১, ১২ জুলাই, রঙমহল)
পরবর্তীকালে 'রক্তের ডাক' নাটকটির চলচ্চিত্ররূপ দেওয়া হয়।

সিদ্ধান্তবাক্য : রক্তেমেশা দীর্ঘকালীন সামাজিক সংস্কার প্রেমিক প্রেমিকার মিলনে অন্তরায় সৃষ্টি করে চরম দুঃখ ডেকে আনে।

কথাবস্তু : শ্বশুর বাড়ীর অত্যাচারে জর্জরিতা গ্রাম্যবধূ বুলু আত্মহত্যা করতে গেলে বাল্যকালের খেলার সাথী বর্তমানে জমিদার শুভেশের অনুপ্রেরণায় শহরে গিয়ে নিজের চেষ্টায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার নূতন নামকরণ হয় শতাব্দী। শতাব্দী ব্রাহ্মণ ও বিবাহিতা বলে কায়স্থ শুভেশকে ভালবাসলেও সামাজিক কারণে তাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে না পেরে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেয়। শুভেশও তাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু তাকে না পেয়ে ব্যর্থপ্রেম ও অন্তর্জ্বালায় সে আত্মহত্যা করে।

নামকরণ : যে সামাজিক প্রথা মানুষের রক্তে মিশে আছে সেই প্রথায় তাকে শতাব্দী তার প্রেমিক শুভেশের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারেনি। তাই এই নাটকের নাম দেওয়া হয়েছে 'রক্তের ডাক'।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—উক্ত নাটকটি অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে 'নাট্যনিকেতনের' জন্য লিখিত হয়। তখন এর নাম ছিল 'শতাব্দীর প্রেম', কিছুদিন পরে এর নূতন নামকরণ হয় 'নরনারী'। কিন্তু নাটকটি

'নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হয়নি। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'নাট্যনিকেতন' ত্যাগ করে 'নাট্যভারতী'তে' যোগ দিলে তাঁর কথামত নাটকটি 'নাট্যভারতী' কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দেওয়া হয়। সেখানে 'রক্তের ডাক' নামকরণ করা হয়। সেখানেও নাটকটি অভিনীত হয়নি। শেষ পর্যন্ত দুর্গাদাস 'রঙমহল'-এ যোগদান করলে এটি পূর্বোল্লেখিত নামে 'রঙমহল'-এ মঞ্চস্থ হয়।'[১৩]

যুগপ্রভাব : ১৯৫৬ সালে হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ বিল প্রবর্তিত হয়। এর পূর্বে বিবাহিত নারী স্বামী পরিত্যাগ করে অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে পারত না, ...এটি একটি সামাজিক নিয়ম ছিল। এছাড়া সে সময় জাতিভেদ প্রথাও সমাজে প্রবল ছিল। এই দুটি বিষয় মানুষের মনে রক্তে মেশা গভীর সংস্কারের মত কাজ করত। শতাব্দীও এই সংস্কারগুলি অতিক্রম কবতে পারেনি। এই সামাজিক পটভূমিকাব ওপব নাটকটি গঠিত।

তাইতো

(প্রথম অভিনয : ১৯৪৪, ৩ ফেব্রুয়ারী, শ্রীরঙ্গম)

সিদ্ধান্তবাক্য : বিবাহ বিষয়ে নাবীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলে বিবাহ সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব হয়।

কথাবস্তু : উগ্রস্বভাবের জন্য জীবনময় বাবুর দুই কন্যা মল্লিকা, বল্লিকার বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বল্লিকার বিবাহ স্থির হওয়ায় মল্লিকা বিবাহ ব্যাপারে নিজেই উদ্যোগ নেয়। এদিকে সম্পত্তি পাবার আশায় মানসিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমর নামে এক যুবক বিধবা-বিবাহে সম্মত হয়। বিবাহোৎসুক মল্লিকা তার বান্ধবী মালবিকার সহায়তায় বিধবা সেজে সমরের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটিত হলে সমর বিধবা-বিবাহ করেনি বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং দুই কন্যার বিবাহ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হওয়ায় জীবনময়বাবু মানসিক শান্তি পান। উক্ত কথাবস্তু-ই এই পারিবারিক নাটকটির অবলম্বন।

নামকরণ : অজানা ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন নাট্যচরিত্র প্রত্যেক দৃশ্যের শেষে বলে উঠেছে.....'তাই তো'। এই কারণে নাটকের নামকরণ করা হয়েছে 'তাইতো'। বারবার এই উক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকের পূর্বনাম ছিল—'এই কি লেটেস্ট'।

যুগপ্রভাব : স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনৈতিক কাজকর্মে নারীরা অংশগ্রহণ করায় সে সময় থেকে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং তারা অনেক কাজ পুরুষের সাহায্য ব্যতীত করতে সক্ষম হয়। বাংলা সমাজের নারীপ্রগতি, বিধবাবিবাহ ও বিধবাবিবাহের প্রতি অনীহার কথা এই নাটকে স্থান পেয়েছে।

তেরশো পঞ্চাশ

(প্রথম অভিনয়, ১৩৫১, ২৯ বৈশাখ, রঙমহল)

সিদ্ধান্তবাক্য : আকাল সম্পন্ন পরিবারকেও ধ্বংস করে।

কথাবস্তু : গ্রামের সম্পন্ন চাষী তারিণী মণ্ডল প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট আকালের সময নিঃস্ব হয়ে পুত্র শিবু ও কন্যা গৌরীকে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে আশ্রয নেয়। সেখানে চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাদের দিন কাটতে থাকে। একদিন তারিণী খাদ্য সংগ্রহের জন্য রাস্তায় বের হলে গাড়ী চাপা পড়ে মাবা যায। মৃত পিতাকে নিয়ে শিবু হাসপাতালে গেলে গৌরী একাকিনী হয়ে পডে। সেই সময় মানব নামে এক ভবঘুরে জমিদার পুত্রের বদান্যতায় (মানব একদা কিছুদিনের জন্য তারিণীমণ্ডলের গৃহে আশ্রিত ছিল) বিপদগ্রস্ত নিরাশ্রয় গৌরী ভগ্নীরূপে তার তৈরী আনন্দআশ্রমে ঠাঁই পায়।

—এই কথাবস্তু নিয়ে সামাজিক নাটকটি গড়ে উঠেছে।

নামকরণ : তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রভাবে এই নাটক রচিত হওয়ায় এর নামকরণ হয়েছে 'তেরশো পঞ্চাশ'।

যুগপ্রভাব : তেরশো পঞ্চাশের বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে।

খবর বলছি

(প্রথম অভিনয়-১৯৫০, ৫ ডিসেম্বর, রঙমহল)
নাট্যকার 'মানস দাশ' ছদ্মনামে এই নাটক রচনা করেন।

সিদ্ধান্তবাক্য : অর্থনৈতিক অসহায়তা এলে সুযোগ সন্ধানীদেব চক্রান্তে মানুষ বিপর্যস্ত হয়।

কথাবস্তু : দেশ বিভাগের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিহীন ও সর্বহারা লক্ষ লক্ষ নরনারী এদেশে চলে আসে। এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে ভবতোষ নামে এক অসৎ, চক্রান্তকারী ব্যক্তি এক উদ্বাস্তু দম্পতির (চন্দ্রমোহন-দীপা) মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। অনেক দুঃখ-দুর্দশার পর স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটে। কিন্তু মানসিক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দীপা মিলন মুহূর্তে তীব্র উত্তেজনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যামূলক সামাজিক নাটক।

নামকরণ : উদ্বাস্তু সমস্যার সময় এই ধরণের নানা ঘটনা দৈনন্দিন সংবাদ হয়ে উঠেছিল। তাই এই নাটকের নাম 'খবর বলছি'।

যুগপ্রভাব : দেশবিভাগের পর যে উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেই রাজনৈতিক ঘটনাজাত অর্থনৈতিক সমস্যার পটভূমিকায় এই নাটক রচিত।

অন্ধদেবতা

(প্রথম অভিনয় : ১৯৫২, এপ্রিল, রঙমহল)
পরবর্তীকালে এই নাটকটির চলচ্চিত্ররূপ দেওয়া হয়।
কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ ছবিটি মুক্তি পায়নি।

সিদ্ধান্তবাক্য : নিঃসহায় দরিদ্র ব্যক্তি সমাজের স্বার্থপর ধনীব্যক্তির অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে বিফল মনোরথ হয়।

কথাবস্তু : প্রশমন নামে এক যুবকের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ধনী ব্যবসায়ী পি.পি. তাকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডি.ভি.র হত্যার কাজে লাগান। কার্যসিদ্ধ হলে পূর্বপরিকল্পনামত প্রশমনকে পি.পি. পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে সে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালায়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক পি.পি.কে শাস্তি দিতে গিয়ে প্রশমন পি.পি'র গুলিতে প্রাণ হারায়। এটি সামাজিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত।

নামকরণ : অসৎ ধনীব্যক্তির অন্যায় ক্রিয়াকলাপ ও দরিদ্রের ওপব তাদেব অত্যাচার দেখলে মনে হয় ভগবান যেন অন্ধ হয়ে গেছেন। তাই তাঁর বিচার ঠিক পথে চালিত হচ্ছে না। বিচারের সর্বশক্তিমান দেবতা যেন অন্ধ। এই ভাব থেকে নাটকের নামকরণ করা হয়েছে 'অন্ধদেবতা'।

যুগপ্রভাব : সাধারণতঃ সমাজের ক্ষমতাশালী অসৎ ব্যক্তিরা অসহায় বিত্তহীন লোকের অর্থনৈতিক অক্ষমতার সুযোগ নেয় ও তাদের নানাভাবে শোষণ করে। উক্ত নাটকে এই অর্থনৈতিক দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

সেই তিমিরে

(প্রথম অভিনয় : ১৯৫২, ৭ ডিসেম্বর, রঙমহল)
উক্ত নাটকটির রচয়িতা বিধায়ক ভট্টাচার্য ও অনিল ভট্টাচার্য।

সিদ্ধান্ত বাক্য : নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুখের সংসার গড়ে ওঠে।

কথাবস্তু : পুরুষের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে থাকার জন্য স্বাহা, শিপ্রা, বনলতা, সন্ধ্যা, তনিমা, অনুপমা প্রমুখ একদল নারী অন্যত্র একত্রে বসবাস করতে শুরু করে। কিন্তু একটি সুন্দর সংসার রচনা করতে গেলে যে নারী ও

পুরুষ উভয়ের সহযোগিতার প্রয়োজন—একথা প্রথমে তারা বুঝতে পারেনি। কিছুদিন পৃথকভাবে থেকে নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে তাদের চেতনা জাগ্রত হয় এবং নরনারী আবার নিজ নিজ গৃহে স্বামীদের কাছে ফিরে আসে এবং যে মেয়েটি (শিপ্রা) অবিবাহিত থাকবে বলে পণ করেছিল সেও শেষ পর্যন্ত বিবাহ করতে স্বীকৃত হয়। এই বিষয়টি বর্তমান সামাজিক নাটকে প্রকাশিত হয়েছে।

নামকরণ : স্ত্রীরা স্বামীদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্য জায়গায় বসবাস করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত সাংসারিক জীবনের তাগিদে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তাই এই নাটকের নাম 'সেই তিমিরে'।

নাটকটির পূর্বনাম ছিল 'পুনর্মূষিকোভব'। সংস্কৃত হিতোপদেশের 'পুনর্মূষিকোভব'-এর নামানুসারে এইরূপ নামকরণ করা হয়। সেই ভাব-ই পরবর্তী নামকরণে রয়েছে।

যুগপ্রভাব : আধুনিক নারীজীবনে পরিবর্তনের হাওয়া লাগলেও তারা যে নরনারী উভয়ের প্রচেষ্টায় গড়া আদর্শ সংসারের মূল্য অস্বীকার করতে পারে না—এই সামাজিক ভাবধারায় এই নাটক রচিত।

পিতাপুত্র

(প্রথম অভিনয় : ১৯৫৫, ১৫ জানুয়ারী, মিনার্ভা)

এই নাটকটি পূর্বে 'আঁধার পথে' নামে অভিনীত হয়—এই তথ্যটুকু, 'পিতাপুত্র' নাটকের 'প্রাক্-পাঠ্য' অংশে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে নাটকটির অভিনয়স্থল ও সময়ের উল্লেখ না থাকায় বর্তমান আলোচনায় তা লিপিবদ্ধ করা গেল না।

সিদ্ধান্তবাক্য : পরিবারের একটি মানুষ বিপথে চালিত হলে তার প্রিয়জন অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে।

কথাবস্তু : একদা মৃত বলে ঘোষিত, পুলিশ অফিসার প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সমীর বর্তমানে এক ডাকাতদলের সদস্য। একদিন ভুলক্রমে শ্বশুরবাড়ীতে ডাকাতি করতে গেলে পত্নী বিনতি তাকে চিনতে পেরে সব ত্যাগ করে তার দলে যোগ দেয়। এক ডাকাতিতে মুখোশধারী সমীরকে চিনতে না পেরে তার সঙ্গে পুত্রবধূকে আলিঙ্গনাবস্থায় দেখে কর্তব্যরত পুলিশ-অফিসার পিতা তাকে গুলিতে হত্যা করেন। শোকে দুঃখে পুত্রবধূ ঘটনাস্থলে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে পুত্র নিজের পরিচয় দিলে হতবাক্ পিতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

এটি সামাজিক নাটক।

নামকরণ : পিতা ও পুত্রের কর্মকাণ্ড নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে বলে এই নাটকের নাম 'পিতাপুত্র' রাখা হয়েছে।

যুগপ্রভাব : স্বদেশীযুগে বিপ্লববাদীরা শোষণকারী ধনীগৃহে ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ করতেন। সেই অর্থের কিছু অংশ দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হত এবং আন্দোলন চালাবার জন্য বাকি অর্থ ব্যয় করা হত। নাট্যকাহিনীতে এই রাজনৈতিক বিষয়ের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ক্ষুধা

(প্রথম অভিনয় : ১৩৬৪, ৬ বৈশাখ, বিশ্বরূপা)
এই নাটক একাদিক্রমে পাঁচশত তিয়াত্তর রজনী চলেছিল।
এটি সোভিয়েত রাশিয়ায় অনূদিত হয়েছে।[১৪]
'ক্ষুধা' পরবর্তীকালে চলচ্চিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

সিদ্ধান্তবাক্য : *অর্থনৈতিক দৈন্য নরনারীর সামাজিক মিলনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।*

কাহিনীবস্তু : স্বদেশ, গজেন, রমেন শিক্ষিত বেকার যুবক। নিজেদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করার জন্য চাকুরী সংগ্রহের চেষ্টা করে তারা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত জীবিকা অর্জনের জন্য স্বদেশ, গজেন কুলি মজুরের কাজ নিতেও দ্বিধা করে না। রমেন চাকুরীর সন্ধানে কলকাতা ত্যাগ করে অনেক দূরে চলে যায় এবং এক জায়গায় প্রশাসনিক কর্মক্ষমতার সুযোগ পেয়ে প্রচুর অর্থোপার্জনে সক্ষম হয় এবং তার দরিদ্র প্রেমিকা মানবীর কাছে ফিরে আসে। কিন্তু পুনর্মিলনের সময় আনন্দের উত্তেজনায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট প্রেমিকার হৃদ্স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়। এই কথাবস্তু সামাজিক নাটকটিতে রূপায়িত হয়েছে।

নামকরণ : এই নাটকের অধিকাংশ চরিত্রের কার্যকলাপ ও আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ক্ষুধার জ্বালা। তাই উক্ত নাটকের নাম 'ক্ষুধা'।

যুগপ্রভাব : পূর্ববঙ্গ ও রেঙ্গুন থেকে আগত অসংখ্য উদ্বাস্তুর জন্য বাংলায় যে চাপের সৃষ্টি হয়েছিল সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রভাবে 'ক্ষুধা'র নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে।

তোমার পতাকা

(প্রথম অভিনয় : ১৯৬২, রঙমহল)

সিদ্ধান্তবাক্য : *নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিকের আদর্শ মানুষকে স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।*

কথাবস্তু : ইংরেজ সরকারের একনিষ্ঠ ভক্ত জমিদার মিঃ তালুকদার ও সরকারী সুবিধাভোগী অন্যান্য লোকদের প্রতিকূলতা অহিংসপন্থী গান্ধীবাদী নেতা অনুকূল বিশ্বাসকে আদর্শচ্যুত করতে চেষ্টা করেও সাফল্যলাভ করতে পারে না। অনুকূল-পুত্র আশিস ও অন্যান্য স্বদেশী যুবকের আত্মত্যাগ জমিদার-কন্যা স্বপ্নার মনে স্বদেশ-চেতনা জাগিয়ে তোলে। অনুকূলের আদর্শে অনুপ্রাণিত পত্নী হেমাঙ্গিনী পুলিশের অবরোধ ভেঙ্গে সাহসভরে পতাকা হাতে এগিয়ে এলে পুলিশের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতার হাত থেকে সেই পতাকা তুলে নিয়ে জমিদার-কন্যা অন্যান্যদেরও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে তোলে।

এটি রাজনৈতিক সমস্যামূলক নাটক।

নামকরণ : পতাকাহস্তে মৃত্যুবরণ ও সেই পতাকা নিয়ে সকলকে স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কথা নাটকে বলা হয়েছে। নাটকের বক্তব্য অনুসারে উক্ত নাটকের নামকরণ করা হয়েছে 'তোমার পতাকা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৈবেদ্য' (১৩০৮) কাব্যগ্রন্থের ২০ সংখ্যক কবিতার "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি" পংক্তির ভাবানুসরণ নাটকের নামকরণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

যুগপ্রভাব : গান্ধীজির অহিংসনীতি, ডাণ্ডি অভিযান, অসহযোগ আন্দোলন, অগ্নিযুগ ও মাতঙ্গিনী হাজরার রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রভাব নাট্য কাহিনীর মূলে ক্রিয়াশীল।

উক্ত নাটক সম্পর্কে নাট্যকার ভূমিকায় বলেছেন—"এর ব্যাক্ গ্রাউন্ড আজকের দিন নয়। অজয় মুখার্জী এবং মাতঙ্গিনী হাজরার সময়কাল।"

মন্দাক্রান্তা ।। জয়-পরাজয়

(প্রথম অভিনয় : ১৯৬৫, ৬ আগষ্ট, মিনার্ভা)

বর্তমান নাটকটি প্রথমে 'মন্দাক্রান্তা' নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এটি 'জয় পরাজয়' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক-কন্যা বিদিশা ভট্টাচার্যের বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

"বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'মন্দাক্রান্তা' নাটকটি প্রথমে এই নামে মুদ্রিত হয় এবং 'একত্রিকা' কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। এর বেশ কয়েক বছর পরে এই নাটকটিই পুনরায় মুদ্রিত হয় 'জয়-পরাজয়' নামে।"

সিদ্ধান্তবাক্য : স্বামী-প্রেমের প্রতি সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রী অপরিণামদর্শী কাজ করলে তার পরিণতি বেদনাদায়ক হয়।

কথাবস্তু : সদাব্যস্ত নাট্য পরিচালক স্বামী সৌমিত্রকে কাছে পাওয়ার জন্য তার স্ত্রী মন্দাকিনী স্বামীর বন্ধু নীলাদ্রির সঙ্গে পরামর্শ করে তার সঙ্গে বাড়ী থেকে চলে যায়। স্ত্রীর এই ধরণের আচরণে সৌমিত্র গভীর আঘাত পায় ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে একই বাড়ীতে অবস্থানকারী নীলাদ্রি মন্দাকিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিবাহের প্রস্তাব দেয় কিন্তু মন্দাকিনী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করে। মন্দাকিনী স্বামীর কা- ফিরে এলেও তাদের মিলনানন্দ একটি মৃত্যুর বেদনায় ডুবে যায়। এটি পরিবারকেন্দ্রিক নাটক।

নামকরণ : 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দের সঙ্গে এই নাটকের নায়িকা চরিত্রের বিশেষ মিল আছে। মন্দাক্রান্তা সপ্তদশ অক্ষরের একটি সংস্কৃত ছন্দ। এর প্রথম, চতুর্থ, দশম, একাদশ, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ বর্ণ গুরু। মহাকবি কালিদাস বিরহকাব্য 'মেঘদূত' রচনা করেন এই ছন্দে—

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া স্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধছায়াতরুষুবসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।[১]

বাংলা কবিতায়ও এ ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'যক্ষের নিবেদন' কবিতায় :

"পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও,—
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও,"

—'মন্দাক্রান্তা' অসমমাত্রা সংখ্যার তথা অসম চালের ছন্দ। ক্রমদীর্ঘায়মান এই ছন্দের সঙ্গে যেন দীর্ঘতম নিঃশ্বাসের অর্থাৎ গভীর দুঃখের যোগ আছে।

এই নাটকের নায়িকার কাজের মধ্যে সমতার অভাব আছে। তাই স্বামীপ্রেমে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে সে প্রেমাভিনয়ে লিপ্ত হয়। এই ছলনের জন্য তার জীবনে অনর্থ ঘটে এবং নাটকের সমাপ্তি হয় দুঃখের মধ্য দিয়ে। এজন্য এ নাটকের নামকরণ 'মন্দাক্রান্তা' করা হয়েছে।

এ নাটকের অন্য নাম 'জয় পরাজয়'। নায়িকা স্বামীকে সম্পূর্ণ নিজের মত করে পেয়ে জীবনপথে জয়ী হতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বামীকে সে ফিরে পেলেও তারই জন্য স্বামী-বন্ধুর আত্মহত্যা তাকে পরাজয়ের গ্লানিতে ভরিয়ে দেয়। তাই এ নাটকের নাম 'জয় পরাজয়'।

যুগপ্রভাব : বিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসার, নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ ও নারী-প্রগতি—এই সামাজিক প্রভাব নাটকে বিধৃত।

অতএব

(প্রথম অভিনয় : ১৯৬৬, ৬ অক্টোবর, রঙমহল)

সিদ্ধান্তবাক্য : কার্যসিদ্ধির জন্য কৌশলের আশ্রয় নিলে সার্থকতা আসে।

কথাবস্তু : মাতৃপিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র সুমিত্রকে মানুষ করার জন্য দোলগোবিন্দ অকৃতদার থেকে যান। তিনি সুমিত্রর বিবাহ দিতে চান কিন্তু চঞ্চল প্রকৃতির সুমিত্র প্রেম করলেও বিবাহ করে সংসারী হতে চায় না। শেষ পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতাত বিরক্ত হয়ে সুমিত্রার প্রেমিকা অমিতাকে স্বয়ং বিবাহ করার এক সাজানো নাটক তৈরীর কৌশল অবলম্বন করলে সে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বিবাহ করতে সম্মত হয়।

এটি পরিবার-কেন্দ্রিক নাটক।

নামকরণ : সহজভাবে কাজে সার্থকতা এল না, 'অতএব' কৌশলে সে কাজ সিদ্ধ করতে হল,—এই নাটকে জ্যেষ্ঠতাত দোলগোবিন্দর কর্মের মধ্য দিয়ে তা-ই দেখানো হয়েছে বলে এর নামকরণ হয়েছে—'অতএব'।

যুগপ্রভাব : বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজের অনেক পরিবার যে বিবাহপূর্ব প্রেমকে সহজে স্বীকার করে নিয়েছিলেন নাট্যকাহিনীতে সেই সামাজিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এন্টনী কবিয়াল

(প্রথম অভিনয় : ১৯৬৬, ২৬ অক্টোবর, কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ)

সিদ্ধান্তবাক্য : শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির পশ্চাতে নারীর প্রেরণা বিশেষ সহায়করূপে ক্রিয়াশীল হয়।

কথাবস্তু : এন্টনী কবিয়াল পর্তুগীজ সন্তান হলেও বঙ্গদেশে তাঁর জন্ম। এই দেশের প্রকৃতি, মানুষ, গান সকলকে তিনি ভালবাসেন। আর সেই ভালবাসার টানে সমাজের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলার বালবিধবা সৌদামিনীকে তিনি বিবাহ করেন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিনি ধীরে ধীরে কবিয়ালরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন—উক্ত বিষয় অবলম্বনে সামাজিক নাটকটি রচিত।

কাহিনীর উৎস : এন্টনী কবিয়াল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর সম্পর্কে এই তথ্য জানা যায় যে, তাঁর পিতৃবংশ ছিলেন পর্তুগীজ, মা এদেশীয়। বাংলাদেশে তাঁর জন্ম। মানসিক ঔদার্য তাঁর ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। সেই উদারতা তাঁর কবিগানের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ায় গানগুলি বিশেষ আবেদনের সৃষ্টি করে।[১৫]

এই নাটক সম্পর্কে নাট্যকার ভূমিকায় বলেছেন—"এন্টনী কবিয়াল অবশ্যই ইতিহাসের মানুষ। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস বিশদ কিছু বলে না। ফলে নাটক লিখতে গিয়ে কল্পনাশ্রয়ী হতে হয়েছে।"

নামকরণ : কেন্দ্রীয় চরিত্র এন্টনী কবিয়ালের নামানুসারে এই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে।

যুগপ্রভাব : অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কলকাতা ও কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে কবিগান যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তারই প্রতিফলন উক্ত নাটকে রয়েছে। এর সঙ্গে তৎকালীন বাঙালী হিন্দু সমাজের উচ্চশ্রেণীর জাত্যাভিমান এবং বিধবা নারীর অপমানজনক অবস্থা—সমাজের এই বিষয়গুলি নাটকে পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিধা

(প্রথম অভিনয় : ১৯৬৮, ১৫ আগষ্ট, শীশমহল)

সিদ্ধান্তবাক্য : অর্থনৈতিক সামর্থ্যহীনতা ও সামাজিক প্রতিকূলতা মেয়েদের জীবনে ব্যর্থতা এনে দেয়।

কথাবস্তু : মাতাপিতার সংসারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রত্না নামে এক বিবাহিতা (যদিও বিবাহ রাত্রে পাত্রের দেহে সিফিলিটিক্ ইরাপ্সন বের হওয়ায় বিবাহটি অসমাপ্ত থাকে) যুবতী চাকুরী পাবার জন্য কুমারী সাজতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়, উর্ধ্বতন অফিসারকে সন্তুষ্ট করার জন্য অসম্মানজনক কাজে তাকে লিপ্ত হতে হয়। এমনকি সামাজিক প্রতিকূলতার জন্য তাকে প্রেমের ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হতে হয়। জীবনযুদ্ধে বিধ্বস্ত রত্না বুক-ভরা বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকে।

এটি অর্থনৈতিক সমস্যামূলক নাটক।

নামকরণ : প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নায়িকাকে আত্মত্যাগ করতে হয়েছে বলে এই নাটকের নাম 'দ্বিধা' দেওয়া হয়েছে।

যুগপ্রভাব : দেশ বিভাগের পর দেশের মধ্যে অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি হলে বহুনারীকে বাঁচার প্রয়োজনে অসম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়—সমাজের এই অর্থনৈতিক সমস্যার দিকটি এই নাটকে লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিধা সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্যরসিক ও নাট্যসমালোচক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য একটি পত্রে নাট্যকারকে জানিয়েছেন—

"প্রথমেই আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আপনার 'দ্বিধা' নাটকখানির জন্য। গতকাল নাটকটি দেখে এসে অবধি মনের অভিভূত অবস্থা আজও কাটেনি। কাহিনীর ব্লিষ্ঠ বক্তব্য, সরস ও বিদগ্ধ সংলাপ সর্বোপরি অভিনয় কুশলতা সকল দিক দিয়েই নাটকখানি সার্থক হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। .....নাটকের পরিচালনা এবং অভিনয়ও অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হয়েছে।"[১৬]

যাত্রানাটক

বিধায়ক প্রধানতঃ থিয়েটারী নাটক রচনা করেছেন। তবে দেশের বিরাট দর্শককুলের সঙ্গে তাঁর নাট্যকুশলতার পরিচয় ঘটানোর জন্য তিনি কয়েকটি যাত্রানাটক বা লোকনাট্য রচনা করেন।

থিয়েটারী নাটক ও লোকনাট্য একশ্রেণীভুক্ত নয়। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে মূলতঃ লোকনাট্য রচিত হয়। বিভিন্ন লৌকিক ধারণা যেমন, ধর্মাধর্ম, সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি অবলম্বনে এর কাহিনী গড়ে ওঠে, চরিত্রের প্রকৃতিও সেই ভাব অনুসারে সৃষ্ট হয়। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও কাল্পনিক কাহিনীনির্ভর পালাতে উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বা আদর্শের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু থিয়েটারী নাটক মূলতঃ লোকশিক্ষার দিকে তাকিয়ে লেখা হয় না।

পূর্বে লোকনাট্যে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ ঘটানো হত। কোন কোন পালায় নয়টি ভাবের (রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, শম) সন্নিবেশ ঘটিয়ে নবরস (শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত) পরিবেশিত হত। উদাহরণ স্বরূপ 'সপ্তর্ষি সৃজন', 'পৃথিবী', 'অনন্ত মাহাত্ম্য' প্রভৃতি পালার নাম করা যেতে পারে।[১৭] পূর্বে লোকনাট্যের অভিনয় সময় ছিল আট ঘণ্টা, বর্তমানে যুগচাহিদা অনুসারে সেটি সাড়ে তিন ঘণ্টার মত সময়ে সমাপ্ত হয়। ফলে পূর্বে যেমন পালায় বিভিন্ন ভাবেব সমাবেশ ঘটানো হত, বর্তমানে সময়াভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। এখন পালার মূলভাব হচ্ছে—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ। প্রয়োজনে কখনো কখনো অন্যভাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু থিয়েটারী নাটকে এ বিষয়ে কোন বিধিবদ্ধ রীতি নেই।

লোকনাট্যে হাস্য রসসৃষ্টির জন্য বিশেষ ধরণের চরিত্রের আগমন ঘটে কিন্তু থিয়েটারে এরূপ বিশেষ নিয়ম নেই।

প্রধানত লোকরঞ্জন, কোন বিশিষ্ট অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের দিকে লক্ষ্য রেখে লোকনাট্যের দৃশ্য রচিত হয়। ফলে অনেক সময় প্রতিটি দৃশ্য স্বতন্ত্ররূপে আকর্ষণীয় হয়ে উঠলেও সামগ্রিক নাট্য-সংহতি ব্যাহত হয়। কিন্তু থিয়েটারী নাটকে অবান্তর দৃশ্য (আকর্ষণীয় হলেও) বর্জন করে নাটককে যুক্তি নির্ভর দৃঢ়পিনদ্ধ সংহত রূপ দান করতে হয়। এ বিষয়ে লোকনাট্যের সঙ্গে জাপানী কাবুকি নাটকের অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কাবুকিতেও গঠনপ্রণালীগত সংহতি (organic compactness) প্রায়ই দুর্লভ। এখানে ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে অধিকাংশ সময় পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে না ও অভিনেতার ব্যক্তিগত কলাকুশলতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে অনেক অসংলগ্ন দৃশ্য দেখা যায়।

লোকনাট্যের সঙ্গে মেলোড্রামার বিশেষ যোগ আছে। মেলোড্রামার অর্থ সঙ্গীতযুক্ত নাটক বা গীতাভিনয় (melos+drama)। এটি ঘটনাপ্রধান। এখানে নানাধরণের অস্বাভাবিক ঘটনা ও চরিত্র থাকে, দ্বন্দ্ব-সৃষ্টিতে অনেক সময় অস্বাভাবিকতার আশ্রয় নেওয়া হয়। এর গঠন শিথিল। অতিরঞ্জিত ও সামঞ্জস্যহীন ঘটনাবলী, রোমাঞ্চকর দৃশ্য ও উত্তেজক ভাবের সমাবেশ ঘটানো এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে এখানে গভীর ভাব ও সাহিত্য-গুণ প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। এখানে চরিত্রের ক্রমবিবর্তন না থাকায় চরিত্রগুলি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। এখানে দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দিলেও চরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব অগ্রসর না হয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে বলে সেটি কৃত্রিম হয়ে দাঁড়ায়। লোকনাট্যে এ ধরণের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। থিয়েটারী নাটকেও মেলোড্রামার উপস্থিতি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। তবে লোকনাট্যের সঙ্গে মেলোড্রামাব সম্পর্ক গভীর।

বর্তমান যুগে লোকনাট্যের ওপর থিয়েটারী নাটকের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এজন্য এখন লোকনাট্য তার পূর্ব লক্ষণ অনেকটা হারিয়েছে এবং থিয়েটারী নাটকের বেশ কাছাকাছি যাত্রানাটক এসে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার বিধায়কের বক্তব্যটি স্মরণযোগ্য—

> "আমি মঞ্চের নাট্যকার। কাজেই যাত্রা বা থিয়েটার যে
> নাটকই আমি লিখি না কেন—তা মঞ্চঘেঁষা হতে বাধ্য।"[১৮]

॥ সুরা-নারী-সিংহাসন ॥

(প্রথম প্রকাশ- ১৩৭৩, রথযাত্রা, গণেশ অপেরা কর্তৃক অভিনীত)

সিদ্ধান্তবাক্য : সুরা নারীতে আসক্ত হয়ে রাজনৈতিক কূটকৌশল বিস্মৃত হলে রাজা সিংহাসন রক্ষা করতে পারেন না।

কথাবস্তু : সুরা নারীতে আসক্ত গৌড়ের রাজা দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে কৈবর্ত প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে হত্যা করে এবং তাদের নেতা দিব্বোক দাসকে রাজ সিংহাসনে বসায়। কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমদাস গৌড়ের রাজা হন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধির অভাব থাকায় রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাই কিছুদিনের মধ্যে দ্বিতীয় মহীপালের বিতাড়িত

ভ্রাতা রামপাল রাজনৈতিক কূটকৌশল অবলম্বনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ভীমদাসকে পরাস্ত করে গৌড়ের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন।

এটি ঐতিহাসিক নাটক।

নাট্যকাহিনী-উৎস : ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, পালরাজ তৃতীয় বিগ্রহ পালের তিন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় মহীপাল (একাদশ শতাব্দী) ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান। এক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর মধ্যে কূটনৈতিক বুদ্ধির অভাব ছিল। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উত্তরবঙ্গের কৈবর্তজাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন এবং কৈবর্তনেতা দিব্য (দিব্বোক, দিবোক) বরেন্দ্রী অধিকার করেন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা রামপাল কৈবর্তদের পরাভূত করে হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন।

সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে দ্বিতীয় মহীপালকে নিষ্ঠুর ও দুর্নীতিপরায়ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

উক্ত নাটকে তথ্যগত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ইতিহাসে আছে তৃতীয় বিগ্রহপালের তিনপুত্র— দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল, রামপাল।[১২] বর্তমান নাটকে দ্বিতীয় শূরপালের কোন উল্লেখ নেই। অন্য একটি ত্রুটি হল, দিব্বোকের ভ্রাতা রুদ্রোক বা রুদোকের বিষয়ে নাট্যকার নীরব। রুদ্রোক দিব্বোকের মৃত্যুর পর বরেন্দ্রীর সিংহাসনে আরোহণ করেন ও তারপর ভীম সিংহাসন লাভ করেন।[১৩]

নামকরণ : সুরানারীতে আসক্ত হয়ে রাজার নানা প্রকার কুকর্মে লিপ্ত হওয়া রাজনৈতিক কূটকৌশলের বিরোধী। এরফলে রাজার পক্ষে সিংহাসনের অধিকার বজায় রাখা সম্ভব হয় না, ...এই ভাবনা অবলম্বনে নাটকের নামকরণ করা হয়েছে— 'সুরা-নারী-সিংহাসন'।

যুগপ্রভাব ; পালবংশের রাজা দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচার, তাঁর চারিত্রিক অসংযম ও পতন, কৈবর্ত প্রজার বিদ্রোহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই নাটকটি রূপলাভ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইংরেজ শক্তির শোষণ ও নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য গণ-চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে। নাট্যকার সেই রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অতীতের শোষণবিরোধী অভ্যুত্থানের ঘটনা অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেন। উক্ত নাটকে একালের রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।

রাষ্ট্রবিপ্লব

(প্রথম প্রকাশ- ১৩৭৫, নবরঞ্জন অপেরা কর্তৃক অভিনীত।

সিদ্ধান্তবাক্য : সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় মানুষ উচ্চস্থানে পৌঁছতে পারে।

কথাবস্তু : গোপালদেব সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নিজের যোগ্যতার দ্বারা জনসাধারণের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে গৌড়ের অত্যাচারী রাণীকে পদচ্যুত করে সে দেশের রাজা হন এবং দেশে শাসন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বেশ কিছুকাল সুষ্ঠুভাবে রাজত্ব করার পর পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে তিনি রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন ও সন্ন্যাসজীবন পালনের জন্য স্ত্রীসহ রাজ্য ত্যাগ করে অনেক দূরে চলে যান।

কাহিনী-উৎস : খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে বাংলাদেশে অরাজকতা দেখা দিলে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গোপাল নামে এক স্থানীয় নেতাকে বাংলার রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেন।[২১] ইনি-ই বিখ্যাত পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সঠিক রাজত্বকাল জানা যায় না তবে তিনি যে দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছিলেন সে তথ্য পাওয়া যায়।[২২] তিনি অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

এটি ঐতিহাসিক নাটক।

নামকরণ : রাজনৈতিক অরাজকতার ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে গোপালদেবের পরিচালনায় যে বিদ্রোহ-বিপ্লব দেখা দিয়েছিল ও শেষ পর্যন্ত সেই বিদ্রোহে যে সাফল্য এসেছিল তারই একটি উজ্জ্বল ছবি এই নাটকে ধরা পড়ায় এর নাম 'রাষ্ট্র বিপ্লব' রাখা হয়েছে।

যুগপ্রভাব : অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাৎস্যন্যায় রাজত্বের অবসানকল্পে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত বঙ্গদেশের রাজা গোপালদেবের অসাধারণ নেতৃত্ব অবলম্বনে এই নাটক গড়ে উঠেছে। 'রাষ্ট্রবিপ্লব'-এ একালের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ-বিরোধী পটভূমিকা লক্ষিত হয়।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, গোপালদেব চরিত্র অবলম্বনে মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) 'অমৃত অতীত' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯, পরিবর্ধিত রূপ ১৯৬৪) নাটক রচনা করেন। 'রাষ্ট্রবিপ্লব' ও 'অমৃত অতীত' আলোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাকে অরাজকতার হাত

থেকে রক্ষা করার জন্য প্রজাপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজারূপে নির্বাচিত করেছিলেন—এই ঐতিহাসিক ঘটনাটুকু উভয় নাট্যকার গ্রহণ করে তারমধ্যে কল্পনার যোজনায় নাট্যঘটনা বর্ণনা করেছেন। উভয়ের নাটকেই বর্তমান যুগের সমাজ ও রাজনীতির প্রতিফলন ঘটেছে। তবে মন্মথ রায়ের নাটকে একমাত্র গোপালদেব ভিন্ন সব-ই কাল্পনিক চরিত্র। এ সম্পর্কে মন্মথ রায় উক্ত নাটকের ভূমিকায় বলেছেন,

"একমাত্র গোপালদেব ভিন্ন অন্য চরিত্রগুলি আমার কল্পনাপ্রসূত।" অন্যদিকে বিধায়কের নাটকে গোপালদেব, তাঁর স্ত্রী দেদ্দা ও ধর্মপাল ঐতিহাসিক চরিত্র।

মাইকেল মধুসূদন

(প্রথম প্রকাশ- ১৩৭৫, নবরঞ্জন অপেরা কর্তৃক অভিনীত।)

সিদ্ধান্তবাক্য : অপরিণামদর্শিতা জীবনে চলার পথে দুঃখময় পরিণতি আনে।

কথাবস্তু : মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্মগ্রহণ, তাঁর সাহিত্য সাধনা, তাঁর প্রতি বন্ধুদের অকৃত্রিম ভালবাসা, দারিদ্র্য, বিদ্যাসাগরের উদার অর্থ সাহায্যলাভ ও চরম কষ্টের মধ্যে মৃত্যুবরণ অবলম্বনে উক্ত নাটক রচিত হয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা এই নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে। জীবনী-নাটকে একটি বিশেষ জীবনের পরিবর্তন ও পরিণতি দেখানো মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান নাটকে সেই বিষয়টি অনুসৃত হওয়ায় এটিকে জীবনী নাটক রূপে গ্রহণ করা যায়।

নাট্যকার বর্তমান নাটকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) জীবনের মূল ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-কন্যা দেবকীকে যে মধুসূদনের প্রথম প্রেমিকারূপে চিত্রিত করা হয়েছে বাস্তবে সে ঘটনা পাওয়া যায় না। কারণ মধুসূদন যখন খ্রীষ্টান হন তখন কৃষ্ণমোহনের দ্বিতীয় কন্যা দেবকী জন্মগ্রহণ করেননি।[২৩] তবে বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯) নাটকে দেবকীকে নায়িকারূপে চিত্রিত করেন। বিধায়ক সম্ভবতঃ এই বিষয়ে 'শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

বর্তমান নাটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন, হেনরিয়েটা ও মধুসূদনের কাছে মধুসূদনের প্রথম স্ত্রী রেবেকা ম্যাকটাভিস-এর গর্ভজাত পুত্রকন্যা লালিত হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। রেবেকার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হলে মধুসূদন পুত্রকন্যাদেরও ত্যাগ করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।[২৪]

নামকরণ : কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামে এই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে 'মাইকেল মধুসূদন'।

যুগপ্রভাব : ভারতবর্ষে নিজের অধিকার কায়েম রাখার জন্য ইংরেজ খ্রীষ্টধর্ম প্রচার শুরু করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। ফলে সেই সময় অনেকে খ্রীষ্টানদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজে প্রকটিত ধর্মমূলক সমস্যার আংশিক রূপ পরিস্ফুট হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) মাইকেল মধুসূদনের জীবনী অবলম্বনে 'শ্রীমধুসূদন' নাটক রচনা করেন। নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণে নাট্যকার কিছু পরিবর্তন করেন। আমরা পরিবর্তিত রূপে লিখিত নাটকের ভিত্তিতে বর্তমানে আলোচনা করছি। মধুসূদনের আঠার বৎসর বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের মূল ঘটনা এই নাটকে পরিবেশিত হয়েছে।

এই নাটকের শেষে নাট্যকার কল্পনার আশ্রয় নিয়ে অভিনব দৃশ্যের সংযোজন করেছেন। শেষদৃশ্যে দেখা যায়, বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে মধুসূদনের ভূত এসে হাজির হয়ে নিজের অসমাপ্ত সাহিত্য কর্ম সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব বঙ্কিমের ওপর অর্পণ করলেন। সেই ভূত চলে যাবার পর বঙ্কিম খবর পেলেন মধুসূদন মারা গেছেন এবং সেই দুঃসংবাদ শুনে বিস্মিত বঙ্কিম বলছেন.....

"মধুসূদন মরেনি— মরতে পারে না— অসম্ভব।"

.....এই দৃশ্যটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে মোহিতলাল মজুমদার এর প্রশংসা করেন।[২৫]

মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল' নাটকে (প্রথম অভিনয়, ১৯৪২, ৫ জুন, রঙমহল) মাইকেল মধুসূদনের শেষ দুই বছরের জীবনের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। তবে নানা চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে মধুসূদনের অতীত জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত নাটকে দেবকী চরিত্র অনুপস্থিত।

'মাইকেল' নাটকের পরিচালনা ও নামভূমিকায়-অবতীর্ণ হন অহীন্দ্র চৌধুরী।

নিতাই ভট্টাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর (১৮৮৯-১৯৫৯) অনুপ্রেরণায় মধুসূদনের জীবনকাহিনীনির্ভর 'মাইকেল মধুসূদন' (১৯৪২) রচনা করেন। এই নাটকটি শিশির কুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় ১৯৪২ সালে শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয় এবং মধুসূদন চরিত্রে পরিচালক স্বয়ং অবতীর্ণ হন। কিন্তু নাটকটি মুদ্রিত না হওয়ায় আলোচনা করা সম্ভব হল না।

উৎপল দত্ত মধুসূদন অবলম্বনে লিখেছেন; 'দাঁড়াও পথিকবর' (প্রথম অভিনয়, ২২ নভেম্বর, ১৯৮১, য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট)। এই নাটকে নাট্যকার মাইকেল মধুসূদনের সমগ্র জীবনের পরিবর্তে খন্ড জীবন-কাহিনী (বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মধুসূদনের নাটক অভিনয় থেকে শুরু করে তাঁর ভের্সাই শহরে অবস্থান পর্যন্ত) রূপায়িত করেছেন।

এখানে মধুসূদন সংগ্রামী, বিদ্রোহী, বিপ্লবী। তিনি সামাজিক কুসংস্কার এবং সর্বপ্রকার গতানুগতিকতার বিরোধী। তিনি রাজনীতি সচেতন। তাই ভের্সাই শহরে তাঁকে দেশপ্রেমিক নানাসাহেব ভ্রমে গ্রেপ্তার করা হলে উল্লসিত কবি বলেছেন—

"চলুন মঁসিয়্য, সত্যি বলছি, আমাকে এত সম্মান আর কেউ দেয়নি। ব্রাহ্মণী, আমি লিখেছিলাম না? আমরা দুর্বল-ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃংখলে। হঠাৎ নানাসাহেব হতেই শৃংখলটা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আমি এখন স্বাধীন।" (দশম দৃশ্য)

প্রকৃতপক্ষে এখানে মধুসূদনের মধ্যে নাট্যকারের বিশেষ ভাবনারই ছায়াপাত ঘটেছে।

তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকে নাট্যকার এখানে বিশেষভাবে স্থান দিয়েছেন। নীলকরের বিরুদ্ধে বিপ্লব, সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা পটভূমি হিসেবে, নানাসাহেব প্রমুখ বিদ্রোহীদের কথা নাটকে গুরুত্ব পেয়েছে।

নাট্যকার একদল মহিলা-যাত্রা দলকে উপস্থিত করে তাদের যাত্রাগানে মধুসূদনের রচনাংশ ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার দিকটি কৌশলের সঙ্গে প্রদর্শন করেছেন।

এই নাটক মাইকেল মধুসূদনকে কেন্দ্র করে লিখিত হলেও তিনিই একমাত্র আকর্ষণ হয়ে ওঠেননি। বিদ্যাসাগরের কার্যাবলী এখানে অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। এছাড়া জেম্স লং এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

এখানে কাল্পনিক চরিত্র দেবকী স্থান পায়নি।

পরিচালনায় ও মধুসূদন চরিত্রে—উৎপল দত্ত।

কাল-ভৈরব/ভক্ত-ভৈরব-গিরিশচন্দ্র

(প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৬, নিউ আর্য অপেরা কর্তৃক অভিনীত।)

সিদ্ধান্তবাক্য : সাধকের আনুকূল্যে মানুষের ভগবৎ বিমুখ মন ঈশ্বরভক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

কথাবস্তু : গিরিশিচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১১) মন কিভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে রামকৃষ্ণের প্রতি পরমভক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল তা-ই বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে এখানে দেখানো হয়েছে। বর্তমান নাটকে গিরিশচন্দ্র ও রামকৃষ্ণদেবের জীবনের কিছু কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার ভূমিকায় বলেছেন

"এই নাটক লিখতে গিয়ে জীবন-চরিতের আশ্রয় তো গ্রহণ করে উপরন্তু, বাগবাজারের প্রাচীন লোকজনের মুখে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেগুলিরও সাহায্য নিয়েছি।"

তবে উক্ত নাটকে একটি তথ্যগত ভ্রান্তি পাওয়া যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কল্পতরু হওয়ার ঘটনা গোপালচন্দ্র ঘোষের কাশীপুর উদ্যানে ঘটেছিল।[২৬] কিন্তু নাট্যকার সে স্থানের পরিবর্তে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণের কথা বলেছেন।

এটি ভক্তিরসাশ্রিত নাটক।

নামকরণ : কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামে এই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে 'ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্র'। ভক্তিহীন গিরিশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত ভক্ত সাধকে পরিণত হলেন—এই নাটকে তা-ই প্রদর্শিত হয়েছে বলে এই নাটকের উক্ত নামকরণ করা হয়েছে। বাস্তবে তিনি 'ভক্ত-ভৈরব' নামে সুপরিচিত ছিলেন।[২৭] এই নাটকের গিরিশচন্দ্র যেন মহাকাল ভৈরবের মত সব ধর্মীয় চেতনা ধ্বংসের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় প্রেরণায় সেই কালভৈরব অর্থাৎ মহাকাল যেন আবার শান্তশিবে রূপান্তরিত হলেন। গিরিশচন্দ্রের ধর্মবিরোধী উগ্রতা অন্তর্হিত হল। কালভৈরব শান্তশিবের অন্য একটি রূপ। এই ভাবধারা থেকে নাটকের অন্য নাম দেওয়া হয়েছে 'কালভৈরব'।

যুগপ্রভাব : উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সমাজ জীবনে ধর্মীয় প্রভাব বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মধর্মের প্রচার, হিন্দুধর্মের জাগরণে কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের বিশেষ ভূমিকা সে সময় দেশকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। উনিশ শতকের এই সামাজিক পটভূমিকায় গিরিশচন্দ্রকে অবলম্বন করে নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে।

সূত্র পরিচিতি

১. নাট্যশাস্ত্র, ভরত, শ্লোক সংখ্যা ১১৯, একবিংশ অধ্যায়।

২. Unless you can reduce your play to a proposition you have no play..... From the proposition the plot is constructed.

—The Analysis of Play construction and Dramatic Principles, William Thompson Price, P. 31-33, New York, 1912.

৩. The centering of the action upon a definite goal creates the integrated movement which is the essence of drama.

—Theory and Technique of Play writing and Screen writing, John Howard Lawson, P. 180-181, New York, 1949.

৪. A premise has to contain character, conflict and resolution. It is impossible to know all this without a clear-cut premise.

—The art of Dramatic writing : Its Basis in the creative Interpretation of Human Motives, Lajos Egri, P. 29, New York, 1946.

৫. A writer with a serious purpose and a dominating theme will not easily go astray.....

—The Analysis of Play construction and Dramatic Principles, William Thompson Price, P. 7, New York, 1912.

৬. The theme of the play..... is one of its most important components.

—The Play's the Thing, Lawrence Langner, P. 49, New York, 1960.

৭. Dramatic action, therefore, is not with a view to the representation of character. Character comes in as subsidiary to the actions.

—Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, Tr. by S.H.Butcher, P. 343, New York, 1951.

৮. Characters in a play can only exist with reference to the Action.....the plot must be fixed before any use can be made of character.

—The Analysis of Play Construction and Dramatic Principles, W.T. Price, P. 278, New York, 1912.

৯. সাহিত্য দর্পণঃ, বিশ্বনাথ কবিরাজ, ৬।১৪২

১০. সাহিত্য দর্পণঃ, বিশ্বনাথ কবিরাজ, ৬।১৪৩

১১. In his first play 'On Trial' (1914), he.....gave novelty to his treatment of it by introducing a trick—the 'flash-back'—borrowed from the cinema.

—World Drama, A. Nicoll, P. 805, London, 1964.

১২. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, সপ্তম সংস্করণ, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৫১৫, কলকাতা ১৩৯২

১৩. ভূমিকা, রক্তের ডাক, বিধায়ক ভট্টাচার্য।

১৪. 'কান্নাহাসির পালা' নাট্যগ্রন্থে নাট্যকার পরিচিতি, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৬০

১৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্যায়) তৃতীয় সংস্করণ, ভূদেব চৌধুরী, পৃ. ৪৫, কলকাতা, ১৯৬৪

১৬. বিধায়ক ভট্টাচার্যকে লিখিত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের পত্র, ২৭.১.৬৯

১৭. যাত্রা নাটক ও থিয়েটারি নাটক, ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা বর্ষ-৭, সংখ্যা-৪, পৃ. ৩৪৪, কলকাতা

১৮. নাট্যকারের কথা, রাষ্ট্রবিপ্লব লোকনাট্য, বিধায়ক ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৯৬৮

১৯. বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), নীহার রঞ্জন রায়, পৃ. ২৫১-২৫২ কলকাতা, ১৩৭৩

২০. ভারতের ইতিহাস কথা (প্রথম খণ্ড) ষষ্ঠ সংস্করণ, কিরণচন্দ্র চৌধুরী পৃ. ২৭৮, কলকাতা, ১৯৮৫

২১. In short, all the miseries of an anarchical state were harassing the people of Bengal. But the evil brought its own remedy. The chiefs, unable to endure this state of things any longer, agreed to elect Gopala as the ruler of the whole kingdom.

—Ancient India, R.C. Majumdar, P. 282, Banaras, 1952

২২. According to Manjusrimulakalpa his reign-period was twenty-seven years. His accession to the throne may be placed with a tolerable degree of certainty within a decade of 750 A.D. and he probably ceased to rule about 770 A.D.

—History of Bengal (D.U) Vo.-I, Dr. R.C. Majumdar, P. 103.

২৩. চরিতকথা : মধুসূদন রচনাবলী-সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ ঋ, কলকাতা, ১৯৮৬

২৪. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত (পঞ্চম সংস্করণ), যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১০৯, কলকাতা ১৯২৫

২৫. বনফুল রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)-বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা ১৩৮৯

২৬. পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দুই দিবসপূর্বে ১১ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে ভক্তগণ ঠাকুরকে শ্যামপুকুরের বাসা হইতে কাশীপুরের উদ্যান বাটীতে আনয়ন করিলেন.....১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী উপস্থিত হইল। ঠাকুর ঐদিন বিশেষ সুস্থবোধ করায় কিছুক্ষণ উদ্যানে বেড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন.....অদ্য অর্ধবাহ্য দশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে দিব্য শক্তিপূত স্পর্শে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। .....রামচন্দ্র প্রমুখ কোন কোন ভক্ত অদ্যকার এই ঘটনাটিকে ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন।

—শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী, স্বামী তেজসানন্দ, পৃ. ১৮৬, ১৯৪-১৯৬, কলকাতা, ১৩৮২

২৭. গিরিশচন্দ্রের জীবনে ১৮৮৪ সাল একটি স্মরণীয় বর্ষ। এই সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-৮৬) সহিত পরিচিত হন এবং ক্রমে তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও স্নেহের পাত্রে পরিণত হন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। তিনি 'ভক্ত ভৈরব' নামে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত মণ্ডলীর কাছে পরিচিত হন।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ : জীবন কথা, দেবী পদ ভট্টাচার্য, গিরিশ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড) পৃ. ১৪, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৬৯

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

নাট্যগঠন তত্ত্ব

● পাশ্চাত্য নাট্যগঠনরীতি

নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য ও একটি নির্দিষ্ট সময়ে এটি সমাপ্ত করতে হয়, সেই কারণে নাট্যকারকে কাহিনী বিন্যাসে অত্যন্ত সংযত ও সতর্ক হতে হয়। বিশৃঙ্খল কাহিনীর পরিবর্তে আদি-মধ্য-অন্ত্য-যুক্ত সম্পূর্ণ নিটোল কাহিনী নাটকে কাম্য। তাই নাটকের গঠনরীতি রচনায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানার প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য নাটক আলোচনা করলে দেখা যায় যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যদেহে নূতনের ছোঁয়া লেগেছে। ক্লাসিক্যাল নাটকের (গ্রীক নাটক) গঠনরীতিতে ঐক্য ত্রয় (three unities) বজায় রাখতে হয়। এই ঐক্যের কথা Aristotle (384 B.C.- 322 B.C.) 'Peotics' গ্রন্থে বলেছেন। তিনি ত্রি-ঐক্যের মধ্যে ঘটনা ঐক্যকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন। ঘটনা-ঐক্য (unity of action) বলতে তিনি একটিমাত্র ঘটনার কথা বলেছেন। অর্থাৎ নাটকে একটিমাত্র বৃত্ত থাকবে, সেটি-ই মূল বৃত্ত (main plot)। এর সঙ্গে উপবৃত্ত (sub-plot) থাকবে না—.....the plot of a play, being the representation of an action, must present it as a unified whole;[১] তিনি বৃত্ত (plot) চরিত্র (character) সংলাপ (diction) চিন্তাভাবনা (thought) দৃশ্য (spectacle) ও সংগীত (melody)—এই ষড়ঙ্গের মধ্যে বৃত্তকে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, বৃত্ত হচ্ছে কার্যের অনুকরণ ও এটি নানা ঘটনা-বিন্যাসে গড়ে ওঠে। এই ঘটনা সমষ্টি কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত হয়ে সংহত সুশৃঙ্খল বৃত্তকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলে। একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুগঠিত দৃঢ়পিনদ্ধ বৃত্ত রচিত হওয়ার জন্য আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত কাহিনী থাকা দরকার। একটি সুগঠিত বৃত্তের আরম্ভ, বিস্তৃতি ও সমাপ্তি এলোমেলোভাবে হতে পারে না। বৃত্তের মধ্যে ঐক্য নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা প্রয়োজন। এর ফলে বৃত্তটি হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ, সমগ্র ও যথাযথ। কাল-ঐক্য (unity of time) ও স্থান-ঐক্যের (unity of place) কথা তিনি মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির পার্থক্য নির্দেশকালে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন, ঘটনা-ঐক্যের মত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেননি। তাঁর মতে, মহাকাব্যের সময়কাল অসীম। কিন্তু ট্র্যাজিডি সসীম কালসীমার বদ্ধ। কারণ ট্র্যাজিডি দৃশ্যকাব্য। এটি প্রদর্শিত হয় বলে বিশেষ সময়ের মধ্যে সীমায়িত হয়। তাই নাটকের কাহিনী মোটামুটি একদিন বা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (within one revolution of the sun) সমাপ্ত করা উচিত। অর্থাৎ যে কাহিনীর ঘটনা চব্বিশ ঘণ্টায় ঘটতে পারে তা-ই নাটকে উপস্থাপিত করলে কাল-ঐক্য বজায় থাকবে। স্থান-ঐক্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, নাটকে অনেকগুলি

দৃশ্য দেখানো সম্ভব নয় কারণ .....One is limited to the part on the stage and connected with the actors.[২] সুতরাং একটিমাত্র দৃশ্যে নাটক সমাপ্ত হলে স্থান-ঐক্য রক্ষিত হবে। আর এর একটি অন্যতম কারণ হল, সে সময় গ্রীক নাটক সাধারণতঃ রাজবাড়ী বা ডায়োনিসাস্ মন্দিরের সামনে অভিনীত হত। ফলে স্থান পরিবর্তনের অবকাশ ছিল না। সে কারণে স্থান-ঐক্য মেনে চলতেই হতো।

প্রাচীন গ্রীক নাটকে এই ঐক্যত্রয় মোটামুটিভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। যে যুগমানস থেকে এই নাটকের সৃষ্টি তার যথাযথ প্রকাশে ঐক্যত্রয়ের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ডায়োনিসাস মন্দিরের সামনে বসে ভক্তরা যে কোরাস গীত (choric song) গাইতেন সেই সংগীতের করুণ মূর্ছনা থেকে সৃষ্ট হয়েছে ট্র্যাজেডি। দেবদেবী ও মানুষের মিলিত কাহিনী অবলম্বনে বিষয়বস্তু গড়ে উঠত বলে এর মধ্যে ধর্মীয় আবেগ বিশেষভাবে প্রকাশিত হত। কাহিনী সরলীকরণের পথ ধরে এগিয়ে যেত। কোন জটিলতা না থাকায় কাহিনী স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত ও একমুখী হত। ফলে সময়সীমা বিস্তৃত হতে পারত না। নাটকের মধ্যে কোরাসের উপস্থিতিও নাট্য গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করত। কোরাস নাটকের অন্যতম চরিত্র হিসেবে কাজ করত। সে একাধারে সূত্রধার, বিভিন্ন পর্যায়ের যোগসূত্রকারী ও ভাষ্যকার। যেহেতু কোরাস প্রয়োজনমত বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করত সেই কারণেও দৃশ্য পরিবর্তন বা স্থান পরিবর্তনের চিন্তা সম্ভবতঃ নাট্যকারের মনে আসত না।

প্রথম যুগের গ্রীক নাটকে বিশেষতঃ—AEschylus (525-456 B.C.)-এর নাটক (Prometheus Bound, C 470 B.C.) ও Sophocles—এর (495 B.C.-406 B.C.) নাটকে (OEdipus Tyrannus) ঐক্যত্রয়ের সুষ্ঠু প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

পাশ্চাত্য ক্লাসিক্যাল নাটক অঙ্কদৃশ্য সমন্বিত না হলেও পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশের নাম prologue (প্রস্তাবনা)। এই পর্বে নাটক অভিনীত হওয়ার আগে দর্শকদের নাটকীয় কাহিনীর আভাস দেওয়া হত। এরপর শুরু হত কোরাসের প্রবেশগীতি entrance-song একে বলা হয় parodos. দ্বিতীয় অংশের নাম episode। এর তিনটি পর্ব। এই পর্বের মধ্য দিয়ে কাহিনী ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে যেত। প্রত্যেকটি পর্বের শেষে কোরাসের আগমন ঘটত। শেষ অংশকে বলা হয় exodus। এখানে কাহিনী নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছত এবং কোরাসের প্রস্থানগীতি (exit song) দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটত।[৩]

সুতরাং একটি prologue, তিনটি episode, ও একটি exodus—এই পাঁচটি পর্ব নিয়ে গ্রীক নাটক গঠিত হত।

গ্রীক নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগ রীতির অনুসরণে রোমান ট্র্যাজিডি মূলতঃ গড়ে ওঠে। Lucius Annaeus Seneca (4 B.C.-A.D. 65)-র নাটকে ('Hercules Furens'-ইত্যাদি) এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

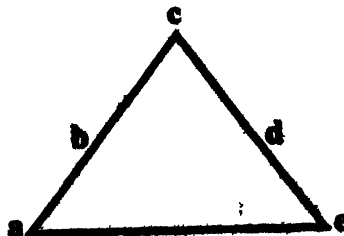
পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিশেষতঃ ইতালীতে গ্রীক-রোমান সভ্যতার পুনর্জাগরণ হলে ক্লাসিক সাহিত্য স্বমহিমায় ফিরে আসে। Horace-এর সাহিত্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ক্লাসিক নাটকের বিশিষ্ট রূপটি প্রচারিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্লাসিক নাটক

রচিত হতে শুরু করে। ক্লাসিক নাটক পুনরায় সাহিত্যে মর্যাদার সঙ্গে নিজের স্থান করে নেয়। এই নাটককে বলা হয় Neo-classical drama. Thomas corneille (1625-1709)-এর নাটক 'Pompee' (1642), John Dryden (1631-1700)-এর নাটক 'The Royal Martyr' (1669) প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। ফরাসী নাট্যকার Jean Racine (1639-99)-কে (তাঁর নাটক Andromaque, 1667) এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা হয়।

পরবর্তীকালে রোমান্টিক নাটকে গ্রীক নাটকের বিপরীতভাব লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল নাটকের বিরোধিতা করে যে নাটকের জন্ম হল, তাকেই রোমান্টিক নাটক বলা যায় (romanticism is as opposed to classicism)। এই ধরণের নাটকে ঐক্যত্রয় মানা হয়নি। এখানে ঘটনা-ঐক্য নেই, কারণ প্রায় প্রত্যেকটি নাটকে মূলবৃত্তের সঙ্গে উপবৃত্ত রয়েছে।[৪] সময় উল্লেখ করে বিভিন্ন দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে বলে কাল-ঐক্য রক্ষিত হয়নি। বহু অংক ও দৃশ্য নাটকে থাকায় স্থান-ঐক্য নেই। ইংল্যাণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকার John Lyly (c. 1554-1606)-এর 'The old wives' Tale (c. 1591), Thomas Kyd (c. 1557-c. 1595)-এর 'The Spanish Tragedy' (c.1589), Christopher Marlow (1564-93)-এর 'Dr. Faustus '(c.1588), William Shakespeare (1564-1616)-এর 'Hamlet' (c.1601), 'Othello' (c.1604), 'King Lear' (1605-6), Macbeth (1605-6) নাটকে গ্রীক নাটকের নিয়ম দুর্লক্ষ্য। জার্মান নাট্যকার Gotthold Ephraim Lessing (1729-81)-এর 'Miss Sarah Sampson' (1755), Johann Wolfgang Vongoethe (1749-1832)-এর 'Goetz Von Berlichingen' (1773), Johann Christoph Friedrich Von Schiller (1759-1805)-এর 'Die Rauber' (The Robbers, 1781) নাটকের গঠনরীতিতে রোমান্টিক ধারাই অনুসৃত হয়েছে।

পাশ্চাত্য রোমান্টিক নাটকের গঠনরীতিতে ক্লাসিক্যাল নাটকের পঞ্চপর্ব বিভাগ রীতির প্রভাব মূলতঃ লক্ষ্য করা যায়। রোমান্টিক নাটকের এই গঠনরীতিতে নাট্যক্রিয়ার বিভাগকে (division of action) Dr. Gustav Freytag 'pyramidal structure' (পিরামিড গঠনরীতি) বলেছেন।[৫] এই পঞ্চবিভাগের নাম.....

(a) exposition, (b) rise, c) climax, d) return or fall, e) catastrophe or denonement.



নাটকের exposition অংশে নাটকের কাহিনী ও চরিত্র সম্পর্কে একটা আভাস দেওয়া হয়। দর্শক মূল ঘটনা শুরু হবার আগেই সমগ্র কাহিনীর একটি ধারণা লাভ করেন। এই প্রাথমিক পরিচিতির ফলে দর্শকমন মূল বিষয়ে প্রবেশ করার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠে। exposition অংশটি নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারণ এর মাধ্যমে দর্শক ও নাট্যচরিত্রের মধ্যে প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয়। এই অংশেই নাট্য-ঘটনা কোন সূত্রে শুরু হল তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথম অঙ্কে কাহিনীর সংঘাতের বীজ উপ্ত হতে দেখা যায়। এই সংঘাতের সূচনালগ্নটি কোনো নাটকে সুস্পষ্টভাবে আবার কোথাও অস্পষ্টভাবে বর্ণিত হতে পারে। আবার কখনো প্রথম অংশের প্রথম দৃশ্যেই এই সংঘাতের রূপ সম্পর্কে ধারণা বা ইঙ্গিত থাকে, কোথাও আবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় দৃশ্যে এই রূপ লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং exposition-এ কাহিনী ও চরিত্রের একটি প্রাথমিক পরিচয় ও নাট্য-ঘটনার সূত্র বর্ণিত হয়।

rise-এ কাহিনীর চরিত্রগুলির মধ্যে বিপরীতমুখী কার্যের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এটি দ্বিতীয় অঙ্কে থাকে। এই অংশে দর্শক কাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। পরিস্থিতি ও চরিত্রের যুগপৎ আকর্ষণে ঘটনা ক্রমশঃ এগিয়ে যায়। এই পর্বে কাহিনীর জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এখানে সৎ ও অসৎ, ভালো ও মন্দ, পরস্পর বিরোধী মূল্যবোধের বিপরীতমুখী কার্য লক্ষ্য কবা যায়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের পরবর্তী কার্য অনুষ্ঠিত হয়। কাহিনীর সংঘাত কোন পর্যায়ে যেতে পারে তার যেন একটি পূর্বাভাস পাওয়া যায় এই অংশে।

দুটি পরস্পর বিরোধী ঘটনা বা কার্যের ফলে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সেই দ্বন্দ্ব নাটককে একটি উত্তুঙ্গ অবস্থায় নিয়ে যায়। এই অবস্থাকে climax বলে। এখানে পূর্ববর্তী সংঘাতের অনিবার্য ফলশ্রুতি দেখা যায়। এব মধ্য দিয়ে চরিত্র ও ঘটনা সুনির্দিষ্ট রূপ পায়। কাহিনীর চূড়ান্ত সংঘর্ষের রূপটি দর্শকের কাছে প্রতিভাত হওয়ায় কাহিনীর পরিণতিও তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। climax-সাধারণতঃ তৃতীয় অঙ্কে হয়ে থাকে।

সংকটের চূড়ান্ত রূপের পর নাট্যকাহিনী মোড় নিতে থাকে ও এটি চতুর্থ অংশে পরিণামমুখী হয়। একে return or fall-বলা হয়। এখানে কাহিনীর জট খুলতে শুরু করে ও আসন্ন পরিণতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। নাটকের প্রথমদিকে যে কৌতূহল ছিল তা এখানে অনেকটা নিবৃত্ত হয়। নাটকের চূড়ান্ত অবস্থা (climax) পর্যন্ত দর্শক যে গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে নাট্যকাহিনী অনুসরণ করে এই পর্বে এসে তার অবসান ঘটে। একদিকে নাট্যকাহিনীর অনিশ্চয়তার অবসান, অন্যদিকে কাহিনীর পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা—এ দুটি ভাব এই অংশে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

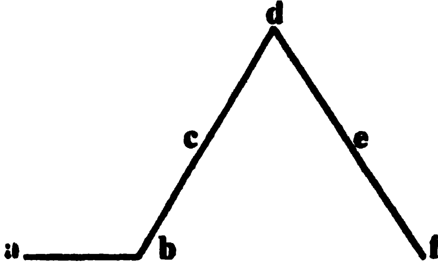
সর্বশেষে নাটকের অন্তিমপর্ব। পঞ্চম অঙ্কে এটি সংঘটিত হয়। এই পর্বে নাট্য ঘটনায় বিশেষ পরিণতি নেমে আসে। এটি-ই catastrophe. এখানে নাটক পরিপূর্ণতা লাভ করে। নাটকের পরিণতি এমন হওয়া উচিত যা দর্শক যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করেন।

Dr. Gustav Freytag climax-কে চূড়ান্ত পর্যায় বলেছেন। তাঁর মতে, এখানে নাট্যকাহিনী চরম অবস্থায় এসে পৌঁছয়। এরপর নাটক ধীরে ধীরে পরিণামমুখী হয়ে catastrophe তে অভিপ্রেত ফললাভ করে।

William Henry Hudson-আলোচিত নাটকের নাট্যক্রিয়ার গঠনরীতি প্রায় Gustav-এর পিরামিড গঠনরীতির মত। তবে তিনি প্রথম পর্যায়কে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। এদুটি ভাগ হল—exposition— ও initial incident.

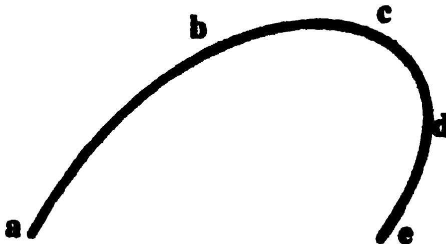
তাঁর মতে, নাটকের মূলবৃত্ত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এই দ্বন্দ্ব যে বিশেষ অবস্থা ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আসে সে সম্পর্কে আমাদের পূর্বেই ধারণা থাকা দরকার। পূর্ব পরিচয়ের ফলে চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে ঘটনা গড়ে ওঠে সেই ঘটনা আমাদের কাছে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। যদিও initial incident-এ কার্যের সূত্র দেওয়া হয়ে থাকে তবু কাহিনীকে স্পষ্ট করার জন্য exposition অংশে এর পূর্বাভাস দেওয়া প্রয়োজন।[৬] Hudson- প্রদত্ত নাট্য গঠনরীতির ছয়টি অংশের নাম—

(a) exposition, b) initial incident, c) growth of the action, d) crisis or turning point, e) resolution, f) catastrophe.



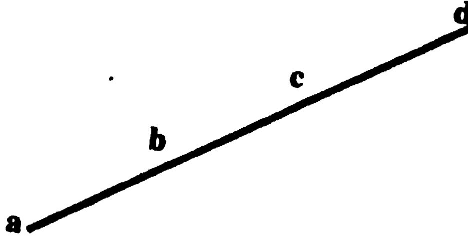
Lewis Campbell-নাট্যক্রিয়ার গঠনরীতিকে অর্ধবৃত্তের (parabola)-র সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৭] তাঁর মতে নাট্যক্রিয়ার রূপ হবে এইরূপ—

a) the opening, b) the climax (or, gradual ascent), c) the acme (or, chief crisis), d) the sequel, e) the close.



opening-এ নাট্য-কাহিনীর সূচনা হয়। এখানে climax হচ্ছে আরোহণ। এটি সিঁড়ির মত। নাটক এখানে ঊর্ধ্বগামী হয়। এটি নাটকের চূড়ান্ত পর্যায় নয়। acme হচ্ছে নাটকের শীর্ষবিন্দু। এখানেই দ্বন্দ্ব তীব্ররূপ নেয়। এই acme নাটকের মাঝামাঝি অংশে অথবা কিছু আগে বা পরেও আসতে পারে। নাটক পরিণামমুখী হলে sequel হয়। close-এ নাটকের সমাপ্তি।

John Howard Lawson নাট্যক্রিয়াকে পাঁচটি অঙ্ক বা পর্বে ভাগ করেননি। তিনি চারটি পর্যায়ের কথা বলেছেন—a) exposition, b) rising action, c) clash, d) climax.



এখানে exposition হচ্ছে নাট্য-ঘটনার সূচনা অংশ। rising action-এ নাট্যক্রিয়ার অগ্রগতি, clash-এ নানাপ্রকার সংঘাতের সমাবেশ এবং climax-এ সংঘাতের তীব্ররূপ দেখানো হয়। Lawson-এর মতে, নাট্য-ঘটনার পতন বলে কিছু নেই। ঘটনা অনবরত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে চূড়ান্ত পরিণতিতে (climax) শেষ হবে। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশ তার সার্থকতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সে বাধা অতিক্রম করতে চেষ্টা করে। ফলে শুরু হয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। clash পর্যায়ে নানা ছোট বড় দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নাটক দ্রুত গতিতে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলে। এইভাবে নাটক ক্রমোন্নত অবস্থার দিকে উঠতে উঠতে একটি বিশেষ অবস্থায় (climax) পৌঁছয়। এখানে সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এটিই নাটকের চূড়ান্ত বা শেষ পর্যায়। এ অবস্থায় দর্শকের আর নূতন করে জানার আগ্রহ থাকে না, ঐ চূড়ান্ত অবস্থা দেখে সমস্ত কৌতূহলের অবসান ঘটে। এ অবস্থায় Gustav Freytag কথিত return or fall এবং catastrophe—এই দুটি পর্যায়ের আর প্রয়োজন থাকে না। ফলে climax নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।[৮]

তাই পরবর্তীকালে সব নাটকের ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসৃত হয়নি। কোনো নাটকে পাঁচটি, কোথাও পাঁচটির কম আবার কখন কখন পাঁচটির বেশি অঙ্ক দেখা যায়। আবার কোনো নাটক খণ্ড-বিভক্ত হয়েছে। যেমন, christopher Marlow-এর 'Tamburlaine' (c. 1587) দুই খণ্ডে বিভক্ত। অনেক নাটক অঙ্ক-দৃশ্য সমন্বিত। কিছু নাটকে অঙ্ক থাকলেও দৃশ্য নেই। যেমন Henrik Ibsen (1828-1906)-এর Ghosts (1881)। এই নাটকের তিনটি অঙ্ক। এই তিনটি অঙ্কের মধ্য দিয়ে নাট্য কাহিনী সূচিত, বিকশিত ও বিশেষ পরিণতি লাভ করেছে। প্রথম অঙ্কে expostion এখানে প্রেত সম্পর্কিত ধারণা উন্মোচিত হয়ে কাহিনী ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে দৃঢ়রূপ লাভ করেছে। দ্বিতীয় অঙ্কে conflict। এখানে দুটি বিপরীতমুখী শক্তির সংঘর্ষে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। তৃতীয় অঙ্কে Transition। এখানে ঘনীভূত সংকটের পরিসমাপ্তি ঘটেছে মূল তথ্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এবং এখানে দর্শকের কৌতূহলের অবসান ঘটিয়ে কাহিনী একটি নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছেছে।

● প্রাচীন ভারতীয় নাট্যগঠনরীতি

পাশ্চাত্য ক্লাসিক্যাল নাটকের মত ভারতীয় ধ্রুপদী নাটকে একটিমাত্র বৃত্ত ছিল না। এখানেও দুই ধরনের বৃত্ত এসেছে—একটি আধিকারিক বৃত্ত, অন্যটি প্রাসঙ্গিক বৃত্ত। ফল লাভের জন্য যে কার্যের পরিকল্পনা করা হয় তাকে আধিকারিক বৃত্ত এবং আধিকারিক ব্যতীত অন্য যে বৃত্ত আধিকারিক বৃত্তের সহায়করূপে আসে তাকে প্রাসঙ্গিক বৃত্ত বলে,—

যৎকার্যং হি ফলপ্রাপ্ত্যাঃ সামর্থ্যাৎপরিকল্প্যতে।
তদাধিকারিকং জ্ঞেয়মন্যৎ প্রাসঙ্গিকং বিদুঃ ॥[৯]

নাটকে সাধারণতঃ কাহিনীকে জটিল, গতিসম্পন্ন ও আকর্ষণীয় করে তোলার প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক বৃত্তের অবতারণা করা হয়। এটি মূল ঘটনাকে উজ্জ্বলতা দান করে একে গভীর ও একাগ্র করে তোলে। এর মাধ্যমে নাট্যকার ঘটনামালাকে সুসম্বদ্ধ কাহিনীতে রূপদান করেন। ফলে মূলবৃত্ত ও উপবৃত্তের মধ্যে একটি সুসম সামঞ্জস্য থাকা দরকার। উপবৃত্ত মূল বৃত্তের পরিপূরক রূপে ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফলে উপবৃত্ত মূলবৃত্ত থেকে যেন কোনক্রমেই বেশী প্রাধান্য না পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে দশরূপকের বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে নাটকের গঠনরীতির প্রসঙ্গ এসেছে। একের মধ্যে অন্যের রূপ আরোপ করা হয় বলে নাটককে রূপক বলা হয়। নাট্য-শাস্ত্রে এইরূপ দশপ্রকার রূপক রয়েছে। এদের নাম—নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথি, প্রহসন, ডিম, ঈহামৃগ। নাটক ও প্রকরণে অঙ্ক সংখ্যা পাঁচ থেকে দশের মধ্যে হবে। এই দুটি রূপকই প্রধান। ডিম ও সমবকার চারসন্ধিযুক্ত, ব্যায়োগ ও ঈহামৃগতে থাকে ত্রিসন্ধি। বীথী, অঙ্ক, ভাণ ও প্রহসন দ্বিসন্ধিবিশিষ্ট।

সংস্কৃত ক্লাসিক্যাল নাটক মূলতঃ পাঁচটি সন্ধিতে বিভক্ত। একে পঞ্চসন্ধি বলে।

মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্শশ্চ তথৈব হি।
তথা নির্বহণং, চৈব সন্ধয়ো নাটকে স্মৃতাঃ ॥[১০]

মুখসন্ধিতে নাটকের বীজ উপ্ত হয়। এখানে নাট্যঘটনার শুরু। একে কাহিনীর সূচনা বলা যায়। যেমন, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণে নাটকের মুখ আরম্ভ হল।

প্রতিমুখে কাহিনী বিস্তার লাভ করে। মূল বিষয়টিকে ধীরে ধীরে বিকশিত করে তোলার জন্য এই সন্ধিতে বিষয়ান্তরের সূচনা করা হয়। যেমন, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক মাধব্যের সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের মৃগয়া বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনার ফলে মূল বিষয়—দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেম দূরে সরে গেল। আবার পরে প্রেম প্রসঙ্গ ফিরে এল। এইভাবে মূল বিষয় অগ্রসর হয়।

কাহিনীর ফললাভের প্রকাশ ও হ্রাস যে সন্ধি অভ্যন্তরে (গর্ভে) ধারণ করে তাকে গর্ভসন্ধি বলে। যেমন, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে বেতসকুঞ্জে দুষ্মন্ত শকুন্তলার নিভৃত আলাপের পর শকুন্তলা উঠে যেতে চাইলে দুষ্মন্ত তাঁকে বাধা দিয়ে বলছেন, সূর্য অস্ত যায়নি, সুতরাং শকুন্তলা আরো কিছুক্ষণ থাকতে পারেন এবং এই বলে রাজা তাঁর হাত ধরে বসালেন। এখানে প্রেমের ফললাভের প্রকাশ ঘটেছে। আবার

ঐ অঙ্কে শকুন্তলা রাজাকে বলছেন রাত্রি সমাগত, আর্যা গৌতমী তাঁর সন্ধানে আসছেন সুতরাং রাজা যেন বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করেন—এই অংশে ফললাভ হ্রাস পাচ্ছে। এই দুই বিপরীতভাব এই সন্ধিতে থাকায় একে গর্ভসন্ধি বলা হয়।

বিমর্ষ-সন্ধিতে বিষয় আচ্ছাদিত হবে। এখানে ক্রোধ, ব্যসন, বিলোভন, অপবাদ, দ্রব (ঘৃণা), দ্যুতি (তিরস্কার), বিরোধ, অভিশাপ প্রভৃতির দ্বারা ফললাভ আচ্ছাদিত হয়। দুর্বাসার অভিশাপের দ্বারা এই নাটকের ফললাভ আচ্ছাদিত হওয়ায় চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ অঙ্ক মিলে বিমর্ষ সন্ধি চলেছে। উক্ত নাটকের চতুর্থ অঙ্কে দুষ্মন্তের চিন্তায় মগ্ন শকুন্তলা অতিথি দুর্বাসাকে দেখতে না পাওয়ায় অপমানিত দুর্বাসা তাঁকে অভিশাপ দেন। এরপর দুষ্মন্তের রাজধানী গমনকালে শচীতীর্থে স্নান করার সময় দুষ্মন্ত প্রদত্ত স্মারক-চিহ্ন আংটি শকুন্তলার অঙ্গুলি থেকে জলে পড়ে যায়। শকুন্তলা রাজাকে আংটি দেখাতে না পারায় বিতাড়িত হলেন। পরে ধীবরের কাছ থেকে প্রাপ্ত অঙ্গুরীয় দেখে রাজার পূর্বস্মৃতি মনে পড়ে এবং তিনি অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকেন এবং শকুন্তলাকে ফিরে পাবার জন্য তাঁর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। শকুন্তলাও ইতোমধ্যে মারীচ আশ্রমে গিয়ে অসংযমী প্রবৃত্তির প্রায়শ্চিত্ত করতে থাকেন।

যে সন্ধিতে বীজযুক্ত বিষয় সমূহ একার্থে উপনীত হয় তাকে নির্বহণ সন্ধি বলে। নির্বহণে ফললাভ ঘটে। সপ্তম অঙ্কে ঋষি মারীচের আশ্রমে গ্লানিমুক্ত রাজা দুষ্মন্ত ও পুত্রসহ পরিশুদ্ধ শকুন্তলার মিলনের মধ্য দিয়ে প্রার্থিত ফললাভ হয় এবং নাটকের সমাপ্তি ঘটে। তাই সপ্তম অঙ্ক জুড়ে নির্বহণ সন্ধি রয়েছে।

সংস্কৃত ক্লাসিক্যাল নাটকে প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্তি সম্ভব, নিয়ত ফলপ্রাপ্তি ও ফলযোগ—নাট্যকারের এই পঞ্চ-অবস্থা থাকে—

প্রারম্ভশ্চ প্রযত্নশ্চ তথা প্রাপ্তেশ্চ সম্ভবঃ।
নিয়তা চ ফলপ্রাপ্তিঃ ফলযোগশ্চ পঞ্চমঃ॥[১১]

প্রারম্ভে কার্যের ফলসিদ্ধির জন্য ঔৎসুক্য থাকে। এখানে নাটকের প্রাথমিক অবস্থা সূচিত হয়। এটি নাট্যকার্যের প্রথম পদক্ষেপ। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত শকুন্তলার পরস্পরের প্রতি আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রযত্নে নায়ক নায়িকা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নানারকম প্রচেষ্টা করে। ফলে তাঁদের কর্মতৎপরতা বেড়ে যায়। যেমন, দ্বিতীয় অংকে রাজমাতা দুষ্মন্তকে আশ্রম থেকে রাজধানীতে ফিরে যাবার জন্য সংবাদ পাঠালে দুষ্মন্ত তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বিদূষককে সেখানে পাঠিয়ে দেন এবং রাজকর আদায় ও মুনিদের দেখাশোনা করার অজুহাতে শকুন্তলার জন্য আশ্রমে থেকে যান। এই যে দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলনের কর্মপ্রচেষ্টা একে প্রযত্ন বলে।

যেখানে ফললাভের সম্ভাবনা থাকে তাকে প্রাপ্তিসম্ভব বলে। উক্ত নাটকের তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার সখীরা তাঁকে মালিনী নদীর তীরে বেতস কুঞ্জে নিয়ে গিয়ে পদ্মপত্রে দুষ্মন্তের উদ্দেশে চিঠি লিখিয়ে ফুলের সঙ্গে দুষ্মন্তকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এখানে প্রেমের প্রকাশ সুস্পষ্ট হয়। এরপরে দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার সাক্ষাৎকার ঘটে। এইভাবে উভয়ের ভালোবাসার প্রাপ্তিসম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়, ঋষিরা শকুন্তলাকে স্বামীগৃহে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। সখীরা শকুন্তলাকে বলছেন, রাজা যদি শকুন্তলাকে চিনতে না পারেন তবে তিনি যেন রাজার দেওয়া স্মারক-চিহ্ন দেখান।

নিয়ত ফলপ্রাপ্তিতে যেমন বাধা থাকে, তেমনি ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও দেখা দেয়। পঞ্চম অঙ্কে শচীতীর্থে স্নান করার সময় শকুন্তলা রাজপ্রদত্ত স্মারক-চিহ্ন আংটিটি হারান। রাজসভায় তিনি রাজা দুষ্মন্তকে সেই আংটি দেখাতে না পারায় রাজাকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হলেন। এখানে ফললাভে বাধা এসেছে। কিন্তু ধীবরের কাছ থেকে আংটিটি পেয়ে রাজার মনে শকুন্তলাকে ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁর বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে। শকুন্তলার বিরহে কাতর দুষ্মন্ত স্মৃতির সাহায্যে শকুন্তলার ছবি আঁকলেন 'চিত্রীকৃতাকান্তা'। এদিকে অপ্সরা শানুমতী আকাশপথে এসে রাজার মনোবেদনার কথা জানতে পেরে মারীচের আশ্রমে স্থিতা শকুন্তলাকে সেই সংবাদ পৌঁছে দিলেন। দুষ্মন্তের চিন্তায় বিভোর শকুন্তলার মন এর ফলে দুষ্মন্তের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই সব ঘটনা নিয়ত ফলপ্রাপ্তির পরিচায়ক। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্ক জুড়ে এই কার্যের অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে।

ফলযোগে নাটকের কাহিনী পূর্ণ বিকশিত হয়ে পরিণতি লাভ করে। মারীচের আশ্রমে রাজার সঙ্গে শকুন্তলার সাক্ষাৎ হল। রাজা শকুন্তলাকে জানালেন, তিনি শকুন্তলার সঙ্গে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন তার জন্য অনুতপ্ত। রাজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শকুন্তলা যেন রাহুমুক্ত চাঁদ। রাজা শকুন্তলা ও তাঁদের পুত্র সর্বদমনের সঙ্গে মিলিত হলেন। ঋষি মারীচের নির্দেশে দুষ্মন্ত স্ত্রীপুত্রসহ স্বর্গরাজ ইন্দ্রের রথে চড়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। এইভাবে নাট্যকাহিনীর ফলযোগ সম্পূর্ণ হল।

সংস্কৃত নাটকে এছাড়া পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি আছে—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য। এদের প্রকৃতি-পঞ্চক বলা হয়—

বীজ: বিন্দু: পতাকা চ প্রকরী কার্যমেব চ।
অর্থপ্রকৃতয়: পঞ্চজ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি॥[১২]

বীজ হচ্ছে ফললাভের আদিকারণ। এর মধ্য দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত হয়। এখানে কাহিনী অল্পমাত্র বিকীর্ণ হয়ে পরবর্তীকালে বিস্তৃত হওয়ার আভাস দেয়। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে হিমগিরি উপত্যকায় কণ্বের আশ্রমে দুষ্মন্ত শকুন্তলার ভালোবাসা হল নাটকের বীজ। এটি প্রথম অঙ্কে আছে।

মূল বিষয় থেকে কাহিনী দূরে সরে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলে তাকে বিন্দু বলে, —'বিন্দুরচ্ছেদকারণম্।' উক্ত নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কে বিন্দুর প্রকাশ। এখানে বিদূষকের সঙ্গে রাজার শিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কথা শুরু হওয়ায় শকুন্তলাপ্রসঙ্গ দূরে সরে গেল। আবার কিছুক্ষণ পর পূর্ব প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রেমের কথা ফিরে এল। অন্য প্রসঙ্গ দ্বারা কাহিনী মূল বিষয় থেকে সরে গিয়েও আবার স্বস্থানে ফিরে আসায় এখানে বিন্দু হয়েছে।

পতাকা হচ্ছে প্রাসঙ্গিক-বৃত্ত। আধিকারিক বৃত্তের উপকারার্থে এটি নাটকে আসে। এই নাটকে দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে ষষ্ঠ অঙ্ক পর্যন্ত রাজবয়স্য বিদূষক নানাভাবে নাটকে এসেছে। বিদূষকের বৃত্তান্ত-ই হচ্ছে প্রাসঙ্গিক বৃত্ত তথা পতাকা।

কাহিনীর প্রয়োজনে যে বিশেষ ঘটনা নাটকে আসে তাকে প্রকরী বলে। ষষ্ঠ অঙ্কে দানবের সঙ্গে যুদ্ধে স্বর্গরাজ ইন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য মাতলী স্বর্গ থেকে রাজা

দুষ্মন্তকে নিতে আসেন। শকুন্তলার ধ্যানে মগ্ন রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মাতলী মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের ছাদে অপেক্ষারত রাজবয়স্য বিদূষকের ঘাড় মটকে দেন। বিদূষক যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলে রাজা ধনুকসহ তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। মাতলী তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন, বললেন, স্বর্গে উপদ্রবকারী দানবদের দমন করার জন্য স্বর্গরাজ রাজাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কাহিনীর এই অংশটুকু হল প্রকরী। নাটকে এই অংশটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ দুষ্মন্তকে স্বর্গে না নিয়ে গেলে পরবর্তীকালে মারীচ আশ্রমে শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর মিলন সম্ভব হত না।

গতিশীল ও সম্পর্কযুক্ত ঘটনাবলী নিয়ে যে নাট্যক্রিয়া গড়ে ওঠে তাকে কার্য বলে। এর মধ্য দিয়ে কাহিনী বা গল্প গড়ে ওঠে, চরিত্র বিকশিত হয় এবং নাট্যকারের মূল বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে বিভিন্ন সম্পর্কযুক্ত গতিশীল ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া অর্থাৎ কার্য পূর্ণতা লাভ করেছে।

পূর্বোক্ত তত্ত্বের আলোকে বিধায়কের নাটকের গঠনরীতি আলোচনায় প্রবেশ করছি।

।। থিয়েটারী নাটক

মেঘমুক্তি

নাটকটি পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত, এখানে দৃশ্য নেই। তবে চতুর্থ অঙ্কে দুটি ভাগ আছে। এই অঙ্কে একই বাড়ীর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ দেখানোর জন্য দৃশ্যান্তর হয়েছে। ফলে এই দুটি অংশ দুটি দৃশ্যে পরিণত হয়েছে।

এই নাটকের অঙ্কগুলিকে বিশেষ বিশেষ নামে ভূষিত করা হয়েছে। যেমন— মেঘসঞ্চার, মেঘবিস্তার ইত্যাদি। এই রীতি প্রাচীন ভারতীয় কিছু সংস্কৃত নাটক ও প্রকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন, কৃষ্ণ মিশ্রের "প্রবোধ চন্দ্রোদয়ম্" নাটকের অঙ্কগুলি বিভিন্ন নামে ভূষিত হয়েছে। সেখানে প্রতিটি অঙ্কের শেষে অঙ্কের নামকরণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, "ইতি শ্রীকৃষ্ণমিশ্র বিরচিতে প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে 'সংসারাবতারো' নাম প্রথমোহঙ্ক:॥" "ইতি প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে 'বৈরাগ্যোৎপত্তি' নাম পঞ্চোমোহঙ্ক:॥"-র নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

● **ঘটনা-সংযোজন**

যুবক উকিল প্রদ্যোতের স্ত্রী অণিমা। প্রদ্যোতের বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু বিজয় স্বামী-স্ত্রীর স্নেহধন্য। সম্প্রতি প্রদ্যোত সুন্দরী যুবতী পত্নীকে না জানিয়ে তার মৃত্যু পথযাত্রী অধ্যাপকের সেবা শুশ্রূষা করছে। সেজন্য কিছুদিন ধরে সে রাতে বাড়ী ফিরতে পারছে না। সেই

বিষয়ে স্বামীকে প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর না পাওয়ায় অণিমার মনে অভিমানের মেঘ জমেছে। মীরাট থেকে প্রদ্যোতের দাদামশায়ের বন্ধু অতুল গুপ্ত তাঁর আধুনিকা নাতনী বেবীকে নিয়ে প্রদ্যোতের বাড়ী বেড়াতে এসেছেন। তিনি স্বামী-স্ত্রীর অম্ল সম্পর্ক নিয়ে চিন্তিত। মৃত্যুকালে অধ্যাপক প্রদ্যোতকে তাঁর যুবতীকন্যা গীতার সব দায়িত্ব গ্রহণ করতে বিশেষ অনুরোধ করলে প্রদ্যোত স্বীকৃত হয়। প্রদ্যোতের ডাক্তার-বন্ধু স্বপন রায় দুশ্চরিত্র, প্রতারক। সে স্বামী-স্ত্রীর বর্তমান অবস্থার সুযোগ নিয়ে অণিমার হৃদয়জয়ে ব্যস্ত। সেজন্য সে প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে অণিমার মন ভারাক্রান্ত করে তোলে। একদিন দিল্লী থেকে আগত প্রদ্যোতের বন্ধু প্রণব প্রদ্যোতের অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীতে উপস্থিত হলে স্বপন ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে গীতার বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে সেখানে প্রদ্যোতের সন্ধান নিতে বলে। ইতোমধ্যে একদিন স্বপন কৌশলে অণিমাকে গীতা ও প্রদ্যোতের সম্পর্ক নিয়ে মিথ্যা কথা বললে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির শুরু হয় ও অশান্তির মেঘ উভয়কে ঘিরে ধরে (মেঘসঞ্চার)।

এদিকে গীতা ও বিজয়ের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রদ্যোত গীতাকে ছোট বোনের মত দেখে। প্রদ্যোত ও বিজয় প্রতি সন্ধ্যায় গীতার বাড়ী আসে। প্রণব একদিন প্রদ্যোতের সন্ধানে গীতার বাড়ী এসে তার দেখা পায় এবং তার পলাতক ভগ্নীপতিকে খুঁজে বের করতে প্রদ্যোতকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এর কিছুক্ষণ পূর্বে বিজয় বিশেষ কাজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। সেই সুযোগে স্বপন ডাঃ তাপহরণ রায় পরিচয়ে গীতার বাড়ীতে প্রবেশ করে ও প্রদ্যোত যে মদ্যপ এবং বিজয় যে একসময় অপর্ণা নামে একটি মেয়ের প্রতি প্রেমাসক্ত ছিল—এই মিথ্যা কাহিনী বলে গীতার মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে। (মেঘবিস্তার)।

প্রদ্যোতের অনুপস্থিতিতে স্বপন অসুস্থ অণিমার মন তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিষাক্ত করে তোলে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি দেখে অতুলবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। একদিন স্বপন অণিমাকে প্রেমনিবেদন কালে উচ্ছ্বাসভরে তার হাত ধরলে সেখানে প্রদ্যোতের আগমন ঘটে। সেই দৃশ্য দেখে সে দ্রুত প্রস্থান করে। ইতোমধ্যে অণিমার বান্ধবী অপর্ণা নিরুদ্দেশ স্বামীর সন্ধানে অণিমার বাড়ী আসে। বহুনারীভোক্তা স্বামী যে বিবাহের পর তাকে ত্যাগ করে অন্তর্ধান করেছে—সে কথা অপর্ণা অণিমাকে জানায়। এদিকে অণিমা ও প্রদ্যোতের সম্পর্ক এত তিক্ত হয়ে ওঠে যে প্রদ্যোত অণিমাকে অসুস্থতার জন্য বায়ুপরিবর্তনের কথা বললে অণিমা সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। ক্ষুব্ধ প্রদ্যোত অণিমাকে আঘাত করার জন্য গীতা যে তার তুলনায় কত উঁচু মানসিকতার অধিকারী সে মন্তব্য করে। এই অপমানে অণিমা কেঁদে ফেলে। প্রদ্যোত প্রস্থান করলে অপমানিতা অণিমা স্বামী-প্রশংসিতা গীতাকে দেখার জন্য স্বপন রায়ের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। অপর্ণা সেকথা জানতে পেরে সে কাজে অণিমাকে নিবৃত্ত হতে বলে। এদিকে অপর্ণাকে প্রদ্যোতের বাড়ীতে সে মুহূর্তে আবিষ্কার করে স্বপন রায় যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। (মেঘাড়ম্বর)।

অণিমা ও স্বপন গীতার বাড়ীতে গোপনে গমন করে এবং একসময় ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে উভয়ে পলায়ন করে। সেদিন প্রদ্যোত গীতাকে অণিমার জন্মদিন উপলক্ষে তার বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানায় (মেঘবিশ্লেষ-গীতাদের বাড়ীতে)।

এদিকে পলায়নরত স্বপন ও অণিমাকে চিনতে না পেরে বিজয় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসে। তবে পলায়নরত ব্যক্তিটি যে ডাঃ স্বপন রায় অনুমানে সে কথা বিজয় বললে প্রণব জানায়, সেও ডাঃ মেঘবরণ নামে এক ব্যক্তিকে খুঁজছে। সেই নাম শুনে বিজয়ের মনে কেমন সন্দেহ উপস্থিত হয়। তার দৃঢ় ধারণা হয়, স্বপন-ই কখনো তাপহরণ, কখনো মেঘবরণ, আবার কখনো স্বপন নাম ধারণ করে সকলকে বিভ্রান্ত করছে। (মেঘবিশ্লেষ— গীতাদের বাড়ীর সম্মুখের দৃশ্য)।

অণিমার জন্মদিনে আমন্ত্রিত গীতা প্রদ্যোতের বাড়ী আসে। সেদিন অণিমা গীতার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে প্রদ্যোত গীতাকে বোনের মত স্নেহ করে। অনুতপ্ত অণিমা অতুলবাবর পরামর্শে পিতৃমাতৃহীন গীতাকে নিজের গৃহে রাখা স্থির করে। বিজয় ও গীতা যে অদূর ভবিষ্যতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে তাও জানা যায়। ইতোমধ্যে স্বপন যে অপর্ণার পলাতক স্বামী তা প্রকাশিত হয়। নিজের স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ায় স্বপন উৎসব বাড়ী থেকে পলায়ন করে। এদিকে প্রণব এসে নিখোঁজ ভগ্নী অপর্ণার সাক্ষাৎ পায়। অতুল গুপ্ত স্বামী পরিত্যক্তা অপর্ণাকে তার স্বামী স্বপনকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। অণিমা-প্রদ্যোতের অভিমান ও সন্দেহের মেঘ কেটে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী পুণর্মিলিত হয়। সংসারে আবার শান্তি ফিরে আসে। (মেঘমুক্তি)।

● বৃত্ত-গঠন

এই নাটকের দুটি বৃত্ত।

অধ্যাপক-কন্যা যুবতী গীতাকে কেন্দ্র করে প্রদ্যোত ও অণিমার মধ্যে যে অশান্তি ও ভুল বোঝাবুঝি হয়, প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে তার অবসান ঘটে—এটি আধিকারিক বৃত্ত (Main plot)।

আধিকারিক বৃত্তের সহায়তার জন্য গীতা-বিজয়-উপকাহিনী, স্বপন-অপর্ণা-প্রণব-উপকাহিনী প্রাসঙ্গিক বৃত্ত (Sub-plot) রূপে এসেছে।

● অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্র

এই নাটকে কোন অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য নেই। তবে বেবী ও আরতি-চরিত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই মূলকাহিনীকে সহায়তা করেনি। সুতরাং এরা নাট্য কাহিনীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চরিত্র। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার আরতি চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন—"আরতি চরিত্রটি অনায়াসেই বাদ দিতে পারেন— তাতে নাটকের কোন অঙ্গহানি হবে না। একান্ত প্রয়োজনেই ঐ চরিত্রটি আমাকে রচনা করতে হয়েছে।"

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

Dr. Gustav Freytag-এর 'পিরামিড গঠনরীতি' অনুসারে 'মেঘমুক্তি'র নাট্যক্রিয়াকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়।

'মেঘসঞ্চার' অংশে নাটকের মূল বক্তব্যের আভাস দেওয়া হয়েছে। এখানে স্বামী-স্ত্রীর সংঘাতের বীজ উপ্ত হয়েছে। গীতাকে কেন্দ্র করে প্রদ্যোত অণিমার মানসিক ব্যবধান, স্বামী-স্ত্রীর দূরত্ব সৃষ্টির ব্যাপারে প্রদ্যোতের বন্ধু দুশ্চরিত্র স্বপনের বিশেষ ভূমিকা—এই অংশ থেকে জানা যায়। সুতরাং এটি নাট্যক্রিয়ার প্রথম পর্যায় বা সূচনা অংশ (exposition)।

'মেঘবিস্তার'-এ মূল দ্বন্দ্ব জটিল হয়ে নাট্যক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এখানে মূল দ্বন্দ্বকে পরিপুষ্ট করার জন্য অন্যান্য ঘটনার জাল বিস্তার করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য কাহিনী ঊর্ধ্বমুখী (rise) হয়েছে।

'মেঘাডম্বর'এ প্রদ্যোতের অণিমাকে অপমানের মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব চরম অবস্থায় (climax) পৌঁছেছে।

'মেঘবিশ্লেষ' অংশে দ্বন্দ্ব পরিণামমুখী (return or, fall) হয়েছে এবং নাট্যকাহিনী একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে। এটি নাট্যক্রিয়ার চতুর্থ পর্যায়। স্বপনের সঙ্গে অণিমার গোপনে গীতার বাড়ী গমন, ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সে স্থান থেকে পলায়ন এবং গীতাকে অণিমার জন্মদিন উপলক্ষে প্রদ্যোতের আমন্ত্রণ—এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনীর অনিশ্চয়তার অবসানে সুস্পষ্ট ফলপরিণতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'মেঘমুক্তি'তে গীতার কথায় অণিমার ভুল ভাঙ্গা ও অনুতাপ, স্বপনের স্বরূপ প্রকাশ ও অণিমা-প্রদ্যোতের পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া অভীষ্ট পরিণতি (catastrophe) লাভ করেছে।

মাটির ঘর

নাটকটি অঙ্ক-বিভক্ত নয়, দৃশ্যে বিভক্ত। এখানে ছয়টি দৃশ্য আছে।

● ঘটনা-সংযোজন

সভ্যপ্রসন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বিপত্নীক উদার পিতা। তাঁর তিন কন্যা—তন্দ্রা, নন্দা ও ছন্দা। তিনি এদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন. তন্দ্রা বিবাহের পূর্বে অলক নামে এক পুরুষকে ভালোবাসত। কিন্তু বিবাহে মত দেওয়ার ব্যাপারে তন্দ্রার ইতঃস্তত ভাবের জন্য উভয়ের বিবাহ সংঘটিত হয়নি, অপমানিত অলক নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

পরে তন্দ্রা পিতৃনির্বাচিত পাত্র কল্যাণকে বিবাহ করে এবং পিতার ইচ্ছায় পিত্রালয়ে স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। তন্দ্রার বিবাহের কিছুদিন পর প্রতিশোধ স্পৃহায় অলক তন্দ্রাকে ভয় দেখিয়ে মাঝে মাঝে অর্থ নিতে শুরু করে। একদিন ঝড় দুর্যোগের রাতে তন্দ্রার ঘরে অলকের আগমন ঘটে। সেদিন অলকের ফেলে দেওয়া পোড়া সিগারেটের অংশ বিশেষ দেখে স্ত্রীর কাছে এ ব্যাপারে কোন সদুত্তর না পেয়ে কল্যাণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় (প্রথম দৃশ্য)।

সত্যপ্রসন্নর দ্বিতীয় কন্যা নন্দার স্বামী চঞ্চল দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। তার অত্যাচারে নন্দা পিতার ঘরে ফিরে এসেছে। সেজন্য সত্যপ্রসন্নর দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ইতোমধ্যে চঞ্চল স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে এলে নন্দা স্বামীগৃহে যেতে অসম্মতি জানায়। ফলে রুষ্ট চঞ্চল স্ত্রীকে শাস্তি দেবার হুমকি জানিয়ে ফিরে যায়। সত্যপ্রসন্নর তৃতীয় কন্যা ছন্দা সহপাঠী উৎপলকে ভালবাসে। এদিকে কল্যাণ অলক-তন্দ্রার পূর্ব সম্পর্ক জানতে পারে। একদিন উভয়ের কিছু বিসদৃশ আচরণে কল্যাণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে (দ্বিতীয় দৃশ্য)।

ছন্দা-উৎপলের প্রেম ঘনীভূত হয়ে বিশেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। চঞ্চল আবার নন্দাকে ফিরিয়ে নিতে এসে সত্যপ্রসন্নকে অসম্মানজনক কথা বলে। অপমানিত সত্যপ্রসন্ন জামাতা চরিত্রের চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে কন্যাকে আসন্ন দুর্গতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য চঞ্চলের সঙ্গে নন্দাকে পাঠাতে সম্পূর্ণ অসম্মতি জানান। অকৃতকার্য হয়ে চঞ্চল ফিরে গেলে কিছুক্ষণ পর চঞ্চলের দিদি অঞ্জনা নন্দাকে ফিরিয়ে নিতে আসে এবং ব্যর্থ হয়ে নন্দাকে আইনের ভয় দেখিয়ে বিদায় নেয়। এদিকে অলক তন্দ্রাকে স্বামীত্যাগ করে তার সঙ্গে চলে যাবার দাবী জানায়। তার প্রতি স্বামীর অকৃত্রিম প্রেমের কথা ভেবে তন্দ্রা অলকের সঙ্গে যেতে অস্বীকৃত হলে প্রতিশোধপরায়ণ অলক ছন্দাকে বিবাহের ইচ্ছার কথা জানায়। ছন্দা-উৎপলের প্রেমের কথা ভেবে তন্দ্রা তাকে সে কাজে নিবৃত্ত হতে বলে। ইতোমধ্যে কল্যাণ এসে গভীর রাতে তন্দ্রা ও অলককে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে। এর ফলে তন্দ্রা অপমানিত বোধ করে ও অলকের প্ররোচনায় গৃহত্যাগ করতে সম্মত হয়। স্বামীর ব্যবহারে বিপর্যস্ত নন্দা স্বামী কর্তৃক পিতার অপমানের কথা জানতে পেরে নিজের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। তার পক্ষে জীবনের ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। (তৃতীয় দৃশ্য)।

তন্দ্রা পূর্বপরিকল্পনামত অলকের সঙ্গে গোপনে গভীররাতে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু যাবার মুহূর্তে নন্দার বিষপানে আত্মহত্যার ঘটনার আঘাতে তার মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয় (চতুর্থ দৃশ্য)।

এরপর তন্দ্রার পাগলামি ক্রমশঃ বেড়ে চলে। তন্দ্রা ও নন্দার ঘটনা সত্যপ্রসন্নকে আঘাত করলেও তিনি ধৈর্যের সঙ্গে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করেন। সেই অবস্থায় তিনি ছন্দার বিবাহ দিয়ে তাঁর জীবনের শেষ কাজ সম্পন্ন করতে চান। কিন্তু উৎপল এসে ছন্দার সঙ্গে তার বিবাহে পিতার অসম্মতির কথা জানালে তিনি মানসিক আঘাত পান (পঞ্চম দৃশ্য)।

কল্যাণ অসুস্থ স্ত্রীকে নিরাময়ের চেষ্টায় তার নূতন চাকুরীস্থল সিমলায় নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ছন্দাকে বিবাহেচ্ছু চঞ্চলের ভয়ংকর গ্রাস থেকে এবং সত্যপ্রসন্নর সংসারকে (সত্যপ্রসন্ন, তন্দ্রা, ছন্দা) বাঁচাতে কল্যাণ অলককে তার কর্মস্থল থেকে সিমলায় ডেকে পাঠায় এবং ছন্দাকে বিবাহ করার জন্য তাকে অনুরোধ করে। বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে অলক সেই বিবাহে সম্মত হয়। সত্যপ্রসন্ন ও ছন্দার সঙ্গে সিমলায় আগত চঞ্চলের প্রকৃতরূপ অচিরে প্রকাশ পায়। চঞ্চল যে নন্দার কাছে বিষ পাঠিয়ে তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল তা মৃত নন্দার ক্যাশ বাক্স থেকে কল্যাণ দ্বারা উদ্ধার করা চিঠিতে প্রমাণিত হয়। লোভী, প্রতারক, নীচ-স্বভাব চঞ্চলকে এরপর বিতাড়িত করা হয়। সব দায়িত্বভার অলকেব হাতে অর্পণ করে কল্যাণ যেন শান্তিতে মৃত্যুবরণ করে। সংসারের চরম বিপর্যয়ে সত্যপ্রসন্ন গভীর বেদনায় ভেঙ্গে পড়েন। (ষষ্ঠ দৃশ্য)।

● বৃত্ত-গঠন

এই নাটকের দুটি বৃত্ত—একটি আধিকারিক বৃত্ত, অন্যগুলি প্রাসঙ্গিক বৃত্ত। কন্যাদের বিপর্যয়ে সত্যপ্রসন্নর জীবন ব্যর্থতার হাহাকারে ভরে ওঠে—এটি মূল বা আধিকারিক বৃত্ত।

এই নাটকের প্রাসঙ্গিক বৃত্ত তিনটি—

(ক) তন্দ্রার বিবাহ-পূর্ব প্রেমিক অলকের সঙ্গে পুনঃসম্পর্ক স্থাপন, তন্দ্রা ও অলকের সম্পর্ক নিয়ে তন্দ্রার স্বামী কল্যাণের অসন্তোষ, তন্দ্রাকে নিয়ে অলকের পালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, নন্দার আত্মহত্যার খবরে মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত তন্দ্রার মস্তিষ্ক বিকৃতি।

(খ) চঞ্চলের অত্যাচারে নন্দার পিত্রালয়ে বসবাস, চঞ্চল ও ননদিনী অঞ্জনার নন্দাকে শ্বশুরালয়ে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা, চঞ্চলের সত্যপ্রসন্নকে অপমান, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় নন্দার বিষপানে আত্মহত্যা।

(গ) ছন্দা ও উৎপলের ঘনিষ্ঠতা, প্রেম ও শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত বিবাহসম্বন্ধ ছিন্ন।

● অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্র

এই নাটকে কাহিনীর পক্ষে অতিরিক্ত দৃশ্য নেই। তবে কিছু অপ্রয়োজনীয় অংশ আছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে ছন্দার বান্ধবীদের কথোপকথন অংশটি নাট্য ঘটনা-অগ্রগতির সহায়ক হয়নি। এ প্রসঙ্গে নাটকের ভূমিকায় নাট্যকারের মন্তব্যটি উদ্ধার করা যেতে পারে—

"মেয়ে সাজাবার লোকের অভাব হলে ১৭ পাতার ছন্দার গানের পর * তারকা চিহ্ন থেকে ২১ পাতার গানের নীচের * তারা চিহ্ন পর্যন্ত বাদ দিয়ে দেবেন, তাতে নাটকের অঙ্গহানি হবে না।"

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

John Howard Lawson-এর তত্ত্বানুসারে 'মাটির ঘর'-এর নাট্য ক্রিয়াকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই নাটকের সূচনা অংশে (exposition) মূল ঘটনা ও বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলে হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্য নিয়ে সূচনা অংশ গড়ে উঠেছে। তিন কন্যার ব্যর্থ জীবন যে সত্যপ্রসন্নকে চরম মানসিক কষ্ট দিয়েছে নাটকের এই মূল বক্তব্যের ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হয়েছে। সত্যপ্রসন্নর বিবাহিত প্রথম কন্যা তন্দ্রার সঙ্গে পূর্ব প্রেমিক অলকের সম্পর্ক নিয়ে তন্দ্রার স্বামী কল্যাণের মনে সন্দেহ (প্রথম দৃশ্য), সত্যপ্রসন্নর মধ্যম কন্যা নন্দার সঙ্গে দুশ্চরিত্র স্বামী চঞ্চলের তিক্ত সম্পর্ক, কনিষ্ঠকন্যা ছন্দাব সঙ্গে সহপাঠী চঞ্চলের ঘনিষ্ঠতার (দ্বিতীয় দৃশ্য) মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী সূচিত হয়েছে। এটি নাট্যক্রিয়ার প্রথম পর্যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নন্দাকে অত্যাচারী স্বামীগৃহে প্রেরণে সত্যপ্রসন্নর অসম্মতি, স্বামীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ তন্দ্রাব পূর্বপ্রেমিক অলকের সঙ্গে অন্যত্র যাওয়ার পরিকল্পনার (তৃতীয় দৃশ্য) মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার অগ্রগতি (rising action) হয়েছে।

তৃতীয় পর্যাযে নাট্যকার বহুপ্রকার সংঘাত (clash)-এর অবতারণা করেছেন। অত্যাচারী স্বামীগৃহে নন্দাকে না পাঠানোর জন্য সত্যপ্রসন্নর সঙ্গে নন্দার স্বামী চঞ্চলের সংঘাত, নন্দাকে ফিরিয়ে নিতে এলে চঞ্চলের দিদি অঞ্জনার সঙ্গে নন্দার সংঘাত, অলককে কেন্দ্র করে তন্দ্রার সঙ্গে কল্যাণের সংঘাত বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া চঞ্চল কর্তৃক পিতার অপমানের কথা জানতে পারায় নন্দা যে অত্যন্ত মানসিক কষ্ট পেয়েছে এটিও নন্দা ও চঞ্চলের মানসিক সংঘাতের-ই একটি রূপ (তৃতীয় দৃশ্য)।

চতুর্থ পর্যায়ে নাট্যক্রিয়ার চূড়ান্তরূপ (climax) লক্ষ্য করা যায়। এই অংশেই সমস্ত ঘটনার মীমাংসা ও সমাপ্তি ঘটেছে। এরপর দর্শক ও পাঠকের নাট্যকাহিনী সম্পর্কে অজানা বা কৌতূহল কিছুই থাকে না। নন্দার বিষপানে মৃত্যু সংবাদের আঘাতে তন্দ্রার মস্তিষ্ক-বিকৃতি (চতুর্থ দৃশ্য), এর ফলে অলকের অনুশোচনা (পঞ্চম দৃশ্য), ছন্দা ও উৎপলের প্রেম সম্পর্ক ছিন্ন (পঞ্চম দৃশ্য), দুশ্চরিত্র প্রতারক চঞ্চলের হাত থেকে সত্যপ্রসন্নর সংসারকে বাঁচানোর জন্য মৃত্যু পথযাত্রী কল্যাণের অনুরোধে অলকের ছন্দাকে বিবাহ করার প্রস্তাব গ্রহণ, স্ত্রীকে বিষপানে প্ররোচিত করার খবর জানতে পারায় চঞ্চলের প্রকৃতরূপের প্রকাশ ও তাকে বিতাড়ন, কল্যাণের মৃত্যু (ষষ্ঠ দৃশ্য)-র মধ্য দিয়ে সত্যপ্রসন্ন রচিত ঘরের বিপর্যয়ের কাহিনী সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যক্রিয়ার চতুর্থ পর্যায়ের পরিণতি নেমে এসেছে।

বিশ বছর আগে

এই নাটকটি এগারটি দৃশ্য-সমন্বিত। তবে মূল কাহিনী তৃতীয় দৃশ্য থেকে আরম্ভ হয়েছে। এখানে বিশ বছর আগের ঘটনা flash back প্রথায় বর্ণিত। প্রথম, দ্বিতীয় ও একাদশ দৃশ্যে বিশ বছর পরের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। বিশ বছর পূর্বে যে রহস্যময় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল সেই রহস্যের উদ্ঘাটন হল বিশ বছর পর। এটি নাটকের একাদশ দৃশ্যে প্রদর্শিত হয়েছে।

- **ঘটনা-সংযোজন**

ভাড়া নেবার জন্য এক আগন্তুক একটি জীর্ণ পুরাতন বাগানবাড়ীর সামনে উপস্থিত হয়। সে বাড়ীতে এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা থাকে। বৃদ্ধার নাম মণি, সে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থা। আগন্তুককে বৃদ্ধ জানায় সে সেই বাড়ীতে রোজ গভীর রাতে একটা পিস্তলের শব্দ শুনতে পায় এবং রাত দুটোর সময় একটি পুরুষের গোঁ গোঁ শব্দ ও একটি মেয়ের কান্না শোনা যায়। আগন্তুক সে কথা শুনে বাড়ীর অভ্যন্তরে যেতে চায় (প্রথম দৃশ্য)।

সে বৃদ্ধের সঙ্গে বাড়ীর বসবার ঘরে এসে দাঁড়ায়, বৃদ্ধকে জানায় সেই ঘরে বন্ধুহত্যার অপরাধে সে ধৃত হয়েছিল। সেজন্য তার বিশ বছরের দণ্ড হয়। বিশ বছর পর কারামুক্ত হয়েই সে বর্তমান স্থানে চলে এসেছে। তার বন্ধু গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে কিন্তু সে জানে সে তাকে হত্যা করেনি। কার গুলিতে তার মৃত্যু হল, সেই রহস্য দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে সে সমাধান করতে পারেনি, এবং সেই রহস্য সমাধানের জন্য তার আগমন ঘটেছে। বৃদ্ধ চলে গেলে সেই ব্যক্তি বিশ বছর আগের ঘটনা চিন্তা করতে থাকে। ক্রমে তার চোখের সামনে বিশ বছর আগের ঘটনা ভেসে ওঠে (দ্বিতীয় দৃশ্য)।

জমিদার প্রদীপ ও অভিনেতা দীপক সহপাঠী ও বন্ধু। প্রদীপ একটি রঙ্গমঞ্চের অধিকর্তা। সেই মঞ্চে দীপক অভিনয় করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা দুজনে সহপাঠিনী তমসাকে ভালবাসে। তমসা দীপককে ভালোবাসে। কিন্তু সে স্পষ্টভাবে দুই বন্ধুকে সে কথা জানায় না। প্রদীপ তা বোঝে, সেজন্য তার মনে জ্বালা। একদিন তমসা তাদের জানায়, সে তার মা'র ইচ্ছানুসারে দুই বন্ধুর একজনকে বিবাহ করতে চায়, কিন্তু কাকে বিবাহ করবে সেটা সে স্থির করতে পারছে না। তাই সে তাদের অনুরোধ করে, তারা যেন সেই ব্যাপারে পরস্পর পরামর্শ করে বলে যে, সে কাকে জীবনসঙ্গী করবে। প্রদীপ তমসার কৌশল বুঝতে পেরে ক্রোধে সেই বাড়ী ত্যাগ করে। প্রদীপকে বিবাহ করার

জন্য দীপক তমসাকে অনুরোধ জানায়। সে বলে, তার অন্নদাতা প্রদীপকে তমসা বিবাহ করলে সে সুখী হবে। সে যেন দীপকের মত ছন্নছাড়া নটের জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে না ফেলে (তৃতীয় দৃশ্য)।

প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রদীপ দীপককে অপদস্থ করার জন্য থিয়েটারের ম্যানেজার ও বন্ধু প্রকাশকে জানায়, সে আর আর্থিক ক্ষতি সহ্য করে থিয়েটার চালাতে রাজী নয় এবং নূতন নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য যে দুই হাজার টাকা শিল্পীদের দেবার কথা ছিল তাও সে দিতে অক্ষম। প্রদীপের সেই অন্যায় কাজের প্রতিবাদে সেই রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী মনীষা নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে দুই হাজার টাকা দিয়ে দেয়। মনীষার বোন তন্বীকে তিন বছর আগে বিশেষ কারণে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। মনীষার অনুরোধে দীপক তন্বীকে বিবাহ করার কথা পুলিশকে জানালে সে মুক্ত হয়। কিন্তু তাদের বিবাহ হয়ে ওঠে না। তবে সেদিন থেকে তন্বী দীপককে স্বামীজ্ঞানে সেবাযত্ন করে। দীপক অবশ্য তাকে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দেয় না। এ নিয়ে মনীষার অভিযোগের শেষ নেই। সেদিন প্রদীপ চলে যাওয়ার পর দীপক বঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে ও সমস্ত ঘটনা জানতে পারে। কিছুক্ষণ পর প্রদীপের খোঁজে তার স্টেটের ম্যানেজার দুঃখদহন আসে ও প্রদীপের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য দীপকের কাছ থেকে দুটি ঠিকানা সংগ্রহ করে বিদায় নেয়। দুঃখদহন চলে গেলে তন্বী দীপকের জন্য চা জলখাবার নিয়ে আসে। সহ্যের প্রতিমূর্তি তন্বীকে দেখে দীপকের মধ্যে অপরাধবোধ জাগে। সে তার প্রতি অবিচারের জন্য তন্বীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে (চতুর্থ দৃশ্য)।

দীপককে অপদস্থ করার জন্য মোসাহেব মনোহরের প্ররোচণায় বিশ্বনারী সংরক্ষণী সমিতির সম্পাদিকা তরলিকার সাহায্যে তন্বীকে অপহরণ করে প্রদীপ তার বাগান বাড়ীতে নিয়ে আসার জন্য ষড়যন্ত্র করে। ইতোমধ্যে থিয়েটারের কর্মী সনাতন মারফৎ রঙ্গমঞ্চে নূতন নাটক 'সুভদ্রাহরণ' শুরু হবার কথা প্রদীপ জানতে পেরে দীপকের উপর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কারণ তার ধারণা হয়, এ সবের মূলে দীপকের অবদান রয়েছে। উন্মত্ত প্রদীপ তার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো তমসার ছবিতে চাবুক মারতে থাকে। অকস্মাৎ সেখানে তমসার আবির্ভাব ঘটে। সে আগামীকাল থিয়েটারে তার সঙ্গে প্রদীপের যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছিল। প্রদীপের নিষ্ঠুর আচরণ দেখে সে হতবাক্ হয়ে যায়। তমসাকে দেখে অপ্রস্তুত প্রদীপ তমসাকে বলে, তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণায় সে এ ধরণের উন্মত্ত আচরণ করেছে কিন্তু দীপকও ভালোমানুষ নয়, সে তন্বী নামে একটি মেয়েকে বিবাহ করে সংসার করছে অথচ সে কথা অনেকেই জানে না। তমসা শান্তভাবে বলে, দীপক তাকে সব কথা বলেছে। দীপক তন্বীকে বিবাহ করেনি, যদিও তন্বী তাকে স্বামী বলে মনে করে। সে সময় দুঃখদহন সেখানে আবির্ভূত হয়। তাকে দেখে প্রদীপ বিস্মিত হয়। দুঃখদহন তাকে জানায়, সে দীপকের কাছ থেকে তার বাড়ী ও তমসার বাড়ীর ঠিকানা সংগ্রহ করেছে। দুঃখদহন প্রদীপকে তার সঙ্গে বিশেষ একটি জায়গায় যেতে বলে। প্রদীপ দুঃখদহনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে (পঞ্চম দৃশ্য)।

দীর্ঘ চারবছর পর দুঃখদহনের চেষ্টায় কলকাতার একটি বাড়ীতে প্রদীপের স্ত্রী বনলতার সঙ্গে প্রদীপের সাক্ষাৎ হয়। বনলতা তাকে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে কিন্তু প্রদীপ তাতে অসম্মতি জানায় এবং স্ত্রীকে অপমানিত করে চলে যায় (ষষ্ঠ দৃশ্য)।

তমসা ও প্রদীপ 'সুভদ্রাহরণ' নাটক দেখতে এসেছে। অভিনয় শেষে তমসা দীপককে অভিনন্দন জানাতে আসে। প্রদীপের তমসার প্রতি আকর্ষণের কথা চিন্তা করে তমসাকে নিজের প্রতি বিরূপ করে তোলার জন্য দীপক দূর থেকে তাকে আসতে দেখে থিয়েটারের একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকে। সে দৃশ্য দেখে তমসা দীপককে ধিক্কার দিয়ে ঘৃণায় সেখান থেকে সরে আসে। সে তখন প্রদীপকে বলে, তার দীপক সম্পর্কে পূর্ব ধারণা ভেঙ্গে গেছে এবং সে প্রদীপকে বিবাহ করতে চায়। তমসা ও প্রদীপ চলে গেলে দীপক গভীর দুঃখে তন্বীকে তার লজ্জাজনক জন্মবৃত্তান্ত জানিয়ে বলে, সে মাতৃপরিত্যক্ত ও অনাথ আশ্রমে বড় হয়ে ওঠায় কোন দিন কোন নারীকে ভালোবাসতে পারেনি। কথা শেষে সে তন্বীকে বাড়ী চলে যেতে বলে। তন্বী একাকী বাড়ী চলে যায় (সপ্তম দৃশ্য)।

এদিকে তমসার সঙ্গে প্রদীপের বিবাহের খবর শুনে তমসার বাড়ীতে দুঃখদহন বনলতাকে নিয়ে আসে। সেদিন তমসা জানতে পারে প্রদীপ বিবাহিত। সেই বিবাহ যাতে না হয় সেজন্য বনলতা তমসাকে অনুরোধ করে। তমসা জানায়, যেহেতু প্রদীপ বিবাহিত সেই কারণে তাকে সে বিবাহ করতে পারে না। ইতোমধ্যে মনীষা এসে সংবাদ দেয়, তন্বী অপহৃত হয়েছে (অষ্টম দৃশ্য)।

তন্বীকে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সে কথা দীপককে জানালে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে সময় তমসার মুখে প্রদীপের বিবাহিত জীবনের কথাও সে জানতে পারে। ইতোমধ্যে দুঃখদহন প্রদীপ কর্তৃক তন্বী-অপহরণ-সংবাদ দেয়। দীপক প্রদীপকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিতে চায়। তবে উদ্বিগ্ন বনলতাকে বলে, সে পিস্তল দেখিয়ে তার বন্ধুকে শুধু ভয় দেখাবে। তখন দুঃখদহন একটি গুলিবিহীন পিস্তল তার হাতে তুলে দেয়। (নবম দৃশ্য)।

প্রদীপের বাগান বাড়ীতে তন্বীকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হলে সে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার খবরে প্রদীপ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। ঠিক সে সময় দীপক পিস্তল হাতে প্রবেশ করে ও পূর্বপরিকল্পনামত তাকে গুলি করার ভান করে। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটি গুলির শব্দ শোনা যায় এবং গুলির আঘাতে প্রদীপের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় দুঃখদহন নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে। তার ধারণা হয়, যে পিস্তলকে সে গুলিবিহীন বলে মনে করেছিল, সম্ভবতঃ ভুলবশতঃ তারমধ্যে গুলি ছিল। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সে সেখানেই গুলির আঘাতে আত্মহত্যা করে। দীপক নিজেকে প্রদীপের হত্যাকারী মনে করে পুলিশের হাতে ধরা দেয়। দণ্ড হিসাবে তার বিশ বছরের জন্য দ্বীপান্তর হয় (দশম দৃশ্য)।

বিশ বছর পর সেই বাগানবাড়ীতে বসে দীপক সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা চিন্তা করে উত্তেজনায় চিৎকার করে বলে ওঠে, সেদিন প্রদীপকে সে হত্যা করেনি কিন্তু কে তাকে হত্যা করল। সেই চিৎকারে শুনে মণি পাগলী ছুটে এসে বলে, সে প্রদীপকে হত্যা করেছে। সে জানায়, দীপক যখন পিস্তল তুলে প্রদীপকে ভয় দেখাচ্ছিল সে সময় সে দরজার আড়াল থেকে গুলি করে পালিয়ে যায়। দীপক তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে বলে তার নাম মনীষা, সে তন্বীর দিদি। দীপক বন্ধু-হত্যার প্রতিশোধ নিতে মনীষাকে

গুলি করতে গেলে মনীষা মৃত্যুর পূর্বে তার পাপস্খালনের জন্য দীপককে প্রণাম করে। তা দেখে দীপকের হাত থেকে পিস্তল পড়ে যায়। সে মনীষাকে হত্যা করতে পারে না (একাদশ দৃশ্য)।

● বৃত্ত গঠন

এই নাটকের একটি আধিকারিক বৃত্ত, দুটি প্রাসঙ্গিক বৃত্ত। দীপক-তমসার প্রেমের মধ্যে প্রদীপের অনুপ্রবেশ ঘটায় উভয়ের প্রেম সার্থকতা লাভ করে না—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

মনীষা-তন্বী-উপকাহিনী, বনলতা-দুঃখদহন উপকাহিনী—এই প্রাসঙ্গিক বৃত্ত দুটি আধিকারিক বৃত্তের প্রয়োজনে এসেছে।

● অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্র

এই নাটকে ... অবান্তর দৃশ্য নেই তবে কিছু অংশ ও চরিত্র অপ্রয়োজনীয়। যেমন, ষষ্ঠ দৃশ্যের ... ও নিতাই-এর কথোপকথন, বনলতা-সরমার আলোচনা অংশটি নাট্য অগ্রগতির সহায়ক নয়। সপ্তম দৃশ্যে হেনা-অভয়ের কথোপকথন অংশটি নিষ্প্রয়োজন। যদুপতি, নিতাই, সরমা, অভয়, গোপাল, নরেশ অপ্রয়োজনীয় চরিত্র।

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

John Howrad Lawson-এর তত্ত্ব প্রয়োগ করে এই নাটককে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

তৃতীয় দৃশ্যে দীপকের অনুরক্ত তমসার তার প্রতি আসক্ত প্রদীপকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য কৌশলে দীপক ও প্রদীপের কাছে বিবাহ প্রস্তাব, তমসার কৌশল বুঝতে পারায় প্রদীপের ক্রোধে সে স্থান ত্যাগ, প্রদীপকে জীবনসঙ্গী করার জন্য দীপকের তমসাকে অনুরোধের মধ্য দিয়ে এই নাটকের সূচনা অংশ (exposition) গড়ে উঠেছে। এটি নাটকের প্রথম পর্যায়।

দীপককে হেয় করার জন্য প্রদীপের থিয়েটারে প্রতিশ্রুত অর্থদানে অস্বীকৃতি, দুঃস্থ শিল্পীদের কথা চিন্তা করে সেই থিয়েটারের অভিনেত্রী মনীষার কষ্টলব্ধ অর্থদান, মনীষার বোন তন্বীর সঙ্গে দীপকের সম্পর্ক, প্রদীপের জমিদারীর ম্যানেজার দুঃখদহনের প্রদীপের খোঁজে দীপকের কাছে আগমন (চতুর্থ দৃশ্য), প্রদীপের তন্বী অপহরণের ষড়যন্ত্র, প্রদীপের তমসাকে তন্বী-দীপক সংবাদ পরিবেশন, তমসার প্রত্যুত্তর (পঞ্চম দৃশ্য) অবলম্বনে নাট্যকাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ নাট্য-অগ্রগতি (rising action) হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে এসেছে অনেকগুলি সংঘাত (clash)। গ্রামে ফিরে যাওয়া নিয়ে প্রদীপের সঙ্গে বনলতার সংঘাত, একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দীপককে উপবিষ্ট দেখে দীপকের সঙ্গে তমসার সংঘাত, তন্বী অপহরণ সংবাদে দীপকের প্রদীপকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার সংকল্পের মধ্য দিয়ে প্রদীপ ও দীপকের সংঘাতের রূপটি এই পর্যায়ে স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। নাটকের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম দৃশ্য অবলম্বনে তৃতীয় পর্যায় গড়ে উঠেছে।

প্রদীপের বাগান বাড়ীতে তন্বীর আত্মহত্যা, দীপকের পিস্তল দিয়ে প্রদীপকে ভয় দেখানোর সময় দরজার অন্তরালে অবস্থিত মনীষার পিস্তলের গুলিতে প্রদীপের মৃত্যু, দুঃখে মনস্তাপে দুঃখদহনের আত্মহত্যা, পুলিশের কাছে নিজেকে প্রদীপের হত্যাকারী মনে করে দীপকের পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ (দশম দৃশ্য) এবং প্রদীপের হত্যাকারীরূপে মনীষার স্বীকারোক্তিতে (একাদশ দৃশ্য) নাট্যক্রিয়ার চূড়ান্তরূপ (climax) তথা চতুর্থ পর্যায় রচিত হয়েছে।

এটি রহস্য-মূলক নাটক। নাট্যকার দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রকৃত হত্যাকারীর পরিচয় সম্পর্কে দর্শকদের কৌতূহলী করে তোলেন এবং সেই কৌতূহলের নিরসন হয় একাদশ দৃশ্যে। দশম দৃশ্যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটে গেলেও বিশ বছর পর (একাদশ দৃশ্য) হত্যাকারী আত্মপ্রকাশ করলে দর্শকের কৌতূহলের অবসান ঘটে। সেই কারণে দশম ও একাদশ দৃশ্যের মধ্যে বিশ বছরের পার্থক্য থাকলেও এই দুটি দৃশ্য মিলে নাটকের চূড়ান্ত পর্যায় গড়ে উঠেছে।

মালা রায়

নাটকটি ছয়টি দৃশ্যের সমাহারে রচিত। তবে পঞ্চম দৃশ্যটি সংলাপহীন।

● ঘটনা সংযোজন

সুবিনয়ের শিক্ষিতা স্ত্রী মালা অনিন্দ্য সুন্দরী। তাদের বছর দুই বিবাহ হয়েছে। কিন্তু বিবাহের এক বছর পর থেকে সুবিনয় দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে ভুগছে। বর্তমানে তার বাঁচার আশা কম। মালা প্রাণপণে স্বামীর সেবা করে যাচ্ছে। সে জানে স্বামীকে বাঁচানো সম্ভব নয়। দুঃখে শোকে মালা রুক্ষ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে সে স্বামীর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারও করে, এতে সুবিনয় ভীষণ কষ্ট পায়। সুবিনয় এক সময় বুঝতে পারে তার মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসছে। তাই তার জমিদার বন্ধু অপরূপকে বর্তমান বাসস্থান পুরীতে ডেকে পাঠিয়েছে। অপরূপ রূপবান যুবক, সে বিবাহিত। বন্ধুর চিঠি পেয়ে অপরূপ আসে। সে মালার রূপ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। ইতোমধ্যে মালার মামা মামী মিঃ সেন ও মিসেস সেন দীর্ঘদিন মালার কোন খবর না পেয়ে পুরীতে উপস্থিত হন। সুবিনয়

তার অবস্থার কথা জানিয়ে অপরূপকে তার অবর্তমানে মালার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলে অপরূপ সে দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হয়। সেদিন-ই সুবিনয়ের মৃত্যু হয় (প্রথম দৃশ্য)।

অপরূপ মালাকে তার বাড়ীতে নিয়ে এসেছে। অপরূপের স্ত্রী সন্ধ্যা সে বাড়ীতে অনুপস্থিত। তার এক সময় বেরীবেরী হওয়ায় চোখের খুব ক্ষতি হয়েছিল। সে চোখের চিকিৎসার জন্য কিছুদিন আগে দাদার কাছে গেছে। সেই বাড়ীতে অপরূপের মাসতুত ভাই বিজন থাকে। কিছুদিনের মধ্যে বুদ্ধিমতী মালা অপরূপ ও বিজনের তার প্রতি দুর্বলতার কথা বুঝতে পারে। সেজন্য তার বিরক্তি ও অস্বস্তির শেষ নেই। কিছুদিন পর সন্ধ্যা স্বামীর কাছে ফিরে আসে কিন্তু সে সময় সে অন্ধ হয়ে গেছে। (দ্বিতীয় দৃশ্য)।

মিঃ সেনের একমাত্র কন্যা বেণু। সেদিন তার জন্মদিন। সে তার অসংখ্য গুণমুগ্ধ, রূপানুরাগী ভক্ত পরিবৃত হয়ে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করছে। সেদিনই মিঃ সেন মালার চিঠি পান। মালা তাঁকে তার কাছে নিয়ে আসার জন্য চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছে। মিঃ সেন পরদিন মালাকে আনতে যাবেন স্থির করেন। ইতোমধ্যে তাঁর কর্মচারী অবিনাশ তাঁর কাছে অর্থ চায়। এর আগে সে মিঃ সেনকে ভয় দেখিয়ে বার হাজার টাকা আদায় করেছে। মিঃ সেনও অতীতের কোন গোপন অন্যায় কাজের শাস্তি স্বরূপ তাকে অর্থ দিয়ে যাচ্ছেন। এবার তিনি অবিনাশকে পাঁচশত টাকা দেন। অবিনাশ চলে গেলে মায়া নামে এক বেদেনী এসে মিঃ সেনকে বলে যে, তাঁর পূর্বকৃত অন্যায়ের জন্য তাঁর জীবন সে দুর্বিসহ করে তুলবে। (তৃতীয় দৃশ্য)।

মালার প্রতি অপরূপের আকর্ষণ উন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছেছে। সে সন্ধ্যার সঙ্গে সেকারণে রূঢ় ব্যবহার করে। এতে মালার অশান্তি বাড়ে। সে জানায়, সে খুব শীঘ্র অপরূপের বাড়ী ত্যাগ করে মামার কাছে চলে যাবে। মিঃ সেন এলে অপরূপ তাঁকে জানায়, সে মালাকে ভালবাসে। তাই তাকে বিবাহ করতে চায়। মিঃ সেন তার উন্মত্ত আচরণের জন্য অপরূপকে ভর্ৎসনা করে। অপরূপ মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ইতোমধ্যে অবিনাশ এসে মিঃ সেনকে সংবাদ দেয়, মায়া মিঃ সেনকে অনুসরণ করে সেখানে এসেছে, তাই তিনি যেন সাবধানে থাকেন। অপরূপের গৃহে আগত মিঃ সেনের কন্যা বেণুর সঙ্গে বিজনের আলাপ হয়। সেখানে তাদের নির্জনে কথা বলতে দেখে অবিনাশ একসময় বিজনকে বলে, বিজন যদি বেণুকে বিবাহ করতে চায় তবে সে ব্যবস্থা করে দিতে পারে কারণ সে চায় প্রত্যেকটি পুরুষ যেন কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং পরে উপেক্ষা করে তাকে রাস্তায় ফেলে দেয়। বিজন সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে চলে যায়। একটু পরে অবিনাশের কাছে মায়া আসে। মায়া তাকে জানায়, তাদের সর্বনাশের জন্য সে অবিনাশকে শাস্তি দেবে, সকলের সামনে তার স্বরূপ প্রকাশ করবে। ভীত অবিনাশ তখনকার মত বুঝিয়ে তাকে শান্ত করে। অবিনাশ প্রস্থানোদ্যোত হলে মালা সেখানে আসে। অবিনাশ চলে গেলে মালা মায়ার তাঁবুতে যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। এদিকে মালা চলে যাচ্ছে বলে বিজন মালার প্রতি তার দুর্বলতার কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে ফেলে। মালা সে কথা শুনে বিজনকে ভর্ৎসনা করে। বিজন চলে গেলে অন্ধ সন্ধ্যা মালার ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে হোঁচট খায়। মালা সন্ধ্যাকে তুলে বসিয়ে

দেয়। সন্ধ্যা সেদিন মালার কথা জানতে পারে। এতদিন অপরূপের নির্দেশে কেউ মালার কথা তাকে জানায়নি। সব জানতে পেরে সন্ধ্যা অপমানে ও বেদনায় স্তব্ধ হয়ে যায়। সে সময় ঘরে প্রবেশ করে সন্ধ্যার মুখে মালার নাম শুনে অপরূপ বুঝতে পারে সন্ধ্যার কাছে মালার খবর অজ্ঞাত নয়। তখন সে মরীয়া হয়ে মালার প্রতি তার দুর্বলতার কথা স্বীকার করে। মালা এই পরিস্থিতিতে সেদিনই মায়ার সঙ্গে সে বাড়ী ত্যাগ করে। অপরূপ সে সংবাদে উন্মত্তের মত মালার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। (চতুর্থ দৃশ্য)।

মালা মায়ার সঙ্গে বেদেনীদের তাঁবুতে উপস্থিত হয়। সেখানে সে অন্যান্যদের সঙ্গে ছোরা খেলার অভ্যাস করতে থাকে (পঞ্চম দৃশ্য)।

এদিকে স্বামীর খোঁজে সন্ধ্যা বিজনের সঙ্গে মিঃ সেনের বাড়ী আসে। স্বামীর সুখের জন্য সে অপরূপের সঙ্গে মালার বিবাহ দিতে চায়। ইতোমধ্যে বিজনকে একাকী পেয়ে অবিনাশ বেণুকে বিবাহ করার জন্য পুনর্বার বিজনকে অনুরোধ করে। বিজন এ ব্যাপারে তার আগ্রহের কারণ জানতে চাইলে সে জানায়, সে মেয়েদের ঘৃণা করে, তাই পুরুষরা মেয়েদের যত অত্যাচার, উপেক্ষা করে ততই সে একধরণের পৈশাচিক আনন্দ পায়। কারণ তার বিমাতা তার পিতার মৃত্যুর পর প্রেমিকের সাহায্যে তাকে হত্যার চেষ্টা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। সে কোনক্রমে মরণফাঁদ তেকে পালিয়ে আসে এবং সেদিন থেকে সে তীব্র নারীবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। বিজন চলে গেলে মায়া অবিনাশের সামনে এসে দাঁড়ায়। সে বলে, তার মা জাতিধর্ম ত্যাগ করে অবিনাশকে বিয়ে করেছিল কিন্তু একদিন দুর্যোগের রাতে সে স্ত্রী ও কন্যা (মায়া)কে নিষ্ঠুরের মত ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়। দুঃখে শোকে তার মা'র মৃত্যু হয়। মায়া সুযোগ বুঝে তাই প্রতিশোধ নিতে বসেছে। অবিনাশ অকস্মাৎ মায়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরে, মায়াও প্রতিরোধ করার জন্য ছোরা তোলে। ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ সেন সেখানে প্রবেশ করলে উভয়ে নিরস্ত হয়। মিঃ সেন সে সময় মায়ার কাছ থেকে জানতে পারেন, অবিনাশ মায়ার পিতা। অবিনাশ প্রকাশ করে মালা হচ্ছে মিসেস সেনের বিধবা বোন রমা ও মিঃ সেনের অবৈধ সন্তান। মিঃ সেন রমা ও মালাকে অবিনাশের কাছে রাখার বন্দোবস্ত করেন। রমা মারা গেলে অবিনাশের স্ত্রী অর্থাৎ মায়ার মা তাকে মানুষ করতে থাকে। লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য মিঃ সেন নিজের মেয়েকেই মায়ার মা'র কাছ থেকে কিনে নেন। মায়া এ কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে এতদিন জানত, মালা তার সহোদরা এবং মালার খোঁজে সে একসময় ভারতবর্ষের নানাপ্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে। গভীর হতাশায় ও দুঃখে মায়া ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। মিঃ সেন স্বীকার করেন, মালা তাঁরই মেয়ে। সেসময় উন্মত্তপ্রায় অপরূপ সেখানে মালার খোঁজে আসে। তার কণ্ঠস্বর শুনে সন্ধ্যা মালার হাত ধরে অপরূপের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং মালাকে অনুরোধ করে সে যেন অপরূপকে বিবাহ করে দেশে ফিরে আসে। অপরূপ দেশে যেতে অস্বীকৃত হয়। সে জানায়, সে মালা ব্যতীত আর কিছু চায় না। এ ধরণের নিষ্ঠুর কথা সন্ধ্যা সহ্য করতে পারে না। মানসিক আঘাতে তার হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। মালা ইতোমধ্যে মিসেস সেনের কাছ থেকে তার জন্ম পরিচয় জেনেছে। সে তখন মিঃ সেনকে বলে, এক লালসার ফলে তার জন্ম, সে অনিমন্ত্রিত হয়ে এ পৃথিবীতে এসেছে। তাই সে

তার অবাঞ্ছিত জীবন নিয়ে বাঁচতে চায় না—এই বলে সে অপরূপের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। অপরূপ বাধা দিতে থাকে। হঠাৎ পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে মালার দেহ বিদ্ধ করে, এবং নিস্পন্দ মালা লুটিয়ে পড়ে (ষষ্ঠ দৃশ্য)।

● **বৃত্ত গঠন**

এই নাটকের দুটি বৃত্ত। একটি আধিকারিক বৃত্ত, অন্যগুলি প্রাসঙ্গিক বৃত্ত। অবাঞ্ছিত গুপ্তকাহিনী প্রকাশে মালার জীবনে করুণ পরিণতি নেমে আসে—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তের পরিপুষ্টির জন্য এসেছে—অপরূপ-সন্ধ্যা উপকাহিনী, বিজন-উপকাহিনী, অবিনাশ-মায়া-উপকাহিনী এবং মিঃ সেন-রমা উপকাহিনী।

● **অপ্রয়োজনীয় অংশ ও চরিত্র**

মিঃ সেনের কন্যা বেণুর জন্মদিনের উৎসব অংশটি নাট্যকাহিনীর অগ্রগতিতে কোন সহায়তা করেনি।

● **নাট্যক্রিয়ার বিভাগ**

John Howard Lawson-এর নাট্যতত্ত্ব অনুসারে 'মালা রায়' নাটককে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম দৃশ্যে, মৃত্যু পথযাত্রী বন্ধু সুবিনয়ের অনুরোধে অপরূপের পুরী আগমন, সেখানে সুবিনয়ের অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রী মালাকে দর্শন ও তার মুগ্ধতাবোধ, পুরীতে মালার মামা মামীর আগমন, সন্তানতুল্য মালার বর্তমান বিপদে তাঁদের শোক, সুবিনয়ের অবর্তমানে মালার দায়িত্বভার গ্রহণে অপরূপের প্রতিশ্রুতি এবং সুবিনয়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সূচনা অংশ (exposition) গড়ে উঠেছে। মালার জীবন যে ভবিষ্যতে বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে চলেছে তারই আভাস এখানে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে, মালার অপরূপের বাড়ী গমন, মালার প্রতি অপরূপ ও অপরূপের মাসতুত ভাই বিজনের দুর্বলতা, অপরূপের স্ত্রী সন্ধ্যার পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে কাহিনী জটিল রূপ ধারণ করে নাট্যক্রিয়ার অগ্রগতি (rising action) ঘটিয়েছে। এটি নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়।

তৃতীয় পর্যায়ে মালার মামা মিঃ সেনের কর্মচারী অবিনাশের মিঃ সেনকে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়ের ঘটনা, অবিনাশকে মায়ার ভীতিপ্রদর্শন (তৃতীয় দৃশ্য), মালার প্রতি রূপমুগ্ধ অপরূপের উন্মত্ত আচরণে মালার সঙ্গে অপরূপের সংঘাত, অপরূপের বাড়ীতে অবিনাশের সঙ্গে মায়ার সংঘাত, মালার প্রতি বিজনের আকর্ষণের কথা প্রকাশিত হলে মালার বিজনকে ভর্ৎসনা, অন্ধ সন্ধ্যা মালার উপস্থিতি জানতে পারলে স্বামীর সঙ্গে তার সংঘাত, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার জন্য মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত মালার মায়ার

সঙ্গে পলায়ন (চতুর্থ দৃশ্য) এবং বেদের তাঁবুতে মালার ছোরা খেলা শিক্ষা (পঞ্চম দৃশ্য)—এইসব ঘটনাব মধ্য দিয়ে নাট্যকার বিভিন্ন সংঘাতের (clash) সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে মূল ঘটনার মীমাংসার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। মিঃ সেনের গৃহে মায়ার অবিনাশকে আক্রমণ ও অবিনাশের প্রতি-আক্রমণ, মালার জন্ম-বহস্য উদ্‌ঘাটন, উন্মত্তপ্রায় অপরূপের মালার খোঁজে মিঃ সেনের গৃহে গমন, অপরূপের রূঢ় আচরণের আঘাতে সন্ধ্যার হৃদ্‌যন্ত্রক্রিয়া বন্ধ হওয়া, নিজের কলঙ্কময় ইতিহাস জানতে পারায মালার আত্মহত্যার (ষষ্ঠ দৃশ্য) মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়াব চূড়ান্তরূপ (climax) দেখানো হযেছে এবং সেই সঙ্গে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে।

কুহকিনী

এই নাটকটি অঙ্ক দৃশ্য-সমন্বিত। প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে একটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি দৃশ্য রয়েছে।

এই নাটকের কিছু কিছু অংশ সম্ভাব্যতা (probability)-হীন। এগুলি কাল্পনিকতার আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। যেমন, সভ্যদেশের মানুষকে অনার্যদেশ কামরূপে রাণীর যাদুদন্ড দ্বারা পশুতে পরিণত করা, কামরূপের পুরোহিত বিপ্রদেবের অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, রাণী রত্নার স্বপ্নকাহিনী, সুন্দর কর্তৃক প্রসাদ উচ্ছিষ্ট হওয়ায় দেবীর কোপে বজ্রাঘাতে বিপ্রদেবের মৃত্যু।

● **ঘটনা সংযোজন**

অনার্যদেশ কামরূপে রাণী রত্না। তিনি তন্ত্রসিদ্ধ পুরোহিত বিপ্রদেবের নির্দেশে কামরূপে আগত সভ্য দেশের মানুষকে যাদুদণ্ড দ্বারা পশুতে পরিণত করতেন। রাণী অসামান্যা সুন্দরী। তাঁর রূপের আকর্ষণে বিভিন্ন সভ্য দেশের রাজকুমার—কুশল, সোমেন, দেবতোষ, বরুণ—সেদেশে এসেছেন। কাঞ্চীরাজ জয়ন্ত সহচর সুন্দরসহ মৃগয়া করতে এসে পথ ভুলে সেই রাজ্যে উপস্থিত হন। সেদিনই গভীর রাতে মহাকালী পুজোর সময় তাঁদের সকলকে পশুতে পরিণত করা হবে বলে রত্না জানাল। ঘোষণা শোনার পর সকলে সেখান থেকে প্রস্থান করলে জয়ন্ত একাকিনী রত্নার মধ্যে শাশ্বত নারীসত্তা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে সেই বীভৎস কাজ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করেন। তাঁর কথায় রত্না যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েন। যদিও তিনি জয়ন্তর অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁকে দেশে ফিরে যাওয়ার পথ দেখান না। ইতোমধ্যে জয়ন্তর ভাই অজয় মন্ত্রীসহ এসে জানান, তাঁর বাবার মৃত্যু হওয়ায় তিনি মুকুট নিয়ে চলে এসেছেন তাঁকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত

করার জন্য। মন্ত্রী জয়ন্তর মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন। জয়ন্ত রাজা হিসেবে রাজকর্তব্য পালনের শপথ নিয়ে মাথার মুকুট খুলে মন্ত্রীকে দিয়ে বলেন, তিনি বর্তমানে রাজ্যে ফিরতে পারছেন না। যতদিন না তিনি ফেরেন ততদিন যেন যুবরাজ অজয় কুমার রাজ্য পরিচালনা করেন। রত্না সে সময় বলেন, তিনি অজয় এবং মন্ত্রীকেও রাজ্যে ফিরে যেতে দেবেন না। জয়ন্ত তাঁদের জন্য প্রাণভিক্ষা চান। তাঁর ব্যাকুল কণ্ঠের প্রার্থনায় রত্না মত পরিবর্তন করে তাঁদের মুক্তি দেন (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)।

সভ্য দেশের যে সব মানুষ মেষে পরিণত হয়েছেন তাঁদের চরাতে গিয়ে কয়েকটি মেয়ে দুঃখপ্রকাশ করে বলে পুরোহিত বিপ্রদেব দ্বারা চালিত হয়েই রাণী মানুষকে মেষে রূপান্তরিত করেছেন। সে সময় সে স্থানে রত্নার সহচরী শীলাকে আসতে দেখে তারা পালিয়ে যায়। শীলা গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করেন। গান শেষ হলে শীলার কাছে জয়ন্তর সহচর সুন্দর আসেন। তিনি সৌন্দর্য প্রশংসা দ্বারা শীলাকে সন্তুষ্ট করে সেই রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ জানতে চেষ্টা করেন। শীলা সুন্দরকে অগ্রাহ্য করে চলে যান। (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)।

সুবিশাল মন্দিরে পুরোহিত বিপ্রদেব রাণী রত্নার দুইশত বৎসর পরমায়ু কামনায় মহাকালীর পুজো করছেন। কিন্তু মন্ত্র আবৃত্তির মাঝখানেই মহাকালীর হাত থেকে খড়্গটি মাটিতে পড়ে যায়। মন্দির থেকে বেরিয়ে ক্রুদ্ধ পুরোহিত সমবেত জনতার উদ্দেশে বলেন, কোন ব্যক্তির পাপে এ অঘটন ঘটেছে। তিনি একে একে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত রত্নার দিকে দৃষ্টি ফেরান। রত্নাকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর হাতে যাদুদন্ড দিয়ে তিনি জয়ন্তকে পশুতে পরিণত করতে তাঁকে আদেশ দেন। রত্না তিনবার চেষ্টা করেও সফলকাম হন না। বিপ্রদেব বুঝতে পারেন, রত্না জয়ন্তর প্রেমে পড়েছেন। ক্রোধে পুরোহিত রত্নাকে রাণীর পদ থেকে বিচ্যুত করে সে রাজ্য থেকে নির্বাসনের আদেশ দেন। জয়ন্ত রত্নাকে বলেন, রত্না পথ দেখিয়ে দিলে তিনি তাঁকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে পারেন। রত্না কিন্তু যাদুশক্তি হারিয়ে সে রাজ্য থেকে বহির্গমনের পথ বিস্মৃত হয়েছেন। ভুলে যাওয়ার ব্যর্থতায় রত্না জয়ন্তর বাহুতে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ওঠেন। (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

শিষ্য সোমদেব গুরু বিপ্রদেবকে সংবাদ দেন, যথেষ্ট নির্যাতন করা সত্ত্বেও বন্দী রত্না ও জয়ন্ত পরস্পরকে কোনপ্রকারে ত্যাগ করতে সম্মত নন। ক্রুদ্ধ বিপ্রদেব জানান, রত্না যদি তাঁর আদেশ পালন না করেন তবে তিনি তাঁকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না। তিনি আরো বলেন, তিনি দেড়শো বছর ধরে জরামৃত্যু অতিক্রম করে কামরূপ রাজ্য গড়ে তুলেছেন। রত্নার পূর্বে তিন রাণী নির্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করে গেছেন, সে সময় কোন অঘটন ঘটেনি কারণ তাঁদের মধ্যে প্রেমের লেশমাত্র ছিল না কিন্তু রত্না সেই ভাবালুতাকে জয় করতে পারেননি। সুতরাং তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে। তিনি রত্না ও জয়ন্তকে তাঁর সামনে উপস্থিত করতে সোমদেবকে আদেশ দেন। বিপ্রদেব প্রস্থান করলে শীলা এসে সোমদেবকে বলেন, ভালোবাসার দুর্নিবার আকর্ষণে রত্না নিশ্চিত বিপদ জেনেও জয়ন্তকে ত্যাগ করছেন না। সোমদেব জয়ন্ত ও রত্নাকে আনতে বেরিয়ে

যান। একাকিনী শীলা গান গাইতে থাকেন। গানের শেষে সুন্দর প্রবেশ করেন (মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি জয়ন্তর জন্য সেখানে থেকে যান)। সুন্দর শীলাকে প্রেম নিবেদন করলে তিনি তাঁকে নিবৃত্ত করেন ও তাঁকে দেশে ফিরে যেতে বলেন। সুন্দর সম্মত হন না। এরপর সুন্দরের অনুরোধে শীলা গান গাইতে শুরু করেন। গানের মাঝে বিপ্রদেবকে সেখানে আসতে দেখে সুন্দর পলায়ন করেন। বিপ্রদেব গানের ভাষা ও শীলার তন্ময়তা লক্ষ্য করে বিরক্ত হন। তিনি শীলাকে বলেন, তিনি যেন রত্নার মত বিশ্বাসঘাতকতা না করেন। শীলা রত্নার মত কাজ করবেন না বলে জানান। বিপ্রদেব বলেন, রত্না যদি তাঁর প্রস্তাবে রাজী না হন তবে শীলাকেই তিনি পরবর্তী রাণী নির্বাচন করবেন। এরপর শীলাকে সেস্থান ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে বিপ্রদেব মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কারণবারি পান করেন, মনের অস্থিরতা দূর করার জন্য দেবদাসীদের নৃত্য করতে বলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি মানসিক বল ফিরে পান না। জয়ন্ত ও রত্না এলে বিপ্রদেব পুনরায় একই প্রশ্ন করেন। কিন্তু উভয়েই পরস্পরকে ত্যাগ করতে অস্বীকৃত হলে বিপ্রদেব তাঁদের সামনে দুটো গোখরো সাপ ছেড়ে দিয়ে সে ঘর বন্ধ করে দিতে সোমদেবকে নির্দেশ দেন। সোমদেব আদেশ পালন করলে দুটি প্রকাণ্ড গোখরো গর্জন করতে করতে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসে। রত্না ও জয়ন্ত নির্বাক সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন (দ্বিতীয় অঙ্ক। যবনিকা পতন)।

কাশ্মীরাজ জয়ন্ত রত্না ও সুন্দরসহ স্বদেশ ফিরে এসেছেন। তারা কিভাবে কামরূপ থেকে ফিরে আসেন সে কথা সেদিন সুন্দর তাঁর দেশের লোকের কাছে বর্ণনা করছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়, যখন সাপ দুটো গর্জন করতে করতে জয়ন্ত ও রত্নার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, সে সময় সরু সুতোয় বাঁধা একটি ধারালো তলোয়ার ওপর থেকে নেমে আসে এবং জয়ন্ত তলোয়ার পাওয়া মাত্র সেই সাপ দুটোকে কেটে ফেলেন। তারপর শীলা সে ঘরে এসে বলেন, তিনি জানালা দিয়ে তলোয়ার ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। জয়ন্ত ও রত্না যাতে পলায়ন করতে পারেন সেজন্য তিনি বিপ্রদেব ও সোমদেবকে কারণের সঙ্গে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছেন। তারপর শীলার সাহায্যে জয়ন্ত রত্না ও সুন্দর কামরূপের সীমানা অতিক্রম করেন। রত্না শীলাকে তাঁর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, তাঁদের পলায়নে সাহায্য করে তিনি যে মহাপাপ করেছেন স্বরাজ্যে থেকে তিনি তার প্রায়শ্চিত্ত করবেন। এরপর শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলেন, পরদিন মহারাজা জয়ন্ত নূতন রাণীকে নিয়ে সিংহাসনে বসবেন বলে শোনা যাচ্ছে কিন্তু প্রজারা নূতন রাণীর সম্পর্কে আপত্তি তুলেছে। সেই সময় একজন ঘোষক এসে মহারাজা জয়ন্তর পরদিবস সিংহাসন আরোহন উপলক্ষে প্রজাদের উপস্থিতি কামনা করে একটি ঘোষণা করে যায় (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)।

জয়ন্তর শয়নকক্ষে জয়ন্ত, অজয় ও মন্ত্রীমশাই মন্ত্রণায় বসেছেন। জয়ন্ত বলেন, প্রজাদের অসম্মতিতে তিনি কখনো রত্নাকে পাশে বসিয়ে সিংহাসনে আরোহন করতে চান না। আবার রত্না ব্যতীত তিনি সিংহাসনেও বসবেন না কারণ রত্না তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। মন্ত্রীমশাই বলেন, রত্না অনার্য বলে নন, কুহকিনী বলে প্রজারা তাঁকে

রাণী হিসেবে মেনে নিতে পারছে না। তাদের মতে, কুহকিনী রাণী সিংহাসনে বসলে রাজ্যের অমঙ্গল হবে। তবে সে সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা সেজন্য মন্ত্রীমশাই প্রজা প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠিয়েছেন। জয়ন্ত প্রজাদের যখন বুঝিয়ে বলেন যে, রত্নার কুহকশক্তি বর্তমানে নষ্ট হয়ে গেছে তখন আর প্রজাদের আপত্তি থাকে না। কিন্তু পাছে তাঁর মধ্যে কুহকশক্তি পুনরায় ফিরে আসে সেজন্য পুরোহিতকে হত্যা ও কামরূপ রাজ্য ধ্বংস করা স্থির হয়। সেকথা শুনে পুরোহিতের অসীম শক্তিতে বিশ্বাসী রত্না আতঙ্কিত হয়ে জয়ন্তকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন। রত্নার আকুতিতে বিহ্বল জয়ন্ত যুদ্ধ করবেন না বলে অজয়কে জানান। সেকথা শুনে বিরক্ত ও বিস্মিত অজয় রাজ্যের কল্যাণের জন্য জয়ন্তকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বলেন। জয়ন্ত সে প্রস্তাবে সম্মত হলে অজয় নিজেকে সেই মুহূর্তে রাজা বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন তিনি যুদ্ধার্থে কামরূপ যাচ্ছেন। যতদিন তিনি স্বদেশে ফিরে না আসেন ততদিন জয়ন্ত ও রত্না বন্দী হিসেবে গণ্য হবেন। জয়ন্ত সে আদেশ মাথা পেতে নেন। সকলে প্রস্থান করলে রত্না সুন্দরকে ডেকে বলেন, তিনি যেন অবিলম্বে কামরূপ গিয়ে শীলাকে আত্মরক্ষার্থে সাবধান হতে বলেন। সুন্দর চলে গেলে রত্না ঘুমোতে যান এবং তিনি স্বপ্নে দেখেন, বিপ্রদেব তাঁকে হুমকি দিয়ে বলছেন, তাঁর হাতে জয়ন্ত ও রত্নার মৃত্যু অনিবার্য এবং তাঁদের পলায়নে সহায়তা করার অপরাধে শীলারও নিস্তার নেই। সে সময় শীলাকে বন্ধনাবস্থায় বিপ্রদেবের সামনে আনা হলে তিনি তাঁকে ভীতিপ্রদর্শন করে চলে যান। সে সময় সুন্দর আসেন এবং শীলার বন্ধনদশা মুক্ত করেন ও রত্নার সতর্কবাণী জ্ঞাপন করেন। শীলা জানান, কাঞ্চীর বিশাল সৈন্য বাহিনী ধ্বংস করার জন্য বিপ্রদেব মহাকালীর পুজোয় বসবেন। পুজো সমাপ্ত হলে তাঁকে পরাভূত বা হত্যা করা অসম্ভব। কিন্তু মহাকালীর পুজোর নৈবেদ্য উচ্ছিষ্ট করতে পারলে বিপ্রদেবের মৃত্যু অনিবার্য। সে কাজটি সুন্দর সম্পন্ন করবেন বলে শীলাকে কথা দেন। রত্নার স্বপ্ন দেখা শেষ হয়। তিনি তখনো ঘুমোচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর বিপ্রদেব সেখানে আসেন ও রত্নাকে জাগান। সম্মোহিতা রত্না বিপ্রদেব নির্দেশিত পথে চলতে শুরু করেন। (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)।

রত্নার অন্তর্ধান সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। রাজ্যের সর্বত্র অনুসন্ধান করেও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন জয়ন্তকে মন্ত্রীমশাই রত্নাকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দেন। জয়ন্তর বোন সুমিত্রা বলেন, তাঁর ধারণা রাজ্যের অমঙ্গলের কথা চিন্তা করেই রত্না কামরূপে চলে গেছেন। ইতোমধ্যে মন্ত্রীমশাই বাইরে থেকে সংবাদ নিয়ে জানান, গতরাত্ত থেকে সুন্দরও নিরুদ্দেশ হয়েছেন এবং তাতে মনে হয় রত্নার অন্তর্ধানের সঙ্গে সুন্দরের নিরুদ্দেশ হওয়ার গভীর সম্পর্ক আছে। সেই মন্তব্যে মর্মাহত জয়ন্ত বলেন, রত্না তাঁর প্রেমে ঐশ্বর্য সম্পদ ত্যাগ করে এসেছেন। তাই তিনি সুন্দরের সঙ্গে পলায়ন করার মত হীন কাজ করতে পারেন না। মন্ত্রীমশাই আর একটি দুঃসংবাদ দেন, অজয় কামরূপ যাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, তবে তিনি বাইরে থেকে সমগ্র কামরূপ অবরোধ করে রেখেছেন। সেই সময় রক্ষী অজয়ের পত্র জয়ন্তকে দেন। সেই পত্রে অজয় তাঁর বর্তমান অবস্থা জানিয়ে জয়ন্তকে অনুরোধ করেছেন, তাঁকে সাহায্য করার জন্য জয়ন্ত

যেন তাঁর কাছে চলে আসেন। সে চিঠি পড়ে জয়ন্ত কামরূপ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। সুমিত্রাও জয়ন্তের অজ্ঞাতে কামরূপ যাত্রা করেন (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)।

অজয় কামরূপ অবরোধ করে আছেন কিন্তু তখনো কামরূপের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। একদিন নীলমাধব নামে এক ব্যক্তিকে বন্দী করে আনা হয় কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোন সংবাদ বার করা যায় না। ইতোমধ্যে জয়ন্ত সেখানে পৌঁছন। তিনি অজয়কে আশ্বাস দিয়ে বলেন, তিনি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। সে সময় সেখানে সুমিত্রা উপস্থিত হয়ে বলেন, তিনি স্বামীর ভালোবাসার টানে সেখানে এসেছেন। জয়ন্ত সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলেন (চতুর্থ অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)।

সুন্দর কামরূপ রাজ্যের নির্জন মহাকালীর মন্দিরে প্রবেশ করে নৈবেদ্য থেকে একটি ফল তুলে দাঁত দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। পলায়নের সময় তিনি বিপ্রদেবের কাছে ধরা পড়ে যান। বিপ্রদেব তাঁকে বলেন, পূজান্তে তাঁকে মহাকালীর সামনে বলি দেওয়া হবে। বল্লাকে তাঁর সামনে আনার জন্য তিনি সোমদেবকে আদেশ দেন। তারপর তিনি ধ্যানে বসেন। হঠাৎ নেপথ্যে নানাপ্রকার বীভৎস শব্দ শুরু হয়। পুরোহিত বুঝতে পারেন, তাঁর পুজোর স্থান কেউ অপবিত্র করেছে। তিনি বার বার মহাকালীর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকেন। হঠাৎ সেকানে বজ্রপাত হয় ও সেই বজ্রপাতে পুরোহিতের সর্বাঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। তার মৃত্যু হয়। এরপর ভূমিকম্পে মন্দির ভেঙে পড়ে। দ্রুতপদে সেখানে জয়ন্ত, অজয় ও সুমিত্রা আসেন। জয়ন্ত বল্লাকে ফিরে পান। (চতুর্থ অঙ্ক। শেষ দৃশ্য- যবনিকা নামে)।

- **বৃত্ত-গঠন**

এই নাটকের দুটি বৃত্ত।

ভালোবাসার শক্তিতে কামরূপ রাজ্যের রাণী বল্লা ও কাশ্মীররাজ জয়ন্ত সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে সক্ষম হন- -এটি আধিকারিক বৃত্ত।

প্রাসঙ্গিক বৃত্ত হচ্ছে—

ক) তন্ত্রসিদ্ধ পুরোহিত বিপ্রদেব ও সোমদেব উপকাহিনী

খ) শীলা ও সুন্দর উপকাহিনী

গ) অজয় ও মন্ত্রীমশাই উপকাহিনী।

- **অপ্রয়োজনীয় অংশ**

এই নাটকে অপ্রয়োজনীয় অঙ্ক-দৃশ্যাদি নেই। তবে কোন কোন অংশ নাট্য অগ্রগতিতে সহায়তা করেনি। প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে গ্রাম্য বালিকাদের কথোপকথন, নীলমাধব ও মাধবীর কথোপকথন অংশটি নাট্যঘটনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

● নাট্যকারের বক্তব্য

নাট্যকার ভূমিকায় বলেছেন.....“মফঃস্বলে যাঁরা এই নাটক অভিনয় করবেন, তাঁরা অনায়াসেই এর ভেল্কির অংশটুকু, বাদ দিয়ে দিতে পারবেন। এবং গ্রাম্য বালিকা, দেবদাসী ও নর্তকী ইত্যাদি সবই বাদ দেওয়া যেতে পারে।”

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

John Howard Lawson-এর তত্ত্ব অবলম্বনে ‘কুহকিনী’র নাট্যক্রিয়ার বিভাজন আলোচনা করা যেতে পারে।

কাঞ্চীরাজ জয়ন্তর কামরূপ রাজ্যের রাণী রত্নাকে সভ্য দেশের মানুষকে পশুতে পরিণত করার বীভৎস কর্ম থেকে বিরত হওয়ার জন্য অনুরোধ--জয়ন্তর কথায় রত্নার মানসিক পরিবর্তনের (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য) মধ্য দিয়ে নাট্য-ঘটনা সূচিত (exposition) হয়েছে।

এরপর শীলাকে সুন্দরের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), বিপ্রদেবের কাছে রত্নার দুর্বলতার প্রকাশ, বিপ্রদেবের ক্রোধ, বিপ্রদেব কর্তৃক রাণীপদ থেকে রত্নাকে বিতাড়ন (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য) রত্না ও জয়ন্তর শাস্তির ব্যবস্থা (দ্বিতীয অঙ্ক)র মধ্য দিয়ে নাট্য কাহিনীর অগ্রগতি (rising action) লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয় পর্যায়ে অনেকগুলি সংঘাত (clash) এসেছে। রত্না ও জয়ন্তর পরস্পরকে ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশে বিপ্রদেবের সঙ্গে তাঁদের সংঘাত (দ্বিতীয় অঙ্ক), বিপ্রদেব প্রেরিত গোখরো সাপকে কৌশলে হত্যা করার ব্যাপারে সাহায্য করায় পরোক্ষভাবে শীলার বিপ্রদেবের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য), বিপ্রদেবকে হত্যার জন্য কাঞ্চী রাজ্যের কামরূপ ধ্বংস করার পরিকল্পনা, রত্নার বিশেষ অনুরোধে জয়ন্ত কামরূপ যাত্রা প্রত্যাহার করলে অজয়ের ক্রোধ এবং জয়ন্ত ও রত্নাকে বন্দী (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), অজয়ের কামরূপ অবরোধ ও অজয়ের বিশেষ অনুরোধে ভ্রাতার সাহায্যার্থে জয়ন্তর কামরূপ গমনের (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য) মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংঘাতের রূপটি প্রকাশিত হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়ে এসেছে নাট্য ঘটনার চূড়ান্ত রূপ (climax)। কামরূপের মহাকালীর মন্দিরে প্রবেশ করে সুন্দরের নৈবেদ্য অশুচি করায় দেবীর কোপে বিপ্রদেবের বজ্রাঘাতে মৃত্যু ও জয়ন্ত-রত্নার পুনর্মিলনে (চতুর্থ অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য) নাট্যঘটনার চূড়ান্ত রূপ পরিলক্ষিত হয় ও নাটকে আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি নেমে আসে।

রক্তের ডাক

চার অঙ্কে রচিত নাটকটিতে প্রথম অঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য অঙ্কগুলিকে দৃশ্যে ভাগ করা হয়নি। প্রথম অঙ্ক দুটি দৃশ্যে বিভক্ত।

● ঘটনা-সংযোজন

গ্রামের বধূ বুলু নেশাগ্রস্ত, অকর্মণ্য শরতের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বুলু রূপসী-যুবতী। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে তার নির্যাতনের শেষ নেই। সেদিন জল আনতে পুকুরঘাটে গেলে দীর্ঘদিন পর বুলুর সঙ্গে তার বাল্যের খেলার সাথী পিতৃগ্রামের জমিদার শুভেশের দেখা হয়। বুলুকে শুভেশের সঙ্গে কথা বলতে দেখে শাশুড়ী বিরজা ও স্বামী পরিত্যক্তা ননদ বিনি তাকে অকথ্য ভাষায় ভর্ৎসনা করে এবং শরৎ বাড়ী এলে তার কাছে বুলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। বুলু এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে বিরজা ও বিনি তাকে প্রহার করে। এরপর তিনজন ঘরের ভেতরে চলে গেলে বুলু দাওয়া থেকে কলসী নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)।

বুলু আত্মহত্যা করার জন্য পুকুরঘাটে গিয়ে জলে নামে কিন্তু সে সময় শুভেশ সেখানে উপস্থিত হয় এবং বুলুকে জল থেকে উদ্ধার করে। সে বুলুকে নূতন জীবন শুরু করার জন্য কলকাতায় তার সঙ্গে যেতে বলে। বুলু শুভেশের সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করে। পুকুরঘাটে কলসী পড়ে থাকে আত্মহত্যার সাক্ষীর মত। (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)।

কলকাতায় বুলু শতাব্দী নামে পরিচিত হয়। শুভেশ শতাব্দীকে মিসেস মজুমদার নামে এক ভদ্রমহিলার কাছে থাকার বন্দোবস্ত করে। সেখানে শতাব্দী কলেজে ভর্তি হয়। কলেজের মেয়েরা সকলে মিলে একটি 'চ্যারিটি শো' করছে। মিসেস মজুমদারের বাড়ীতে তার মহলা চলছে। মিসেস মজুমদার শুভেশের অনুমতি না নিয়ে নাটকের একটি ভূমিকায় শতাব্দীর অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এ সংবাদে অসন্তুষ্ট শুভেশ শতাব্দীকে সেই নাটকে অংশগ্রহণ করতে বারণ করে। চিত্র-পরিচালক ও বর্তমান নাটকটির নির্দেশক

পিনাকী ঘোষ শুভেশের আপত্তির কথা শুনে শুভেশের অবর্তমানে শতাব্দীকে বলে, শতাব্দীর মত সম্ভাবনাপূর্ণ মেয়ে শুধু নাট্যজগৎ নয়, চিত্রজগৎকেও নূতন আলোর সন্ধান দেবে। শুভেশের আচরণে ক্ষুব্ধ শতাব্দী দুঃখের সঙ্গে জানায়, তার ইচ্ছা থাকলেও শুভেশের অনুমতি ব্যতীত তার কিছু করার অধিকার নেই। এদিকে সেখানে শুভেশের সঙ্গে নমিতা নামে একটি মেয়ে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে আলাপ করতে আসে। পরিচিত হবার পর শুভেশ তাকে গাড়ী করে পৌঁছে দিতে যায়। শুভেশ চলে গেলে শতাব্দী মহলায় অংশগ্রহণকারী কিছু মেয়ের কাছ থেকে শুভেশের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কথা জানতে পেরে গভীরভাবে মর্মাহত হয়। একদিকে শুভেশের তার প্রতি প্রবল অধিকারবোধ, অন্য দিকে শুভেশের চরিত্র-স্খলন সংবাদ তাকে এত পীড়িত করে যে সে শুভেশের আশ্রয় ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবে বলে মনস্থির করে। সে শুভেশের নামে একটি চিঠি লিখে পিনাকী ঘোষের কাছে যায় এবং চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ব্যাপারে সম্মতি জানায়। পিনাকী ঘোষ শতাব্দীর জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে বলে তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়। শতাব্দী মিসেস মজুমদারের বাড়ী ত্যাগ করে পিনাকী-নির্ধারিত নূতন বাড়ীতে ওঠে। শুভেশ চিঠিতে সব জানতে পেরে একটা পরাজয়ের বেদনায় অবসন্ন হয়ে পড়ে। (দ্বিতীয় অঙ্ক)।

শুভেশ ভোগের প্রয়োজনে নারীর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যায় করত। অনেকে এই অবস্থার সুযোগ নিত। আবার শুভেশও তার খুশিমত নারীকে ব্যবহার করে যে কোন মুহূর্তে অবহেলায় ত্যাগ করত।

সেদিন শুভেশের ম্যানেজার অবনী শুভেশকে জানায়, তার প্রিয়পাত্রী নমিতা একটি চিঠিতে তার অসুস্থতার কথা জানিয়ে শুভেশের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। শুভেশ উত্তর দেয়, তার নমিতার সম্পর্কে কোন কৌতূহল বা আগ্রহ নেই যা আটমাস আগে ছিল। এ প্রসঙ্গে সে বলে, সকলেরই রূপ বদলায় যেমন গ্রাম্য বধূ বুলু বর্তমানে অভিনেত্রী শতাব্দীতে রূপান্তরিত হয়েছে। শুভেশ প্রস্থান করার কিছুক্ষণ পর শুভেশের বাড়ীতে শতাব্দী আসে এবং তার অবনীর সঙ্গে দেখা হয়। অবনী বলে, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য শুভেশের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তার বিশ্বাস, একমাত্র শতাব্দী শুভেশকে এই দুরবস্থা থেকে বাঁচাতে পারে। শুভেশ এলে শতাব্দী তাকে বেহিসেবী জীবন ত্যাগ করে সুস্থ জীবন যাপন করতে অনুরোধ করে। শুভেশ বলে, মেয়েরা প্রশ্রয় দেয় বলে সে মেয়েদের ভোগ করে। এ ব্যাপারে সে কোন মেয়েকে উপদেশ দেয় না। সে একমাত্র শতাব্দীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কিছু উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে তা উপেক্ষা করেছে। ইতোমধ্যে শুভেশের চাকর হরিয়া সেখানে আসে। সে শতাব্দীর পিতৃগ্রামের লোক। শতাব্দীর বর্তমান রূপ দেখে সে তাকে ধিক্কারদেয়। লজ্জায় শতাব্দী মাথা নত করে। এরপর সে শুভেশের বাড়ীর ভেতর যায়। সে সময় শুভেশের কাছে নমিতা আসে। নমিতা শুভেশকে জানায় সে তার সন্তানের মা হতে চলেছে। সে যেন তাকে বিবাহ করে তার সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষা করে। শুভেশ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। পরিবর্তে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নমিতাকে অর্থ দিতে চায়। অপমানিতা নমিতা তার এই নিষ্ঠুর আচরণের উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য খাবার জলের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে শুভেশকে হত্যা করতে যায়। শুভেশের বাড়ীর উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শতাব্দী তা লক্ষ্য করে নীচে ছুটে আসে এবং নমিতার বিষ মেশানো জলের গ্লাস কেড়ে নেয়। (তৃতীয় অঙ্ক)।

শতাব্দীর অভিনয়ের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একদিন অবনী শতাব্দীর বাড়ী এসে জানায়, যে মেয়েটি শুভেশের ব্যবহারে ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছে তার মূল্য হিসেবে শুভেশকে কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। ইতোমধ্যে শুভেশ প্রবেশ করে। তাকে দেখে বিব্রত অবনী বেরিয়ে যায়। শুভেশ শতাব্দীকে বলে, সে তাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চায়, সে শতাব্দীকে নিযে নূতনভাবে জীবন শুরু করতে চায়। শতাব্দী শুভেশকে মনে মনে গভীরভাবে ভালবাসে। কিন্তু সে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। প্রত্যাখ্যাত শুভেশ চলে গেলে শতাব্দী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কিছুক্ষণ পর বিরজা, বিনি ও শরৎ সেখানে প্রবেশ করে। তাদের দেখে শতাব্দী বিস্মিত হয়। শরৎ দাবী করে, শতাব্দী যেহেতু তার শাস্ত্রসম্মত স্ত্রী সেইহেতু তার সেই বাড়িতে থাকার পূর্ণ অধিকার আছে। শতাব্দী তাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য শুভেশকে ফোন করে। কিন্তু শুভেশ না থাকায় সেই ফোন পেয়ে অবনী তার কাছে আসে। শতাব্দী জানায়, সে বিশেষ কারণে সেই রাতে ওয়ালটেয়ার চলে যেতে চায়। অবনী বলে, তার যদি আপত্তি না থাকে তবে সে শতাব্দীর সঙ্গে ওয়ালটেয়ার যেতে রাজী আছে, কারণ সে তার জন্য সর্বকিছু কবতে পাবে। এমনকি চাকরী ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। (চতুর্থ অঙ্ক)।

শতাব্দী বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর শুভেশ নানা জাযগায় তার খোঁজ করে কিন্তু কোথায়ও সন্ধান পায় না। সে অবনীকে শতাব্দীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু অবনী উত্তরে বলে, সে তার কোন খবর জানে না। এরপর অবনী শুভেশের কাছ থেকে মাসখানেকের ছুটি চায়। ছুটি মঞ্জুর হয়। শুভেশ শতাব্দীর বিরহে নিজের যন্ত্রণা ঢাকতে মদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। হঠাৎ সেখানে শুভেশের এক প্রিয়পাত্রী রমা আসে। সে জানায় ওয়ালটেয়ারে শতাব্দীর কাছে অবনী যাচ্ছে। শুভেশ একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায। বমা আরো জানায়, অবনী তার স্বামী। স্বামীর উন্নতির কথা চিন্তা করে সে শুভেশকে দেহ দান করেছিল। সে অন্য একটি খবর দেয়, নমিতা আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হয়নি। সে বর্তমানে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে শুভেশের বাড়ীর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুযোগ পেলেই সে তার ক্ষতিসাধন করবে। রমা চলে যাওয়ার কিছু পরে শতাব্দী আসে। সে বলে, সে অবনীর চারিত্রিক দুর্বলতা ও দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে ওয়ালটেয়ার যায়নি যদিও অবনী জানে সে সেখানে যাচ্ছে। তবে সে ঠিক করেছে সে এ জীবন ত্যাগ করে অনেকদূর চলে যাবে। তাই যাওয়ার আগে শুভেশের কাছে শেষ বিদায় জানাতে এসেছে। সে বলে, সে শুভেশকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু সে পরস্ত্রী। এই সংস্কারের জন্য শুভেশকে সে কোনদিন স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না। যদি পরজন্ম থাকে তবে সে নিশ্চয় ভালোবাসর জোরে শুভেশকে স্বামী রূপে পাবে। শতাব্দী চলে গেলে উন্মাদিনী নমিতাকে শুভেশের ঘরে দেখা যায়। সে শুভেশকে বলে, তার কলঙ্কিত জীবনের জন্য শুভেশ দায়ী, তাই সে তাকে খুন করতে চায় এবং তৎক্ষণাৎ সে শুভেশকে আক্রমণ করে। শুভেশও প্রতি আক্রমণ করে। শুভেশের আঘাতে নমিতার মৃত্যু হয়। তাকে হত্যা করে শুভেশ আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করে। (পঞ্চম অঙ্ক)।

● বৃত্ত গঠন

এখানে দুটি বৃত্ত। পরস্ত্রী শতাব্দী বাল্যবন্ধু শুভেশকে ভালোবাসলেও দীর্ঘকালীন সামাজিক সংস্কারের জন্য তাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারেনি—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকাবিক বৃত্তকে উজ্জ্বলতাদানের জন্য প্রাসঙ্গিক বৃত্ত এসেছে—বিরজা-বিনি-শরৎ উপাকাহিনী, মিসেস মজুমদার-পিনাকী ঘোষ-উপকাহিনী, অবনী-রমা-উপকাহিনী, নমিতা-উপকাহিনী।

● অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্র

এই নাটকে অবান্তর অঙ্ক ও দৃশ্যাদি নেই। তবে অঙ্কের কিছু অংশ ও চরিত্র নাট্যক্রিয়াব ক্ষেত্রে অপ্রযোজনীয়। যেমন, দ্বিতীয় অঙ্কে রেবার উপস্থিতি, তৃতীয় অঙ্কে শুভেশেব গ্রামেব প্রজা পবাণের সঙ্গে বিকাশ, অবণী ও শুভেশের কথোপকথন, অমিযব সঙ্গে শতাব্দীর কথোপকথন, চতুর্থ অঙ্কে অমিয়র সঙ্গে শতাব্দীর কথোপকথন অংশ অপ্রাসঙ্গিক।

রেবা, পরাণ ও অমিয় এই নাটকের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় চরিত্র।

● নাট্যকারের বক্তব্য

'রক্তের ডাক' নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন—

"ক্ষেন্তি ও রেবা প্রযোজন হলে একটি লোকের দ্বারাই চলতে পারে। এমন কি তেমন দরকার বোধ করলে ক্ষেন্তি ও রেবা দুটো চরিত্রই বাদ দেওয়া যেতে পারে, তাতে মূল নাটকের কোন ক্ষতি হবে না।"

মন্তব্য : নাট্যকার নাটকের ভূমিকাতে ক্ষেন্তি ও রেবা চরিত্রের উল্লেখ করলেও মূল নাটকে ক্ষেন্তি নামে কোন নারীচরিত্রের অস্তিত্ব নেই।

—গবেষক।

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

John Howard Lawson-এর তত্ত্বের ভিত্তিতে 'রক্তের ডাক' নাটককে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

পুকুর ঘাটে গ্রাম্যবধূ বুলুর সঙ্গে বাল্যের খেলার সঙ্গী পিতৃগ্রামের জমিদার শুভেশের দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ, শুভেশের সঙ্গে বুলুকে কথা বলতে দেখে ননদিনী, শাশুড়ী ও স্বামীর বুলুকে ভর্ৎসনা ও নিগ্রহ, আত্মহত্যার জন্য বুলুর পুকুর ঘাটের উদ্দেশে গমন, পুকুরঘাটে আত্মহত্যা করতে গেলে শুভেশের বাধাদান ও শুভেশের অনুপ্রেরণায় নূতনভাবে জীবন শুরু করার জন্য শুভেশের সঙ্গে গ্রামত্যাগের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী সূচিত হয়েছে।

এটি নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য ও দ্বিতীয় দৃশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে। এটি নাটকের সূচনা অংশ (exposition) তথা নাট্যক্রিয়ার প্রথম পর্যায়।

কলকাতায় শুভেশের তত্ত্বাবধানে শতাব্দীর জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে (দ্বিতীয় অঙ্ক) নাট্যক্রিয়ার অগ্রগতিতে (rising action) দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক থেকেই নাট্যকার নানারকম সংঘাতের (clash) সৃষ্টি করায় দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যক্রিয়ার তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। কলেজের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে শুভেশ অনুমতি না দেওয়ায় শতাব্দীর মনঃক্ষোভ, শুভেশের তার প্রতি প্রবল অধিকারবোধ ও তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কথা জানতে পারায় শতাব্দীর শুভেশের আশ্রয় ত্যাগ করে অন্যত্র বাস এবং তার অভিনেত্রী জীবন গ্রহণের দ্বারা শুভেশের বিরুদ্ধাচরণ (দ্বিতীয় অঙ্ক) শুভেশের পরিত্যক্তা প্রেমিকা নমিতার শুভেশকে হত্যার চেষ্টা ও শতাব্দীর বাধাদান (তৃতীয় অঙ্ক), শুভেশের শতাব্দীকে বিবাহ প্রস্তাব ও শতাব্দীর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, শতাব্দীর বাড়ীতে তার শাশুড়ী, ননদিনী ও স্বামীর আগমন ও তাদের থেকে মুক্তি পাবার জন্য শতাব্দীর গৃহত্যাগের সংকল্প (চতুর্থ অঙ্ক) শতাব্দীর রূপমুগ্ধ অবনীর শুভেশের অজান্তে শতাব্দীর সঙ্গে ওয়ালটেয়ার যাওয়ার চক্রান্ত ও অবনীর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে শতাব্দীর ওয়ালটেয়ার না গিয়ে অন্যত্র যাওয়ার সংকল্পের মধ্য দিয়ে (পঞ্চম অঙ্ক) নানা সংঘাতের (clash) অবতারণা করা হয়েছে।

শতাব্দীর শুভেশের কাছে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ, শুভেশের গভীর হতাশা, উন্মাদিনী নমিতার শুভেশকে আক্রমণ, শুভেশের আঘাতে নমিতার মৃত্যু ও আত্মগ্লানিতে শুভেশের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে (পঞ্চম অঙ্কের শেষার্ধ)। এটি নাটকের চতুর্থ পর্যায়। এখানে নাট্যক্রিয়ার চূড়ান্তরূপ (climax) লক্ষ্য করা যায় এবং চূড়ান্তরূপ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য কাহিনীতে পরিণতি নেমে এসেছে।

তাই তো

এই নাটকের তিনটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে দুটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে একটি দৃশ্য রয়েছে।

- **ঘটনা-সংযোজন**

রাত বারোটা বাজে। বল্লিকা নামে এক যুবতী একটি সিনেমা দেখে একাকিনী ফিরছে। তাকে দেখে একটি লোক পাশ থেকে একটি গানের কলি গেয়ে পালিয়ে যায়। সেসময় সেখানে সমীর নামে এক যুবক সিগারেট খাচ্ছিল। বল্লিকা তাকে পূর্বোক্ত যুবক

ভেবে গালে একটি চড় বসিযে দেয। সমীব তাব অপবাধেব কাবণ জানতে চাইলে বল্লিকা বলে, একজন মহিলাব সঙ্গে কিভাবে ব্যবহাব কবতে হয সেটা তাব জানা উচিত। সমীব বলে, সে ইচ্ছা কবলে তাব বিরুদ্ধে পুলিশেব কাছে অভিযোগ কবতে পাবে, কিন্তু তাব সম্মানেব কথা চিন্তা কবে সে সেকাজ কববে না। সেই সময সমব নামে অন্য এক যুবক সেখানে উপস্থিত হযে বলে, এত গভীববাতে একজন মহিলাব একা চলাও ঠিক নয। বল্লিকা তাকে প্রশ্ন কবে, সে কেন এত বাতে ঘুবে বেড়াচ্ছে। সমব উত্তব দেয, তাব মত বাত্রিচাবিণীব হাতে মাব খাবাব লোভে সে ঘুবে বেড়াচ্ছে। বাগত বল্লিকা তাকে সত্যি সত্যি মাববে বলে হুমকি দেয। সমব বলে, বল্লিকা মাবলে সেও তাকে প্রহাব কববে। বাল্লকা বেগে প্রস্থান কবে। সমব সমীবেব কাছে পূর্ব ঘটনা শুনে বলে, তাব ক্ষেত্রেও প্রায অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। সে একদিন তাব বন্ধু সুহাসকে পাশে বসিযে গাড়ি চালিযে আসছিল। সে সময একজন যুবতী বাস্তা পাব হতে গেলে গাড়িব চাকা থেকে খানিকটা কাদা ছিটকে তাব গাযে লাগে। সে তখন ক্ষমাপ্রার্থনা কবলে মেযেটা তাব গালে একটি চড় বসিযে দেয। তাব বন্ধুটিও বাদ যাযনি। সেদিন থেকে সে স্থিব কবেছে মাব খেলে সেও প্রতিদানে মাববে। কথা প্রসঙ্গে সে জানায, মামাব ইচ্ছানুসাবে বিধবা বিবাহ কবতে বাজি হলে সে মামাব সম্পত্তিব অধিকাবী হবে। (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)।

জীবনময বাবুব বড় মেযে মল্লিকাকে বিবাহেব পাত্র দেখতে আসবে। সেজন্য মল্লিকাব ছোট বোন বাল্লকা সুন্দব কবে ঘব সাজিযেছে। সে নানাবকম জলখাবাবেব বন্দোবস্ত কবেছে। অবশ্য সেজন্য কিছু বেশি অর্থব্যয হওযায কৃপণ জীবনময বিবক্ত। যথাসমযে পাত্র সমীব সবান্ধব হাজিব হয। তাব মল্লিকাকে পছন্দ হযেছে। সমীব বাড়ীতে তৈবী কাটলেটে সবে কামড় বসাতে যাবে ঠিক সেই মহূর্তে সেখানে বল্লিকাব আগমন ঘটে। তাকে দেখামাত্রই সে পূর্বরাত্রিব চপেটাঘাতেব কথা স্মবণ কবে ভযে আহাব অসমাপ্ত বেখে বিদায নেয। (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয দৃশ্য -যবানকা)

সেদিন সমবেব বন্ধু সুহাস জীবনময বাবুব বাড়ী এসেছে। সে ইনসিওবেন্স কোম্পানিতে কাজ কবে। সে সম্পর্কে জীবনমযবাবুব মাসাব পিসতুত বোনঝিব ভাসুবপো। জীবনময তাব যে কোন একটি কন্যাকে বিবাহ কবতে সুহাসকে অনুবোধ কবলে সে মামাব অনুমতি নিযে জীবনমযবাবুব কাছে ফিবে আসবে বলে প্রস্থান কবে। ইতোমধ্যে সমীব জীবনমযেব চিঠি পেযে তাব বাড়ী এসেছে। এদিকে একটি লোক এসে মল্লিকাব হাতে সুহাসেব চিঠি দেয। চিঠিতে লেখা আছে, জীবনময বাবুব অনুবোধ সত্ত্বেও সে তাঁব কোন কন্যাকে বিবাহ কবতে বাজী নয। শুধু তাই নয, এমন কন্যাব পিতা হওযাব অপবাধে তাব আত্মহত্যা কবা উচিত। মল্লিকা চিঠি পড়ে স্তব্ধ হযে যায এবং বল্লিকাকে চিঠি দেখিযে দুঃখ কবে বলে, এইভাবে তাব আটবাব বিবাহেব সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে। সে সময জীবনময একটি বিজ্ঞাপন নিযে সে ঘবে প্রবেশ কবেন। সেখানে লেখা আছে, সুপাত্রীব জন্য সমব নামে কোন ব্যক্তি বিধবা বিবাহে ইচ্ছুক। বল্লিকা সেই মুহূর্তে সুহাসেব চিঠি জীবনমযকে দেখালে তিনি স্তম্ভিত হযে যান। মনেব বেদনায তিনি সে স্থান ত্যাগ

করেন। বল্লিকাও অন্য ঘরে চলে যায়। একাকিনী মল্লিকা কি যেন চিন্তা করে। তারপর সে কাগজের একটি অংশ ছিঁড়ে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে সমীর জীবনময় বাবুকে জানায়, সে মল্লিকাকে নয়, বল্লিকাকে বিবাহ করতে চায় এবং জীবনময় প্রস্তাবিত ঘরজামাই হতে প্রস্তুত। জীবনময় মল্লিকার কথা ভেবে দুঃখিত হয় এবং বল্লিকার সমীরের সঙ্গে বিবাহে সম্মতি আছে জেনে শেষ পর্যন্ত রাজী হন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

সমর যে বিধবা বিবাহের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল তার উত্তরে আড়াই হাজার চিঠি এসেছে। তার সেক্রেটারী সুরেশ নির্বাচিত কিছু লোককে সমরের কাছে পাঠিয়েছে। প্রথমে আসে মালবিকা মালাকার। সে জানায়, সে অবিবাহিতা কিন্তু সমর যদি তাকে বিবাহ করতে রাজী হয় তবে সে এর মধ্যে যে কোন এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে তাকে হত্যা করে বিধবা হয়ে সমরের কাছে চলে আসবে। সমর সে কথা শুনে আঁতকে ওঠে। মালবিকা প্রস্থানের পূর্বে জানিয়ে যায়, সে দু-চার দিনের মধ্যে বিধবা হয়ে সমরের কাছে ফিরে আসছে। এভাবে এক তরুণ তার সদ্য বিধবা মাসতুত বোনের এক বয়স্কা মহিলা নিজের জন্য, এক বৃদ্ধ তার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর জন্য, এক ব্যক্তি আশ্রমের বোবা মেয়ের জন্য আবেদন করতে এলে বিরক্ত ক্রুদ্ধ সমর প্রত্যেককে বিদায় করে দেয়। এরপর মল্লিকা বিধবাবেশে সেখানে আসে। সে জানায়, তার পনের দিন পূর্বে বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু বিবাহের পাঁচদিন পর গাড়ী চাপা পড়ে তার স্বামী মারা যায়। মল্লিকা বলে, তার মনে হয়েছে, সমর মোটর থেকে নেমে এসে ক্ষমা চাইলেও তার পরিবর্তে সে তাকে চপেটাঘাত করায় ভগবান তাকে সেই আঘাত দিয়েছেন। তাই সে স্থির করেছে, যদি কোথাও মাথা হেঁট করতে হয় তবে সে একমাত্র সমরের কাছে করবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি সমর তাকে বিবাহ না করে তবে আত্মহত্যা ব্যতীত তার অন্য পথ নেই। সে কথা শুনে সমর বিব্রত বোধ করে, তার মল্লিকার প্রতি কোমল ভাব জাগে। সে বলে, সে মল্লিকাকে বিবাহ করতে রাজী আছে তবে বিবাহের পর সে যেন সমরকে প্রহার না করে। মল্লিকা তাকে আশ্বস্ত করে বলে, সমীর স্বামী হলে তাকে প্রহারের পরিবর্তে প্রণাম করবে, তার সব কথা শুনবে এবং পরশু-ই বিবাহ হোক বলে সে প্রস্তাব দেয়। (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

সমর মল্লিকার বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে। ফুলশয্যার পরদিন সমরকে জব্দ করার জন্য মল্লিকা বলে, সমরের কিছু কিছু আচরণের সঙ্গে তার পূর্ব স্বামীর মিল খুঁজে পাচ্ছে। সে কথা শুনে সমর অত্যন্ত ব্যথিত হয়। মল্লিকা সমরের মানসিক অবস্থা দেখে তাকে আশ্বস্ত করে বলে, সে তার সঙ্গে মজা করছিল। সে সময় সুহাস দেখা করতে আসে। সে সমরের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেনি। কিন্তু মল্লিকাকে সমরের স্ত্রীরূপে দেখে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে সে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করে। সুহাস চলে গেলে মল্লিকা আবার কল্পিত স্বামীর কথা বলে সমরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে। কিছুক্ষণ পর বল্লিকা, তার স্বামী সমীর ও জীবনময় বাবু চাকর দীননাথসহ এলেন। বল্লিকা ও সমীরের কাছ থেকে সমর জানতে পারে, মল্লিকা বিধবা নয়। সমস্ত ব্যাপারটি সাজানো। সমর সে

কথা শুনে আশ্বস্ত হয়। কিন্তু বিধবাবিবাহ না করলে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে—সমর এই আশঙ্কা প্রকাশ করলে সমীর প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করতে নিষেধ করে। সমীরের পরামর্শ সমরের মনঃপূত হয়। সে সময় মালবিকা মালাকার এসে উপস্থিত হয়। সে বলে, সমরকে বিবাহ করার জন্য সে এক মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধকে গলা টিপে হত্যা করে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। সমর তাকে বিবাহ করতে অসমর্থতা জানালে সে তাকে ছুরি নিয়ে হত্যা করতে চায়। সমর ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। অকস্মাৎ মল্লিকা সেখানে প্রবেশ করে ও দুই বান্ধবী হেসে ওঠে। স্তম্ভিত সমরকে বল্লিকা জানায়, সমরের মাথা থেকে বিধবা বিবাহ নামক ভূতটি তাড়াবার জন্য দুই বান্ধবী মিলে স্থির করে, একজন তাকে ভীতিপ্রদর্শন করবে, অন্যজন তাকে বিবাহ করবে। ইতোমধ্যে বিরূপাক্ষ সমরের পাত্রীরূপে একটি মুখরা মেয়েকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সমরের বিবাহের কথা শুনে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ একশত টাকা আদায় করে ফিরে যায়। এরপর জীবনময় তাদের সকলকে আনন্দ উৎসব করার সুযোগ দিয়ে দীননাথের সঙ্গে অন্য ঘরে চলে যান। (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

- **বৃত্ত-গঠন**

এই নাটকে দুটি বৃত্ত। বহু পাত্র দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা মল্লিকা নিজের চেষ্টায় ও কৌশলে সমরকে বিবাহ করে পিতাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করে— এই বিষয়টি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তের পরিপুষ্টির জন্য নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক বৃত্তগুলি এসেছে—

(ক) বল্লিকা-সমীর—প্রাসঙ্গিক বৃত্ত

(খ) জীবনময়-সুহাস—প্রাসঙ্গিক বৃত্ত

(গ) মালবিকা মালাকার—প্রাসঙ্গিক বৃত্ত

- **অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্র**

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের সোনা ও সর্দারের কথোপকথন অংশ, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের ভবশঙ্কর, নিস্তারিণী, পটি ও মল্লিকার কথোপকথন অংশ নাট্য কাহিনী অগ্রগতির সহায়ক হয়নি।

সোনা সর্দার, ভবশঙ্কর, নিস্তারিণী, পটি ও পল্লব চরিত্র নাটকের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়।

এই নাটকের বিশেষ একটি ঘটনা বাস্তবক্ষেত্রে অসম্ভব বলে মনে হয়—বল্লিকার মত মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবতী মেয়ের রাত বারটায় একাকিনী সিনেমা থেকে বাড়ী ফেরার ঘটনাটি আমাদের কাছে বিসদৃশ ঠেকে।

● **নাট্যক্রিয়ার বিভাগ :**

'তাই তো'র নাট্যক্রিয়া বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে John Howard Lawson-এর তত্ত্ব প্রযোজ্য।

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে বল্লিকার সঙ্গে সমীর ও সমরের সাক্ষাৎ, সমরের মল্লিকার চপেটাঘাত লাভ, বল্লিকার সমীরকে চড় দেওয়ার মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনীর প্রথম পর্যায় তথা সূচনা অংশ (expositon) রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নাট্য ঘটনার অগ্রগতি (rising action) হয়েছে। সমীরের মল্লিকার পাত্ররূপে জীবনময়বাবুর বাড়ীতে গমন, সেখানে পাত্রীর বোনরূপে বল্লিকাকে দেখে মল্লিকাকে বিবাহে সমীরের অস্বীকৃতি দান (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), সুহাসের মল্লিকাকে বিবাহ করার অনিচ্ছা প্রকাশ ও দুটি দুর্বিনীত কন্যার পিতা হওয়ার অপরাধে জীবনময়বাবুকে ধিক্কার দিয়ে তার পত্রলিখন, সেই পত্র পাঠে মল্লিকার মনোবেদনা, সমীরের বল্লিকাকে বিবাহের ইচ্ছাপ্রকাশ, বিধবা বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে মল্লিকার বিশেষ চিন্তাভাবনা ও বিজ্ঞাপনের ঠিকানার উদ্দেশে গমনের (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য) মাধ্যমে নাট্যকাহিনী ক্রমশ এগিয়ে গেছে।

তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ নানা ধরণের সংঘাত (clash) নাট্য অগ্রগতির (rising action) সঙ্গে যুগপৎ শুরু হয়েছে। সমীরের মল্লিকাকে বিবাহে অস্বীকৃতি, সুহাসের জীবনময়বাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে মল্লিকাকে বিবাহ করার অনিচ্ছা প্রকাশ, জীবনময়বাবুকে সুহাসের কঠোর পত্রলিখন, সেই পত্রপাঠে মল্লিকার মানসিক আঘাতের দ্বারা নাট্যকার নানারকম সংঘাতকে তুলে ধরেছেন।

চতুর্থ পর্যায়ে মল্লিকার বিধবা সেজে সমরের কাছে গমন, মালবিকার সহযোগিতায় সমরের সঙ্গে তার বিবাহ সংঘটন ও মল্লিকার প্রকৃতরূপ উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার চূড়ান্তরূপ (climax) লক্ষিত হয় এবং এখানেই নাটকের বাঞ্ছিত পরিণতি নেমে আসে।

তেরশো পঞ্চাশ

এই নাটকটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে—ঘরে ও বাইরে। 'ঘরে' অংশের চারটি দৃশ্য, 'বাইরে' অংশের তিনটি দৃশ্য।

● **ঘটনা-সংযোজন**

চন্দনা নদীর ধারে ময়না গ্রাম। সেই গ্রামের সম্পন্ন কৃষক তারিণী মণ্ডল। সেদিন গ্রামের অধিকাংশ লোক যাত্রা শুনতে গেলে তাঁর বাড়ীতে ডাকাতি হয়। ডাকাতরা তারিণী

ও তাঁর কন্যা গৌরীকে দুটি ঘরে বন্ধ করে চলে যায়। তারিণীর পুত্র শিবু যাত্রা থেকে ফিরে তাঁদের মুক্ত করে ও থানায় খবর দিতে যায। গৌরীর দেহ থেকে কয়েক হাজার টাকার গহনা ডাকাতরা কেড়ে নেয়। গহনার শোকে গৌরী কাঁদতে শুরু করলে তারিণী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এর চেয়ে অনেক বেশী টাকা (পাঁচ হাজার) তিনি তাঁর বাগানের আমগাছ তলায় পুঁতে রেখেছেন। সুতরাং গহনার জন্য তার আর শোকের প্রয়োজন নেই। ডাকাতির খবর পেয়ে প্রতিবেশী ললিতা বৈষ্ণবী, দীনবন্ধু চক্রবর্তী আসেন। কিছুক্ষণ পর গ্রামের জমিদার সেখানে আসেন এবং সব শুনে দীননাথ চক্রবর্তীকে সেই ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করবার অনুরোধ জানিয়ে কলকাতার দিকে রওয়ানা হন। থানা অনেক দূর। থানার দারোগার আসতে দেরী হবে ভেবে দীনবন্ধু কিছুক্ষণের জন্য বাড়ীতে চলে যান। সে সময় দুপুর গড়িয়ে গেছে। তারিণী ও গৌরী শুধু চিঁড়ে মুড়ি খাবে বলে স্থির করেন। ঠিক সেই সময় মানব নামে এক ব্যক্তি সেখানে এসে আশ্রয় চান। তিনি বলেন, তিনি পায়ে হেঁটে বাংলাদেশ দেখতে বেরিয়েছেন। সবশুনে তারিণী তাঁকে তাঁর বাড়ীতে থাকার বন্দোবস্ত করেন। (ঘরে। এক)

গৌরী মানবকে দুধ চিঁড়ে এনে দেয়। মানব তৃপ্তির সঙ্গে খান। ইতোমধ্যে ললিতা এসে গৌরীকে বলেন, চন্দনা নদীতে শীঘ্র বান আসবে বলে শোনা যাচ্ছে, জল যেন কেমন ক্ষেপে ফুলে উঠেছে। শঙ্কিতা গৌরী তারিণীকে সে সংবাদ জানালে তারিণী তাকে আশ্বস্ত করে বলেন গত আটচল্লিশ বৎসরের মধ্যে চন্দনা নদী গ্রামের কোন ক্ষতি করেনি, সুতরাং এবারও কিছু হবে না। মানব তারিণীর অনুমতি নিয়ে সে রাতের মত সেখানে থেকে যান। (ঘরে। দুই)

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার। শিবু দারোগাবাবুকে নিয়ে আসে। দারোগাবাবু কথা প্রসঙ্গে চন্দনা নদীর আসন্ন বানের কথা বললে তারিণী চমকে ওঠেন। (ঘরে। তিন)

তারিণীর বাড়ীতে মানব সেদিন আশ্রয় নিয়েছেন শুনে দারোগাবাবু তাঁকে থানায় নিয়ে যেতে চান। সে সংবাদে গৌরী কাঁদতে থাকে। হঠাৎ বাইরে চন্দনার বান ডেকেছে বলে শোরগোল ওঠে। দারোগা তাড়াতাড়ি মানবকে নিয়ে বেরিয়ে যান। ইতোমধ্যে উন্মাদের মত তারিণী ছুটে এসে জানান, আমগাছ তলায় পুঁতে রাখা তাঁর সঞ্চিত ধন চন্দনার জলে ভেসে গেছে। শিবু তৎক্ষণাৎ বাবা ও গৌরীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ললিতা সেখানেই স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। জল-স্রোতের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। (ঘরে-চার)।

এদিকে কলকাতায় 'মিতালী সঙ্ঘ' নামে একটি অভিজাত ক্লাবের সদস্যারা চন্দনা নদীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের সাহায্যার্থে একটি সভার আয়োজন করেছেন। সভার সভাপতি ময়না গ্রামের জমিদার সুবিমল চট্টোপাধ্যায়। সভাশেষে সদস্যারা সিনেমা দেখতে চলে যান। একমাত্র সুবিমলের বোন শেলী ও অন্য এক সদস্য রবীন থেকে যান। শেলী সেদিনের বাহ্যিক আড়ম্বরসর্বস্ব আলোচনা ও বক্তৃতার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে শেলীর রান্নার ঠাকুর পুডিং নিয়ে আসে। পুডিং-এ সামান্য পোড়া গন্ধ পাওয়ায় শেলী ক্রুদ্ধ হয়ে ঠাকুরের পাঁচটাকা জরিমানা করেন। (বাইরে। এক)

সুবিমলের বাড়ীর সামনের ফুটপাতের ডাস্টবিনে একজন বৃদ্ধ খাবার খুঁজছে। এমন সময় সেই বাড়ীর ওপরথেকে সুবিমলের বান্ধবী লুসি একটি কমলালেবুর খোসা নীচে ছুঁড়ে ফেললে সেই বৃদ্ধটি বাঘের মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু কিছু না পেয়ে হতাশ হয়। একটু পরে গৌরীর হাত ধরে ক্লান্ত তারিণী মন্ডল সেই বাড়ীর সামনে বসে পড়েন। গৌরী বাবাকে তামাক সেজে দেয়। এরপর ক্ষুধার্ত গৌরীকে ভাতের ফ্যান খেতে দেখে তারিণী গভীর কষ্টের সঙ্গে বলেন, তাঁর গ্রামে যে খাদ্য গরু খায় অবস্থা বিপর্যয়ে তাঁর মেয়েকে তা-ই খেতে হচ্ছে। এদিকে গতকাল থেকে শিবু ফেরেনি। সে ভিক্ষায় বেরিয়েছিল। গৌরী তাই খুব উদ্বিগ্ন। ইতোমধ্যে লুসি সে স্থান থেকে তাঁদের চলে যেতে বললে তারিণীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েন। ঠিক সেই মুহূর্তে সুবিমল (ময়না গ্রামের জমিদার) সেখানে উপস্থিত হন। তারিণী সুবিমলকে জানান, তাঁরা বন্যার পর ছয়মাস ধরে আশ্রয়হারা হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের দুঃখের কথা শুনে সুবিমল সেই রাতের মত তাঁদের গাড়ী বারান্দায় থাকতে দেন। কিছুক্ষণ পর শেলী বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন এবং গৌরীকে চিনতে পেয়ে ও তাদের দুরবস্থার কথা শুনে তারিণীর হাতে দশ টাকা দিয়ে সেদিনের মত খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে বলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য আশ্বাস দেন। তারিণী দোকানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, সেই সময় দীনবন্ধু চক্রবর্তী জমিদার সুবিমলের খোঁজ করতে করতে সেখানে উপস্থিত হন। তারিণী এক সময় দীনবন্ধুকে অর্থ ঋণ দিয়েছিলেন, বর্তমান অবস্থায় তিনি তাঁর প্রাপ্য অর্থ থেকে পাঁচশত টাকা চান। দীনবন্ধু সে অর্থ দেওয়ার অসমর্থতার কথা জানান। উপরন্তু তিনি পরামর্শ দিলেন, সুবিমল অবিবাহিত, সুতরাং গৌরীর মত মেয়েকে সে বাড়ীতে কাজে লাগাতে পারলে তারিণীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। কথা প্রসঙ্গে দীনবন্ধু শেলী প্রদত্ত দশ টাকার কথা শুনে তারিণীকে নিবৃত্ত করে নিজেই সেই টাকা নিয়ে চিঁড়ে মুড়ি কেনার নাম করে চলে গেলেন আর সেখানে ফিরলেন না। তারিণী তাঁর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করতে থাকেন। ইত্যবসরে শেলী চাকর দিয়ে বলে পাঠান, তাঁরা যেন দোকানের খাবার কিছু না কেনেন কারণ তিনি তাঁদের জন্য বাড়ীতে খাবার ব্যবস্থা করেছেন। সে কথা শুনে তারিণী দীননাথকে ফিরিয়ে আনার আশায় বেরিয়ে পড়লেন। একটু পরে রক্তাক্ত দেহে শিবু ফেরে। সে জানায়, ভিক্ষা চাইতে গিয়ে সে মার খেয়েছে। এরপর তাকে থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে বার ঘণ্টা বন্দী থাকে। পরে মুক্ত হয়ে খুঁজতে খুঁজতে তাদের দেখা পায়। গৌরী শিবুকে দীননাথের দশটাকা নিয়ে চলে যাওয়া ও তার সন্ধানে তারিণীর গমনের কথা জানালে শিবু মন্তব্য করে, দীননাথ আর ফিরে আসবেন না। শিবু পিতার সন্ধানে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর শিবু ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয় তাদের বাবা গাড়ী চাপা পড়েছেন। সে দুঃসংবাদ শুনে গৌরী কাঁদতে কাঁদতে শিবুর সঙ্গে বাবাকে দেখতে যাবে বলে ছুটে বেরোতে যাচ্ছে সে সময় কোথা থেকে মানব সেখানে উপস্থিত হন। তিনি গৌরীকে যেতে দেন না, বলেন, গাড়ী চাপা পড়ে তারিণীর দুরবস্থার অবসান হল বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। শিবু বেরিয়ে যায়। সে আবার ফিরে এসে খবর দেয়, তাদের বাবা বেঁচে নেই। তাঁকে প্রথমে হাসপাতালে,

তারপর মর্গে নিয়ে যাওয়া হবে। শিবুকে তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে। সে জানে না সে কখন ফিরবে, তবে গৌরী যেখানেই থাকুক সে তাকে খুঁজে বের করবেই। সে সময় বাড়ী থেকে শেলী বেরিয়ে আসেন। তিনি সেখানে মানবকে দেখে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। (বাইরে। দুই)

মানব সুবিমলের কাছে এসেছেন। তিনি সুবিমলকে বাংলাদেশ ভ্রমণেব সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা জানান। সুবিমলও জানান, শেলী মানবের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। কিন্তু মানব বলেন, স্ত্রীর ভরণপোষণের ক্ষমতা নেই বলে তিনি শেলীকে বিবাহ করবেন না বলে স্থির করেছেন। তিনি তাঁর বাড়ীকে আশ্রমে পরিণত করেছেন এবং সমস্ত সম্পত্তি তাঁর মাসীমার নামে লিখে দিয়েছেন। মাসীমাই বর্তমানে সেই আশ্রমেব কর্ত্রী। তারপর গৌরীর দিকে ফিরে মানব বলেন, সেই বন্যার দিনে তিনি থানার থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখেন, ললিতা বৈষ্ণবী বসে আছেন। এরপর তিনি ললিতাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন। আশ্রমের কর্ত্রী মাসীমা-ই হচ্ছেন ললিতা বৈষ্ণবী। মাসীমা'র আদেশেই তিনি গৌরীর সন্ধানে বেরিয়েছেন। তাঁর নির্দেশেই তিনি গৌরীকে আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছেন। সুবিমলের মনে হল, মানবের হয়তো গৌরীর প্রতি আকর্ষণ আছে। তাই তিনি মানবকে বললেন, মানব যদি শেলীকে বিবাহ করেন তবে তিনি বোনের সুখের জন্য গৌরীকে বিবাহ করার মত আত্মত্যাগ করতে রাজী আছেন। মানব বললেন, গৌরী তাঁর কাছে ছোটবোনের মত সুতরাং সুবিমলের কোন শর্ত আরোপ করাব প্রশ্নই উঠছে না। অপমানিতা শেলী মানবকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। গৌরী শেলীকে প্রণাম করতে গেলে ক্রুদ্ধ শেলী তাকে পদাঘাত করেন। ক্রন্দনরতা গৌরীকে নিয়ে মানব আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করেন। (বাইরে। তিন)

● **বৃত্ত-গঠন**

আকালে গ্রামের সম্পন্ন কৃষক তারিণী মণ্ডলের সুখী পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়—এটি এই নাটকের আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তের সহায়তায় নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক বৃত্ত এসেছে—

(ক) মানব-গৌরী-শেলী-সুবিমল—উপকাহিনী।

(খ) ললিতা বৈষ্ণবী—উপকাহিনী।

(গ) দীনবন্ধু—উপকাহিনী।

● **অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্র**

এখানে কোন অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য নেই। তবে রাস্তায় গৌরীর সঙ্গে মাতালের কথোপকথন অংশটি (৮০পৃঃ-৮১পৃঃ) অপ্রয়োজনীয়। মাতাল চরিত্র নাট্যঘটনাকে কোন সহায়তা করেনি।

নাট্যকার বলেছেন—

"মেয়ের পার্ট অভিনয় করবার লোক কম থাকলে অভিজাত সম্প্রদায় থেকে মিলি অথবা লুসিটিকে অনায়াসে বাদ দিয়ে একজনের মুখে কথা দিলে কোন ক্ষতি নেই।"

● **নাট্যক্রিয়ার বিভাগ**

John Howard Lawson-এর নাট্য গঠনতত্ত্ব এই নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তারিণী মণ্ডলের বাড়ীতে ডাকাতি, পুত্র শিবুর থানার উদ্দেশে গমন, ডাকাতিতে কন্যা গৌরীর দেহ থেকে প্রচুর অলঙ্কার চলে যাওয়ায় তার শোক, কন্যাকে সান্ত্বনা দেবার সময় তারিণী যে আমগাছতলায় পাঁচ হাজার টাকা পুঁতে রেখেছেন সে তথ্য প্রকাশ, ডাকাতির খবরে ললিতা বৈষ্ণবী, দীনবন্ধু চক্রবর্তীর তারিণী মণ্ডলের বাড়ীতে আগমন, ডাকাতির ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য গ্রামের জমিদার সুবিমলের দীনবন্ধুকে অনুরোধ ও তাঁর কলকাতায় যাত্রা, ভবঘুরে মানবের তারিণীর বাড়ীতে আশ্রয় লাভ (ঘরে। এক)—এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার প্রথম পর্যায় গড়ে উঠেছে। এটি নাটকের সূচনা অংশ (exposition)।

গৌরীকে মানবের ভ্রমণকাহিনী বর্ণন, চন্দনা নদীতে যে শীঘ্র বান ডাকবে ললিতার সে সংবাদ প্রদানে তারিণীর অবিশ্বাস (ঘরে। দুই), থানার দারোগার তারিণীর বাড়ীতে আগমন, দারোগার মুখে নদীতে আসন্ন বন্যার সংবাদে তারিণীর আশঙ্কা (ঘরে। তিন), মানবকে অপরাধী সন্দেহে দারোগার তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া (ঘরে-চার)-র মাধ্যমে কাহিনীর অগ্রগতি (rising action) লক্ষিত হয়। এটি নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়।

তৃতীয় পর্যায়ে সংঘাত (clash) এসেছে। বন্যার স্রোতে আমগাছ তলায় পোঁতা তারিণী মণ্ডলের ধন ভেসে যাওয়া, পুত্রকন্যাসহ তারিণী মন্ডলের গ্রাম ত্যাগ (ঘরে। চার), তারিণীর অর্থ (শেলী প্রদত্ত) নিয়ে দীনবন্ধুর পলায়ন, ভিক্ষা চাইতে গিয়ে শিবুর প্রহার লাভ (বাইরে। দুই)—এইসব নানা সংঘাত নাট্যকাহিনীকে চূড়ান্ত অবস্থার দিকে নিয়ে গেছে।

তারিণীর গাড়ী চাপা পড়া, মানবের সঙ্গে গৌরীর পুনরায় সাক্ষাৎলাভ, শিবুর সঙ্গে গৌরীর বিচ্ছিন্ন হওয়া, (বাইরে। দুই) শেলীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণে মানবের অসমর্থতা প্রকাশ ও ললিতার নির্দেশে স্বপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমে মানবের গৌরীকে নিয়ে যাত্রা (বাইরে। তিন)-র মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার তীব্ররূপ (climax) লক্ষ্য করা যায়, এই চতুর্থ পর্যায়েই নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে।

খবর বলছি

নাটকটি অঙ্ক-দৃশ্য বিভক্ত। এখানে চারটি অঙ্ক রয়েছে। প্রথম অঙ্কে একটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে একটি দৃশ্য। তৃতীয অঙ্ককে দৃশ্যে বিভক্ত করা হয়নি। কিন্তু ঘটনার বিচারে এই অঙ্ককে দুটি দৃশ্যে ভাগ করা যায়,———একটি দশ্যে বরেনবাবুর বাড়ী, অন্য দৃশ্যে চোরাকারবারীদের আস্তানা। চতুর্থ অঙ্কে দুটি দৃশ্য।

- **ঘটনা-সংযোজন**

পূর্ববঙ্গে একদা সম্পদশালী চন্দ্রমোহন ও তার অসামান্য সুন্দরী স্ত্রী দীপা দাঙ্গার সময় কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনের একাংশে আশ্রয় নিয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য উদ্বাস্তু স্টেশনে আসছে। অনেক সুযোগ সন্ধানী অসৎলোক এদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন চন্দ্রমোহন স্টেশনে নিজের গ্রমের লোকের খোঁজ নেবার জন্য বেরোতে যাবে এমন সময় ভবতোষ নামে এক ব্যক্তি এসে জানায়, সে চন্দ্রমোহনের ভাই অনাথের সঙ্গে চন্দ্রমোহনের গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে যে আদর যত্ন পেয়েছিল তা ভোলবার নয়। ভবতোষ তাদের বর্তমান অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তার বাড়ী যেতে অনুরোধ করে। চন্দ্রমোহন বলে, তার পরিবর্তে ভবতোষ যদি একটি বাসা ঠিক করে দেয় তবে খুব উপকার হয়। চন্দ্রমোহন যখন আপনমনে কথা বলছিল ভবতোষ একদৃষ্টিতে দীপাকে দেখছিল। চন্দ্রমোহনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভবতোষ বলে, সে মাসিক কুড়ি টাকা ভাড়ায় এক বন্ধুর বাড়ী তাদের জন্য অবিলম্বে ঠিক করে দেবে। তার কথায় চন্দ্রমোহন ভবতোষের সঙ্গে বাড়ী দেখতে যায়। দীপা একটা ট্রাঙ্কের উপর বসে অপেক্ষা করতে থাকে। সে সময় মধুসূদন নামে চন্দ্রমোহনের গ্রামের এক ব্যক্তি দীপার কাছে এসে তাদের খবরাখবর জানতে চাইলে দীপা ভবতোষের কথা বলে। সে কথা শুনে মধুসূদন বলে, এত অল্প পরিচয়ে চন্দ্রমোহনের ভবতোষের সঙ্গে যাওয়া ঠিক হয়নি। মধুসূদন চন্দ্রমোহনের ওপর বিরক্ত হয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর শিপ্রা নামে এক তরুণী আসে। সে দীপার সঙ্গে সই-সম্পর্ক পাতিয়ে বলে, সে অভিনেত্রী, দীপা যদি চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে চায় তবে সে ব্যবস্থা করে দিতে পারে। দীপা জানায়, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার পক্ষে কিছু করাই সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে ভবতোষ এসে জানায়, চন্দ্রমোহন নূতন বাড়ীতে রয়েছে এবং সে দীপাকে ভবতোষের সঙ্গে সেই বাড়ীতে যেতে বলেছে। শিপ্রা সে কথা শুনে বলে, ভবতোষ চন্দ্রমোহনের কোন চিঠি এনেছে কিনা। ভবতোষ বলে, সে সেই ধরণের প্রয়োজনবোধ করেনি। দীপা তার স্বামীকে তার কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য অনুরোধ করলে ভবতোষ দীপাকে ভয় প্রদর্শন করে বলে, দীপা এরূপ ব্যবহার করলে তাকে একলা ফলে সে চলে যাবে। ভীতা দীপা তখন শিপ্রাকে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। শিপ্রা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, তার শুটিং থাকায় তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে দীপা যদি রাজী হয়, শিপ্রা তার পরিচিত এক ব্যক্তিকে দীপার সঙ্গে পাঠাতে পারে। দীপা সে প্রস্তাবে রাজী হলে শিপ্রা চলে যায়। ভবতোষ দীপাকে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বাধ্য করাতে চেষ্টা করলে দীপা কাঁদতে শুরু করে। চারপাশে লোক জড়ো হয়।

তাদের মধ্যে কেউ ভবতোষের পক্ষে, কেউ বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে থাকে। ইত্যবসরে শিপ্রা মহাদেব মহান্ত নামে একব্যক্তিকে নিয়ে উপস্থিত হয়। তখন ভবতোষ ও মহাদেবের মধ্যে বচসা শুরু হয়। দীপা কারো সঙ্গে যেতে চায় না। সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দীপার এক ব্যক্তির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। দীপা তার পা ধরে দুষ্টলোক দুটোর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য অনুরোধ করে। সেই ভদ্রলোক দীপার কথা শুনে তাকে অভয় দেয়। বিপদ বুঝে ভবতোষ ও শিপ্রা অন্তর্হিত হয়। সে মহাদেবকে জেরা করে জানতে পারে শিপ্রা টাকার বিনিময়ে দীপাকে তার হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। সেই ভদ্রলোক এরপর দীপাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

সেই ভদ্রলোকের নাম প্রফেসর বরেন মিত্র। তার স্ত্রীর নাম অরুন্ধতী, কন্যা নমামি। দীপার মত রূপসী নারীকে বাড়ীতে আনায় অরুন্ধতীর মনে অশান্তি। মাঝে মাঝে এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়। অরুন্ধতী দীপার সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করে। নমামিও দীপাকে অধিকাংশ সময় হেয় করার চেষ্টা করে। বরেন দীপার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলেও মুখে তা প্রকাশ করে না। তবে তার মনোগত ইচ্ছা, দীপা তার বাড়ীতেই থাকুক। সেজন্য সে দীপাকে কথা দিলেও চন্দ্রমোহনের ভালোভাবে অনুসন্ধান করে না। স্বামীর দীপার প্রতি দুর্বলতা বুঝতে পেরে অরুন্ধতী দীপাকে তাদের বাড়ী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য তার মাসতুত ভাই লম্পট ও জুয়াড়ী অনুপমকে সেখানে আসতে খবর দেয়। (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)।

নমামি মতিচাঁদ নামে এক ধনী পাঞ্জাবীকে বিয়ে করতে চায় এবং সেজন্য সে বাবা মাকে না জানিয়ে বাড়ী থেকে চলে যাবে বলে স্থির করে। এদিকে অরুন্ধতী বরেনের আপত্তি ও দীপার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুপমের সঙ্গে সিনেমা দেখতে দীপাকে পাঠায়। এর আগে দীপাকে সরিয়ে দেবার জন্য অনুপমকে এক হাজার টাকা অরুন্ধতী দেয়। দীপাকে নিয়ে অনুপম চলে যায় এবং ঠিক সেই মুহূর্তে চাকর এসে অরন্ধতীকে একটি চিঠি দিয়ে যায়। চিঠিতে নমামির পলায়ন সংবাদ জানতে পেরে অরুন্ধতী স্তম্ভিত হয়ে যায়। অরুন্ধতীর মানসিক অবস্থা দেখে বরেন মিত্র প্রেতের মত হেসে ওঠে। (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য—দৃশ্য ঘুরছে)

ভবতোষ চোরাকারবারী দলের সঙ্গে যুক্ত। এই দল মেয়েদের নিয়েও ব্যবসা করে। ভবতোষ এই দলের সর্দারকে দুঃখের সঙ্গে জানায় সে একটি মেয়ে (দীপা)কে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসেও শেষ পর্যন্ত দুর্ভাগ্যের জন্য তাকে ধরে রাখতে পারেনি। ভবতোষ চলে গেলে অনুপম দীপাকে নিয়ে সেই জায়গায় আসে। দীপা চারপাশের পরিবেশ দেখে অনুপমের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে এবং অনুপমকে সেজন্য ধিক্কার দেয়। ধিক্কৃত অনুপমের মধ্যে অনুতাপ শুরু হয়। এদিকে সর্দার এসে দীপার মত সুন্দরী মেয়ে আনার জন্যে অনুপমের প্রশংসা করে এবং পুরস্কার হিসেবে দুই হাজার টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। সে দীপাকে পাশের ঘরে যেতে বলে। দীপা যেতে অস্বীকার করলে সর্দার তার হাত ধরতে যায়। মুহূর্তের মধ্যে অনুপমের মধ্যে যেন কি ঘটে যায়। সে চিৎকার করে বাধা দেয় এবং বলে লক্ষ টাকা পেলেও সে সর্দারের কাছে দীপাকে বিক্রি করবে না। সর্দার অনুপমকে ভালোবাসে। তাই প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে দীপাকে নিয়ে অনুপমকে চলে যেতে বলে। অনুপম তৎক্ষণাৎ দীপাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

নমামি মতিচাঁদকে বিবাহ করেছে। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পর শ্বশুর বাড়ীর কিছুলোকের ব্যবহারে অপমানিত বোধ করায় নমামি মতিচাঁদকে ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে আসে এবং শ্বশুরবাড়ীর কোন চিহ্ন রাখবে না বলে পথে উপবিষ্ট একটি দরিদ্র মহিলাকে শ্বশুরবাড়ী প্রদত্ত গহনার পুঁটলিটি দান করে। বরেন মিত্র দীপার খোঁজে নানাস্থানে ঘুরতে ঘুরতে ভবতোষের সাক্ষাৎ পায়। তাকে দীপা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে নিজেকে সখের গোয়েন্দা বলে পরিচয় দেয় এবং দুইশত টাকার পরিবর্তে তাকে খুঁজে বার করবে বলে আশ্বাস দেয়। বরেন মিত্র চলে গেলে ভবতোষ সেখানে গ্যাসপোস্টের গায়ে বিজ্ঞাপন দেখে তা লিখে নিতে থাকে। ঠিক সেই সময় উন্মাদপ্রায় চন্দ্রমোহন দীপার খোঁজ করতে করতে সেখানে উপস্থিত হয়। সে ভবতোষকে দেখতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার আক্রমণে বিপর্যস্ত, ভীত ভবতোষ জানায়, সে পনেরো দিন পূর্বে একস্থানে দীপাকে দেখেছে, সেখানে চন্দ্রমোহনকে সে নিয়ে যাচ্ছে। (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

অনুপম ও দীপা একটি চালাঘরে বসবাস করে। অনুপমকে দীপা দাদা বলে। দীপা একটি বাড়ীতে রান্নার কাজ নিয়েছিল। কিন্তু সে বাড়ীর ছোটবাবু তাকে কুপ্রস্তাব দিলে সে সম্প্রতি সেই চাকুরী ছেড়ে দেয়। কিন্তু সে কথা অনুপমকে জানায় না এবং অধিকাংশ সময় অনাহারে থাকে। এদিকে মদের প্রকোপে অনুপমের যকৃতের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। অনুপমের স্বাস্থ্য নিয়ে দীপা চিন্তিত। মনের অশান্তি চেপে সে রোজ স্বামীর প্রতীক্ষা করে। সেদিন মদ্যপ অনুপম ঘুমিয়ে পড়লে দীপা বাড়ীর বাইরে বেরোয়। সেই সময় বরেন মিত্র দীপাকে দেখে এবং সে দীপার সঙ্গে তার বাড়ী আসে। সেখানে বরেন অনুপমকে দেখে আশ্চর্য হয়। দীপা জানায়, অনুপমের মত দেবতুল্য ভাই পেয়েছিল বলে সে নূতন জীবন পেয়েছে। বরেন মিত্র সব শুনে দীপা ও অনুপমকে তার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায়। দীপা বলে, সেদিন নমামি ফুটপাতে তাকে গহনার পুঁটলি দিয়ে যায় যদিও নমামি তাকে চিনতে পারেনি, সুতরাং বরেন যেন সে গহনাগুলো নিয়ে যায়। বরেন জানায়, গতকাল নমামি তাদের বাড়ীতে ফিরে এসেছে। দীপা বরেনের সঙ্গে যেতে চায় না। সে বলে, সে তার স্বামীর জন্য সেই বাড়ীতে আজীবন প্রতীক্ষা করবে। বরেন বলে, অরুন্ধতীর ভুল ভেঙ্গেছে। তার ধারণা হয়েছে দীপার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করার জন্য ভগবান তাকে কন্যার পক্ষ থেকে আঘাত দিয়েছে। অরুন্ধতী স্বয়ং বরেনকে দীপার খোঁজ করতে বলেছে। বরেন তাদের আশীর্বাদ করে বাড়ী ফিরে যাবার জন্য অগ্রসর হলে দীপা হঠাৎ মত পরিবর্তন করে বলে, সে মহাদেবতুল্য বরেনের কথার অমর্যাদা করতে পারবে না, সুতরাং সে তার সঙ্গে যাবে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে থেকে চন্দ্রমোহনের গলা শোনা যায়। চন্দ্রমোহন দীপার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভেতরে প্রবেশ করে। দীপা দৌড়ে বেরোতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে। সে ওঠবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত বের হতে থাকে। চন্দ্রমোহন ছুটে দীপার কাছে আসে। চন্দ্রমোহন জানায়, সকলে দীপার মৃত্যুর কথা বললেও সে বিশ্বাস করেনি, সে তার চিন্তায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল, কত লোক তাকে বদ্ধ উন্মাদ ভেবে তার শরীরে আঘাত করেছে। এরপর সে বলে, দীপা সুস্থ হলেই তারা আবার নিজের দেশে

ফিরে যাবে। দীপা চন্দ্রমোহনকে বরেন ও অনুপমের মহানুভবতার কথা বলতে থাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে রক্তবমি করতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। (চতুর্থ অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

● বৃত্ত-গঠন

এই নাটকের দুটি বৃত্ত। একদল সুযোগ-সন্ধানী অসৎ ব্যক্তির জন্য পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তু চন্দ্রমোহন ও তার স্ত্রী দীপার জীবন ধ্বংস হয়ে যায়—এটি নাটকের আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তকে সহায়তা দানের জন্য ভবতোষ-শিপ্রা-উপকাহিনী, বরেন-অরুন্ধতী—উপকাহিনী, নমামি-মতিচাঁদ-উপকাহিনী, অনুপম-উপকাহিনী প্রাসঙ্গিক বৃত্ত রূপে এসেছে।

● অপ্রয়োজনীয় অংশ ও চরিত্র

এই নাটকে কোন অবান্তর অঙ্ক বা দৃশ্য নেই। তবে দৃশ্যের কিছু কিছু অংশ অপ্রয়োজনীয়। সঞ্জয় ও সর্দারের কথোপকথন (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), শিবে ও কেলো-র কথোপকথন (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য) অংশটি নাট্যক্রিয়ার অগ্রগতিতে কোন প্রয়োজন সাধন করেনি।

সঞ্জয়, শিবে ও কেলো চরিত্রের এ নাটকে কোন প্রয়োজন নেই।

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

John Howard Lawson-এর নাট্যতত্ত্ব প্রয়োগে 'খবর বলছি' নাট্য-কাহিনীকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা যায়।

উদ্বাস্তু চন্দ্রমোহন ও তার রূপসী স্ত্রী দীপার শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় লাভ, সুযোগসন্ধানী ভবতোষের চক্রান্তে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ও দীপার বরেন মিত্রর মত মহানুভব ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভের মধ্য দিয়ে (প্রথম অঙ্ক) নাট্যকাহিনীর সূচনা অংশ (exposition) গড়ে উঠেছে।

দীপাকে কেন্দ্র করে বরেন ও অরুন্ধতীর অশান্তি, দীপাকে গৃহছাড়া করার জন্য অরুন্ধতীর অনুপমের সঙ্গে দীপাকে প্রেরণ, মতিচাঁদকে বিবাহ করার জন্য নমামির গৃহত্যাগের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায় গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক জুড়ে এই নাট্যক্রিয়ার অগ্রগতি (rising action) হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে অনেকগুলি সংঘাতের (clash) সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্দারের হাতে দীপাকে তুলে দিতে অনুপমের অস্বীকৃতি (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য) নমামির সঙ্গে মতিচাঁদের

পরিবারের সংঘাত, ভবতোষকে চন্দ্রমোহনের আক্রমণ (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)-এ নানা ধরণের সংঘাত লক্ষিত হয়।

চতুর্থ পর্যায়ে চন্দ্রমোহনের (দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানের পর) দীপার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও অসুস্থ উত্তেজিত দীপার রক্তবমিতে মৃত্যুতে (চতুর্থ অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য) নাট্য কাহিনীর চূড়ান্ত রূপ (climax) লক্ষিত হয়।

অন্ধদেবতা

এটি তেরোটি দৃশ্যে সজ্জিত নাটক।

- **ঘটনা-সংযোজন**

প্রশমন নামে এক যুবক পাঁচহাজার টাকার বিনিময়ে বিখ্যাত ব্যবসায়ী রায়বাহাদুর পি.পি.র নির্দেশে তারই বাল্যবন্ধু ও ব্যবসায়ী ডি.ডি.র ব্যবসা সংক্রান্ত একটি গোপন ফাইল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে ডি.ডি.কে গুলিতে হত্যা করে ফাইলসহ পালিয়ে যায়। তার গুলির আঘাতে ডি.ডি.র সেক্রেটারী গুরুতরভাবে আহত হয় (প্রথম দৃশ্য)।

চুক্তিমত পি.পি.র সেক্রেটারী বিজন একটি রেস্তোরাঁতে প্রশমনের হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেয় কিন্তু প্রশমন বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পরিকল্পনানুসারে পুলিশের কাছে বিজন প্রশমনের বিরুদ্ধে অর্থচুরির অভিযোগ আনে। (দ্বিতীয় দৃশ্য)।

প্রশমন বস্তির একটি ঘরে থাকে। সে ঘরের পাঁচ মাসের ভাড়া বাকি। তাই বাড়ীওয়ালা দাঁ মশাই প্রশমনের স্ত্রীরূপে পরিচিতা লতাকে সেদিন ভাড়ার টাকার কথা তুলে অপমান করে। ইতোমধ্যে প্রশমন এসে পাঁচ মাসের ভাড়ার দেড়শো টাকা দিয়ে দেয়। লতার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশমন জানায়, সে পরিশ্রম করে পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন করেছে। লতা কিন্তু প্রশমনের বিবাহিতা স্ত্রী নয়। এক বছর আগে শিয়ালদহ স্টেশনে কতকগুলি গুণ্ডার হাত থেকে প্রশমন তাকে রক্ষা করে ঘরে নিয়ে আসে। এজন্য লতার প্রশমনের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। প্রশমন একটি ভিখারী দলের কুসঙ্গ থেকে কানু নামে একটি ছেলেকেও উদ্ধার করে এনেছে। বাইরের লোকের কাছে প্রশমন ও লতা স্বামী-স্ত্রী ও কানু তাদের সন্তান বলে পরিচিত (তৃতীয় দৃশ্য)।

পরদিন সকালে মুদির দোকান থেকে কিছু জিনিস কেনার জন্য লতা কানুকে একশ টাকার একটা নোট দিয়ে পাঠায়। দোকানদার কোন জিনিস তো দিলই না উপরন্তু প্রশমন চুরি ডাকাতি করে এই টাকা পেয়েছে কিনা সেই সব নানা কথা বলে কানুকে

বিদ্রূপ করে। এদিকে প্রশমন মাছ-মাংস তরিতরকারি কিনতে বাজারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সেই সময় পাশের বাড়ীর রেডিয়ো থেকে ঘোষণা শোনা যায় যে, হোটেল থেকে এক ব্যক্তির পাঁচ হাজার টাকা চুরি গেছে। নোটের নম্বরের উল্লেখ করে বলা হয কোন ব্যক্তি যেন এই নম্বরের নোটের লেনদেন না করে। প্রশমন ঘোষণা শুনে বুঝতে পারে তাকে পি.পি ভীষণভাবে প্রতারণা করেছে। সে তৎক্ষণাৎ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। (পঞ্চম দৃশ্য। যবনিকা)

ডিটেক্টিভ অতীন কর লতাকে প্রশমনের ব্যাপারে জেরা করলে লতা বলে, সে যদি জানতে পারে প্রশমন অর্থ চুরি করে এনেছে তবে সে প্রশমনকে সেই অর্থ থানায় ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করবে। অতীন লতার ঘর থেকে বেরোতে যাবে এমন সময় একজন সিপাই এসে অতীনকে একটি চিঠি দিয়ে যায়। সেই চিঠি থেকে জানা যায়, কে যেন ডি.ডি.কে হত্যা করেছে এবং সেই হত্যা তদন্তের দায়িত্ব অতীনের উপর অর্পণ করা হয়েছে। সেই অবস্থায় বাড়ীওয়ালা লতাকে পরদিনই বাড়ী ছেড়ে দিতে বলে। এই দুঃসময়ে প্রতিবেশিনী সন্ধ্যা তার ঘরে লতা ও কানুকে আশ্রয় দেয় (ষষ্ঠ দৃশ্য)।

এদিকে প্রশমন চন্দননগর প্রতীক্ষালয়ে বিনা পারিশ্রমিকে বেবী নামে এক মহিলার জিনিষপত্র বহন করে এনেছে। এর পরিবর্তে সে বেবীর টিকিট পেতে চায় কারণ সে তাড়াতাড়িতে টিকিট কাটতে পারেনি। কথা প্রসঙ্গে বেবী জানায় তার ভাবী স্বামীর নাম ইন্সপেক্টর অতীন কর এবং সে তার প্রতীক্ষা করছে। পুলিশের নাম শুনে প্রশমন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং বেবীকে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে তার সঙ্গে স্টেশন থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে। (সপ্তম দৃশ্য)

লতা রেডিও মারফৎ জানতে পারে প্রশমন চন্দননগরের কাছাকাছি কোথাও আছে। সে তখন প্রশমনের খোঁজে চন্দননগরের দিকে রওয়ানা হয়। (অষ্টম দৃশ্য)

চন্দননগরের একটি পোড়ো বাড়ীতে প্রশমন বেবীকে নিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে প্রশমন বেবীকে ডি.ডি. খুনের কাহিনী বর্ণনা করে। খুনের প্রকৃত কারণ জেনে বেবী প্রশমনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এদিকে প্রশমন ধরা পড়ার ভয়ে বেবীকে একটি ঘরে বন্ধ করে পালিয়ে যায়। বেবী সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে, মাঝে মাঝে শাড়ীর আঁচল বের করে বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। একটু পরে সেখানে বিজন আসে। বেবী বিজনের সাহায্য চায় এবং বিজনের সঙ্গে তার বাগানবাড়ীতে যেতে রাজী হয়। বেবীকে বিজন তার পরিচয় দিলে সে চমকে ওঠে কারণ এই নামটি সে প্রশমনের মুখে শুনেছে। (নবম দৃশ্য)

বিজনের বাগানবাড়ীতে বেবী বিজনকে জানায় প্রশমনের সঙ্গে বিজনের প্রতারণার ব্যাপারটি সে অবগত আছে এবং প্রশমন প্রতিশোধ নেবার জন্য তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এর ফলে বিজন খুব ভয় পায় এবং বেবীকে গোপনে হত্যার জন্য চাকর মহেন্দ্রকে নির্দেশ দেয়। মহেন্দ্র কিছুক্ষণ পরে বিজনকে জানায় সে তার কথামত কাজ করেছে। সেই কথা শুনে বিজন নিশ্চিন্ত হয়ে কলকাতায় ফিরে যায়। (দশম দৃশ্য)

প্রশমন ঘুরতে ঘুরতে বিজনের বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হয়। হঠাৎ একটি ঘরের ভেতর থেকে আর্তস্বর শুনে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে ও হাত পা বাঁধা অবস্থায় বেবীকে দেখে। সে বেবীকে মুক্ত করে। বেবী প্রশমনকে তার বর্তমান দুরবস্থা থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে বলে আশ্বাস দেয়। প্রশমনের ব্যক্তিগত জীবনের কথা জেনে বেবী এত অভিভূত হয়ে পড়ে যে সে তাকে প্রণাম করে। প্রশমন বেবীকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে যায়। (একাদশ দৃশ্য)

ডি.ডি.র সেক্রেটারী মানু পুলিশ অফিসার মিঃ মুখার্জীকে জানায় ডি.ডি.-র হত্যাকারীর নাম প্রশমন দে। ইতোমধ্যে পি.পি তার বাড়ীর চতুর্দিকে পুলিশ প্রহরা রাখার জন্য মিঃ মুখার্জীকে ফোনে অনুরোধ করে। ঠিক সেই সময় অতীন এসে জানায়, চন্দননগর স্টেশনে সে তার ভাবী বধূ বেবীকে প্রশমনের সঙ্গে যেতে দেখেছে। সে ধরে নেয়, তার অজ্ঞাতে উভয়ের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মিঃ মুখার্জী তাকে শান্ত করে প্রকৃত খবর জানার জন্য বেবীর কাছে যেতে বলে। সে সময় বেবীর ফোন আসে। সে ফোনে অতীনকে জানায়, সে প্রশমনের ব্যাপারে অনেক তথ্য দিতে পারে। সে কথা শুনে অতীন বেবীর বাড়ী রওয়ানা হয়। (দ্বাদশ দৃশ্য)

বিজন রায়ের অফিসে এসে লতা তাকে বলে, তার স্বামী প্রশমনের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে বিজন যে অভিযোগ করেছে সে যেন তা প্রত্যাহার করে নেয়। বিজন সে কথা শুনে দারোয়ান দিয়ে লতাকে বহিষ্কার করে। লতা বেরিয়ে গেলে সেখানে প্রশমন প্রবেশ করে এবং বিজনকে বলে বিজন যেন সেই ঘটনার মূল হোতা পি.পি.র ঘর তাকে দেখিয়ে দেয়। ইতোমধ্যে সেখানে পি.পি. প্রবেশ করে ও প্রশমনের পরিচয় জেনে বলে, সে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রশমনকে দিয়ে হত্যা করিয়েছে এবং হত্যাব ব্যাপারে কোন সাক্ষী যাতে না থাকে সেজন্য সে এই ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রশমন সে কথা শুনে পিস্তল দিয়ে পি.পি.কে গুলি করতে গেলে বাইরে অতীন রায়ের সাড়া পাওয়া যায়। সেই মুহূর্তে প্রশমন অন্যমনস্ক হলে পি.পি. তাকে গুলি করে। প্রশমনকে গুলি করার অপরাধে অতীন পি.পি.কে গ্রেপ্তার করে। গুলির শব্দে লতা ঘরে ঢোকে। সে প্রশমনের কাছে এগিয়ে যায় এবং প্রশমনের বুক থেকে রক্ত নিয়ে কপালে ও সিঁথিতে সেই রক্ত ছুঁইয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। (ত্রয়োদশ দৃশ্য। শেষ যবনিকা)

● বৃত্ত-গঠন

এখানে দুটি বৃত্ত। দরিদ্র প্রশমন স্বার্থপর সমাজের বলি হয়েছে—এটিই নাটকের আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তের পরিপুষ্টির জন্য এসেছে—

(ক) ডি.ডি.-পি.পি-বিজন-উপকাহিনী।

(খ) লতা-কানু-সন্ধ্যা-উপকাহিনী।

(গ) বেবী-অতীনকর-উপকাহিনী।

● **অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য**

চতুর্থ দৃশ্যটি অপ্রয়োজনীয়।

● **নাট্যক্রিয়ার বিভাগ**

John Howard Lawson-এর তত্ত্বানুসারে এই নাটককে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।

প্রথম পর্যায়ে পি.পি.র নির্দেশে প্রশমনের ডি.ডি.র ফাইল চুরি ও তাকে হত্যা, কার্যসিদ্ধ হলে পূর্ব পরিকল্পনামত প্রশমনের হাতে পি.পি.র সেক্রেটারী বিজনের পাঁচ হাজার টাকা প্রদান ও প্রশমন প্রস্থান করলে পুলিশের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্য দিয়ে কাহিনীর বীজ উপ্ত হয়েছে। এটি নাট্য কাহিনীর সূচনা অংশ (expisition)। প্রথম থেকে পঞ্চম দৃশ্য পর্যন্ত সূচনা অংশ বিস্তৃত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি (rising action) লক্ষ্য করা যায়। এখানে রেডিও মারফৎ তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগের সংবাদে প্রশমনের কলকাতা থেকে চন্দননগরে পলায়ন, কলকাতায় প্রশমনের বাসস্থানে ইন্সপেক্টার অতীন করের আগমন, প্রশমনের স্ত্রী বলে পরিচিত লাতাকে প্রতিবেশিনী সন্ধ্যার আশ্রয় দান, চন্দননগর স্টেশনে অতীনের ভাবীবধূ বেবীর সঙ্গে প্রশমনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যঘটনা এগিয়ে গেছে। এটি ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্য জুড়ে রয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে এসেছে সংঘাত (clash)। বেবীকে প্রশমনের ভীতি প্রদর্শন (সপ্তম দৃশ্য)। পোড়োবাড়ীতে বেবীকে বন্ধ করা (নবম দৃশ্য), বিজনের বাগানবাড়ীতে বেবী প্রশমনের পক্ষ হয়ে কথা বললে বিজনের বেবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র (দশম দৃশ্য), বাগানবাড়ী থেকে বেবীকে প্রশমনের উদ্ধারের (একাদশ দৃশ্য) মাধ্যমে নাট্যকার বিভিন্ন ধরণের সংঘাত সৃষ্টি করেছেন।

চতুর্থ পর্যায়ে নাট্যকাহিনীতে এসেছে চূড়ান্ত অবস্থা (climax)। পি.পি.কে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রশমনের পি.পি.র অফিসে গমন এবং প্রশমনের মুহূর্তের অন্যমনস্কতার সুযোগে পি.পি.র প্রশমনকে হত্যায় (ত্রয়োদশ দৃশ্য) নাটকের চরম অবস্থা লক্ষ্য করা যায় এবং এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটেছে।

সেই তিমিরে

এই নাটকের নয়টি দৃশ্য।

● **ঘটনা-সংযোজন**

পুরুষের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে বসবাস করার জন্য স্বাহা কিছু সংখ্যক নারীসহ গৃহত্যাগ করে 'জাগরণী সম্মিলনী' স্থাপন করেছে। সমিতির সভানেত্রী আনন্দবাবুর অবিবাহিতা নাতনী শিপ্রা উপস্থিত মহিলাদের সম্বোধন করে বলে, আমাদের দেশে পুরুষের অত্যাচারে নারী লাঞ্ছিত হয়, তাদের মনুষ্যত্ব খর্ব হয়। সুতরাং যারা স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহ ত্যাগ করে এসেছে তারা যেন সেখানে ফিরে গিয়ে নিজেকে কলুষিত না করে। সমিতির সম্পাদিকা রুদ্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাহা বলে, যতদিন স্বামীরা তাদের সমান অধিকার দিতে রাজী না হয় ততদিন স্বামীর বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন চলবে। অন্য সদস্যা সন্ধ্যা বলে, তারা তাদের ব্যক্তিত্বের সম্মান, নারীত্বের মূল্য পেতে চায়। এইভাবে আরো অন্যান্য সদস্যা তাদের স্বামীর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে। এরপর শিপ্রার নির্দেশে সকলে স্বামীর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের শপথ নেয়। কিন্তু তাদের মধ্যে সদ্য বিবাহিতা তনিমা সেই অনুষ্ঠানে নীরব থাকে। শিপ্রা তার নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, সে স্বাহার কথায় সমিতিতে যোগদান করেছে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তার বোধগম্য হচ্ছে না। তনিমা অবশ্য বলে, তার স্বামী অন্যত্র পরীক্ষা নিয়ে এত ব্যস্ত যে সে উনিশ খানা চিঠি লিখে একটারও উত্তর পায়নি। তাই স্বামীর প্রতি অভিমানে সে সমিতিতে চলে এসেছে। সেই সময় ঝি নিস্তারিণী এসে সকলের রাতের বিভিন্ন ধরণের খাদ্য তালিকা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতে করতে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর অনুপমা নামে এক অল্প বয়সী মহিলা সমিতির সদস্যাভুক্তা হয়। তার অভিযোগ, তার তেরো বৎসর বয়সে বিবাহ হয় এবং বর্তমানে সে এগারটি সন্তানের জননী। শিপ্রা বলে, সে কারণেই সে বাইশ বৎসর বয়সেও বিবাহ করেনি। (প্রথম দৃশ্য)

স্ত্রী স্বাহা গৃহত্যাগ করায় স্বামী রুদ্রেশ্বরের মানসিক অবস্থা ভাল নয়। তার নামে কোন চিঠি এসেছে কিনা সে খবর বার বার চাকরের কাছ থেকে নেয় এবং প্রতিবারই হতাশ হয়। এমন সময় তার বন্ধু অতনু আসে। সে প্রাণ-চঞ্চল যুবক, সদ্য জাপান থেকে পাশ করে ফিরেছে। সে রুদ্রেশ্বরের কাছ থেকে জানতে পারে, সেদিন স্বাহা তার বন্ধু মিঃ চাউডুরীর সঙ্গে সিনেমা দেখে ও বেড়িয়ে রাত দুটোর সময় বাড়ী ফিরলে রুদ্রেশ্বর বিরক্তি প্রকাশ করে। স্বাহা সেজন্য অপমানিত বোধ করে গৃহত্যাগ করে। সেই সময় রুদ্রর সম্পর্কে দাদু আনন্দবাবু এসে শিপ্রার গৃহত্যাগের খবর দেন। তিনি একটি

সংবাদপত্র দেখান। সেখানে 'জাগরণী সম্মিলনী' একজন কেরাণী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অতনু বিজ্ঞাপনটি পড়ে স্থির করে, সে দরখাস্ত করবে এবং সেই পদে নিযুক্ত হলে কৌশল প্রয়োগ করে সমিতির সব সদস্যাকে ঘরে ফিরিয়ে আনবে। রুদ্র ও আনন্দবাবু সেই প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করে। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

সেদিন সমিতির সদস্যা বনবালার স্বামী সত্যসিন্ধু 'জাগরণী সম্মিলনী'র বাড়ীতে এসেছে তার স্ত্রীকে গৃহে ফিরিয়ে নিতে। বনবালা বর্তমানে সুপুরি কেটে অর্থ উপার্জন করছে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করায় সে অত্যাচারী স্বামীর কাছে ফিরে যেতে রাজী হয় না। কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যার স্বামী ব্রজদুলাল সন্ধ্যাকে ফিরিয়ে নিতে এসে নিরাশ হয়। রোমান্টিক মনোভাবাপন্ন সন্ধ্যার সঙ্গে বাস্তববাদী স্বামীর মানসিক ব্যবধান-ই সন্ধ্যাকে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। সুতরাং সন্ধ্যা পুরোনো একঘেয়ে জীবনে ফিরে যেতে চায় না। এরপর অনুপমার স্বামী দিব্যেন্দু আসে। সে তাদের এগারটি সন্তানকে সামলাতে না পেরে অনুপমার শরণাপন্ন হয়েছে। অনুপমা সন্তানদের ভালভাবে দেখাশোনার নির্দেশ দিয়ে দিব্যেন্দুকে বাড়ী ফিরে যেতে বলে। কিছুক্ষণ পর তনিমার স্বামী প্রভাতকিরণ স্ত্রীব অভিমান ভাঙ্গিয়ে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপর পূর্বপরিকল্পনামত অতনু চাকুরীর খোঁজে সেখানে আসে। (তৃতীয় দৃশ্য)

জাগরণী সম্মিলনীর কাজকর্মে বাধা দানের জন্য রুদ্রেশ্বরের বাড়ীতে স্বামী-সংরক্ষণ সংসদ গঠিত হয়েছে। সেখানে একে একে সকল সদস্যের অভিযোগ লিখে রাখা হয়। আনন্দবাবু বললেন, অতনু 'জাগরণী সম্মিলনী'র কেরাণী নিযুক্ত হওয়ায় তার কাছ থেকে প্রত্যেক সদস্য তার স্ত্রী'র খবরাখবর পাবে। কিন্তু অতনু যে সেই সংবাদ পরিবেশন করছে সে কথা কোন সদস্য যেন কারো কাছে না জানায়। এরপর সভা ভঙ্গ হয়। (চতুর্থ দৃশ্য)

সম্মিলনী ভবনে অতনু এসেছে। বনবালা সুপুরি কাটার পয়সা অতনুর কাছে জমা দেয এবং স্বামীর চিঠি এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। চিঠি না আসায় হতাশ হয়ে চলে যায়। সন্ধ্যাতারা নারীমঙ্গল মাসিক পত্রিকায় দুটো কবিতা লিখে যে তিনটাকা পেয়েছে সেই টাকা জমা দেয়। শিপ্রা এসে অভিযোগ করে, অতনু যে সমিতির সদস্যা হতে ইচ্ছুক এক মহিলাকে সমিতির বিরুদ্ধে কথা বলে বিদায় করে দিয়েছে সে খবর সে জানতে পেরেছে। স্বাহা অতনুর অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য বিরক্তি প্রকাশ করে। অনুপমা পোষাক সেলাই থেকে প্রাপ্ত দশটাকা অতনুকে দিতে এলে অতনু তাকে বাড়ী ফিরে যাওয়ায় কথা বলে। সে কথা শুনে অনুপমা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক সময়, আনন্দবাবু সেখানে আসেন। অতনু শিপ্রার খবর দেয়। অতনু আনন্দবাবুকে শিপ্রার সঙ্গে দেখা করার কথা বললে অভিমানী আনন্দবাবু রাজী হন না। (পঞ্চম দৃশ্য)

সম্মিলনীভবনে অতনু পূর্বপরিকল্পনানুসারে চিঠিগুলি সদস্যাদের হাতে তুলে দেয়। চিঠি পড়ে বনবালা, সন্ধ্যাতারা, তনিমা, অনুপমা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এদিকে অতনুও নানা কথার চাতুরীতে শিপ্রার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে। (সপ্তম দৃশ্য—বিরতি)।

ধীরে ধীরে সম্মিলনী ভবন থেকে অনেক সদস্যা চলে যায়। অতনু এই ঘটনায় খুব খুশি। সে অফিসঘরে বসে গুণ গুণ করে গান গাইছে। শিপ্রা অতনুর সব সময় গান গাওয়া নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে। শিপ্রার বারবার এসে অভিযোগ করার ছলে

অতনুর কাছে আসার মধ্য দিয়ে তার প্রতি শিপ্রার দুর্বলতার দিকটা যেন অতনুর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেদিন বনবালার স্বামী সত্যসিন্ধু সন্ন্যাসী বেশে উপস্থিত হয়ে বলে, সে পুত্রকন্যাদের সামলাতে না পারায় সন্ন্যাস নিয়েছে। বনবালা তৎক্ষণাৎ রিক্সা ডেকে স্বামীর সঙ্গে বাড়ী ফিরে যায়। ব্রজগোপাল এসে তার মিথ্যা বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র দেখালে সন্ধ্যাতারা কাঁদতে কঁ দতে স্বামীর সঙ্গে গৃহাভিমুখী হয়। প্রভাতকিরণ এলে তনিমাও তার সঙ্গে চলে যায়। অনুপমা পুত্রকন্যার চিন্তায় অস্থির হয়ে একাই বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়। রুদ্র এসে স্বাহাকে বলে, সে স্বাহাকে কোন চিঠি দেয়নি বলে স্বয়ং তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। রুদ্র স্বাহাকে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার জন্য অনুরোধ করলে স্বাহা রাজী হয় ও দুজনে প্রস্থান করে। শিপ্রা অতনুকে বলে, সে দাদুর চিঠি পেয়েছে। সে চিঠিতে দাদুর হরিদ্বার চলে যাওয়ার কথা রয়েছে। সে কথা শুনে অতনু বলে ফেলে, এই বিষয়টি তো তার জানা ছিল না। এরপর শিপ্রার প্রশ্নের উত্তরে অতনু জানায়, শিপ্রার দাদুর নির্দেশে সে কেরাণীর চাকুরী নিয়েছে ও সে স্বাহার স্বামী রুদ্রেশ্বরের বন্ধু। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে শিপ্রার চোখে জল আসে। অতনু তাকে সান্ত্বনা দেয় ও কিছু কথা শোনার জন্য তাকে অনুরোধ করে। শিপ্রা চেয়ারে বসে পড়ে। (অষ্টম দৃশ্য)

রুদ্রেশ্বর স্বাহার বাড়ীতে শিপ্রা অতনু আনন্দবাবু এসেছেন। অতনুর সঙ্গে শিপ্রার শীঘ্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কতা শোনা যায়। সে বাড়ীতে নিস্তার এসে রুদ্রেশ্বরের চাকর দুস্তরকে দেখে অবাক হয়ে যায়। দুস্তরও তার গৃহত্যাগী স্ত্রী নিস্তারকে দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়—দীর্ঘদিন পর উভয়ের মিলন ঘটে। (নবম দৃশ্য—যবনিকা)।

● বৃত্ত-গঠন

এই নাটকের দুটি বৃত্ত।

সাময়িক উত্তেজনাবশে স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী স্বাহা তার স্বামী রুদ্রেশ্বরকে ত্যাগ করে কিছু নারীর সঙ্গে অন্যত্র বসবাস করতে শুরু করলেও কিছুদিন পর প্রিয়জনের আকর্ষণে স্বামীগৃহে ফিরে আসে—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তের সহায়তায় নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক বৃত্ত এসেছে—

(ক) শিপ্রা-আনন্দবাবু-অতনু-উপাকাহিনী।

(খ) বনবালা-সত্যসিন্ধু, সন্ধ্যাতারা-ব্রজদুলার, তনিমা-প্রভাতকিরণ, অনুপমা-দিব্যেন্দু, নিস্তার-দুস্তর-উপকাহিনী।

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

Lewis Campbell-এর অধিবৃত্ত (parabola) গঠনরীতি 'সেই তিমিরে' নাট্যক্রিয়া বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পুরুষের শৃঙ্খলপাশ মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবন-যাপনের আকাঙ্ক্ষায় রুদ্রেশ্বরের স্ত্রী স্বাহার নেতৃত্বে কিছু মহিলা কর্তৃক 'জাগরণী সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা, সেই প্রতিষ্ঠানে পুরুষের

অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহিলাদের নানা অভিযোগ ও স্বমর্যাদায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সকলের আন্দোলনের শপথ গ্রহণে (প্রথম দৃশ্য) নাট্যকাহিনীর সূচনা (opening) হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে স্ত্রী স্বাহার গৃহত্যাগে স্বামী রুদ্রেশ্বরের মানসিক অস্থিরতা, সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বন্ধু অতনুর সাহায্য প্রার্থনা, আনন্দবাবুর শিপ্রার গৃহত্যাগের সংবাদ পরিবেশন, মহিলাদের স্বগৃহে ফিরিয়ে আনার মানসে জাগরণী সম্মিলনীতে কেরাণী পদ গ্রহণে অতনুর সিদ্ধান্ত (দ্বিতীয় দৃশ্য), সন্ধ্যা ও অনুপমার স্বামীদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান, অতনুর কেরাণী পদ লাভ (তৃতীয় দৃশ্য), রুদ্রেশ্বরের বাড়ীতে স্বামী-সংরক্ষণ সংসদের প্রতিষ্ঠা, সেখানে স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীদের অনুযোগ, অতনুর মাধ্যমে স্বামীরা যাতে স্ত্রীর খবরাখবর পায় সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব (চতুর্থ দৃশ্য), জাগরণী সম্মিলনী প্রতিষ্ঠানে আগত একটি মহিলাকে অতনুর কৌশলে ফিরিয়ে দেওয়া ও সেজন্য শিপ্রার অনুযোগ, অতনুর আত্মপক্ষ সমর্থন, অনুপমাকে স্বগৃহে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করলে অতনুর প্রতি তার ক্রোধ প্রকাশ, আনন্দবাবুর সম্মিলনীতে আগমন (পঞ্চম দৃশ্য), মহিলাদের নিজগৃহে ফিরিয়ে আনার জন্য স্বামী সংরক্ষণ সংসদের প্রত্যেক সদস্যের নামে অতনুর পত্রলিখন (ষষ্ঠ দৃশ্য)—চিত্রিত হয়েছে। এটি নাট্যক্রিয়ার আরোহন (climax)। এটি নাটকের বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে সম্মিলনী ভবনে অতনু পূর্বপরিকল্পনামত মহিলাদের স্বামী সংরক্ষণ সংসদের সদস্যদের পত্র প্রদান করলে তারা বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। (সপ্তম দৃশ্য)। এখানে নাট্যক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ লক্ষ্য করা গেল। এটি নাটকের শীর্ষবিন্দু (acme)।

সম্মিলনী ভবন থেকে অধিকাংশ সদস্যের বিদায়গ্রহণ, শিপ্রার কাছে অতনুর নিজের প্রকৃত পরিচয় দান ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার (অষ্টম দৃশ্য) মধ্য দিয়ে নাট্যঘটনা পরিণামুখী (sequel) হয়েছে। এটি নাটকের চতুর্থ পর্যায়।

এরপর রুদ্রেশ্বর-স্বাহার বাড়ীতে আনন্দবাবু-শিপ্রা-অতনুর আগমন, শিপ্রা-অতনুর আসন্ন বিবাহবন্ধনের সংবাদ, নিস্তার ও দুস্তরের মিলনে (নবম দৃশ্য) নাট্য কাহিনীর সমাপ্তি (close) ঘটেছে।

পিতাপুত্র

এই নাটকের চারটি অঙ্ক, দৃশ্য নেই। প্রতিটি অঙ্ককে বিশেষ নামে ভূষিত করা হয়েছে। যেমন, প্রথম অঙ্কের নাম সূচনা। এই ভাবে দ্বিতীয় অঙ্ক সম্ভাবনা, তৃতীয় অঙ্ক সন্দর্শন ও চতুর্থ অঙ্ক সংঘাত নামে বিশেষিত হয়েছে। নাট্যকারের অন্য নাটক 'মেঘমুক্তি'তে

এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় কিছু সংস্কৃত নাটকে এইভাবে অঙ্কের নামকরণ করা হত। যেমন— বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষে বলা হয়েছে— "ইতি মুদ্রালাভো নাম প্রথমোহঙ্ক:।"

● **ঘটনা-সংযোজন**

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার রায়বাহাদুর ভুজঙ্গভূষণ মুখার্জী তাঁর বিধবা যুবতী কন্যা বিনতি ও দূর সম্পর্কের দৌহিত্র শ্যামলকে নিয়ে শহর থেকে দূরে নির্জন জায়গায় বসবাস করেন। সেদিন বিনতিকে অনেক রাত পর্যন্ত তিনি পিস্তল ছোঁড়া শেখালেন। কারণ, একটি ভয়ঙ্কর ডাকাত দলকে তিন চার বছর পুলিশ গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হওয়ায় গৃহস্থ বাড়ীর পক্ষে এই দলটি মারাত্মক হয়ে উঠেছে। তিনি বিনতিকে বলেন, বিপদে আত্মরক্ষা না হোক, অন্তত আত্মহত্যা করার জন্য বাঙালী মেয়েদের পিস্তল ছোঁড়া শেখা উচিত। তখন রাত এগারটা বেজে গেছে। শ্যামল তখনো বাড়ী ফেরেনি বলে মিঃ মুখার্জী উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি বলেন, এ রকম দেরী করে ছেলেদের বাড়ী ফেরা ঠিক নয়। বিনতির স্বামী প্রখ্যাত পুলিশ অফিসার প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যাযের পুত্র সমীরও ঠিক এইভাবে প্রথম প্রথম দেরী করে বাড়ী ফিরত। তরপর সে আর ফিরল না। শেষে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তার মৃত্যুসংবাদ এল। সে প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা। সে সময় তাঁদের পরিচিত গজেন্দ্র এসে জানান, চারিদিকে যেভাবে ডাকাতি শুরু হয়েছে তাতে তিনি কিছুদিনের জন্য অন্যত্র চলে যাবেন। তিনি আরো বললেন, তার মন বলছে, সেই রাতে ডাকাতদল আসবে। গজেন্দ্র চলে গেলে মিঃ মুখার্জী বিনতিকে বলেন, বিনতির এমন মন্দ কপাল যে, তার শ্বশুর রাজস্থানে ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিযে নিহত হন, বিয়ের একবছরেব মধ্যে স্বামী নিরুদ্দেশ হয়। তারপর তার মৃত্যু সংবাদ আসে। তাঁর আশঙ্কা উক্ত ডাকাতদল হয়তো তাঁর জীবনে নূতন কোন লাঞ্ছনা নিয়ে আসবে। তিনি আরো বলেন, এই ডাকাতদলকে শায়েস্তা করার জন্য ভারত সরকার তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একজন অভিজ্ঞ বিচক্ষণ পুলিশ অফিসার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিনতি গজেন্দ্রকে সেই পুলিশ অফিসার হিসেবে সন্দেহ প্রকাশ করলে মিঃ মুখার্জী বলেন, তার মনেও অনুরূপ একটা ভাবনা এসেছে। মিঃ মুখার্জী নিজের ঘরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর শ্যামল এল। রোজ দেরী করে বাড়ী ফেরার জন্য বিনতি তাকে ভর্ৎসনা করে। শ্যামল বিনতিকে প্রশ্ন করে, মা বড় না জন্মভূমি বড়। এ প্রশ্নে বিনতি ক্রুদ্ধ হয়। তাদের কথোপকথনের শব্দে মিঃ মুখার্জী ঘরে প্রবেশ করেন এবং সব শুনে বলেন, জন্মভূমির কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার পূর্বে নিজের মা'র সেবা করা প্রধানতম কর্তব্য। শ্যামল চলে গেলে বিনতি মিঃ মুখার্জীকে বলেন, তিনি যে ইনস্যুরেন্সের চেক ভাঙ্গিয়ে বিরাট অঙ্কের টাকা বাড়ীতে রেখেছেন সেটা বোধহয় ঠিক হয়নি। সে, আরো বলে, টাকাটা যে তিনি আয়রন সেফে রেখেছেন শ্যামল ছাড়া আর কেউ একথা জানে না। রাত বারটা বাজে। ঠিক সে সময় দারোয়ান ও মিঃ মুখার্জীকে আহত করে বিনতির ঘরের দরজায় মুখোস পরা সমীর আঘাত করতে থাকে। পিস্তল হাতে বিনতি দরজা খুলে ছদ্মবেশী সমীরের কণ্ঠস্বর শুনে তাকে

চিনতে পারে। সমীর বলে, সরকারী চাকুরে বাবার যাতে কর্মজীবনে অসুবিধে না হয় সেই কারণে সে নিজেকে মৃত বলে প্রচার করেছিল। এতদিন পর স্বামীকে কাছে পেয়ে বিনতি সমীরের সঙ্গে চলে যেতে চায়। সমীর তার বিপদ-সংকুল জীবনের কথা বলে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিনতিকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যায় না। সে সমীরের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। (সূচনা। প্রথম অঙ্কের বিরাম)

গভীর অরণ্যে দস্যুদের আস্তানা। সেখানে পরাণপুর গ্রামের সবচেয়ে ধনী সুদ-ব্যবসায়ী গোবর্ধনকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। ডাকাত দলের সদস্যা মীনা মুক্তিপণ হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে দাবী করে। সে অর্থ দিতে অস্বীকার করায় তার নাতি কিশোরকে মীরা গুলি করতে উদ্যত হলে বিনতি সে কাজে বাধা দেয়। বিনতি বলে, তাদের দল যে দেশসেবার ব্রত নিয়েছে এই ধরণের নিষ্ঠুর হত্যার মধ্য দিয়ে সেই কার্য সাধিত হবে না। সে সময় সমীর উপস্থিত হলে মীনা বিনতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। সমীর বিনতিকে তাদের যে কোন কাজের ব্যাপারে কোন মন্তব্য বা বিরুদ্ধাচরণ করতে বারণ করে। সমীর আবো বলে, তারা গুরুদেবের নির্দেশে এই কাজ করে যাচ্ছে। তারা ডাকাতি-লব্ধ অর্থ গুরুদেবকে দিয়ে আসে। সেই অর্থ তিনি, দীনদরিদ্রকে নয় নিম্ন মধ্যবিত্তদের বিলিয়ে দেন। তাঁর মতে, সমাজে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাই সবচেয়ে কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে জীবনযাপন করে। কারণ তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি আগ্রহ আছে, আত্মীয়-কুটুম্বিতা আছে কিন্তু অর্থ নেই। ইতোমধ্যে শ্যামল এসেছে। সে এক জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়ে (এই তার প্রথম ডাকাতির চেষ্টা) ব্যর্থ হয়েছে, সেজন্য দলের নিয়মানুসারে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্যামল জানায়, তাদের দলকে গ্রেপ্তার করার জন্য ভুজঙ্গভূষণ বাবু বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠেছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে তারা যেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শ্যামল চলে গেলে রমেন নামে এক সদস্য বলে, গোবর্ধন সরকার শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজী হয়েছে। এরপর মীনা পরবর্তী ডাকাতির কথা ঘোষণা করে। তারা কুসুমপুরের জমিদারবাড়ী লুট করবে বলে স্থির হয়। ইতোমধ্যে গুপ্তচর সন্দেহে গজেন্দ্রকে সেখানে ধরে আনা হয়। গজেন্দ্র কথার চাতুরীতে মীনাকে অভিভূত করে মুক্তি পায়। এদিকে দলের সদস্যা দীপালি শ্যামলকে ভালোবাসে। সে এক সময় শ্যামলকে বদ্ধ ঘর থেকে মুক্ত করলে মীনা তা জানতে পারে ও দুজনকে হত্যা করার জন্য পিস্তল তুললে সমীর তাদের ক্ষমা করতে বলে। এর মূল্যস্বরূপ শ্যামলকে কুসুমপুরের ডাকাতিতে অংশগ্রহণে সম্মতি দিতে হয়। তারা প্রস্থান করলে ভিক্ষুকের ছদ্মবেশধারী ভুজঙ্গভূষণবাবুকে গুপ্তচর সন্দেহে ধরে এনে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। দীপালি তাকে বন্ধনাবস্থায় দেখে দয়াপরবশ হয়ে মুক্ত করে দেয় ও তিনি অভুক্ত আছেন শুনে খাদ্য সংগ্রহের জন্য চলে গেলে ভুজঙ্গভূষণবাবু কন্যাকে সেইস্থানে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি কন্যাকে ধিক্কার দেন। বিনতি বলে, সে যা করছে তা তার জীবনদেবতার নির্দেশে করছে, সে বর্তমানে তার নাম বলতে পারছে না। তখন তিনি বিনতিকে তার সঙ্গে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু বিনতি সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করে। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গভূষণ বিনতিকে বলেন, তিনি খুব শীঘ্র এই ডাকাতদলটিকে গ্রেপ্তার করবেন এবং সেদিন প্রয়োজনে বিনতিকে গুলি করতে দ্বিধা করবেন না। তিনি এরপর সে স্থান ত্যাগ করেন। (সম্ভাবনা-দ্বিতীয় অঙ্ক)

ডাকাত দলের সদস্যা মণিকা বিশেষ চাপের মধ্যে পড়ে পিতৃবন্ধু ভুজঙ্গভূষণকে তার দলের গোপণ তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। এর পুরস্কার স্বরূপ ভুজঙ্গভূষণ ভালো পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ের বন্দোবস্ত করেছেন। সেদিন মণিকার পাকা দেখা। সেই উপলক্ষে মণিকার বান্ধবী ও দলের সদস্যা কণা এসেছে। কিছুক্ষণ পর নাটকীয়ভাবে অনিমন্ত্রিত মীনা সেখানে প্রবেশ করে। মীনাকে দেখে মণিকা ও কণা যেন বিপদের পূর্বাভাস পেয়ে আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। ভীতা মণিকা মীনাকে জানায়, সে তার দলের কথা ভুজঙ্গভূষণবাবুকে জানিয়েছে। সেই সংবাদে মীনা ক্রুদ্ধ ও বিপন্নবোধ করে। সে সময় ভুজঙ্গভূষণবাবু সেখানে এলে তার সঙ্গে মণিকা মীনার পরিচয় করিয়ে দেয়। মীনা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে চলে যায়। মীনাকে দেখে ভুজঙ্গভূষণ বাবুর কেমন সন্দেহ হয় এবং সে বিষয়ে তিনি কণাকে জেরা করতে শুরু করেন। কণা সঠিক উত্তর দেবার আগেই তার বাড়ীর চাকর গৌর এসে সংবাদ দেয়, তার বাবা সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। সেই খবর শোনমাত্র কণা বাড়ীর দিকে দৌড়ে যায়। ইতোমধ্যে মণিকা এসে জানায়, কণার বাবা তাদের বাড়ীতে বসে তার বাবার সঙ্গে গল্প করছেন। সুতরাং সেটি মিথ্যা সংবাদ। এরমধ্যে লালবাজার থেকে ভুজঙ্গভূষণাবাবুর কাছে নির্দেশ আসে, তিনি যেন গজেন্দ্রকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। গজেন্দ্র যেতে অসম্মত হলে ভুজঙ্গভূষণ তাকে যাওয়াব জন্য আদেশ করেন। গজেন্দ্র তখন নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে বলেন, তিনি-ই পুলিশ সুপার প্রদীপ্ত বন্দোপাধ্যায়। রাজস্থানের পলাতক ডাকতদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি নিজেকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং বর্তমানে ডাকাতদলকে ধরার জন্য ছদ্মবেশে রয়েছেন। কণা সে সময় বাড়ী থেকে ফিরে এসে জানায়, তার চাকর গৌরেব ছদ্মবেশে কোন ব্যক্তি তাকে প্রতারণা করেছে। ইতোমধ্যে ভুজঙ্গভূষণবাবু একটি জরুরী ফোন পেয়ে বেরিয়ে যান। এদিকে সমবেত অতিথিবৃন্দের অনুরোধে মণিকার নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হয়। আসর যখন বেশ জমে উঠেছে সে সময় সমীর, দীপালি ও শিখবেশী বিনতির আবির্ভাব হয়। বিনতির প্রতি মণিকার অপহরণের দায়িত্ব ছিল। বিনতি নিজেকে সেইভাবে প্রস্তুত করে এসেছিল কিন্তু মণিকার কনের সাজ দেখে তার নিজের বিয়ের দিনের কথা মনে পড়ে যায়। সে কিছুতেই মণিকার ক্ষতি করতে পারে না। ইতোমধ্যে ভুজঙ্গভূষণবাবু এসে জানালেন, তিনি মিথ্যে সংবাদ পেয়েছিলেন। শিখবেশী বিনতিকে দেখে তার কেমন সন্দেহ হয় কিন্তু বিনতি নিজেকে শিখ বলে পরিচয় দিতে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নেন। এদিকে বিনতি নিজের কাজে অকৃতকার্য হওয়ায় সমীর সে কাজের দায়িত্ব নেয়। সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এক সময় মণিকাকে একা ঘরে পেয়ে উদ্যত পিস্তল দেখিয়ে তাকে সে অনুসরণ করতে বলে। ঠিক সে সময় গজেন্দ্র তাদের দেখতে পেয়ে পিস্তল তোলেন। কিন্তু সমীরকে দেখে তাঁর কেন জানি হাত কেঁপে ওঠে। সমীরেরও গজেন্দ্রকে দেখে হাত কাঁপতে থাকে। দুজনেই স্বীকার করেন, কোন প্রিয়জনের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে তাঁরা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। এ সময় ভুজঙ্গভূষণের গলা শুনে প্রদীপ্ত সমীরকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। (সন্দর্শন। তৃতীয় অঙ্ক)

পীরপুরের জমিদার হরবিলাসবাবুর পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্রকে নিয়ে সংসার। সেদিন রেডিওতে ডাকাতদল সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারিত হওয়ায় হরবিলাসবাবু চিন্তিত। সেদিন

রাতেই সমীরের দল বাড়ী আক্রমণ করে। পুত্র গৌরীশঙ্কর ডাকাতদের বাধা দিতে গেলে মীনার গুলিতে নিহত হয়। পুত্রবধূ সরমা মীনাকে নিষ্ঠুর কাজের জন্য ধিক্কার দিলে সে বলে, সেও একদিন সরমার মত গৃহবধূ ছিল কিন্তু জমিদারের অত্যাচারে স্বামীপুত্র হারিয়ে জমিদারের দৈহিক নির্যাতন সহ্য করে সে বর্তমানে পিশাচিনী হয়েছে। এরপর সে সরমার কাছে সিন্দুকের চাবি চায়। সরমা তা দিতে অস্বীকার করলে মীনা পিস্তল তোলে। সে সময় হরবিলাসবাবু ছুটে এসে সরমাকে বলেন, পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে সরমার বেঁচে থাকা উচিত। মীনার হাতে চাবি তুলে দিয়ে হরবিলাসবাবু সরমা ও পৌত্র খোকনকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। এদিকে ডাকাতদল সিন্ধুকে আশাতীত গহনা পেয়ে অত্যন্ত খুশিমনে বাইরে যাওয়ার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছে সেই সময় সমীর ও বিনতি এসে খবর দেয়, যে গুরুদেবের নির্দেশে তারা সর্বস্ব ত্যাগ করে কাজে নেমেছিল তিনি তাদের সংগৃহীত প্রায় পৌনে দুইকোটি টাকা নিয়ে পলায়ন করেছেন। সমীর আরো জানায়, তাদের আশ্রম পুলিশ অধিকার করেছে। দীপালি শ্যামল ধরা দিয়েছে এবং অন্যান্যরা পালিয়েছে। দীপালির মাধ্যমে খবর সংগ্রহ করে পুলিশ সেই বাড়ীতে আসছেন। সুতরাং সকলে যেন পলায়ন করে। মীনা গুরুদেবের প্রতারণার কথা শুনে বলে, সে একটি গুলিতে গুরুদেবকে হত্যা করে অন্যগুলিতে আত্মহত্যা করে সেই ঘৃণ্য জীবনের অবসান ঘটাবে। মীনা চলে গেলে অন্যান্যরা বিদায় নেয়, সমীর তাকে ত্যাগ করে বিনতিকে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু বিনতি স্বামীকে ত্যাগ করতে রাজী হয় না। সেই ফাঁকে পুলিশ এসে পড়ে, কিছু ডাকাতকে তারা ধরে ফেলে। পুলিশ দলের মধ্যে প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দূর থেকে দেখেন, পুত্রবধূ বিনতি একব্যক্তির বুকে মাথা রেখে কাঁদছেন। সে দৃশ্য দেখে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পেছন থেকে সেই ব্যক্তিকে গুলি করেন। মুখোশ পরিহিত সমীর গুলির আঘাতে পড়ে যায়। প্রদীপ্ত বিনতিকে অসতী ভেবে গুলি করতে গেলে সমীর প্রদীপ্তকে বাবা বলে ডেকে ওঠে। তার মুখে পরিচিত বাবা ডাক শুনে প্রদীপ্ত সমীরের মুখোশ খুলে ফেলেন ও আর্তনাদ করে ওঠেন। সমীরের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, স্বামীর মৃত্যু দেখে বিনতি আত্মহত্যা করে। মৃত পুত্র ও পুত্রবধূর মাঝে দাঁড়িয়ে প্রদীপ্ত অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলেন। (সংঘাত। সম্পূর্ণ বিরাম)

- বৃত্ত-গঠন

এই নাটকে আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক—দুই ধরণের বৃত্ত রয়েছে। পুত্র সমীর অন্য ব্যক্তির দ্বারা ভ্রান্ত পথে চালিত হয়ে পিতা প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশেষ দুঃখের কারণ হয়—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তকে উজ্জ্বলতা দানের জন্য নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক বৃত্ত এসেছে—

(ক) ভুজঙ্গভূষণ-বিনতি-উপবৃত্ত

(খ) শ্যামল-দীপালি-মীনা-উপবৃত্ত

(গ) মণিকা-কণা-উপবৃত্ত

(ঘ) হরবিলাস-গৌরীশঙ্কর-সরমা-উপবৃত্ত

● অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্র

এখানে কোন অবান্তর দৃশ্য নেই তবে দৃশ্যের কোন কোন অংশ ও চরিত্র নাট্যকাহিনী অগ্রগতির সহায়ক হয়নি। যেমন, তৃতীয় অঙ্কে মণিকার পাকাদেখার আসরে পাঁচু গোঁসাই পটকা ভৃত্য, বনমালী সোম, মহেশ্বর ছাজলানী, মিসেস সরকারা, মণিকা, গজেন্দ্রের কথোপকথন অংশটি অপ্রয়োজনীয়। পাঁচু গোঁসাই, বনমালী, পটকা ভৃত্য, বনমালী সোম, মহেশ্বর-ছাজলানী, মিসেস সরকারা চরিত্রও অপ্রোয়জনীয়।

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

John Howard Lawson-এর তত্ত্ব এই নাটকের ক্রিয়াবিভাগের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত।

ডাকাতদলের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য ভুজঙ্গ ভূষণের কন্যা বিনতিকে পিস্তল ছোঁড়া শিক্ষাদান, জীবনবীমার চেক ভাঙানো টাকা বাড়ীতে রাখার সংবাদ শ্যামলের গোচরে আসা, শ্যামল-প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ডাকাত দলের ভুজঙ্গভূষণের বাড়ী আক্রমণ, ডাকাতদলের অন্যতম নেতা তথা বিনতির স্বামী সমীরের সঙ্গে বিনতির সাক্ষাৎ। ডাকাত স্বামীর সঙ্গে বিনতির স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগের (প্রথম অঙ্ক) ঘটনা অবলম্বনে নাট্যকাহিনীর সূচনা অংশ (exposition) গড়ে উঠেছে। এটি নাটকের প্রথম পর্যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ডাকাতদলের বিবিধ কার্যকলাপ, সেই দলে ছদ্মবেশে গজেন্দ্রের প্রবেশ ও কৌশলে পলায়ন, ডাকাতদলের পীরপুরের জমিদারবাড়ী আক্রমণের পরিকল্পনা, ছদ্মবেশী ভুজঙ্গভূষণের ডাকাতদলে আগমন ও বিনতিকে সেখানে আবিষ্কার করে তাকে ধিক্কার দানের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী অগ্রসর (rising action) হয়েছে। এটি দ্বিতীয় অঙ্ক জুড়ে বিস্তৃত।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে সংঘাত (clash)। ডাকাতদলের সদস্যা মণিকার পুলিশের কাছে ডাকাতদল সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য তার সঙ্গে মীনা ও সমীরের সংঘাত, হরবিলাসবাবুর পুত্র গৌরীশঙ্করের সঙ্গে মীনার সংঘাত, গুরুদেবের প্রতারণার সংবাদে মীনার প্রতিক্রিয়া প্রকাশের মধ্যে সংঘর্ষের আভাস, দীপালি-শ্যামলের পুলিশের কাছে জমিদার বাড়ী ডাকাতির সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে ডাকতদলের সঙ্গে উভয়ের সংঘাত-ই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই সংঘাত সম্পূর্ণ তৃতীয় অঙ্ক ও চতুর্থ অঙ্কের কিছুটা অংশ ধরে চলেছে।

চতুর্থ পর্যায়ে জমিদার বাড়ীতে ছদ্মবেশী পুত্র সমীরকে চিনতে না পেরে প্রদীপ্তর তাকে হত্যা, স্বামীর মৃত্যুতে বিনতির আত্মহত্যা এবং পুত্র ও পুত্রবধূর ভয়াবহ পরিণতিতে যন্ত্রণাদগ্ধ প্রদীপ্তর হাহাকারের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনীর চূড়ান্ত পর্যায় (climax) লক্ষ্য করা যায়। এটি চতুর্থ অঙ্কের প্রায় শেষ অংশে রয়েছে। নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি এখানেই ঘটেছে।

ক্ষুধা

এই নাটককে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে—প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ। প্রথমার্ধে দশটি দৃশ্য, দ্বিতীয়ার্ধে সাতটি দৃশ্য রয়েছে। এখানে দুটি বিরতি। প্রথমার্ধের পর একটি, দ্বিতীয়ার্ধের পর সমাপ্তি।

● ঘটনা-সংযোজন

তিনবন্ধু স্বদেশ গজেন, রমেন। স্বদেশ গজেন এক সময় বর্মায় থাকত। বর্মাতে বোমা পড়ায় তাদের পরিবারের সকলে মারা যায়। তারা দুজনে কোনক্রমে বেঁচে কলকাতায় আসে। রমেন খুলনার এক সম্পন্ন ঘরের ছেলে। দেশে দাঙ্গা শুরু হলে সকলকে হারিযে নিঃস্ব হয়ে কলকাতায় আসে। বছর খানেক ধরে বন্ধুত্রয় প্রাণপণে চাকুরির চেষ্টা করেও কোন কাজ পায় না। রমেন একজায়গায় গৃহশিক্ষকের কাজ করে সামান্য অর্থ উপার্জন করে। সেদিন স্বদেশ ও গজেন একটি পার্কে রমেনের জন্য অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পর রমেন এসে জানায়, তার ছাত্র বায়ু পরিবর্তনের জন্য বাইরে যাওয়ায় কিছুদিনের জন্য তার কাজ বন্ধ। ছাত্রের বাবা যাওয়ায় আগে সাত টাকা দিয়েছেন। রমেন সেই টাকা দিয়ে তার প্রেমিকা মানবীর জন্য একটি পড়ার বই কিনেছে। কারো হাতে টাকা নেই কিন্তু বাড়ী ভাড়া বাকি। বাড়ীওয়ালা জগৎ চৌধুরী (ইনি একটি সম্পূর্ণ বাড়ী ভাড়া নিয়ে আর্থিক সুবিধার জন্য তিনবন্ধুকে একটি ঘর ভাড়া দিয়েছেন) ভাড়ার টাকা না পেলে নিশ্চয় কটুবাক্য বর্ষণ করবেন—সেই আশঙ্কা করতে করতে তারা বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়। (প্রথমার্ধ—প্রথম দৃশ্য)

তিনবন্ধু বাড়ী ফিরলে জগৎবাবু নয়মাসের বাড়ী ভাড়া বাবদ অর্থ দিতে না পারার জন্য তাদের অপমানসূচক উক্তি করেন এবং দুঃখ করে জানান, একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হওয়ায় তিনি আর্থিক দুরবস্থা ঘোচাবার জন্য এদের উপ-ভাড়াটে করেছিলেন কিন্তু সেদিক থেকেও কোন সাহায্য পাচ্ছেন না। জগৎবাবু চলে গেলে তাঁর নাতনী মানবী রমেনকে গোপনে কিছু খাবার দিতে চাইলে রমেন তার অভুক্ত বন্ধুদের কথা চিন্তা করে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

পরদিন জগৎ চৌধুরী টাকার জন্য গজেন ও স্বদেশকে আবার অপমান করেন। মানবীর মা প্রভাবতী এদের দুরবস্থার জন্য কষ্ট পান। এক ফাঁকে মানবী রমেনকে হালুয়া খাওয়ায়। (তৃতীয় দৃশ্য)

রমেনের কাছ থেকে মানবীর হালুয়া খাওয়ানোর ঘটনা শুনে অন্য দুই বন্ধু দুজনের মধুর সম্পর্ক নিয়ে মজা করে। হঠাৎ জগৎ চৌধুরীর পুনরায় তিরস্কার লাভের আশঙ্কায় তিনবন্ধু ঠাট্টা তামাসা ত্যাগ করে বাড়ী থেকে পলায়ন করে। (চতুর্থ দৃশ্য)

এর কিছুক্ষণ পর জগৎ চৌধুরী পেনসনের টাকা নিতে বেরোতে যাচ্ছেন এমন সময় সেই বাড়ীর মালিকের সরকার মশাই বাড়ীভাড়ার টাকা চাইতে আসে। কথা প্রসঙ্গে ঘরে যুবতী মেয়ে থাকা সত্ত্বেও তিনটি যুবককে জগৎবাবু কেন ঘরভাড়া দিলেন—এই কুশ্রী ইঙ্গিত সে করলে জগৎবাবু তাকে ঘর থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। জগৎবাবু বেরিয়ে গেলে তিনবন্ধু ফিরে আসে। মানবী তাদের চা দিতে চাইলে প্রভা দারিদ্র্যের জ্বালায় বিরক্তি প্রকাশ করেন কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনটি অভুক্ত ছেলের কথা চিন্তা করে মানবীকে চা দেওয়ার অনুমতি দেন। (পঞ্চম দৃশ্য)।

তিনবন্ধু চাকুরীর চেষ্টা করে কোন আশার আলো দেখতে পায়না, স্বদেশ বলে, সে পথে একটি বিয়ের বাড়ী দেখেছে। সুতরাং সেই বিয়ের বাড়ীতে বরযাত্রী সেজে তারা সেদিনের মত ক্ষুধা মেটাবে। রমেন প্রথমে রাজী না হলেও দুইবন্ধুর বিশেষ অনুরোধে সে সেখানে যেতে সম্মত হয়। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

তিনবন্ধু সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে না আসায় প্রভার মন তাদের জন্য কেঁদে ওঠে। তারা সারাদিন অভুক্ত রয়েছে অনুমান করে তিনি মানবীকে একটু বেশী আটা মাখতে বলেন। ইতোমধ্যে ক্লান্ত জগৎবাবু ফিরে আসেন। পেনসনের টাকা নিতে অফিসে গেলে সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার বাড়ী ফিরতে দেরী হয়। সেই অবস্থায় প্রভা জগৎবাবুর উপর নির্ভরশীল পরিবারের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। (সপ্তম দৃশ্য)।

বিয়ের বাড়ী ভেবে তিনবন্ধু যে উৎসব বাড়ীতে উপস্থিত হয় সেখানে জন্মতিথি পালন করা হচ্ছিল। তাই তারা নিজেদের বরযাত্রী বলে পরিচয় দিলে ধরা পড়ে যায় এবং পরিণামে তাদের প্রহার লাভ হয়। (অষ্টম দৃশ্য)

প্রহৃত তিনবন্ধুকে রাস্তায় বের করে দিলে তারা বড়লোকের নিষ্ঠুর আচরণের জন্য খেদোক্তি করে। তিনবন্ধুর মধ্যে রমেনের ভাগ্যে বেশি প্রহার জোটে। (নবম দৃশ্য)

তিনজন বাড়ী ফিরে আসে। তারা মানবীকে সব ঘটনা জানায়। ইতোমধ্যে মানবীর বান্ধবী নিরালা তার বন্ধু মানসকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। সে পূর্বকথিত উৎসব বাড়ীতে গিয়েছিল। মানবী তিনবন্ধুর সঙ্গে নিরালার আলাপ করিয়ে দিলে সে তাদের চিনতে পারে। নিরালা চলে গেলে যে যার ঘরে শুতে যায়। দুইবন্ধু ঘুমিয়ে পড়লে রমেন উঠে পড়ে এবং মানবীর কাছে উপযুক্ত মানুষ হয়ে ফিরে আসার শপথ নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে। (দশম দৃশ্য)

মাতঙ্গী মাইকা মাইন্স-এর মালিক শ্যামল বাবু। তিনি রমেনকে রাস্তা থেকে নিয়ে এসে তার খনির কাজে নিযুক্ত করেন। রমেন আপনবুদ্ধি ও অধ্যাবসায় বলে মৃতপ্রায় খনির পুনর্জীবন ঘটায়। বর্তমানে সে সেই খনির জেনারেল ম্যানেজার। শ্যামলালবাবুর ইচ্ছা, তার মেয়ে অনসূয়ার সঙ্গে রমেনের বিবাহ হোক। এদিকে শ্যামলালবাবুর আত্মীয়া নিরলার মাধ্যমে তার প্রেমিক মানস সেই বিবাহ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। মানস নিরালাকে প্রলোভিত করে বলে, সে অনসূয়াকে বিবাহ করলে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হবে এবং সেই সম্পত্তি পেলে সে নিরালাকে নিয়ে সুখে জীবন ভোগ করতে পারবে। সে আরো জানায়, সে সেই ব্যাপারে কিছুটা কাজ এগিয়ে রেখেছে। সে মাতঙ্গী মাইকা মাইন্স-ওর কর্মচারী অজিতবাবুকে প্রভাবিত করে মানবীকে লেখা রমেনের চিঠি সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছে। মানস রমেনের বিরুদ্ধে শ্যামলালবাবুকেও উত্তেজিত করার

চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে শ্যামলালবাবুর কাছে মহেশ নামে এক ব্যক্তি একটি প্রয়োজনে আসে। শ্যামলালবাবু তাকে রমেনের কাছে যেতে বলেন। (দ্বিতীয়ার্ধ। প্রথম দৃশ্য)

এদিকে রমেন মানবীকে লেখা তার চিঠির উত্তর না পেয়ে চিন্তিত হয় এবং সেজন্য অজিতের গাফিলতি দায়ী বলে তার মনে হওয়ায় সে অজিতকে দোষারোপ করে। ইতোমধ্যে মহেশ আসে। তার শ্যামলালবাবুর কাছে বাড়ী মর্টগেজ রয়েছে। সে নির্দিষ্ট দিনে অর্থ দেওয়ার অক্ষমতা জানিয়ে রমেনের কাছে আরো ছয়মাস সময় চায়। মহেশ সেই ব্যক্তি যার মেয়ের জন্মতিথি উৎসবে স্বদেশ গজেন রমেন প্রহৃত হয়েছিল। রমেন তাকে দেখামাত্রই চিনতে পারে এবং সে তার আবেদন রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। সে স্পষ্টভাবে জানায়, মহেশের বাড়ীতে সে বেকার ছেলেদের আশ্রম করবে যাতে তারা কাজ শিখে দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারে। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

এদিকে স্বদেশ গজেন কোন চাকুরী না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মুটের কাজ নিয়েছে। তারা জগৎবাবুর পরিবারের সুখে দুঃখে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে। প্রায় আটমাস তারা রমেনের কোন চিঠি না পেয়ে খুব চিন্তিত, মানবী মর্মাহত। সেদিন মাতঙ্গী মাইকা মাইন্‌স থেকে একজন লোক রমেনের চিঠি নিয়ে আসে। চিঠি পেয়ে কিছু না পড়েই মানবী অভিমানে তা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। (তৃতীয় দৃশ্য)

মানবী সংসারের অভাব মেটাবার চেষ্টায় বারবার নিজের রক্ত বিক্রি করে টাকা রোজগার করে। সাধ্যাতিরিক্ত রক্ত দিতে দিতে একদিন সে রক্ত দেবার সময় জ্ঞান হারায়। (চতুর্থ দৃশ্য)

দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জগৎবাবুর কিছুটা মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়। অজ্ঞান মানবীকে বাড়ীতে আনা হলে সকলে সেদিন তার রক্ত দেওয়ার ঘটনা জানতে পারে। সেই অবস্থায় প্রভা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। (পঞ্চম দৃশ্য)

শ্যামলালবাবু নিরালার কাছ থেকে মানবী-রমেনের সম্পর্ক জানতে পেরে রমেনকে সে ব্যাপারে প্রশ্ন করলে রমেন জানায় সে মানবীকে ভালোবাসে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাকেই সে বিয়ে করতে চায়। শুধু তাই নয় সে সেই মুহূর্তে মানবী ও তার বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে চায়। শ্যামলালবাবু তাঁর প্রতি রমেনের অকৃতজ্ঞতার জন্য তাকে ধিক্কার দেন। (ষষ্ঠ দৃশ্য)

রমেন মানবী ও তার বন্ধুদের কাছে ফিরে আসে। দীর্ঘদিন পর তাকে ফিরে পেয়ে উত্তেজনায় মানবীর মৃত্যু হয়। (সপ্তম দৃশ্য)

- **বৃত্ত-গঠন**

এই নাটকে দুটি বৃত্ত।

অর্থনৈতিক কারণে রমেন ও মানবীর মিলন সম্ভবপর হয় না—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তের সহায়তায় এসেছে—

১. স্বদেশ-গজেন-উপকাহিনী

২. জগৎ চৌধুরী-প্রভাবতী-উপকাহিনী

৩. মহেশ-উপকাহিনী
৪. নিরালা-মানস-উপকাহিনী
৫. শ্যামলাল-অনসূয়া-উপকাহিনী

● অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্র

এই নাটকে কোন অবান্তর দৃশ্য নেই। তবে ষষ্ঠ দৃশ্যে স্বদেশ, গজেন ও রমেনের সঙ্গে গগন গড়াই-এর কথোপকথন অংশটি, নবমদৃশ্যে গগনের সঙ্গে ভিখারীর কথোপকথন নাট্যকাহিনীর অগ্রগতির সহায়তা করেনি।

এখানে ভিখারী চরিত্র অপ্রয়োজনীয়।

এই নাটকে ঘটনাবিন্যাসে কিছু অসংগতি আছে। স্বদেশ, গজেন ও রমেনের যে পারিবারিক পরিচয় রয়েছে তাতে এই ধরণের চরিত্র অনাহূত হয়ে অন্যের উৎসব বাড়ীতে খেতে যেতে পারে না—এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এই নাটকে বন্ধুত্রয় বিপরীত কাজ করেছে।

আবার শ্যামলালবাবুর রমেনকে রাস্তা থেকে তুলে এনে মাতঙ্গী মাইকা মাইন্‌স-এর দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করার ঘটনাও অনেকটা যুক্তিনির্ভর নয়।

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

John Howard Lawson-এর তত্ত্ব এখানে প্রযোজ্য।

প্রথম পর্যায়ে, স্বদেশ, গজেন ও রমেনের চাকুরীর চেষ্টা, তাদের আর্থিক চরম সঙ্কট, অনাহারে ক্লিষ্ট তিনবন্ধুর একটি ভোজবাড়ীতে অনাহূত গমন, ধৃত তিনবন্ধুর প্রহার লাভ, প্রেয়সী মানবীকে উপযুক্ত মানুষ হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অপমানিত, আত্মধিক্কৃত রমেনের গৃহত্যাগের (প্রথমার্ধ। দশমদৃশ্য) মধ্য দিয়ে সূচনা অংশ (exposition) গড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মাতঙ্গী মাইকা মাইন্‌স-এর জেনারেল ম্যানেজার রূপে রমেনের প্রতিষ্ঠা লাভ, মাইন্‌স-এর মালিক শ্যামলালবাবুর রমেনের সঙ্গে কন্যা অনসূয়ার বিবাহ দানের ইচ্ছা, অনসূয়ার আত্মীয়া নিরালার প্রেমিক মানসের অনসূয়াকে বিবাহের ইচ্ছায় অনসূয়া-রমেনের বিবাহ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেওয়ার পরিকল্পনার (দ্বিতীয়ার্ধ। প্রথম দৃশ্য) মধ্য দিয়ে নাট্য কাহিনীর অগ্রগতি (rising action) লক্ষিত হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে এসেছে অনেকগুলি সংঘাত (clash)। মানস ও অজিতের চক্রান্তে মানসী ও রমেনের পরস্পরের চিঠি পরস্পরের কাছে না পৌঁছনো, মহেশের বাড়ী মর্টগেজের ব্যাপারে মহেশের সঙ্গে রমেনের সংঘাত, রমেনের চিঠি না পাওয়ায় মানবীর মানসিক সংঘাত, মানবীর রক্তদানের খবরে প্রভাব সঙ্গে মানবীর সংঘাত, অনসূয়াকে বিবাহে অস্বীকৃতি জানালে রমেনের সঙ্গে শ্যামলালবাবুর সংঘাত হয়। এই সংঘাতের কাহিনী দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে শুরু করে ষষ্ঠ দৃশ্য পর্যন্ত চলেছে।

সপ্তম দৃশ্যে রমেনকে ফিরে পেয়ে দুর্বল অসুস্থ মানবীর তীব্র উত্তেজনায় হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যে নাট্যকাহিনীর চূড়ান্ত পর্যায় (climax) লক্ষ্য করা যায় এবং এরই সঙ্গে নাটকের সমাপ্তি নেমে আসে।

তোমার পতাকা

নাটকটির দুটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচ।

- **ঘটনা সংযোজন**

সে সময় দেশ ইংরেজের অধীন। ইংরেজের অধীনতা পাশ মুক্ত করার জন্য দেশের অধিকাংশ লোক একতাবদ্ধ হয়েছিল। এর মধ্যে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক ইংরেজদের সহায়তা করে দেশের ক্ষতিসাধন করছিল। সে সময় সারা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। জাপান প্রায় ভারতের দরজার কাছে চলে এসেছে। অনুকূল বিশ্বাস গান্ধীবাদী দেশপ্রেমিক নেতা। তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী স্বামীর আদর্শকে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করেন। পতির নির্দেশে তিনি অবসর সময়ে চরকা কাটেন। পুত্র আশিস ও কন্যা মায়া দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশী কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। একদিন ক্লান্ত অনুকূল সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরলেন, খাবার খেয়ে কিছুটা সুস্থির হলেন। হেমাঙ্গিনী বললেন, গ্রামের জমিদার মিঃ তালুকদারের বন্ধু পুলিশ সুপার মহীতোষ মজুমদার রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছেন। সেই গ্রামের বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য তিনি কলকাতা থেকে এখানে আসছেন। মিঃ তালুকদারও বন্ধুর উপাধি লাভে তাঁকে আপ্যায়ন করার জন্য সেই গ্রামে এসে পৌঁছেছেন এবং তিনি সেখানে কিছুদিন বাস করে আবার কলকাতায় ফিরে যাবেন। তিনি আরো জানান, তালুকদার-কন্যা ও আশিসের সহপাঠিনী স্বপ্না এসে বলে গেছে, আশিস যেন গান্ধী আশ্রমে যাওয়া বন্ধ করে, তা না হলে মহীতোষ মজুমদার তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। হেমাঙ্গিনী রাতের খাবার প্রস্তুত করতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে স্থানীয় ইন্সপেক্টর বিভূতি ভড় এসে বলেন, অনুকূলের ঘরে যত ধান চাল আছে তা যেন ইংরেজ ক্যাম্পে অবস্থিত ব্যক্তিদের (স্বদেশীদের শায়েস্তা করার জন্য যাদের গ্রামে প্রেরণ করা হয়েছে) জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অনুকূল বাধ্য হয়ে রাজী হলেন। বিভূতি যাওয়ার সময় অনুকূলের অন্তঃসত্ত্বা গাভীটিকেও নিয়ে গেলেন। অনুকূল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, হেমাঙ্গিনীর দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নামল (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)।

মিঃ তালুকদারের বাড়ীতে মহীতোষবাবু এলে বিভূতি ভড় জানান, তাঁর আদেশমত অনুকূল খুব শীঘ্র তাঁর কাছে আসছেন। অনুকূল এলে মহীতোষ আসন ছেড়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ও বলেন, অনুকূলের মত অহিংস দেশপ্রেমিকের কাছ থেকে কিছু

কথা শুনতে তিনি আগ্রহী। অনুকূল বলেন, তিনি তাদের দলকে দেশের সর্বাধিক লোকের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন এবং ইংরেজরা জননেতা ও জনতার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল বলে এই আন্দোলন শুরু হয়েছে। এমন সময় বাইরে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল এবং বাড়ীর বেহারা খবর দিল, পুলিশের অনুগত অনুচর বিশ্বম্ভর চক্রবর্তীকে কে যেন গুলি করেছে। সে সময় মিঃ তালকুদারের ম্যানেজারের পুত্র বিপুল ও বিপুলের মামাতো ভাই বিতান জানায়, স্বপ্নাকে বাড়ীতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

অনুকূলের বাড়ীতে জ্যোৎস্নালোকিত দাওয়ায় হেমাঙ্গিনী শুয়ে আছেন। এমন সময় আশিস আসে। সে মা'র কাছ থেকে জানতে পারে, অনুকূলকে বিশ্বম্ভর চক্রবর্তী তালুকদারের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে তালুকদারের বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। ঠিক তখনই মায়া ও স্বপ্না আসে। স্বপ্না আশিসকে অভিযোগ করে বলে, তাদের দল যে আদর্শ প্রচার করে, সেই আদর্শানুসারে কাজ করে না। কারণ মায়া অহিংস দলের সদস্যা হওয়া সত্ত্বেও হিংসাত্মক কাজ করেছে। মায়া জানায়, সে বিশ্বম্ভর চক্রবর্তীকে গুলি করেছে। কারণ সৈন্যদের লালসা তৃপ্ত করার জন্য বিশ্বম্ভর সেদিন গ্রামের অনেককে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে মেয়ে পাওয়ার চেষ্টা করেছে, শুধু তাই নয় এই কার্যসিদ্ধির মানসে সে গ্রামবাসীকে ভয় প্রদর্শনও করেছে। সে মায়াকেও সৈন্যদের কাছে যাওয়ার ঘৃণ্য প্রস্তাব দিয়েছিল। এসব শুনে স্বপ্না বলে, এই অপরাধে কোন ব্যক্তিকে খুন করবার অধিকার তার নেই। আশিস গর্বের সঙ্গে বলে, তার বোন একজন বিশ্বাসঘাতককে মেরে দেশপ্রেমিকের উপযুক্ত কাজ করেছে এবং স্বপ্নার মত রায়বাহাদুরের মেয়ের সে স্থানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়। ক্রুদ্ধ ও অপমানিত স্বপ্না অশ্রু সংবরণ করতে করতে ছুটে বেরিয়ে যায়। আশিসও বিশ্বম্ভর চক্রবর্তীর খবরাখবর নেবার জন্য বেরিয়ে পড়ে। মায়া অবসন্নভাবে সেখানে বসে পড়ে ও ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। হেমাঙ্গিনী তার পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, মায়া কোন অন্যায় কাজ করেনি, সুতরাং তার কোন মনোকষ্টের কারণ নেই, শুধু তাই নয় তিনি তাঁর কন্যার এমন মহৎ কাজের জন্য অন্তরে আনন্দ অনুভব করছেন। কিছুক্ষণপর অনুকূল এলেন। তিনি মায়াকে প্রশ্ন করে জানতে পারেন মায়া বিশু চক্রবর্তীকে গুলি করেছে। ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত অনুকূল তৎক্ষণাৎ মায়াকে থানায় আত্মসমর্পণ করতে বলেন। বাবার আদেশে সারাদিনের অভুক্ত মায়া থানার উদ্দেশে রওয়ানা হয়। (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

গান্ধী আশ্রমে সভা বসেছে। সেখানে নবীন নামে এক স্বদেশী যুবক জানায়, আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর তাদের নেতা অনুকূল বিশ্বাসের নেতৃত্বে ইংরেজের আদালত ও কালেক্টর দখল করতে হবে। ইতোমধ্যে মায়া আসে। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন মায়া সেখানে এসেই জ্ঞান হারায়। এমন সময় সন্তোষ নামে এক সদস্য খবর দেয়, বিভূতি ভড় পুলিশ নিয়ে আশ্রমের দিকে আসছেন এবং আশিস বলে পাঠিয়েছে সকলে যেন গ্রামের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করে ও পরদিন সেখান থেকে দলবদ্ধ হয়ে সদরের দিকে রওয়ানা হয়। সকলে চলে যায়। কেবল নবীন ও রাখাল মূর্ছিতা মায়ার জন্য থেকে যায়। কিছুক্ষণ পর বিভূতি ভড় স্বপ্নাকে নিয়ে প্রবেশ করেন। স্বপ্না বিশু চক্রবর্তীর আক্রমণকারী বলে মায়াকে দেখিয়ে দেয়। সে সময় মূর্ছিতা মায়ার জ্ঞান ফিরে আসে। সে বিভূতির মুখ থেকে জানতে পারে তার গুলিতে বিশু চক্রবর্তী মারা যায়নি। একটি ব্যর্থতার বেদনায় মায়া স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। রাখাল নবীন ও মায়াকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

এদিকে অনুকূলকে মহীতোষ মিঃ তালুকদারের বাড়ীতে ডেকে পাঠিয়েছেন। অনুকূল মহীতোষকে জানান, তিনি বিশু চক্রবর্তীকে গুলি করার অপরাধে তাঁর কন্যা মায়াকে থানায় আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন। মহীতোষ অনুকূলকে প্রশ্ন করেন, আগামীকাল সদর আক্রমণের পরিকল্পনা আছে কিনা। অনুকূল উত্তর দেন, আক্রমণ নয়, অধিকারের ইচ্ছা আছে। তিনি আরো বলেন, তাঁদের অভিযানে আশেপাশের বহুগ্রামের লোক যোগ দিচ্ছেন। দলনেতা অনুকূল যাতে এই অভিযানে নেতৃত্ব দিতে না পারেন সেজন্য মহীতোষ তাঁকে মিঃ তালুকদারের বাড়ীতে আটক রাখতে নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ পর বিভূতি এসে তালুকদারের বাড়ীতে অবস্থিত বিপলুকে গ্রেপ্তার করেন কারণ তালুকদারের বাগানের বাইরে যে পিস্তল পাওয়া গেছে তা বিপুলের বাবার পিস্তল। মহীতোষবাবু অনুকূলের কাছ থেকে খবর পাওয়ার জন্য অনুকূলকে ডেকে পাঠান। তিনি এলে মহীতোষ বলেন, তাঁর ধারণা গ্রামে অনেক বন্দুক, পিস্তল লুকোনো আছে। অনুকূলের সাহায্য পেলে তিনি সেগুলি উদ্ধার করতে পারেন। অনুকূল বলেন, তিনি এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবেন না। তিনি মহীতোষকে দেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ হয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করেন। মহীতোষ বলেন, তিনি অনুকূলের সহযোগিতা না পেলে ক্যাপ্টেন ব্লিকের নিষ্ঠুর সৈন্যবাহিনীকে পাঠিয়ে দেবেন গ্রামের লোকের উপর অত্যাচার করার জন্য। এইভাবে তিনি বিপ্লবের আগুনকে নেভাতে বদ্ধপরিপক। তিনি অনুকূলকে থানায় বন্দী করে রাখার নির্দেশ দেন এবং বিভূতিকে পাঠান ক্যাপ্টেন ব্লিককে খবর দেওয়ার জন্য। বিভূতি অনুকূলকে নিয়ে চলে গেলে দুজন মুখোসপরা যুবক পিস্তল দেখিয়ে মহীতোষকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। (প্রথম অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য)

থানার মধ্যে মায়া বসে আছে। অনুকূলকে নিয়ে বিভূতি সেখানে ঢুকলেন। অনুকূলকে দেখে মায়া বাবা বলে ডেকে ওঠে। অনুকূল সে ডাক অগ্রাহ্য করে হাজতঘরের দিকে এগিয়ে যান। (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

খাবার টেবিলে স্বপ্নাকে সেদিন খুব অন্যমনস্ক ও গম্ভীর দেখায়। তার মা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, দেশ স্বাধীন হলে তাদের মত পরিবার যারা বড় বড় খেতাব পাওয়ার স্বপ্নে ইংরেজদের প্রশ্রয় দিচ্ছে, ভবিষ্যতে দেশের কাছ থেকে তারা কুকুরের মত ব্যবহার পাবে। আর পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে ইংরেজের পরাজয় নিশ্চিত। দেশপ্রেমিকরা যেভাবে হাতে একটাও লাঠি না নিয়ে বুক পেতে মানসিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছে তাতেই মনে হয় তারা জয়ী হবেই। মিঃ তালুকদার এসে খবর দিলেন, দুটি যুবক মহীতোষকে পিস্তল দেখিয়ে কোথায় যেন নিয়ে গেছে। (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

গ্রামের বাইরে একটি পোড়ো বাড়ীর মধ্যে সন্তোষ ও নবীন মহীতোষকে নিয়ে প্রবেশ করল। সেখানে হাত পা শক্ত করে বাঁধা অবস্থায় বিভূতিকে দেখা গেল। মহীতোষ জানতে পারেন, যে ছেলেদের থানায় ধরে রাখা হয়েছিল তাদের বিপ্লবী ছেলেরা মুক্ত করে এনেছে, কেবল অনুকূল তাদের সঙ্গে আসতে রাজী হননি। মহীতোষ বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ একটি কাগজে অনুকূলের মুক্তির আদেশ লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। বিশু চক্রবর্তীর পা দুটো ভেঙ্গে তাকেও সেস্থানে রাখা হয়েছে। আশিস এসে জানায়, মহীতোষ ও বিভূতির খাওয়া হয়ে গেলে তাঁদের ঘরে বন্ধ করে রাখা হবে যাতে বিপ্লবীদল নির্বিঘ্নে ভোর রাতে সদর টাউনে পৌঁছতে পারে। মহীতোষ এইব যুবকদের কর্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, তারা যেন জয়ী হয়ে ফিরে আসে। দুজনকে বেঁধে রেখে যুবকদল বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর অনুকূল এলেন।

তিনি এঁদের বাঁধন খুলে দিলেন। তিনি বিশুকে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। মুক্ত হয়ে বিভূতি ছুটলেন নন্দীগ্রামে বিপ্লবীদের বাধাদানের ব্যবস্থা করতে। অনুকূল মহীতোষকে চলে যেতে বললে মহীতোষ বললেন, যারা তাঁকে বেঁধে রেখে গেছে তারা তাঁকে মুক্ত না করলে তিনি কোথাও যাবেন না। (দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)

আশিস যাত্রার পূর্বে বাড়ীতে তার অনুচরকে নির্দেশ দেয়, সদর দখল করার সময় কারো হাতে যেন কোন অস্ত্র না থাকে। তাদের মূল লক্ষ্য সেখানে ইউনিয়ন জ্যাক সরিয়ে জাতীয় পতাকা স্থাপন করা। প্রতিপক্ষ গুলি করবেই কিন্তু পতাকাবাহী গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে যেন অন্যের হাতে পতাকা তুলে দেয় বা অন্য একজন এসে সেই পতাকা তুলে নেয়। বিপ্লবীদল যখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত সেই সময় বিপুল এসে সে দলে যোগ দেয়। অনুকূল সে সময় বাড়ী আসেন। তিনিও যাবার জন্য প্রস্তুত হন। আশিস বলে, মা'র কাছে বাবার থাকা প্রয়োজন। কিন্তু হেমাঙ্গিনী তাতে রাজী হন না। তিনি বলেন এত বড় কাজে তাঁর স্বামীর যাওয়া প্রয়োজন। অনুকল যাওযাব আগে হেমাঙ্গিনীকে বলেন, যদি তাঁরা কেউ আর না ফেবেন তবে চরকা আর তুলো রইল ; আব রইল আশ্রম, সেখানে তাঁর অন্নসংস্থান হয়ে যাবে। (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

কালেক্টরির সামনের মাঠে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদলের সংঘর্ষে অনেকে নিহত ও আহত হয়। মাযার বুকে গুলি লাগায় তার সেখানেই মৃত্যু হয়। অনুকূল মৃত মেয়ের সামনে চুপ করে বসে থাকেন। বিপুল ত্রিবর্ণ পতাকা নিয়ে এগিয়ে আসে, তার পাযে গুলি লাগে। সে পড়ে যাওয়ার আগে আশিসের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেয়। আশিসকে গুলি করলে সে পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে পতাকা তুলে ধরলে হেমাঙ্গিনী কোথা থেকে ছুটে এসে সে পতাকা তুলে নেন। এরপর তাঁর উপর গুলি চলে। প্রথমে তাঁর ডানবাহুতে গুলি লাগে, তবুও তিনি এগিয়ে যান। তারপর বুকে গুলি লাগলে তিনি পড়ে যান, কিন্তু তিনি পতাকা উঁচু করে ধরে থাকেন। তিনি সেই অবস্থায় চিৎকাব করে সকলকে পতাকা ধরার জন্য আহ্বান জানান। হঠাৎ সেখানে স্বপ্না ছুটে আসে এবং পতাকা তুলে ধরে। স্বপ্নাকে বিভূতি বাধা দেন, সে সেই বাধা অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হলে বিভূতি গুলি করতে যান কিন্তু মহীতোষ বারণ করেন। পতাকা হাতে স্বপ্না বলে ওঠে 'বন্দে মাতরম্', । সঙ্গে সঙ্গে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয 'বন্দে মাতরম্'। স্বপ্না কালেক্টরির মাথায় ভারতীয় পতাকা স্থাপন করে। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। (দ্বিতীয় অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য)

- **বৃত্ত-গঠন**

এই নাটকের দুটি বৃত্ত।

অনুকূল বিশ্বাসের অহিংস দেশপ্রেম অধিকাংশ গ্রামবাসী এমন কি ইংরেজ অনুগ্রহপুষ্ট অনেক ব্যক্তিকে স্বাদেশিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলে—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তের সঙ্গে এসেছে নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক বৃত্ত—

(ক) হেমাঙ্গিনী-আশিস-মায়া-উপকাহিনী

(খ) বিভূতি ভড়-বিশ্বম্ভর চক্রবর্তী-মহীতোষ মজুমদার-উপকাহিনী

(গ) বিপুল-স্বপ্না-মিঃ তালুকদার-মিসেস তালুকদার-উপকাহিনী।

● অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্র

এই নাটকে কোন অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য বা চরিত্র নেই।

কিন্তু নাট্যকাহিনীব শেষে নাট্যকার কাল্পনিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা চালু হলেও ইংরেজ সরকারের লোক দ্বারা সংরক্ষিত সরকারী কালেক্টরীতে ভারতের জাতীয় পতাকা স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। উক্ত নাটকে জাতীয় পতাকা স্থাপনের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের মনের বিশেষ বাসনা-ই রূপায়িত হযেছে মাত্র।

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

John Howard Lawson-এর নাট্যতত্ত্ব এই নাটকের নাট্যক্রিয়া বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

গান্ধীবাদী নেতা অনুকূল বিশ্বাসের নেতৃত্বে একদল দেশপ্রেমিকের ইংরেজের শাসনপাশ মুক্ত হওযার চেষ্টা, অন্যদিকে ইংরেজ অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিদের এর বিরুদ্ধাচরণের (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য) দ্বাবা এই নাটকের সূচনা অংশ (exposition) গড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় পর্যাযে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করাব জন্য মহীতোষ মজুমদারের গ্রামে আগমন, তাঁকে সাহায্য করার জন্য বিভূতি ভড ও বিশ্বম্ভরের ভূমিকা, অনুকূলের ঘরের ধান চাল এবং অন্তঃসত্ত্বা গাভীকে জোর করে নিয়ে যাওয়া (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য), অনুকূল ও মহীতোষ সাক্ষাতের (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য) মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি হযেছে। (rising action)।

স্বপ্নার বিশ্বম্ভর চক্রবর্তীকে গুলি (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), হিংসার আশ্রয় নেওয়ায় স্বপ্নাকে অহিংস আদর্শে বিশ্বাসী অনুকূলের ভর্ৎসনা ও পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের আদেশ (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য), গান্ধী আশ্রমে প্রবেশ করে বিভূতির রাখাল, নবীন ও মানবকে থানায় নিয়ে যাওয়া (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য), বিভূতি ও বিপুলের পরস্পরের প্রতি কটূক্তি, দুজন যুবকের পিস্তল দেখিয়ে মহীতোষকে নিয়ে যাওয়া (প্রথম অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য), থানায় অনুকূলের মায়াকে অগ্রাহ্য করা (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য), বিপ্লবীদল কর্তৃক সংগ্রামের রূপ দেখে স্বপ্নার মানসিক সংঘাত (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), বিশ্বম্ভর চক্রবর্তীর পা দুটো ভেঙ্গে দেওয়া, বিপ্লবী দল কর্তৃক আবদ্ধ বিভূতি, বিশ্বম্ভরকে অনুকূলের মুক্তিদান ও মুক্ত বিভূতির নন্দীগ্রামে বিপ্লবীদের বাধাদানের ইচ্ছায় দ্রুতগমনের (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য) মাধ্যমে সংঘাতের (clash) রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটি নাটকের তৃতীয় পর্যায়।

ইংরেজ কালেক্টরী দখল করার জন্য বিপ্লবীদের সেখানে গমন (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য), তাদের বাধাদানের জন্য প্রথমে সরকারী তৎপরতা, পরে মহীতোষের নির্দেশে স্বপ্নাকে বাধা না দেওয়া এবং কালেক্টরীর মাথায় জাতীয় পতাকা স্থাপনে (দ্বিতীয় অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য) নাট্যক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ (climax) সংঘটিত হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে নাটকের পরিণতি বা সমাপ্তি ঘটেছে।

মন্দাক্রান্তা/জয়-পরাজয়

দুটি দৃশ্য নিয়ে নাটকটি রচিত হয়েছে। দুটি দৃশ্যের মাঝে একবার বিশ্রাম যবনিকা পড়েছে।

● ঘটনা-সংযোজন

সৌমিত্র পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ দীপ্তি থিয়েটারের নাট্যপরিচালক। তার স্ত্রী মন্দাকিনী সুন্দরী যুবতী। স্বামী অধিকাংশ সময় থিয়েটার নিয়ে ব্যস্ত থাকে বলে সে তাকে খুব অল্প সময়ের জন্যে পায়। সেজন্য তার মনে ধীরে ধীরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে সৌমিত্র 'জয় পরাজয়' নামে একটি নাটক পরিচালনায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় চারদিন বাড়ী আসতে পারেনি। তার ব্যস্ততার অন্যতম কারণ নাটকটি পরের দিন মঞ্চস্থ হবে। চতুর্থ দিন মন্দাকিনী অনেক চেষ্টা করেও স্বামীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে না পারায় প্রচন্ড রাগে ফেটে পড়ে। মন্দার ছোটবোন অম্বা কলেজে পড়াশুনো করার জন্য মন্দার বাড়ীতে থাকে। মন্দা অম্বাকে বলে, সে এমন কিছু কাজ করতে চায় যাতে সৌমিত্র তার প্রতি অবহেলাব প্রতিফল পায়। এভাবে মনের উপর চাপের সৃষ্টি হওয়ায় মন্দাকিনী অসুস্থ হয়ে পড়ে। সৌমিত্রর সহপাঠীবন্ধু নীলাদ্রি পিতৃমাতৃহীন হবার পর সৌমিত্রর বাড়ীতে মানুষ হয়। সে সেখানে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করছে। স্বামীর মনকে গৃহমুখী করার জন্য মন্দা নীলাদ্রির সঙ্গে গৃহত্যাগ করা স্থির করে এবং সে ব্যাপারে নীলাদ্রির সাহায্য প্রার্থনা করে। নীলাদ্রি সম্মত হয়। সেদিন রাতে সৌমিত্র বাড়ী ফেরে এবং মন্দাকিনীর অসুস্থতার খবর জানতে পারে কিন্তু বাড়ীতে থিয়েটার সংক্রান্ত নানা কাজে জড়িয়ে পড়ায় মন্দাকিনীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারে না। অভিমানী মন্দাকিনী সেজন্য অত্যন্ত আহত হয়। পরের দিন 'জয় পরাজয়' নাটকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সৌমিত্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু যাত্রাকালে সে মন্দাকিনীর কাছ থেকে জানতে পারে, মন্দাকিনী তাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করে নীলাদ্রির সঙ্গে তার নৃতন কর্মস্থল দুর্গাপুরে চলে যাচ্ছে। সেই অপ্র্যাশিত ঘটনায় সৌমিত্র স্তব্ধ হয়ে যায়। (প্রথম দৃশ্য)

এরপর দেড় বছর কেটে যায়। মন্দাকিনী চলে যাওয়ায় সৌমিত্র মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অম্বা সৌমিত্রকে দেখাশোনা করার জন্য সে বাড়ীতে থেকে যায়। সে সৌমিত্রকে ভালোবাসে কিন্তু তা প্রকাশ করতে না পারায় মনে মনে কষ্ট পায়। সঙ্গে রয়েছে বাড়ীর পুরোনো চাকর বিনোদ। এদিকে 'জয় পরাজয়' নাটক উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। তিনশততম রজনী উপলক্ষে আগামী সরস্বতী পুজোর ভাসানের দিন জাঁকজমকের সঙ্গে সেটি মঞ্চস্থ হবে এবং সেদিন মঞ্চের অভিনেতা, অভিনেত্রী ও পরিচালককে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে মঞ্চের মালিক হরিহর শর্মা সৌমিত্রকে জানায়। সৌমিত্র সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে বলে সম্মতি দেয়। দীর্ঘ দেড় বছর পর

সেদিন নীলাদ্রি সৌমিত্রর কাছে আসে। সে তাকে মন্দাকিনীর একটা চিঠি দেয়। চিঠি পড়ে সৌমিত্র জানতে পারে, মন্দাকিনী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিকিৎসাবাবদ তাকে তিনশত টাকা ধার করতে হয়েছিল। সে টাকা শোধ করার মত নীলাদ্রির আর্থিক সংগতি নেই। তাই সৌমিত্র অর্থ দিলে তার বিশেষ উপকার হয়। অম্বা সে কথা জানতে পেরে নীলাদ্রির সামনে নীলাদ্রি ও মন্দাকিনীর ব্যবহার নিয়ে কটূক্তি করে ও অর্থ দিতে সৌমিত্রকে নিষেধ করে কিন্তু সৌমিত্রর অনুরোধে সে শেষ পর্যন্ত অর্থ দেয়। সৌমিত্রর মহত্বে নীলাদ্রির মাথা হেঁট হয়ে যায়। পনের দিন পরের ঘটনা। সেদিন সরস্বতী পুজোর ভাসান। দুপুরে নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। সৌমিত্র যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। সে সময় তাদের ডাক্তার বন্ধু শেখর এসে জানায়, নীলাদ্রি গতকাল আত্মহত্যা করেছে এবং আত্মহত্যা করার আগে একটা চিঠিতে শেখরকে জানিয়েছে যে সে আত্মগ্লানিতে জীবন বিসর্জন দিচ্ছে এবং অনুরোধ করেছে, অপাপবিদ্ধা মন্দাকে সৌমিত্র যেন পুনরায় গ্রহণ করে। নীলাদ্রির মৃত্যুতে সৌমিত্র গভীর আঘাত পায়। শেখর মর্গে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মন্দাকিনী আসে। সে সৌমিত্রর কাছে নীলাদ্রির খবর জানতে চায়। সে বলে, নীলাদ্রি চুক্তিভঙ্গ করে তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়, তারপর তার আর কোন সংবাদ নেই। ইতোমধ্যে শেখর ফিরে এসে মন্দাকে নীলাদ্রির আত্মহত্যার খবর জানায়। সেই খবরে উদভ্রান্ত মন্দা আবার দুর্গাপুরে ফিরে যেতে চায়। কারণ সে জানে স্বামীর ঘর তার কাছে চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। শেখর মন্দাকে বাধা দেয়। সৌমিত্রও তাকে তার কাছে থাকাব জন্য অনুরোধ করে কারণ সে জানে তাকে কাছে পাবার জন্যই মন্দা সর্বনাশের খেলায় মেতেছিল। সামনে বসে থাকে মন্দা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, সৌমিত্রর চোখ দিয়েও নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়ে। দূরে বিসর্জনের ঢাকের শব্দ শোনা যায়। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

- **বৃত্ত-গঠন**

এখানে দুটি বৃত্ত রয়েছে। মন্দাকিনী স্বামী সৌমিত্রর প্রেমে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে অভিমানে স্বামী-বন্ধু নীলাদ্রির সঙ্গে গৃহত্যাগ করলে পরিণামে গভীর যন্ত্রণা ও দুঃখ লাভ করে—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তের সহায়ক রূপে অম্বার প্রাসঙ্গিক বৃত্ত এসেছে।

- **অপ্রয়োজনীয় অংশ**

প্রথম দৃশ্যে সৌমিত্রর বাড়ীতে নীলাদ্রির সঙ্গে থিয়েটারের কর্মী শ্রীনাথের কথোপকথন, দ্বিতীয় দৃশ্যে সৌমিত্রর সঙ্গে মণিময় ও বাসবী নামে দুই তরুণ তরুণীর কথোপকথন অংশটি নাট্যক্রিয়ার সহায়ক হয়নি। ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন—"অতিরিক্ত যে চরিত্রটি 'বাসবী' নামে পরিচিতা, সেটি অনায়াসেই বাদ দেওয়া যেতে পারে মণিময় শুদ্ধ।"

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

Lewis campbcll-কৃত অধিবৃত্ত (parabola) গঠনরীতি উক্ত নাটকে প্রযোজ্য।

নাট্য পরিচালক স্বামী সৌমিত্রর থিয়েটার নিয়ে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকা এবং স্বামী-সঙ্গ বঞ্চিতা স্ত্রী মন্দাকিনীর সৌমিত্রকে গৃহমুখী করার ইচ্ছায় কিছুদিনের জন্য স্বামী-গৃহ ত্যাগ করার সংকল্পের মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার সূচনা (opening) লক্ষ্য করা যায়। এই ঘটনা নাটকের প্রথম দৃশ্যের প্রথমাংশে পরিবেশিত হয়েছে।

প্রথম দৃশ্যেই মন্দাকিনীর গৃহত্যাগের সংকল্পকে কার্যকরী করার জন্য সৌমিত্রর বন্ধু নীলাদ্রির সহায়তা ও সমর্থন লাভ, বাড়ীতে থিয়েটার সংক্রান্ত নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সৌমিত্রর মন্দাকিনীর প্রতি অনিচ্ছাকৃত উদাসীনতা প্রদর্শন, ফলে মন্দার অভিমান এবং শেষ পর্যন্ত নীলাদ্রির সঙ্গে গৃহত্যাগ, দ্বিতীয় দৃশ্যে গৃহত্যাগের দেড বছর পর নীলাদ্রির সৌমিত্রর কাছে আগমন, অম্বার কটূক্তি ও সৌমিত্রর উদারতায় নীলাদ্রির আত্মগ্লানি—এ সব ঘটনার দ্বারা নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ চূড়ান্ত পর্যায়েব দিকে এগিয়ে যাওয়ায় কাহিনী ঊর্ধ্বমুখী (climax) হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে মন্দা কর্তৃক নীলাদ্রির বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, নীলাদ্রির আত্মহত্যার ঘটনায় নাট্যকাহিনী চূড়ান্ত পর্যায়ে (acme) পৌঁছেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে নীলাদ্রির আত্মহত্যার সংবাদে সৌমিত্রব শোক ও মন্দার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থার মাধ্যমে নাট্য ঘটনা চতুর্থ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এখানে কাহিনী সুস্পষ্ট পরিণতিমুখী (sequel) হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষ পর্যায়ে মন্দাকিনী ও সৌমিত্রর মিলনের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী ফলপরিণতি (close) লাভ করেছে।

অতএব

এই নাটকটি অঙ্ক-দৃশ্য সমন্বিত। এখানে দুটি অঙ্ক, প্রথম অঙ্কে সাতটি দৃশ্য দ্বিতীয় অঙ্কে সাতটি দৃশ্য রয়েছে।

● ঘটনা সংযোজন

সতীগড়ের জমিদার দোলগোবিন্দ চৌধুরী, বয়স পঞ্চাশ। সম্প্রতি তিনি বিবাহেচ্ছু, পাত্রী দেখেছেন ও তাঁর পাত্রী পছন্দ হয়েছে। পাত্রী অমিতার বয়স কুড়ি, সে সুন্দরী। দোলগোবিন্দের এক ভ্রাতুষ্পুত্র আছে। সে দোলগোবিন্দর কাছে বড় হয়েছে। বর্তমানে সে দিল্লীতে কিছুদিন থাকার নাম করে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোলগোবিন্দর

ধারণা সে কাজের নাম করে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। তাই তিনি তার ওপর বিরক্ত। যাইহোক দোলগোবিন্দ বিবাহের পূর্বে পাত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য তাকে একটি হোটেলে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। (১ম অঙ্ক। ১ম দৃশ্য)

স্বপনপুর কলেজের হস্টেলে অমিতা ও তার মাসতুত বোন নয়ন থাকে। হস্টেলের ওয়েটিং রুমে প্রেমিক সুমিত্র এসে অমিতাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে। নয়ন তাদের অভিভাবিকা মাসী হেমাঙ্গিনীর গলা নকল করে তাদের নির্লজ্জ আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করতে থাকে। অমিতা ও সুমিত্র নয়নের বিপরীতে পেছন ফিরে থাকায় নয়নকে দেখতে না পেয়ে তাকেই হেমাঙ্গিনী ভেবে আত্মরক্ষামানসে নানারকম যুক্তি দেখাতে থাকে। ইতোমধ্যে মোটর হর্ণের শব্দ শুনে সুমিত্র ভয় পেয়ে টেবিল ক্লথে ঢাকা টেবিলের তলায় লুকোয়। হেমাঙ্গিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। নয়ন ও অমিতা তাকে নানা কথার কৌশলে প্রভাবিত করতে থাকে এবং সেই অবসরে সুমিত্র পলায়ন করে। সুমিত্র পলায়নের পর অমিতা নয়ন খিল খিল করে হেসে ওঠে এবং হেমাঙ্গিনী কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

পান্থসেবা হোটেলে দোলগোবিন্দ ও হেমাঙ্গিনী রয়েছেন। সেদিন অমিতা ও নয়নকে সেই হোটেলে আনতে হেমাঙ্গিনী স্বপনপুরে গেছেন। একই দিনে সুমিত্র তার বন্ধু কালাচাঁদকে নিয়ে সেই হোটেলে উপস্থিত হয়। (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

হেমাঙ্গিনী নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে তার বোনঝি অমিতা ও নয়নসহ হোটেলে পৌঁছলেন। উদ্বিগ্ন দোলগোবিন্দকে হেমাঙ্গিনী বললেন, অমিতাকে তার বান্ধবীর বিদায় অভিনন্দন জানাতে তার দেরী হয়ে গেল। দোলগোবিন্দকে খুশি করার জন্য তিনি বললেন, অমিতা শুধু দোলগোবিন্দর প্রশংসায় মুখর। দোলগোবিন্দ তাঁর সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, তিনি যদি অমিতাকে বিবাহে রাজী করাতে পারেন তবে অমিতা পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনা পাবে এবং সংসার গুছিয়ে দেবার জন্য ছয়মাস ধরে মাসিক এক হাজার টাকা করে হেমাঙ্গিনীকে দেওয়া হবে। হেমাঙ্গিনী তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, অমিতার সঙ্গে অন্য কোন পাত্রের তিনি কিছুতেই বিবাহ দেবেন না। আনন্দে দোলগোবিন্দ তাঁর সেক্রেটারী চৈতনকে সেই সংবাদ পরিবেশন করলেন। (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

অমিতা নয়নকে বলছে, সে বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে। তার মাসী শত্রুতা করে দোলগোবিন্দর মত এক মিশরের মমীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন। হেমাঙ্গিনী এসে সব শুনে দোলগোবিন্দর মত ধনী ব্যক্তিকে বিবাহ করতে অসম্মতি জানাবার জন্য অমিতাকে ধিক্কার দিলেন এবং অমিতার মনোবিকারের পেছনে নয়নের হাত আছে বলে নয়নকে দায়ী করলেন। বিরক্ত হেমাঙ্গিনী চলে গেলে হোটেলে অবস্থানকারী অনন্তচরণ মাইতি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। নয়ন দোলগোবিন্দকে জব্দ করার জন্য তাঁর সাহায্য চায়। এদিকে চৈতন তাদের ঘরে ফল নিয়ে আসে এবং কথাপ্রসঙ্গে নয়নকে সে যে ভালোবেসে ফেলেছে সে কথা জানায়। নয়ন বুঝতে পারে চৈতনকে দিয়ে তাদের কার্যসিদ্ধি হতে পারে। সেজন্য সে তাকে কিছুটা প্রশ্রয় দেয়। চৈতন চলে গেলে হেমাঙ্গিনী দোলগোবিন্দর সঙ্গে দেখা করার জন্য অমিতাকে প্রস্তুত হতে বললেন। (প্রথম অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য)

দোলগোবিন্দকে চৈতন এসে জানায়, সে নয়নের প্রেমে পড়েছে। দোলগোবিন্দ বললেন, তাঁর বিয়ে হয়ে গেলে তিনি চৈতনের ব্যাপারটা নিয়ে ভাববেন। দোলগোবিন্দ ঘরে একা বসে আছেন। অনন্তচরণ সেখানে প্রবেশ করে দোলগোবিন্দের মত পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি যে অল্পবয়সী একটি মেয়ের পাণিগ্রহণে উদ্যত হয়েছেন সে কথা বলে তাঁকে ধিক্কার দেন। ক্রুদ্ধ দোলগোবিন্দ তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেন। কিন্তু সেই ঘটনায় তিনি এত মর্মাহত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন যে হেমাঙ্গিনীকে ডেকে তৎক্ষণাৎ হোটেল ত্যাগ করার কথা বলেন। পরমুহূর্তে তিনি মত পবিবর্তন কবে বলেন, অমিতাব মত জানার জন্য একবার অমিতার সঙ্গে কথা বলতে চান। এরপর তিনি চৈতনকে নির্দেশ দেন, তাঁর সঙ্গে যেন কেউ সাক্ষাৎ না করে। (প্রথম অঙ্ক। ষষ্ঠ দৃশ্য)

সুমিত্র কালাচাঁদকে বলে, রাত সাড়ে দশটা এগারটার মধ্যে সেদিন অমিতার সঙ্গে তার দেখা করা প্রয়োজন কারণ তার সঙ্গে আলোচনা করে সে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। শুধু তাই নয় রাত বারটায় অমিতাব বিবাহেচ্ছু বৃদ্ধকে খুন করতে হবে এবং হেমাঙ্গিনী দেবী যদি অমিতার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে রাজী না হন তবে তাকে অজ্ঞান করে অমিতাকে নিয়ে পালাবে। আর সে সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কালাচাঁদ ও নয়নের সাহায্য প্রয়োজন। সেই কারণে সে কালচাঁদেব মাধ্যমে নযনকে ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু নযন আসতে দেরী করায় সুমিত্র অস্থির হয়ে উঠেছে। সুমিত্রর অস্থিরতা দেখে কালাচাঁদ সান্ত্বনা দিয়ে বলে, নয়ন আসবেই কারণ সে নয়নের মনের খবর জানে। নয়ন ও তার মধ্যে যে একটা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কথাপ্রসঙ্গে সেকথা কালাচাঁদ জানায়। কিছুক্ষণ পর নয়ন আসে এবং সুমিত্রর পরিকল্পনার কথা শুনে বলে, সেদিন রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক অমিতার সঙ্গে দেখা করছেন। সুতরাং সুমিত্রর পরিকল্পনা সম্ভবত সফলকাম হবে না। (প্রথম অঙ্ক। সপ্তম দৃশ্য)

চৈতন নয়নকে সংবাদ দেয, দোলগোবিন্দবাবু পরদিন সকালে সতীগড়ে ফিরে যেতে চান এবং সে ব্যাপারে হেমাঙ্গিনীদেবীও রাজী হয়েছেন। নযন চৈতনকে বলে, সেদিন যাতে দোলগোবিন্দবাবু সতীগড়ে না যেতে পারেন তাব ব্যবস্থা কবতে হবে। চৈতন চলে গেলে কালাচাঁদ এসে জানায় পরদিন রাতে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে খুন করে সুমিত্র অমিতাকে নিয়ে পলায়ন করবে। নয়ন বলে, পরদিন সকালেই সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক হোটেল ত্যাগ করবেন। সেই ভদ্রলোকের সেদিন যাওয়া বন্ধ করার জন্য কালাচাঁদ নয়নকে অনুরোধ করে। নয়ন সে দায়িত্ব নিতে রাজী হয়। সে সময় দোলগোবিন্দ ও হেমাঙ্গিনীকে দূর থেকে আসতে দেখে তারা সেখান থেকে সরে যায়। দোলগোবিন্দ হেমাঙ্গিনীকে বললেন, সতীগড়ে পৌঁছেই বিবাহ হওয়া সম্ভব নয়, একটি বিশেষ কারণে পাঁচ ছয়দিন দেরী হতে পারে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানালেন, কিছুদিন পর তিনি চৈতনের সঙ্গে নয়নের বিবাহের ব্যবস্থা করবেন। হেমাঙ্গিনী সে প্রস্তাব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সমর্থন করলেন। হেমাঙ্গিনী নয়নকে চৈতন-নয়ন বিবাহ সংবাদ জানালে নয়ন আপত্তি জানায়। কিন্তু হেমাঙ্গিনী চৈতনকে বিবাহ করার জন্য তাকে আদেশ দেন। সে আদেশ শুনে নয়ন কেঁদে ফেলে। নয়ন কালাচাঁদকে সে সংবাদ জানালে সে চৈতনকে খুন করবে—এ কথা বলে নয়নকে আশ্বস্ত করে। এদিকে নয়নের প্রচেষ্টায় অমিতার সঙ্গে সুমিত্রর সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে। ক্রন্দনরতা অমিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে সুমিত্র বলে, সে এর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। ইতোমধ্যে

দোলগোবিন্দবাবুকে আসতে দেখে নয়ন সুমিত্রকে পলায়ন করতে বললে সে চলে যায়। দোলগোবিন্দকে দেখে অমিতা অসুস্থতার ভান করে এবং বিবাহ ব্যপারে দোলগোবিন্দ অমিতাকে প্রশ্ন করলে সে কোন স্পষ্ট উত্তর দেয় না। হেমাঙ্গিনী ভর্ৎসনা করলে অমিতা বিবাহে সম্মতি দেয়। দোলগোবিন্দ পরের দিন যাত্রা স্থগিত রাখলেন। সুমিত্র পূর্বপরিকল্পনামত অমিতার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখে, সে অনুপস্থিত। বিরক্ত ক্ষুব্ধ সুমিত্র কালাচাঁদকে বলে, হত্যাকাণ্ডটি সেদিন রাত দুটোর সময় সে সম্পন্ন করতে চায়। (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

কালাচাঁদ এসে জানায়, সুমিত্রর কথামত সে একটা বড় বস্তা ও দড়ি জোগাড় করেছে। তারপব তারা বস্তা ও দড়ি নিয়ে দোলগোবিন্দর ঘরের দিকে অগ্রসর হলে হঠাৎ পায়ে দড়ি জড়িয়ে কালাচাঁদ পড়ে যায়। (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

সুমিত্র ও কালাচাঁদ জানালা দিয়ে দোলগোবিন্দের ঘরে ঢুকেছে। ওদের আগমনে দোলগোবিন্দের ঘুম ভেঙ্গে যায় ও দুজনকে হাতে নাতে ধরে ফেলেন। সুমিত্র আবিষ্কার করে, বিবাহেচ্ছু ভদ্রলোক স্বয়ং তার জেঠামশাই। সে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়। দোলগোবিন্দ হেমাঙ্গিনী, অমিতা ও নয়নকে ডেকে পাঠান, তারা সুমিত্রকে চেনে কিনা জিজ্ঞাসা করলে সকলে চেনে না বলে জানায়। সুমিত্রও তাদের ক্ষেত্রে একই কথা বলে। দোলগোবিন্দ সুমিত্র ও কালাচাঁদকে পুলিশের ভয় দেখালে সুমিত্র পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। দোলগোবিন্দ সেই মুহূর্তে ড্রাইভারকে ডেকে তাদের সতীগড়ে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

সুমিত্র ও কালাচাঁদের কাপুরুষতায় অমিতা ও নয়ন ক্ষুব্ধ। অমিতা মনের দুঃখে বলে, সে দোলগোবিন্দকেই বিবাহ করবে। ঠিক সেই সময় এক ভিখিরির গান শোনা যায়। সেই গানের মর্মার্থ হচ্ছে, নায়ক তার প্রিয়ার জন্য দূরে যেতে পাচ্ছে না এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তার প্রিয়া রাত তিনটের সময় যেন বাগানে নেমে আসে। গান শুনে দোলগোবিন্দ, অমিতা, নয়ন বুঝতে পারে সুমিত্র সতীগড়ে না গিয়ে গানের মাধ্যমে তার মনের কথা জানাচ্ছে এবং সেই কারণে গান গাওয়ানোর জন্য সে পূর্বোক্ত ভিখিরিকে নিযুক্ত করেছে। কিছুক্ষণ পর সুমিত্র ও কালাচাঁদ আসে। অমিতা সুমিত্রর ওপর অভিমান করে। সুমিত্র বলে, সে জানত না যে, তার জেঠামশাই দোলগোবিন্দবাবু অমিতাকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন। সে জেঠামশাইকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। মা-বাবার মৃত্যুর পর জেঠামশাই তাকে বড় করে তোলেন। জেঠামশাই যদি অমিতাকে বিবাহ করেন তবে সে তাকে জেঠিমা বলে ডাকবে। অমিতা ও নয়ন সুমিত্রকে ব্যঙ্গ করতে থাকে। সে সময় অন্তরাল থেকে দোলগোবিন্দ বেরিয়ে আসেন। সুমিত্র তাকে বলে, ড্রাইভারের হাত পা বেঁধে সে গাড়ি চালিয়ে মধ্য পথ থেকে ফিরে এসেছে। সুমিত্র আরো বলে, জেঠামশাই-এর সঙ্গে অমিতাব বিবাহ হচ্ছে শুনে সে খুশি। দোলগোবিন্দ সে কথা শুনে তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন এবং চৈতনকে দিয়ে হেমাঙ্গিনীকে বলে পাঠান, তিনি বিবাহের বাজার সেরে কালই সতীগড়ে ফিরে যাবেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

সুমিত্র ও অমিতা পরস্পরকে বিবাহ করতে না পারার ব্যর্থতায় আত্মহত্যা করবে বলে স্থির করে। নয়ন সেজন্য দোলগোবিন্দর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে দুটো ফাঁসির দড়ি

ঝুলিয়ে দিয়েছে। সুমিত্র ও অমিতা মৃত্যু বরণ করার পূর্বে নানা শোক দুঃখ অনুতাপ করতে থাকে। তারপর নয়ন ওদের গলায় দড়ি পরিয়ে দেয়। (দ্বিতীয় অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য)

দোলগোবিন্দর আসন্ন বিবাহের সংবাদে হোটেলের অনন্তচরণ সহ কিছু যুবক ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে থাকে। দোলগোবিন্দ বিবাহের বাজার করে হোটেলে ফিরতেই চৈতন তাঁকে সুমিত্র ও অমিতার গলায় দড়ি দেবার খবর দেয়। (দ্বিতীয় অঙ্ক। ষষ্ঠ দৃশ্য)

দোলগোবিন্দ এসে দেখেন, সুমিত্র ও অমিতা ঝুলছে। কালাচাঁদ ও নয়ন কাঁদছে। সেই ঘটনায় স্তম্ভিত দোলগোবিন্দকে নয়ন সুমিত্রর একটি চিঠি দেয। সেই চিঠিতে সুমিত্র দোলগোবিন্দকে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করে। হেমাঙ্গিনীকে লেখা অমিতার চিঠিতেও অমিতা হেমাঙ্গিনীকে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করে। তারপর নয়ন বলে, অমিতা তাকেও একটি চিঠিতে দোলগোবিন্দকে বিবাহ করতে বলে গেছে। সেই কথা শুনে হঠাৎ ঝুলন্ত অমিতা 'না' বলে ওঠে। তা দেখে দোলগোবিন্দ বিছানার চাদর তুলে চৌকির তলা দিয়ে দেখেন দুজন-ই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দোলগোবিন্দ বলেন, সুমিত্র ও আমিতাব মত ছেলে মেয়েদের এত দুর্ভাগ্য যে তারা সুন্দরভাবে বেঁচে থেকে প্রেমও করতে জানে না, আবার ঠিকমত মরতেও জানে না। তিনি সুমিত্রকে বললেন, তিনি আদৌ বিবাহেচ্ছু নন। পূর্বে তিনি যতবার সুমিত্রর বিবাহের ব্যবস্থা কবেছেন ততবারই সে পালিয়ে গেছে। সেজন্য তাঁকে এইরূপ ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। সকলে খুশি মনে ঘব থেকে বেবিয়ে গেলে নয়ন দোলগোবিন্দকে প্রণাম করে বলে, তিনি যে অমিতার এত বড হিতাকাঙ্ক্ষী তা সে পূর্বে বুঝতে পারেনি, সে না বুঝে তাঁকে কত দুঃখ দিযেছে, তার অপরাধের জন্য তিনি যেন তাকে ক্ষমা করেন। দোলগোবিন্দ বলেন, নয়ন কোন অপরাধে করেনি ববং নয়নের সাহায্য না পেলে সুমিত্রকে বিবাহবন্ধনে বাঁধা যেত না। তিনি আশীর্বাদ কবে বলেন, নয়ন যেন সুখী হয়। নয়ন কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরে। সে সময় অনন্তচবণ সেখানে এসে তাদের আলিঙ্গনাবস্থায় দেখে ঠাট্টা করে ওঠে। দোলগোবিন্দ তা শুনে সেখান থেকে দৌড়ে পালান। (দ্বিতীয় অঙ্ক। সপ্তম দৃশ্য —যবনিকা পতন)

- **বৃত্ত-গঠন**

এই নাটকের দুটি বৃত্ত।

বিবাহে অনিচ্ছুক প্রেমিক-ভ্রাতুষ্পুত্র সুমিত্রকে সংসারী করার চেষ্টায় অকৃতদার জ্যেষ্ঠতাত দোলগোবিন্দ তারই প্রেমিকা অমিতাকে বিবাহ করার সাজানো ঘটনা তৈরীর কৌশল অবলম্বন করলে শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হন—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তকে নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক বৃত্ত সহায়তা করেছে—

নয়ন-হেমাঙ্গিনী-কালাচাঁদ-চৈতন-উপকাহিনী।

- **অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্র**

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের শেষাংশ (যেখানে কালাচাঁদ, সুমিত্র ও মিঃ ব্যনার্জীর কথোপকথন রয়েছে) ব্যতীত বাকী অংশ নাট্যকাহিনীর সহায়ক হয়নি। দ্বিতীয় অঙ্কের

দ্বিতীয় দৃশ্যে পঙ্কজা ও সুমিত্রর কথোপকথন, দ্বিতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যে অনন্তচরণের সঙ্গে দুই যুবকের কথোপকথন অংশটি অপ্রয়োজনীয়।

অবিনাশ, হরবিলাস, দীপু, প্রফুল্ল, অম্বিকা, বিভূতি, পঙ্কজা নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধিতে সহায়তা করেনি।

- নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

Lewis Campbell-এর অধিবৃত্ত (parabola) গঠনরীতি এই নাটকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।

পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক দোলগোবিন্দের কুড়ি বছরের পাত্রী অমিতাকে পছন্দ, বিবাহে অনিচ্ছুক দোলগোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র সুমিত্রর ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ, অমিতার মত জানার জন্য তাকে একটি হোটেলে দোলগোবিন্দের আমন্ত্রণ জানানো (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য), এসব ঘটনার মাধ্যমে নাটকের সূচনা (opening) হয়েছে।

পান্থসেবা হোটেলে অমিতা নয়ন আসছে জেনে সেখানে সুমিত্র কালাচাঁদের আগমন (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য), অমিতা নয়নসহ হেমাঙ্গিনীর পূর্বোক্ত হোটেলে পৌঁছনো, হেমাঙ্গিনীকে দোলগোবিন্দের বিবাহের চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, হেমাঙ্গিনীর দোলগোবিন্দকে বিবাহ ব্যাপারে আশ্বস্ত করা (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য), অমিতার নয়নের কাছে খেদোক্তি, দোলগোবিন্দকে জব্দ করার জন্য নয়নের কৌশলে অনন্তচরণ মাইতি ও চৈতনের সাহায্য লাভ (প্রথম অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য), অনন্তচরণের দোলগোবিন্দকে ব্যঙ্গোক্তি, অমিতার মতামত জানার জন্য তার সঙ্গে দোলগোবিন্দের সাক্ষাতের ইচ্ছাপ্রকাশ (প্রথম অঙ্ক। ষষ্ঠ দৃশ্য), অমিতার বিবাহেচ্ছু বৃদ্ধকে খুন করে অমিতাকে নিয়ে পলায়নের জন্য সুমিত্র ও কালাচাঁদের পরিকল্পনা (প্রথম অঙ্ক। সপ্তম দৃশ্য), দোলগোবিন্দের সতীগড়ে নির্ধারিত দিনে না গিয়ে পাঁচ ছয়দিন পর যাওয়ার কথা ঘোষণা, নয়নের প্রচেষ্টায় অমিতা সুমিত্রর সাক্ষাৎকার ও সুমিত্রর অমিতাকে সান্ত্বনা দান, দোলগোবিন্দকে দেখে অমিতার অসুস্থতার ভান করা, হেমাঙ্গিনীর ভর্ৎসনায় অমিতার দোলগোবিন্দকে বিবাহে সম্মতি দান, নির্দিষ্ট স্থানে অমিতাকে অনুপস্থিত দেখে ক্রুদ্ধ বিরক্ত সুমিত্রর সেদিন রাত দুটোয় বৃদ্ধকে হত্যা করার পরিকল্পনা (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য), সুমিত্র ও কালাচাঁদের বৃদ্ধকে হত্যার প্রস্তুতি (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)—এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনী ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী (climax) হয়েছে।

কাহিনীর চূড়ান্তরূপ (Acme) এসেছে দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে। সুমিত্র ও কালাচাঁদকে দোলগোবিন্দর হাতে নাতে ধরে ফেলা, জেঠামশাই দোলগোবিন্দ যে অমিতার পাণিপ্রার্থী—সুমিত্রর সে ঘটনা আবিষ্কার, পুলিশের ভয় দেখানো হলে সুমিত্রর দোলগোবিন্দর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং সুমিত্র কালাচাঁদকে দোলগোবিন্দর সতীগড়ে পাঠানোর বন্দোবস্তের মধ্যে কাহিনীর শীর্ষবিন্দু লক্ষ্য করা যায়।

চতুর্থ পর্যায়ে কাহিনী পরিণামমুখী (Sequel) হয়েছে। সুমিত্র ও কালাচাঁদের কাপুরুষতায় অমিতা ও নয়নের ক্ষোভ, ড্রাইভারের হাত পা বেঁধে গাড়ী চালিয়ে সুমিত্রর

কালাচাঁদের সঙ্গে হোটেলে ফিরে আসা, দোলগোবিন্দর পরদিন সতীগড়ে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশে (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য) কাহিনী পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

পরস্পরকে বিবাহ করতে না পারায় সুমিত্র অমিতার গলায় দড়ি দেওয়া (দ্বিতীয় অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য), আত্মহত্যার ঘটনা চৈতন দ্বারা দোলগোবিন্দর কাছে জ্ঞাপন (দ্বিতীয় অঙ্ক। ষষ্ঠ দৃশ্য), তাদের মৃত্যুর জন্য সুমিত্র ও অমিতার যথাক্রমে দোলগোবিন্দ ও হেমাঙ্গিনীকে দায়ী করে চিঠি লেখা, সুমিত্র ও অমিতা যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেনি তা দোলগোবিন্দ কর্তৃক আবিষ্কার, সুমিত্রকে সংসারী করার জন্যই যে দোলগোবিন্দকে সাজানো বিবাহের কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল সে তথ্য প্রকাশ, নয়নের দোলগোবিন্দের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ও দোলগোবিন্দর তাকে আশীর্বাদেব (দ্বিতীয অঙ্ক। সপ্তম দৃশ্য) মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি (close) নেমে এসেছে।

এন্টনী কবিয়াল

অঙ্ক দৃশ্যে বিভক্ত নাটকটির চারটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে চারটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, তৃতীয অঙ্কে চারটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে দুটি দৃশ্য।

● ঘটনা-সংযোজন

এন্টনী জাতিতে পর্তুগীজ। তাঁর ঠাকুর্দা পর্তুগাল থেকে বাংলায় আসেন। এন্টনীর বাংলাদেশেই জন্ম। বাংলার জল, মাটি, রূপ, গন্ধ তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি নিজেকে মনে প্রাণে বাঙালী বলে ভাবতে ভালোবাসেন। বর্তমানে তিনি ফরাসডাঙ্গায় থাকেন, লবণের ব্যবসা করেন। সম্প্রতি তিনি কলকাতায় এসেছেন রায়বাবুদের গুদামে লবণ জমা দিতে। কলকাতায় তাঁর বান্ধবী লিন্ডা থাকেন। তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সেদিন এন্টনীকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। লিন্ডা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তাঁর মন সর্বদাই বাংলার সৌন্দর্যে বিভোর থাকে বলে অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারছেন না। এন্টনী চলে গেলে লিন্ডার রূপমুগ্ধ জন আসেন। লিন্ডা ওঁকে বলেন তিনি এন্টনীকে ভালোবাসেন, ওঁকে বিয়ে করে সুখী হতে চান। জন বলেন, এন্টনী তাঁকে বলেছেন, ফরাসডাঙ্গার এক সুন্দরী যুবতী বিধবাকে তাঁর ভালো লাগে, মেয়েটি যখন কাকীমার সঙ্গে জল নিতে আসেন তখন তিনি তাঁকে দেখার জন্য বটগাছতলায় বসে থাকেন। লিন্ডা যখন জানতে পারেন এন্টনীর সঙ্গে সেই মেয়েটির কোন কথা হয়নি তখন তিনি এন্টনীর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হন। (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

এন্টনী ফরাসডাঙ্গায় ফিরে এসে তাঁর আড্ডার জায়গা বটতলায় পৌঁছলে দলের অন্যান্যরা আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন। এন্টনী ইতোমধ্যে অনেকগুলি বাংলা গান লিখেছেন বলে জানান। সেখানে মামাবাবু বলে খ্যাত এক ব্যক্তিকে এন্টনী জিজ্ঞাসা করেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে বাঙালী হতে পারবেন কিনা। মামাবাবু বললেন, তিনি নিশ্চয় হতে পারবেন। তবে এর জন্য বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা, আচার আচরণ, সংস্কৃতি শিখতে হবে এবং এর সঙ্গে একটি শান্ত স্বভাবের বাঙালী মেয়েকে বিবাহ করাও প্রয়োজন। তাঁর মতে, মা

দুর্গা যদি সহায় হন তবে যে কোন বাঙালী মেয়ে তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হবেন। এমন সময় পূর্বকথিত বিধবা যুবতী (সৌদামিনী) তাঁর কাকীমা তরঙ্গিনীর সঙ্গে পুকুরঘাটে জল আনতে বটতলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এন্টনীকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন। এন্টনীও মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দেখতে থাকেন। উভয়ের সেই অবস্থা দেখে তরঙ্গিনী সৌদামিনীকে ভর্ৎসনা করেন। সৌদামিনী চলে গেলে মামাবাবু এন্টনীকে সৌদামিনীর মনের খবর জানাতে পারেন এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে এন্টনীর পরিচয় করাতে নিয়ে গেলেন। (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

তরঙ্গিনী বাড়ী ফিরে তাঁর স্বামী জয়গোপালকে অভিযোগ করেন, তাঁর ভাইঝি সৌদামিনী এক সাহেবের প্রেমে পড়েছেন। জয়গোপাল একথা শুনে বললেন, তিনি ব্রাহ্মণ, গ্রামের সমাজপতি। লোকে তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, সৌদামিনী যদি এ ধরণের কাজ করে তবে তাঁকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এমন সময় বাইরে থেকে এন্টনীর গান ভেসে এল। ক্রুদ্ধ জয়গোপাল সে ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসা করার জন্য সৌদামিনীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে এন্টনীর কাছে নিয়ে চললেন। (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

জয়গোপাল ক্রন্দনরতা সৌদামিনীকে এন্টনীর কাছে নিয়ে এলেন। তিনি এন্টনীকে রূঢ় ভাষায় বললেন, তাঁর ভাইঝির সঙ্গে প্রেম করার উপযুক্ত শাস্তি তিনি পাবেন। তিনি আরো বলেন, সাহেবের সঙ্গে প্রেম করার জন্য সৌদামিনীর জাত গেছে সুতরাং তাঁকে তিনি আর ঘরে স্থান দেবেন না। সৌদামিনীকে সেখানে ত্যাগ করে জয়গোপাল চলে গেলেন। মামাবাবু বললেন, ভগবান বোধহয় তাঁদের মিলনের জন্য সেই সুযোগ করে দিয়েছেন। এন্টনী হাত বাড়িয়ে সৌদামিনীর হাত ধরেন। (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

এন্টনী সৌদামিনীর বিয়ে হয়ে যায়। বিবাহের দিনই মামাবাবু তাঁকে কবিয়ালী দীক্ষা দিলেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

বিয়ের রাতে পাড়ার দাইমা সৌদামিনীকে জানায়, ফরাসডাঙ্গার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বদ্যি সকলে মিলে সৌদামিনীকে অপদস্থ করার জন্য ষড়যন্ত্র করছেন। বিয়ের রাতে সৌদামিনীকে একান্তে পেয়ে এন্টনী তাঁর উপর কবিতা বাঁধলে সৌদামিনী তাঁকে 'কবি' বলে সম্বোধন করেন। এন্টনী অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেন, সৌদামিনী যেন সেই নামে তাঁকে ডাকেন। কারণ ঐ নামের মধ্যে তাঁর ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে। এরপর এন্টনীর অনুরোধে তিনি গান করেন। গান শুনে মুগ্ধ এন্টনী সৌদামিনীকে বলেন, তিনি যেন এন্টনীকে বাংলা গান শেখান। তিনি যে একটি কবির দল খুলতে চান সেকথাও এন্টনী জানান। সৌদামিনী তাঁকে খুব উৎসাহ দেন। এমন সময় তাদের আটচালা ঘরে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। মামাবাবু এন্টনীকে আগুন নেভাতে বাইরে বেরিয়ে আসতে বললে এন্টনী ছুটে বেরিয়ে যান। (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

জনের মুখে এন্টনীর বিবাহের কথা শুনে লিন্ডা বিশ্বাস করতে পারেন না। কারণ লিন্ডা ও এন্টনীর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সেই মধুর সম্পর্ক ত্যাগ করে এন্টনী কখনই সে কাজ করতে পারেন না বলে তাঁর স্থির বিশ্বাস। সেদিনই লিন্ডার বাবা ডিসুজা লিন্ডা এন্টনীর বিবাহের ব্যাপারে এন্টনীর মত জানার জন্য ক্লাবে এসেছেন। এন্টনী এসে লিন্ডাকে সৌদামিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা জানালে লিন্ডা গভীরভাবে মর্মাহত হন। এন্টনী লিন্ডাকে বলেন, তিনি লিন্ডাকে কোনদিনই প্রেমিকা হিসেবে ভাবেননি, তাঁকে তিনি ছোটবোনের মত দেখে এসেছেন। লজ্জায় ও দুঃখে লিন্ডা কাঁদতে শুরু করেন। ডিসুজা সব শুনে এন্টনীকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

এদিকে জয়গোপাল গ্রামের কিছুলোকের কাছে আক্ষেপ করে বলছেন, সৌদামিনীকে এন্টনীর বিবাহ না করে রক্ষিতা করে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি বিবাহ করায় তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। সেদিন এন্টনীর নৌকা ঘাটে লাগতেই তাঁর নির্দেশে কিছু লোক গিয়ে তাঁকে তাঁর কাছে ধরে নিয়ে আসে। জয়গোপাল তাঁকে ফরাসডাঙ্গা থেকে উঠে যেতে বললেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্যরা তাঁকে অপমান করতে লাগল। এন্টনী এর প্রতিবাদ করলে সবাই মিলে এন্টনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

এদিকে সময়মত এন্টনী বাড়ী ফিরে না আসায় সৌদামিনী চিন্তিত হয়ে পড়েন। এক সময় ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত এন্টনীকে নিয়ে আসা হয়। এন্টনী বলেন, তিনি ফরাসডাঙ্গা ত্যাগ করে গঙ্গার ধারে গোরাহাটির বাগানবাড়ীতে চলে যাবেন এবং সেখানে তিনি কবির দল পরিচালনা করবেন। মামাবাবু বললেন, সেই রক্তাক্ত কলেবরে এন্টনীর নবজন্ম হোক। এন্টনীকে তিন গান বাঁধতে বললেন। অনেক চেষ্টা করেও প্রথমে এন্টনীর মুখে গান এল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কৃতকার্য হন, গেয়ে উঠলেন—"ভজন পূজন জানিনে মা জেতেতে ফিরিঙ্গী।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য)। প্রথম যবনিকা।

এন্টনীর গোরাবাটির বাগানবাড়ীতে মহিষমর্দিনী দুর্গা পুজা উপলক্ষে গানের আসরের ব্যবস্থা হয়েছে। ভজহরি, ত্রিলোচন, গোরক্ষনাথ, কেষ্ট ঢুলী ও মামাবাবু রয়েছেন। ভোলাময়রার লোকজনও বসে আছেন। ভোলা ময়রা বললেন, এন্টনীর সঙ্গে তিনি অনেক আসরে কবির লড়াই করেছেন। এন্টনীর কবিত্বশক্তি ও ভক্তি দুইই আছে। এরপর গান শুরু হল। প্রথমে ভোলার নির্দেশে এন্টনী গান শুরু করেন। এরপর ভোলা চাপান দিলে এন্টনী তার কাটান দেন। শেষ পর্যন্ত এন্টনী জয়ী হন। (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

এন্টনী লবণের ব্যবসা তুলে দিয়ে শুধু কবিগানের দল নিয়ে আছেন। কিন্তু দলে বড় অর্থাভাব। দলের বাঁধনদার গোরক্ষনাথ মামাবাবুকে অভিযোগ করেন, তিনমাস ধরে এন্টনী টাকা না দেওয়ায় বাড়ীতে বড় অশান্তি চলছে। মামাবাবু বললেন, কাশীমবাজার রাজবাড়ীতে লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন যে গানের আসর বসবে সেখানে অগ্রিম টাকা পাওয়া গেলে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য অর্থ নিশ্চয় দেবার ব্যবস্থা করা হবে। পথে গোরক্ষনাথের সঙ্গে জয়গোপালের সাক্ষাৎ হয়। এন্টনীর বাড়ীতে দুর্গাপূজা হচ্ছে শুনে ক্রুদ্ধ জয়গোপাল গোরক্ষনাথকে বললেন, তিনি যদি সাহায্য করেন তবে জয়গোপাল এন্টনীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন। গোরক্ষনাথ এন্টনীর সঙ্গে সে ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজী হন না। কথায় কথায় জয়গোপাল গোরক্ষনাথের অর্থাভাবের কারণ জেনে নিলেন। জয়গোপাল তাকে প্রলোভিত করে সঙ্গে নিয়ে চললেন। (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

গোরাহাটির বাগানবাড়ীতে ভোলা ময়রাকে হারিয়ে এন্টনী জয়ী হয়েছেন দেখে সৌদামিনীর আনন্দ ধরে না। এন্টনী যে বৌবাজারে মা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন সে কথা সৌদামিনী এন্টনীকে স্মরণ করিয়ে দেন। সে সময় ভোলা ময়রা এসে বলেন, এন্টনী যদি রাজী হন তবে তিনি এমন গানের বায়না নিয়ে আসবেন যাতে তাঁর কিছু অর্থাগম হয়। এর ফলে এন্টনীর নামও দশজনের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। সৌদামিনী উৎসাহের সঙ্গে সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তবে ভোলা ময়রা আসর মাতিয়ে রাখার জন্য এন্টনীকে মাঝে মাঝে সামান্য আদি রসাত্মক গান গাওয়ার কথা বললে সৌদামিনী আপত্তি জানান। ভোলাময়রা চলে গেলে সৌদামিনীর অলংকারবিহীন দেহের দিকে এন্টনীর দৃষ্টি পড়ে। এন্টনী বুঝতে পারেন সব অলংকার দুর্গাপূজায় ব্যয় করা হয়েছে। সৌদামিনী বলেন, এন্টনীর সৃষ্টির কাজে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য তিনি প্রয়োজনেও তাঁর কাছ থেকে অর্থ চাননি। (তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

শ্রীরামপুরের গোঁসাই বাড়ীতে কবিগানের আসরে ভোলাময়রা ও এন্টনীর কবিগান হবে। বাড়ীর কর্তা বড় গোঁসাই-এর নির্দেশে ভোলাময়রা প্রথমে গান ধরেন। এরপর বড়গোঁসাই এন্টনীকে কৃষ্ণকথার ওপর গান করতে বললেন।. মামাবাবু গোরক্ষনাথকে গান বাঁধতে বললে জয়গোপাল-দ্বারা প্ররোচিত গোরক্ষনাথ তাঁর প্রাপ্য অর্থ না দেবার অজুহাতে গান বাঁধতে রাজী হলেন না। ক্রুদ্ধ ভোলাময়রা গোরক্ষনাথের সেই অর্থ মিটিয়ে দিয়ে সভা থেকে বের করে দিলেন। ভোলা এন্টনীকে গান বাঁধতে অনুপ্রাণিত করলেন এবং কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর সত্যি সত্যি এন্টনী কৃষ্ণসংগীত রচনা করে গাইতে লাগলেন। গান শুনে দর্শক জয়ধ্বনি করে উঠল। বড়গোঁসাই এন্টনীকে আলিঙ্গন করলেন, এন্টনী তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন। (তৃতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

এরপর প্রায় দুই বছর কেটে গেছে। এন্টনী বর্তমানে কবিয়ালরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। সেইবার চারমাসের কবিগানের বায়না নিয়ে বেরিয়েছেন। চাবমাস অতিক্রান্তপ্রায়। ইতোমধ্যে তাঁদের বহু প্রত্যাশিত কালীমন্দির তৈরী হয়ে গেছে। কলকাতার লোকজনের ইচ্ছানুসারে মাকালীর নামকরণ করা হয়েছে ফিরিঙ্গীকালী। চারদিন পর কালীপুজো। সৌদামিনী তাই উদ্বিগ্ন। সেদিনই এন্টনী ফিরে এলেন। দীর্ঘদিন পর মিলনের আনন্দে দুজনে বিভোর হয়ে রইলেন। এর মধ্যে সৌদামিনীর কাকা কাকীমা ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে সর্বস্বান্ত হওয়ার মিথ্যা কাহিনী বলে সৌদামিনীর সঞ্চিত তিনশত পঁচিশ টাকা নিয়ে চলে যান। যাওয়ার আগে আরো দুইশত টাকা পাওয়ার আশ্বাস নিয়ে যান। (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

বৌবাজার স্ট্রীটে ফিরিঙ্গীকালী মন্দিরের সামনে এন্টনী গান গাইছেন। গান শেষ হলে তাঁর সামনে লিন্ডা এসে দাঁড়ান। লিন্ডা বলেন, তিনি একান্ত কৌতূহলী হয়ে এন্টনীর গান শুনতে এসেছিলেন কিন্তু গান শুনে তিনি মুগ্ধ। এবং আনন্দে তাঁর চোখে জল এসেছে এইভেবে যে তাঁর ছোট বেলাকার বন্ধু এন্টনী বর্তমানে এত বড় কবিয়াল। তিনি আরো বললেন, তাঁর সঙ্গে বিবাহ হলে হয়তো এন্টনী এত বড় কবি হতে পারতেন না। লিন্ডা চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন। ভোলাময়রা পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। তিনি এন্টনীকে নিমকহারাম বললেন। কারণ তিনি লবণের ব্যবসা করতেন কিন্তু সে ব্যবসা তুলে দিয়ে নিমকহারামি করেছেন, কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করে যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে নিমকহারামি করেছেন, সৌদামিনীকে বিবাহ করে স্বজাতির মেয়ের সঙ্গে নিমকহারামি করেছেন, তাঁর সমস্ত জীবনটাই নিমকহারামির ইতিহাস। এমন সময় বিপন্ন এন্টনীর সামনে চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ী পরা, মুক্তকেশী সৌদামিনী মাকালীর মত আবির্ভূত হয়ে বলেন, এন্টনী যেন ভোলাময়রার অভিযোগের উপযুক্ত উত্তর দেন। ভোলা সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি এন্টনীকে উদ্দীপিত করতে লাগলেন। তিনি বললেন, এন্টনীর উচিত মাকালীর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথার জবাব দেওয়া। সৌদামিনী বলেন, এন্টনী যদি জবাব দিতে না পারেন তবে পরের দিনই তিনি কালীমূর্তি বিসর্জন দিয়ে আসবেন। তাঁদের কথা শুনতে শুনতে এন্টনীর মধ্যে তীব্র আবেগের সৃষ্টি হয়। তিনি ধীরে ধীরে গান গাইতে শুরু করলেন—

আমি নিমক হারাম নই মাগো
নিমক হারাম নই।
আমার নুনের নৌকা গঙ্গাজলে
ডুবে গেছে ওই।

এরপর ভোলাময়রা তাঁর সঙ্গে গান ধরেন। দুজনে গভীর আবেগে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেয়ে চললেন। (চতুর্থ অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য,—শেষ যবনিকা)

● বৃত্ত-গঠন

এন্টনী নিজের কবিত্ব-শক্তির দ্বারা ও সৌদামিনীর অনুপ্রেরণায় কবিয়ালরূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তের সহায়তায় নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক বৃত্ত এসেছে—

(ক) জয়গোপাল-তরঙ্গিনী-উপাকাহিনী

(খ) লিন্ডা-উপকাহিনী

(গ) ভোলাময়রা-মামাবাবু বৃত্তান্ত।

● অপ্রয়োজনীয় অংশ ও চরিত্র

এই নাটকে কোন অপ্রয়োজনীয় অংশ ও চরিত্র নেই।

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

John Howard Lawson-এর তত্ত্ব এই নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নাট্যকাহিনীর সূচনা (exposition) এই ভাবে হয়েছে—লিন্ডার কাছে এন্টনীর বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসার কথা জ্ঞাপন, ফরাসডাঙ্গার একটি বিধবা সুন্দরী যুবতীর প্রতি এন্টনীর আকর্ষণের কথা জন কর্তৃক লিন্ডার কাছে প্রকাশ (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)। এটি নাট্যক্রিয়ার প্রথম পর্যায়।

মামাবাবুর কাছে এন্টনীর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বাঙালীরূপে গড়ে তোলার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ, সৌদামিনী ও এন্টনীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, সে কথা বুঝতে পেরে সৌদামিনীর কাকীমার বিরক্তি প্রকাশ, সৌদামিনীর মনের খবর জানার জন্য মামাবাবুর এন্টনীকে নিয়ে এক ব্যক্তির কাছে গমন (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)। কাকীমার কাকাবাবুকে সৌদামিনীর প্রেম সম্পর্কে অভিযোগ (প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)—এই ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার অগ্রগমন (rising action) হয়েছে।

নানা ধরণের সংঘাতে (clash) তৃতীয় পর্যায় গড়ে উঠেছে। সৌদামিনীকে কেন্দ্র করে এন্টনীকে সৌদামিনীর কাকার অপমান ও সৌদামিনীকে বহিষ্কার (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য), এন্টনী সৌদামিনীর বিবাহ রাত্রিতে এন্টনীর আটচালা ঘরে জয়গোপালের চক্রান্তে আগুন লাগানো (দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য), সৌদামিনীকে এন্টনী বিবাহ করায় লিন্ডার সঙ্গে এন্টনীর সংঘাত (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য), জয়গোপালের প্ররোচনায় কিছু ব্যক্তি কর্তৃক এন্টনীকে প্রহার, (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য), গোরাহাটির বাগানবাড়ীতে ভোলাময়রার সঙ্গে এন্টনী কবির লড়াই (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য), সময়মত অর্থ না পাওয়ায় জয়গোপালের প্ররোচনায় শ্রীরামপুরের গোঁসাইবাড়ীর গানের আসরে গোরক্ষনাথের এন্টনীর প্রতি

বিরুদ্ধাচরণ (তৃতীয় অঙ্ক)—এই সংঘাতগুলি নাট্যক্রিয়াকে গতি দান করে নাটককে চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

শেষ পর্যায়ে নাট্যক্রিয়ার তীব্ররূপ (climax) এসেছে। এন্টনীর কবিপ্রতিভাকে উদ্বোধিত করার জন্য ভোলাময়রার তাঁকে নিমকহারাম বলে অপবাদ দেওয়া, সে কথায় উত্তেজিত সৌদামিনীর অনুপ্রেরণায় এন্টনীর কণ্ঠ থেকে এক অপূর্ব সঙ্গীত বেবিযে আসাব মধ্যে নাট্যক্রিয়ার চূড়ান্তরূপ প্রকাশিত হয়েছে এবং এখানে কাহিনীর পরিণতি নেমে এসেছে।

দ্বিধা

এই নাটকটি চারটি পর্বে বিভাজ্য। প্রতিটি পর্বের মধ্যে অসংখ্য দৃশ্য থাকলেও সেগুলির কোন দৃশ্য-নাম না থাকায় দৃশ্যগুলিকে বিশেষ সংখ্যায় বিশেষিত করা হল।

- **ঘটনা-সংযোজন**

উত্তর কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের একটি ঘরে সাগর মজুমদার নামে এক যুবক থাকে। বাড়ীর সত্বাধিকারিনী এক বৃদ্ধা। তাঁর একমাত্র পুত্র মারা যাওয়ায় বর্তমানে তিনি কাশিবাসিনী। বাড়ীর তিনতলায় এক ইঞ্জিনিয়ার তাঁর স্ত্রী ও কন্যাসহ থাকেন। একতলায় একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। সাগর সকলের ভাড়া আদায় করে প্রতিমাসে সেই বৃদ্ধার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এজন্য সাগরকে তার ঘরের কোন ভাড়া দিতে হয় না। সাগরের ঘরে একটি টেলিফোন আছে। সাগর পর পর কয়েকবার ডাক্তারি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় পড়া ছেড়ে দিয়েছে, দু'তিনটি ছাত্র পড়ানোর কাজ নিয়েছে। তাতে কোনক্রমে নিজের দিন গুজরান হয়। তবে মাসের বেশির ভাগ দিন ইঞ্জিনীয়ারবাবুর স্ত্রী খাবার পাঠিয়ে দেন। সেদিন সাগরের বন্ধু অশোক তার কাছে এসেছে। সে অশোককে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বেরিয়ে যায়। তারা বেরিয়ে গেলে ইঞ্জিনীয়ারের যুবতী কন্যা সীতা এসে সাগরের ঘর সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

এদিকে দক্ষিণ কলকাতার রিজেন্ট পার্কে রত্না নামে এক সুন্দরী যুবতী শুয়ে শুয়ে বাংলা উপন্যাস পড়ছে। এমন সময় তার ছোড়দা প্রিয়ব্রত উপস্থিত হয়। প্রিয়ব্রত রাজনীতি করে। তার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। কথায় কথায় প্রিয়ব্রতকে রত্না জানায়, সে বর্তমানে একটি প্রাইভেট কোম্পানির প্রৌঢ় বিপত্নীক মালিকের স্টেনো। মালিককে নানাভাবে সন্তুষ্ট করে সে বাড়ীর রেডিও টেলিফোন ও দামী দামী আসবাবপত্র লাভ করেছে। ইতোমধ্যে কোম্পানির মালিকের ফোন এলে প্রিয়ব্রত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। যাওয়ার সময় সে জানায়, তার সঙ্গে রত্নার বিবাহিত স্বামী অবিনাশের দেখা হয়েছে। রত্না বলে, ভাগ্যের দোষে তাকে বর্তমান জীবন বেছে নিতে হয়েছে। বড়দা বিবাহ করে আলাদা সংসার

করছে, বাড়ীতে প্যারালিটিক বাবা, বাতে পঙ্গু মা, ছোট ছোট নাবালক ভাইবোনের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে স্টেনোর চাকরি নিতে হয়েছে এবং চাকরি পাওয়ার জন্য তাকে কুমারী সেজে থাকতে হয়েছে। প্রিয়ব্রত চলে গেলে রত্না রাতের খাবার খেয়ে নেয়।

সাগর অশোকের সঙ্গে বাইরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে আসে। তাকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। সীতা সাগরের কাছে এসে তার অন্যমনস্কতার কারণ জিজ্ঞেস করলে সাগর বলে, সে এমন কিছু কথা শুনেছে যা সে আশা করেনি। সাগর এরপর অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। সে সীতাকে বলে, সীতা যে অবাঙালী তা সীতার কথা শুনে বোঝা যায় না। সীতা জানায়, সে বাংলাদেশ ও বাঙালীকে ভালবাসে এবং মনেপ্রাণে বাঙালী হতে চায়। সীতা চলে গেলে সাগর আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে।

রিজেন্ট পার্কে রত্না তার ঘরে মাঝরাতে কলিকের ব্যথায় চীৎকার করে ওঠে। তীব্র যন্ত্রণায় বিছানায় গড়াগড়ি দিতে শুরু করে কিন্তু তাতে ব্যথা কমে না। সে ছুটে বেরিয়ে উপরতলার মেয়ে সেবাকে ডেকে আনে এবং ঘরে ফিরে ডাক্তার তালুকদারকে ফোন করে। কিন্তু অসহ্য ব্যথার জন্য সে ভুল করে অন্য নম্বরে ডায়াল করলে সাগরের ঘরে ফোন বেজে ওঠে। ফোন তুলে সাগর বুঝতে পারে কোন মহিলা তাকে ডাক্তার তালুকদার ভেবে ফোন করেছে। তবু নিতান্ত কৌতূহলী হয়ে রত্নার বাড়ীর ঠিকানা ফোনে জেনে নিয়ে সে তার বাড়ী পৌঁছয়। সে সময় সেবা সংজ্ঞাহীন রত্নার কাছে বসেছিল। সাগর রত্নার অবস্থা দেখে তাকে একটা ইনজেকশান দেয়। সেবাও তাকে ডাঃ তালুকদার ভেবে ভুল করে। সেবা কিছুক্ষণ পর বাড়ীর ডাকে চলে যায়। যাওয়ার পূর্বে সাগরকে অনুরোধ করে, সে যেন রত্নার জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। সাগর জেগে থাকে। শেষরাতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন ভোরে রত্নার ঘুম ভাঙে। সে হাত মুখ ধুতে কলঘরে যায়।

এদিকে সকালে এসে সীতা সাগরের চাকর গৌরের মুখে শোনে, সাগর গতকাল রাতে একটা ফোন পেয়ে বেরিয়ে গেছে।

রত্না কলঘরে যাওয়ার পরই সাগরের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। ঠিক সেই সময় রত্না কলঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং সাগরকে দেখে অবাক হয়ে যায়। সে প্রশ্ন করে জানতে পারে, সাগর রত্নার ফোন পেয়ে তার কাছে এসেছে। সে ডাক্তার নয়, ডাক্তারী পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। রত্না বলে তার ঘরে সাগরের সারা রাত থাকা ঠিক হয়নি। সাগর সে কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, রত্নার এ ধরণের কথা না বলে তার পেটের ব্যথা কমিয়ে দেবার জন্য সাগরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল। এ কথায় বিরক্ত হয়ে রত্না তাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। পরে অনুতপ্ত হয়ে সে সাগরকে ফোন করে (সে কথায় কথায় সাগরের ফোন নম্বর জেনে নিয়েছিল)। কিন্তু ফোনে তাকে পায় না।

সাগরের কাছে অশোক আসে। সাগর অশোককে রত্নার কথা বলে। অশোক সামনের মাসে আবার আসবে বলে চলে যায়।

রত্নার কাছে তার কোম্পানির মালিক বিভাস চৌধুরী এসেছে। সে দাবী করে, অফিস ছুটির পর রত্নাকে তার সঙ্গে অনেকক্ষণ থাকতে হবে কারণ অফিসের অনেক

কাজ রয়েছে। বিভাস চৌধুরীর সঙ্গে রত্নার বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে সাগরের ফোন আসে কিন্তু বিভাস চৌধুরী রত্নাকে সেই ফোন ধরতে না দিয়ে তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। (প্রথম পর্ব (১-২৮ দৃশ্য সংখ্যা)—প্রথম বিরতি।

সাগরকে সীতা জানায়, সাগরের অবর্তমানে রত্না নামে এক মহিলা তার অসুখ সারিয়ে দেবার জন্য সাগরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন করেছিল। ফোনে রত্না সীতাকে সে রাতের সব কথা বলে। সাগর সে রাতের ঘটনা সীতাকে গোপন করায় সীতা আহত হয়। সেদিন সাগরের কাছে রত্নার ফোন আসে। রত্না তাকে তার বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানালে সাগর সম্মত হয়।

সেদিন প্রিয়ব্রত এসে রত্নাকে জানায়, তার সঙ্গে তার স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হয়ে গেছে। কারণ তার স্ত্রী তার মত সাধারণ মানুষকে নিয়ে সুখী হতে পাচ্ছিল না, সে বর্তমানে বড় বড় লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। স্ত্রী মুক্তি চাওয়ায় সে তাকে মুক্তি দিয়েছে। প্রিয়ব্রতকে খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। প্রিয়ব্রত চলে যায়। রত্না স্তব্ধ হয়ে থাকে।

এদিকে সাগরের শ্বশুর ক্ষেত্রনাথ তাঁর মৃত্যু পথযাত্রী কন্যা বিভার শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য সাগরকে নিতে এসেছেন। বিভা যক্ষ্মারোগী। দুই বছর হাসপাতালে তার চিকিৎসা করা হয়েছে। কোন উপকার হয়নি। তাকে এরপর বাড়ীতে আনা হয়েছে। সে মৃত্যুর জন্য দিন গুনছে। মৃত্যুর পূর্বে সে তার স্বামী সাগরকে দেখতে চায়। সাগর জানায়, সে বিভাকে স্ত্রী বলে মানতে রাজী নয় কারণ তার সঙ্গে বিভার বিবাহ অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। বিভার দুরারোগ্য অসুখের কথা গোপন করে তার বাবা জমিদার ক্ষেত্রনাথ বিবাহের বন্দোবস্ত করেছিলেন। বিবাহের আসরে অসুখের কথা জানা যায়। সে সময় সাগরের আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাদ করলে ক্ষেত্রনাথ তাঁদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দেন। সাগরকে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখেন। সাগর কোনক্রমে পালিয়ে আসে। তাই সে বিবাহ সম্পূর্ণ হয়নি। সুতরাং সে বিভার কাছে যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করছে না। ক্ষেত্রনাথ ক্ষমা চান। কিন্তু সাগর যেতে অস্বীকার করলে ক্রুদ্ধ ক্ষেত্রনাথ তাকে অভিশম্পাত দিতে দিতে বেরিয়ে যান। উত্তেজিত সাগর কিছুক্ষণ পর জামাকাপড় গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

সেদিন রাতে মদের সরঞ্জাম নিয়ে মদ্যপ বিভাস চৌধুরী রত্নার ঘরে আসে। বদনামের ভয়ে রত্না তাকে চলে যেতে বলে। বিভাস চলে যায় কিন্তু মদের সরঞ্জামগুলি রেখে যায়। বিভাস চলে যাবার কিছু পরে সাগর আসে ও বিভার সম্পর্কে সব কথা জানায়। সব শুনে রত্না সাগরকে বিভার কাছে যেতে বলে। রত্নার বিশেষ অনুরোধে সাগর বিভার কাছে যেতে রাজী হয়। (দ্বিতীয় পর্ব ১-১৫ দৃশ্য সংখ্যা)-দ্বিতীয় বিরতি।

সেবা সেদিন রত্নাকে তার প্রেমিকের কথা বলে। সেবা টেলিফোন অফিসে কাজ করে। তার প্রেমিক অনুপম সেই অফিসের জোনাল ইন্সপেক্টর। সে জানায় তারা দুজনে মিলে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছে। সেবা চলে গেলে রত্নার ঘরে তার দুই দাদা প্রিয়ব্রত ও প্রশান্ত আসে। রত্না বলে, মা-বাবা ভাই-বোন ব্যতীত তার তথাকথিত স্বামী অবিনাশকে তার টাকা জোগাতে হয়। রত্নার বিবাহ পণের সম্পূর্ণ টাকা দিতে না পারায় বিবাহের দিন বরপক্ষ বিবাহ বন্ধ করে দিতে চাইলে রত্নার বাবা আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্যারালিসিস শুরু হয়ে যায়। এদিকে বিবাহের বাসরে জানা যায়,

অবিনাশ সিফিলিটিক রোগী। বিবাহ্ অর্ধসমাপ্ত রইল। প্রশান্তের মতে, সেটি বিবাহ্ নয়, বিবাহের নামে প্রহসন মাত্র। রত্না বলে, অবিনাশ সে কথা মানতে রাজী নয় এবং স্বামীত্বের দাবীতে সে রত্নার কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। বর্তমানে রত্না আর একটি সমস্যায় পড়েছে। রত্নাকে লেখা বিভাসের চিঠিগুলি অবিনাশ রত্নার কাছ্ থেকে জোর করে নিয়ে গেছে। প্রিয়ব্রত শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে কারণ সেই চিঠি হাতে পেয়ে অবিনাশ অবশ্যই জঘন্য উপায়ে বিভাস ও রত্নার কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করবে।

সাগর রত্নার কাছে ফিরে এসেছে। গত তিনদিন সে বিভার মৃত্যুশয্যায় ছিল। চতুর্থদিন ভোরে বিভার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে সাগরের হাতটি শক্ত করে ধরে ছিল। বিভার সেই বিষণ্ণ মুখ, করুণ চোখ সাগরকে বেদনাহত করে। বিষণ্ণ সাগরকে রত্না সান্ত্বনা দেয়। রত্না সাগরকে বিশ্রাম নিতে বলে। কিছুক্ষণ পর প্রিয়ব্রত এসে সাগরকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে তার পরিচয় জানতে চাইলে রত্না সাগরের পরিচয় দিয়ে বলে, সে তাকে ভালবাসে এবং সাগরকে নিয়ে সে নূতনভাবে বাঁচতে চায়। প্রিয়ব্রত তাকে আশীর্বাদ করে। (তৃতীয় পর্ব—১-৪ দৃশ্য সংখ্যা)—ক্ষণিক বিরতি

সাগর বাড়ী ফিরে এলে সীতা তাকে বলে, সাগর ও সীতার বিবাহের ব্যাপারে তার বাবা মা রাজী হয়েছেন, শুধু সাগর সম্মতি দিলেই শুভকাজটি সম্পন্ন হবে। সীতা এও জানায়, তার বাবা সাগরের জন্য একটা চাকুরির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কিন্তু সাগর জানায়, তারপক্ষে এ বিবাহ করা সম্ভব নয়, সে রত্নাকে ভালবাসে। প্রত্যাখ্যাতা সীতা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সাগর ফোনে রত্নাকে সব কিছু জানায়।

কিছুক্ষণ পর সীতা রত্নার কাছে আসে। সে বলে, সাগরকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে জানে রত্নাই সাগরকে এ বিবাহে সম্মত করাতে পারে। রত্না প্রথমে এ প্রস্তাবে রাজী না হলেও সীতার অশ্রুভরা চোখের দিকে তাকিয়ে তাকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। সীতা চলে গেলে সে সাগরকে ফোনে জানায়—সে অত্যন্ত খারাপ মেয়ে সুতরাং সাগর যেন তাকে ত্যাগ করে সীতাকে বিবাহ করে। সাগর কিছু বুঝতে না পেরে তার কাছে আসছে বলে জানায়। রত্না বিভাসকে ফোন করে তার কাছে আসতে বলে। ইতোমধ্যে অবিনাশ এলে তাকে রত্না একশ টাকার একটা নোট দিয়ে তাকে পুনরায় বিরক্ত করতে বারণ করে। সেই সময় বিভাস চৌধুরী এসে অবিনাশকে দেখে বলে সে তার কাছ থেকে রত্নাকে লেখা তার প্রেমপত্র দেখিয়ে একহাজার টাকা আদায় করেছে অবশ্য সেও তার বিনিময়ে চিঠিগুলি নিয়ে নিয়েছে। অবিনাশের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবাহ না হওয়ায় সে বিবাহ্ অসিদ্ধ—একথা বলে বিভাস রত্নাকে আশ্বাস দেয়। রত্না তখন এক গোছা নোট অবিনাশের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে বলে।

এরপর সে মদের সরঞ্জাম নিয়ে আসে ও মদ খাওয়া শুরু করে। সাগরকে দূর থেকে আসতে দেখে রত্না বিভাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। তারপর হঠাৎ যেন সাগরকে দেখতে পেয়েছে এমনভাব দেখিয়ে সাগরকে বিভাসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে যায়। সাগর রত্নার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে যায়। রত্নার উদ্দেশ্য সফল হয়। কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে বিভাস চলে যায়। সাগর ফিরে আসে ও রত্নাকে তার অদ্ভুত আচরণের কারণ

জিজ্ঞাসা করে। রত্না উত্তরে বলে, সে নষ্টমেয়ে, তাই তার পক্ষে এ ধরণের আচরণ করাই স্বাভাবিক সুতরাং সাগেরর উচিত সীতার মত লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্না মেয়েকে বিবাহ করা। ক্রুদ্ধ সাগর রত্নার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রত্না এরপর আত্মহত্যা করে দুর্বিসহ জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য অনেকগুলি ঘুমের বড়ি নিয়ে যেই খেতে যায় সেই সময় প্রিয়ব্রত এসে বড়িগুলি কেড়ে নেয়। সে বলে, সমস্ত পরিবার রত্নার মুখের দিকে চেয়ে আছে। সুতরাং রত্নার মরা চলবে না। সে আরো বলে, ভগবান পৃথিবীতে একদলকে গড়েন শুধু পরের সুখের জন্য, জীবন উৎসর্গ করার জন্য। গভীর কষ্টে রত্না বলে, সে আর নিজের সুখের কথা ভাববে না, শুধু পরের জন্য যন্ত্রের মত অর্থ উপার্জন করবে এবং তার হৃদয়-যন্ত্রণা ঢাকতে সে খুব জোরে হাসতে শুরু করে। কিন্তু একসময় সেই হাসি কান্নায় পরিণত হয়। (চতুর্থ পর্ব—১-৬ দৃশ্য সংখ্যা)—সম্পূর্ণ বিরতি।

● বৃত্ত-গঠন

এই নাটকের দুটি বৃত্ত।

সমাজের প্রতিকূল পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক কারণে রত্না ও সাগরের ভালোবাসা সার্থকতা লাভ করে না—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

এই নাটকের প্রাসঙ্গিক বৃত্ত চারটি।

(ক) সাগরকে কেন্দ্র করে সীতার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন রচনা, সাগর কর্তৃক তাকে প্রত্যাখ্যান, বিবাহ ব্যাপারে সীতার রত্নাকে অনুরোধ ও রত্নার সে অনুরোধ রক্ষা।

(খ) মৃত্যু পথযাত্রী কন্যা বিভাকে শেষ দেখা দেওয়ার জন্য সাগরকে ক্ষেত্রনাথের অনুরোধ, সাগরের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান, রত্নার অনুপ্রেরণায় সাগরের বিভার কাছে গমন, বিভার মৃত্যুর পর সাগরের রত্নার কাছে ফিরে আসা।

(গ) রত্নার স্বামী অবিনাশের ভয় প্রদর্শন করে রত্নার কাছ থেকে অর্থ আদায় ও শেষ পর্যন্ত বিভাস চৌধুরীর সহায়তায় রত্নার অবিনাশের কাছ থেকে মুক্তি লাভ।

(ঘ) প্রিয়ব্রতর সেবাদর্শ, তার অসুখী বিবাহিত জীবন, বিবাহ বিচ্ছেদ, প্রেমে ব্যর্থ রত্নার আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় তার বাধাদান ও রত্নাকে নূতনভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার অনুপ্রেরণা দান।

● অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও চরিত্র

এখানে অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য নেই। তবে দৃশ্যের কিছু কিছু অংশ নাট্যকাহিনীর অগ্রগতির সহায়ক নয়। যেমন, সেবার দাদা বিষাণের সঙ্গে সেবার কথোপকথন অংশ (প্রথম পর্ব), বিষাণের সঙ্গে রত্নার কথোপকথন (প্রথম পর্ব), বিষাণের সঙ্গে রত্নার কথোপকথন (দ্বিতায় পর্ব)।

এই নাটকে বিষাণ চরিত্রটি অপ্রয়োজনীয়।

● নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

John Howard Lawson-এর তত্ত্বের ভিত্তিতে 'দ্বিধা' নাটককে নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম প.্যায়ে মূল ঘটনা ও নাট্য চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। সাগর ও রত্নার সামাজিক পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি ভুল টেলিফোনের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে এক সুমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠা এবং সাগরের প্রতি অনুরক্তা সীতা, রত্নার পূর্বজীবন (প্রথম পর্ব) বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী সূচিত হয়েছে। এটি নাটকের সূচনা অংশ (exposition)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, রত্নার কথা গোপন করায় সাগরের প্রতি সীতার অভিমান, সাগরের তথাকথিত শ্বশুর ক্ষেত্রনাথের মৃত্যু পথযাত্রী কন্যা তথা সাগরের স্ত্রী বিভাকে শেষ সাক্ষাতের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান, পরে রত্নার অনুরোধে সাগরের বিভার কাছে গমন (দ্বিতীয় পর্ব), রত্নার স্বামী অবিনাশের অর্থ আদায় করার জন্য রত্নাকে লেখা বিভাস চৌধুরীর প্রেমপত্র রত্নার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া, বিভার মৃত্যুর পর সাগরের রত্নার কাছে ফিরে আসা, প্রিয়ব্রতর কাছে রত্নার সাগরের প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা জ্ঞাপন (তৃতীয় পর্ব)—এ সব ঘটনার দ্বারা নাট্যক্রিয়া অগ্রসর (rising action) হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে সংঘাতের (clash) অবতারণা করা হয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী বিভাকে কেন্দ্র করে ক্ষেত্রনাথের সঙ্গে সাগরের সংঘাত (দ্বিতীয় পর্ব), সীতাকে বিবাহ করতে অসম্মত হলে সীতার সঙ্গে সাগরের সংঘাত (চতুর্থ পর্ব) এই পর্যায়ে দেখানো হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়ে রত্নার সাগরকে সীতার কাছে ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি, সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সাগরের সামনে দুশ্চরিত্রা নারীর অভিনয় করা ও ক্রুদ্ধ সাগরের ফিরে যাওয়ায় রত্নার আত্মহননের প্রচেষ্টা, এই কার্যে প্রিয়ব্রতর বাধা দান এবং পরাজয়ের গ্লানিতে রত্নার কান্নায় ভেঙ্গে পড়া—এ সব ঘটনায় (চতুর্থ পর্ব) নাট্য-কাহিনীর চূড়ান্তরূপ (climax) লক্ষ্য করা যায়। এখানে কাহিনী সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দর্শক ও পাঠকের কৌতূহলের অবসান ঘটে।

যাত্রা-নাটক ॥

সুরা-নারী-সিংহাসন

এই নাটকটি অঙ্ক-দৃশ্যের সমবায়ে গড়ে উঠেছে। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য রয়েছে।

এটি লোকনাট্য বলে নাট্যকার জনসাধারণের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে সংগীত ও আবেগমূলক সংলাপ (clapping dialogue) ব্যবহার করেছেন।

● **ঘটনা-সংযোজন**

উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত নেতা দিব্বোক গৌড়ের অত্যাচারী রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে পদচ্যুত করার জন্য কৈবর্তদলকে সংঘবদ্ধ করতে থাকেন। দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম এই ব্যাপারে দিব্বোকের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ভীমের পত্নী ময়না ভীমের এ ধরণের কাজের জন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, তাঁদের মত সাধারণ মানুষের রাজা মহারাজার ব্যাপারে অংশগ্রহণ না করাই ভালো। সে কথা শুনে ক্রুদ্ধ ভীম তাঁকে প্রহার করেন। আত্মমর্যাদাসম্পন্না ময়না গৃহত্যাগ করতে চাইলে দিব্বোকের স্ত্রী তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, স্বামীর ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে সব স্ত্রী-ই প্রহার লাভ করে থাকেন, সেজন্য কোন স্ত্রীর গৃহত্যাগ করা অনুচিত। তাছাড়া ভীম যদি দ্বিতীয় মহীপালকে পদচ্যুত করে দিব্বোককে রাজা করেন তবে তিনি দিব্বোকের স্ত্রী হিসেবে রাণী হবার যোগ্যতা অর্জন করবেন। সুতরাং ভীম উপযুক্ত কাজই করছেন। ইতোমধ্যে দিব্বোক ময়নার প্রহারের খবর জানতে পেরে ভীমকে ভর্ৎসনা করেন। বিরক্ত ভীম ময়নাকে বলেন, অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। ময়না তার উত্তরে বলেন, রাজার সঙ্গে বিরোধ বাঁধলে তাঁদের সংসারের সুখটুকু চলে যাবে। সে কথায় ক্ষীপ্ত ভীম ময়নাকে জানান, যে মেয়ে দেশের দশজনের কথা চিন্তা না করে কেবল নিজের সুখ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাঁর সঙ্গে তিনি কোন সম্পর্ক রাখতে চাননা। তারপর তিনি ময়নাকে পদাঘাত করেন ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। ময়না কাঁদতে কাঁদতে বলেন, তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তবে তাঁর বিশ্বাস, স্বামীর সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হবে, তবে পুনরায় পদাঘাত লাভের জন্য নয়, পদাঘাত থেকে স্বামীকে বাঁচাবার জন্য। ময়না ছুটে বেরিয়ে যান। সে সময় ভীমের আত্মীয় হরিদাস এসে সব কথা শুনে ভীমকে বলেন, ময়নাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা ভীমের উচিত হয়নি। কারণ ময়না আগুন। হয়তো একদিন তিনি সমস্ত দেশে দাবানল জ্বালিয়ে দেবেন। (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

সুন্দরী ময়নাকে পথে একাকিনী পেয়ে রাজশ্যালক শেখর রাজসেনা ঈশানগুপ্তের সহায়তায় তাঁকে জোর করে তাঁর গৃহে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। সে সময় রাজমহিষীর ব্রত উদ্‌যাপনের ভোজ খেয়ে বৃদ্ধ সপ্ততীর্থ ও যুবক অপূর্ব কুমার ন্যায়রত্ন নামে দুই ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরছিলেন। ময়না ছুটতে ছুটতে তাঁদের সামনে এসে পড়েন। বিপন্ন নারীকে রক্ষা করার জন্য নিরস্ত্র ন্যায়রত্ন এগিয়ে আসেন। শেখরের নির্দেশে ঈশান তাঁকে অস্ত্র দিলে ন্যায়রত্ন অস্ত্রের আঘাতে শেখরকে পরাভূত করেন। পরাজিত শেখর নতমস্তকে বিদায় নেন। ঈশান যাবার জন্য অগ্রসর হলে ন্যায়রত্ন তাঁকে অস্ত্র ফেরৎ দেন। অস্ত্র পেয়ে সুযোগ সন্ধানী ঈশান তৎক্ষণাৎ অসতর্ক ন্যায়রত্নকে আহত করে ময়নাকে নিয়ে বেরিয়ে যান। সে সময় দীপঙ্কর নামে জীর্ণবাস পরিহিত পাগল গান গাইতে গাইতে সেখানে আসেন এবং আহত ন্যায়রত্নকে দেখে তাঁকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে চলে যান। (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

সেদিন দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা রামপালের জন্মদিন। তিনি মহীপালমহিষী কঙ্কাবতীকে প্রণাম করলে শৌর্যে বীর্যে পরাক্রমে রামপাল যেন ভারত বিজয়ী রাজা হন একথা বলে তিনি আশীর্বাদ করলেন। তিনি বললেন, খন্ডবিখন্ড ছিন্নভিন্ন ভারতকে একতাবদ্ধ করার জন্য একজন সার্বভৌম রাজার প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহীপাল যেভাবে অত্যাচার করে চলেছেন, তাতে শীঘ্র এক গণ-বিপ্লব সংঘটিত হবে বলে তাঁর আশঙ্কা এবং সেই বিপ্লব জেগে ওঠার পূর্বেই রামপাল যেন নিজশক্তিবলে তার কণ্ঠরোধ করতে পারেন। তিনি আরো বললেন, উত্তরবঙ্গের বিশাল কৈবর্ত সমাজের অসন্তোষের কথা তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। সে সময় রামপালের পত্নী অঙ্গনা আসেন। দ্বিতীয় মহীপালের নিন্দার তিনি প্রতিবাদ করেন। তাঁর ধারণা, কঙ্কাবতী ও রামপাল অকারণে তাঁর দেবতুল্য ভাসুরের নিন্দা করছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মন্ত্রী চক্রপাণি অন্তঃপুরে এসে অপূর্ব ন্যায়রত্ন দ্বারা জ্ঞাত ময়না অপহরণ কাহিনী বিবৃত করেন। সে কথা শুনে অঙ্গনা মাথা নত করলেন। অপূর্বর বীরত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য কঙ্কাবতী রামপালের রক্ষী ও বন্ধুরূপে তাঁকে নিযুক্ত করলেন। (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে চক্রপাণি প্রজাদের অসন্তোষের কথা জানালে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, ঈশ্বর তাঁকে প্রজাপালন করতে পাঠিয়েছেন, তাঁর শাসনে প্রজারা অসন্তুষ্ট হলে তিনি অপারক। সেনাপতি বজ্রসেন তাঁর কুকর্মের সঙ্গী। কাঞ্চন নগরের জমিদার রুদ্রেশ্বর রাজার কাছে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন। মহীপাল সে অভিযোগ অগ্রাহ্য করেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন প্রজা অভিযোগ করতে পারবেন না বলে তিনি চক্রপাণিকে আদেশ দেন। এরপর বললেন, তবে প্রজারা চক্রপাণি, রামপাল ও কঙ্কাবতীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন। সে কথায় অপমানিত মন্ত্রী পদত্যাগ করতে চাইলে মহীপাল তা অনুমোদন করলেন। চক্রপাণি অসময়ে পদত্যাগ করলে রাজ্য পরিচালনায় অসুবিধা হবে বলে বজ্রসেন আশঙ্কা প্রকাশ করলে মহীপাল তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, চক্রপাণি তাঁর পিতা তৃতীয় বিগ্রহপালের বন্ধু। তৃতীয় বিগ্রহপাল মারা যাবার সময় তাঁকে বাল্যকালে চক্রপাণির হাতে সঁপে দিয়ে যান। সুতরাং তাঁর বিশ্বাস,

তিনি অনুরোধ করলে চক্রপাণি পুনরায় মন্ত্রীপদে ফিরে আসবেন। বজ্রসেন মন্ত্রীমশায়ের সততায় সন্দেহপ্রকাশ করলে মহীপাল ঘৃণার সঙ্গে তাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। সে সময় শেখর এসে জানালেন, তিনি একটি সুন্দরী কৈবর্ত রমণী উপহার স্বরূপ রাজার কাছে এনেছেন। রাজার আদেশে ময়নাকে সেখানে আনা হল। ময়নার রূপ দেখে রাজা মোহিত হয়ে গেলেন। ক্রুদ্ধা ময়না প্রথমেই শেখর ও ঈশানকে সেখান থেকে বিতাড়িত করার জন্য রাজাকে অনুরোধ করলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তা পালন করলেন। এরপর মহীপাল তাঁর হাত ধরলেন। ময়না আত্মরক্ষার্থে রাজার হাত কামড়ে দিলেন। আঘাত পেয়ে ক্রুদ্ধ মহীপাল ময়নাকে পদাঘাতের পর পদাঘাত করতে লাগলেন। হঠাৎ সেখানে কঙ্কাবতী উপস্থিত হলে তিন সরে দাঁড়ান। কঙ্কাবতী বললেন, তিনি এতদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণাবোধ করতেন, কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি হয়তো তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারবেন না। তারপর তিনি ভূপতিতা ময়নাকে তুলে ধরে বললেন, ময়না তাঁর মহলে থাকবেন। মহীপাল আপত্তি জানিয়ে বললেন, কঙ্কাবতী তাঁর কাজে বাধা দিলে তিনি কঙ্কাবতীকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। কঙ্কাবতী বললেন, মহারাজ তাঁকে হত্যা করতে পারেন না, কারণ তাঁর সঙ্গে রক্ষাকর্তা আছেন। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র রামপাল প্রবেশ করলেন। কঙ্কাবতী ময়নাকে নিয়ে চলে গেলেন। রামপাল, কঙ্কাবতী ও ময়নার বিচারের জন্য ক্রুদ্ধ মহীপাল সভা ডাকতে আদেশ দিলেন। (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

ভরতপুরের প্রজারা তাঁদের অভিযোগ নিয়ে রাজসভায় এসেছেন। তাঁদের দাবী, মহারাজ তৃতীয় বিগ্রহপাল যে জমির উৎপন্ন শস্যের চারভাগের একভাগ রাজস্ব হিসেবে নেবার বন্দোবস্ত করেছিলেন, বর্তমান রাজা তার পরিবর্তন করে উৎপন্ন শস্যের তিনভাগ যে রাজস্ব হিসেবে জমা দেবার আদেশ দিয়েছেন গরীব প্রজার পক্ষে সে ভার বহন করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় মহীপাল রাজস্ব বিষয়ে পিতার কার্যের সমালোচনা করলে চক্রপাণি মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিয়ে রাজসভা ত্যাগ করেন। মহীপাল তখন রাজকোষাধ্যক্ষ অনন্ত বিক্রমকে মন্ত্রীত্বের ভার দিলেন। তারপর ময়নাকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার অপরাধে কঙ্কাবতী ও রামপালকে নির্বাসন দিলেন। তাঁদের নির্বাসনদণ্ড রদ করার জন্য ময়না স্বেচ্ছায় মহীপালের শয্যাসঙ্গিনী হতে চাইলেন কিন্তু কঙ্কাবতী বললেন, ময়না যেহেতু তাঁর আশ্রিতা সেই কারণে তাঁরা তাঁকে ত্যাগ করতে পারেন না এবং আশ্রিতা বলেই ময়নার নিজস্ব মতামতের কোন মূল্য নেই। কঙ্কাবতী মহারাজকে ধিক্কার দিয়ে রামপাল ও ময়নাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। যাবার আগে মহীপালকে ঘোর আচ্ছন্নতা থেকে জেগে ওঠার জন্য তিনি অনুরোধ করে গেলেন। (প্রথম অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য—যবনিকা)

দিব্বোক দীপঙ্করকে জানালেন, ময়না চলে যাবার পর কৈবর্তজাতির মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। দীপঙ্কর বললেন, শুধু নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনলে চলবে না, মহীপালের অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। কথাপ্রসঙ্গে দীপঙ্কর জানালেন, তিনি দ্বিতীয় মহীপালের অন্তঃপুরে ময়নাকে দেখেছেন এবং ময়নার কারণে কঙ্কাবতী রামপাল নির্বাসিত। তাঁদের সঙ্গে ময়না যে গমন করেছেন সে কথাও বললেন। ভীম তখন মহীপালকে সিংহাসনচ্যুত করে দিব্বোককে সে স্থানে বসাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন।

দিবেবাক চলে গেলে ভীম তাঁর মাসতুত ভাই হরিকে বলেন, মহীপালের অন্তঃপুরে যাওয়ায় ময়নার সতীত্ব গেছে সুতরাং তাঁর পক্ষে তাঁকে নিয়ে সংসার করা সম্ভব নয়। সে কথায় হরি রাগান্বিত হয়ে বললেন, সম্ভবত তিনি ময়নার রূপ যৌবনই দেখেছেন, তাঁর মত স্ত্রীরত্ন পাওয়া ভীমের মত ব্যক্তির পক্ষে সৌভাগ্য ব্যতীত কিছু নয়। (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

মহীপাল ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের কোন প্রজা যদি নির্বাসিত কঙ্কাবতী ও রামপালকে কোন অবস্থাতে আশ্রয়দান, আহার্য প্রদান অথবা তাঁদের সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যালাপ করেন তবে তাঁকে প্রাণদন্ড দেওয়া হবে। পথশ্রমে ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত কঙ্কাবতী ও রামপালকে তাই কোন প্রজা জল দিতে সাহস পাচ্ছেন না। ময়না জলের সন্ধানে গেছেন, তখনো ফেরেননি। মহারাণীর কষ্ট দেখে দুর্গা নামে এক যুবক প্রাণের ভয় ত্যাগ করে জল আনতে গেলেন। কঙ্কাবতী রামপালকে বললেন, রাজার অত্যাচার মানুষ আর বেশিদিন সহ্য করবে না; পথে যেতে যেতে তিনি প্রতিটি প্রজার মুখে বিপ্লবের আগুন দেখেছেন সুতরাং রাজার ধ্বংস অনিবার্য। (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

দুর্গা কঙ্কাবতীর জন্য জল আনছেন। পথে ঈশানগুপ্তের সঙ্গে দেখা। তিনি তার জলের পাত্র ফেলে দিলেন ও তাঁকে বন্দী করলেন। ইতোমধ্যে সেখানে রামপাল ও কঙ্কাবতী এলে ঈশান তাঁদের বললেন, সূর্য অস্ত যেতে এক দন্ড বাকী অথচ সীমান্ত অনেকদূর, এরমধ্যে সীমান্ত না পেরোতে পারলে তাঁদের বন্দী করা হবে বলে সেনাপতি বজ্রসেন বলে পাঠিয়েছেন। কঙ্কাবতী রামপালকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান। রামপাল সে অনুরোধ মানলেন না। সে সময় ময়নাকে নিয়ে শেখর সেখানে উপস্থিত হলেন। ময়না জানান, পথে শেখর তাঁকে বলেছেন যে তিনি যদি রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করেন তবে মহারাজা যুবরাজ ও মহারাণীকে ক্ষমা করবেন। তাই তিনি শেখরের সঙ্গে রাজার কাছে আত্মসমর্পণের জন্য চলেছেন। কঙ্কাবতী ও রামপাল সে প্রস্তাবে রাজী হলেন না। অকস্মাৎ সে স্থানে মহীপালের আবির্ভাব হল। তিনি বললেন, সূর্য অস্তমিতপ্রায় অথচ তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেননি সুতরাং তাঁরা তাঁর হাতে বন্দী। তারপর ময়নাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে ময়না সেই প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তিনি ভেবেছিলেন মহীপালের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে বিষ খাইয়ে তাঁকে হত্যা করে প্রজাদের মঙ্গলসাধন করবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কঙ্কাবতী ও রামপাল তাঁকে যেতে না দেওয়ায় তিনি সেই চিন্তা ত্যাগ করেছেন। ময়নার তেজ-দীপ্ত কথা শুনে মহীপাল চমৎকৃত হয়ে বললেন, ময়নার মত মেয়েই তাঁর প্রয়োজন। এরপর কঙ্কাবতী ও রামপাল অগ্রসর হলে ময়নাও প্রস্থানোদ্যত হলেন। মহীপাল সেই মুহূর্তে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। হঠাৎ সেখানে কৈবর্ত সেনাপতি হরিদাস বিদ্যুদ্বেগে এসে দাঁড়ালেন ও ময়নাকে ত্যাগ করতে মহারাজাকে অনুরোধ করলেন। মহীপাল তাঁকে ছেড়ে দিলে ময়না রামপালের সন্ধানে ছুটলেন। হরিদাস তারপর মহীপালকে বললেন, একদিন পর তাঁরা রাজধানী আক্রমণ করবেন, সে সময় মহারাজার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। বর্তমানে মহারাজা নিরস্ত্র বলে তিনি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না। (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)।

শেখর সুযোগ বুঝে অন্তঃপুরে গিয়ে রামপালের পত্নী অঙ্গনাকে প্রেমনিবেদন করলে অঙ্গনা তা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করলেন। শেখর তখন তাঁর ওপর বলপ্রয়োগ করতে যান সে সময় মহীপাল প্রবেশ করেন ও অঙ্গনাকে উদ্ধার করেন। অঙ্গনা সেখান থেকে চলে গেলে মহীপাল তাঁকে দুর্নীতির অপরাধে অভিযুক্ত করলেন। শেখর যে বিশ হাজার সৈন্যকে যুদ্ধশিক্ষা দেবার নাম করে দুবছর ধরে প্রতিমাসে প্রচুর অর্থ বেতন হিসেবে নিচ্ছিলেন ও কার্যত কোন সৈন্যবাহিনী গঠন করেননি, সে কথার উল্লেখ করে মহীপাল তাঁর শাস্তিস্বরূপ শত্রুদলের সঙ্গে সর্বপ্রথম অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে তাঁকে আদেশ দেন। এরপর বজ্রসেন এলে তাঁকে বললেন, কৈবর্তদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর রাজত্বের অবসান ঘটবে তবে কৈবর্ত শাসন বেশিদিন চলবে না কারণ রামপাল খবর পেলেই তাঁদের পরাভূত করে পুনরায় সিংহাসন অধিকার করবেন। পথশ্রমে কঙ্কাবতীর যে মৃত্যু হয়েছে সে সংবাদ তাঁর গোচর হয়েছে বলে তিনি বজ্রসেনকে জানান। সে সময় চক্রপাণি যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চাইলে তিনি তাঁকে নিবৃত্ত করে ঘরে বসে নগর রক্ষা করতে বললেন। এদিকে অঙ্গনা রামপালের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মহীপালের আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এরপর মহীপাল যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য—যবনিকা)

যুদ্ধক্ষেত্রে শেখর হরিদাসের অস্ত্রের আঘাতে পরাভূত। তিনি হরিদাসকে পরামর্শ দেন, যুদ্ধ না করেই দিব্বোক সিংহাসন অধিকার করতে পারেন কারণ রাজধানী অরক্ষিত, তিনি তাঁদের সেখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। তার পরিবর্তে তিনি অঙ্গনাকে চান। হরিদাস সে প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন ও শেখরকে অস্ত্রের আঘাতে ধরাশায়ী করেন। সেই সময় দিব্বোক এসে জানান, মহীপালের আক্রমণের সামনে কোন বীর দাঁড়াতে পারছেন না, তিনি পরাভূত এবং ভীম তাঁর সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ করতে পারবেন তা বলা যায় না, হরিদাস যেন মহীপালের আক্রমণের প্রতিরোধ করেন। হরিদাস মহীপালের কাছে যান এবং যুদ্ধ করতে শুরু করেন। সে সময় পাগল দীপঙ্কর পশ্চাৎ থেকে মহীপালকে ছুরিকাঘাত করলে মহীপাল আর্ত চীৎকার করে পড়ে যান। দীপঙ্কর বলেন, মহীপাল তাঁর স্ত্রী মহামায়াকে অপহরণ করলে মহামায়া আত্মহত্যা করেন। সেই হত্যার প্রতিশোধ নিতে তিনি মহীপালকে আঘাত করেছেন। মহীপাল বললেন, মহামায়ার প্রতি তাঁর লোভ ছিল ঠিকই, কিন্তু অপহরণ করার পর তিনি যখন তাঁকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করেন তখন তিনি তাঁকে সসম্মানে ফিরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু শেখর সেই রাত্রে তাঁর সর্বনাশ করলে মহামায়া আত্মহত্যা করেন। সুতরাং দীপঙ্করের উচিত শেখরকে খুঁজে বের করা। দীপঙ্কর তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। হরিদাস গুরুতরভাবে আহত মহীপালকে তাঁর শিবিরে পৌঁছে দিতে চাইলে মহীপাল তাঁকে বারণ করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তের কোন এক গাছতলায় শুইয়ে দিতে বললেন, কারণ সেখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করতে চান। (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

মাতুলালয়ে রামপাল রয়েছেন। বজ্রসেন এসে খবর দিলেন, মহীপাল দুমাস পূর্বে মারা গেছেন। তিনি পদব্রজে নানা সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে এতদিন পর পৌঁছতে পেরেছেন। তিনি জানালেন, মহীপাল পরাভূত হলে দিব্বোক দাস সিংহাসনে বসেন, তাঁর মৃত্যু হওয়ায় বর্তমানে ভীমদাস রাজত্ব করছেন। এরপর তিনি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য রামপালকে যুদ্ধ করতে অনুরোধ করলেন। রামপাল নিরুৎসাহের সঙ্গে বললেন, দাদা, বৌদি, অঙ্গনা কেউ বেঁচে নেই। সুতরাং তিনি কিসের আশায় রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে যাবেন। সে সময় অঙ্গনা এসে প্রবেশ করেন এবং তিনি যে স্বামীর কাছে ফিরে

আসার জন্য যাত্রা শুরু করেছিনেল সে কথা জানান। তাছাড়া মহীপাল যে রামপালকে গৌড়ের সিংহাসন উদ্ধারের অনুরোধ জানিয়েছেন সেটিও জ্ঞাত করেন। রামপাল সে কথা শুনে গৌড় যাত্রা করবেন বলে মনস্থির করলেন। ময়না সব ঘটনা শুনে ভীমদাসকে পদচ্যুত করতে রামপালকে যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। ময়নার উৎসাহ দেখে রামপালেব কেমন সন্দেহ হয়। তিনি ভীমদাসের সঙ্গে ময়নার কোন সম্পর্ক আছে কিনা সে কথা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন। উত্তরে ময়না বলেন, সময়মত সে কথা তাঁকে তিনি জানাবেন। (তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য—যবনিকা)

গৌড়ের রণভূমিতে যুদ্ধে রামপালের সঙ্গী ন্যায়রত্ন পরাভূত হয়েছেন। মৃত্যুপথযাত্রী ন্যায়রত্ন রামপালের শুভকামনা করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন। এরপর রামপাল ও হরিদাসের যুদ্ধ শুরু হলে হরিদাস নিহত হন। এদিকে ভীমদাস তাঁর স্ত্রী ময়নাকে পেয়ে মহীপাল-পরিবারের রক্ষিতা ভেবে তাঁকে হত্যা করতে যান। সে সময রামপাল এসে বাধা দেন ও তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। যুদ্ধে ভীমদাস পরাভূত হন। পরাজিত ভীমদাসকে রামপাল পদাঘাত করতে গেলে ময়না ছুটে এসে সেই পদাঘাত নিজদেহে গ্রহণ করে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চান এবং ভীমদাস যে তাঁর স্বামী সে গোপন কথাটি রামপালকে জানান। রামাপল ভীমদাসের ভ্রান্তধারণা দূর করে বলেন, ময়না তাঁর বোনের মত। ভীম নিজের ভুল বুঝতে পেরে ময়নার কাছে ক্ষমা চান। এরপর ময়না তাঁর হাত থেকে গৌড়ের রাজমুকুট গ্রহণ করার জন্য রামপালকে অনুরোধ করেন। রামপাল ময়নার হাত থেকে রাজমুকুট মাথায় তুলে নেন। ময়না ও ভীমদাস বামপালকে প্রণাম করেন। (তৃতীয অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য—যবনিকা)

● **বৃত্ত-গঠন**

এই নাটকে দুটি বৃত্ত।

সুরা নারীতে আসক্ত গৌড়ের রাজা দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে কৈবর্ত সর্দার দিব্বোকের তাঁকে পরাজিত করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার ও রামপাল কর্তৃক সিংহাসন পুনরুদ্ধার—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তের সহায়তায় এসেছে—

ভীমদাস-ময়না-উপকাহিনী, কঙ্কাবতী-রামপাল-অঙ্গনা-উপকাহিনী, শেখর-ঈশান-অপূর্ব কুমার-চক্রপানি-উপকাহিনী, দীপঙ্কর-উপকাহিনী।

● **অপ্রয়োজনীয় অংশ ও চরিত্র**

এই নাটকে কোন অপ্রয়োজনীয় অংশ বা চরিত্র নেই।

● **নাট্যক্রিয়ার বিভাগ**

Lewis Campbell-এর নাট্যগঠনত্ত্ব (parabola structure) এই নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

গৌড়ের অত্যাচারী রাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে কৈবর্ত-সর্দার দিব্বোকের নেতৃত্বে কৈবর্তদের বিদ্রোহ, দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের সুন্দরী স্ত্রী ময়নার এ ব্যাপারে আপত্তি এবং সেই কারণে অসন্তুষ্ট ভীমের স্ত্রীকে পদাঘাতের দ্বারা গৃহ থেকে বহিষ্কারে (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য) নাটকের সূচনা (opening)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কাহিনী ঊর্ধ্বমুখী (climax) হয়েছে। পথে সঙ্গীহীন ময়নাকে রাজশ্যালক শেখরের অপহরণ-প্রচেষ্টা, ময়না রক্ষার্থ অপূর্ব কুমার ন্যায়রত্নের শেখরকে আক্রমণ, পরাভূত শেখরের পলায়ন, নিরস্ত্র অপূর্ব কুমারকে অস্ত্রাঘাতে আহত করে শেখরের সঙ্গী ঈশান গুপ্তের ময়নাকে অপহরণ (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), দ্বিতীয় মহীপালের পত্নী কঙ্কাবতী ও রামপালের কাছে ন্যায়রত্নের ময়না অপহরণ ঘটনা বর্ণন, ন্যায়রত্নের সততা ও বীরত্বের জন্য তাঁকে রামপালের রক্ষী ও সঙ্গীরূপে কঙ্কাবতীর নিযুক্তিকরণ (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য), প্রজাদের অভিযোগ অগ্রাহ্য করে কুচক্রান্তকারী সুযোগসন্ধানী অনুচরদের দ্বিতীয় মহীপালের সমর্থন, রাজার কাছে শেখরের ময়নাকে আনয়ন, রাজা ময়নার হস্তধারণ করলে ময়নার প্রতিরোধ ও রাজার তাঁকে পদাঘাত, রাণী কঙ্কাবতীর আবির্ভাব ও ময়নাকে উদ্ধার করে তাঁকে নিয়ে অন্তঃপুরে গমন, কঙ্কাবতী, রামপাল ও ময়নাকে শাস্তি দেবার জন্য ক্রুদ্ধ রাজার বিচারসভা আহ্বান (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য), পিতার সম্পর্কে মহীপাল বিরূপ সমালোচনা করায় মন্ত্রী চক্রপাণির পদত্যাগ, কঙ্কাবতী, রামপালকে রাজার নির্বাসন দণ্ডদান, কঙ্কার ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া (প্রথম অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য), রাজার বিরুদ্ধে কৈবর্ত প্রজাদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য), রাজার ভয়ে নির্বাসিত কঙ্কাবতী, রামপাল, ময়নাকে প্রজাদের সাহায্য দানে অস্বীকৃতি (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), সূর্যাস্তের পূর্বে দেশত্যাগ করতে স্ত্রী ও ভ্রাতাকে আদেশ দানের জন্য মহীপালের তাঁদের কাছে আগমন, স্ত্রী ভ্রাতা প্রস্থান করলে গমনোদ্যত ময়নাকে রাজার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করা, অকস্মাৎ সেখনে কৈবর্ত সেনাপতি হরিদাসের আবির্ভাব ও ময়নাকে উদ্ধার, নিরস্ত্র রাজার সঙ্গে হরিদাসের যুদ্ধ করার অনিচ্ছা প্রকাশ (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য), রাজ অন্তঃপুরে রামপালপত্নী অঙ্গনার ওপর শেখরের বলপ্রয়োগ-প্রচেষ্টা, মহীপালের অঙ্গনাকে মুক্ত করা ও শাস্তিস্বরূপ কৈবর্তদের সঙ্গে যুদ্ধে শেখরকে প্রথম অস্ত্র ধরার আদেশ দান, কঙ্কাবতীর মৃত্যুসংবাদ রাজার গোচরীভূত হওয়া, রামপালের উদ্দেশে অঙ্গনার যাত্রা, মহীপালের যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুতি (দ্বিতীয় অংক। চতুর্থ দৃশ্য) এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় পর্যায়ে এসেছে দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত রূপ (acme)। কৈবর্তদের সঙ্গে মহীপালের যুদ্ধ ও দীপঙ্কর কর্তৃক ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু, (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)—এই অংশটি নাট্যঘটনার শীর্ষবিন্দু।

কৈবর্ত সর্দার দিব্বোকের গৌড়ের সিংহাসন লাভ, তাঁর মৃত্যুর পর ভীমদাসের সিংহাসনে আরোহণ, দেশের চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাতুলালয়ে অবস্থানকারী রামপালের দেশ পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা, এ ব্যাপারে ময়নার রামপালকে উৎসাহদান ও স্বদেশযাত্রার প্রস্তুতির (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য) মধ্য দিয়ে নাট্য ঘটনা পরিণামমুখী (sequel) হয়েছে।

পঞ্চম বা শেষ পর্যায়ে ভীমদাসের কাছ থেকে রামপালের সিংহাসন পুনরুদ্ধার ও ময়নার হাত থেকে রাজমুকুট গ্রহণ করার (তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য) সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকাহিনীতে সমাপ্তি (close) নেমে এসেছে।

রাষ্ট্রবিপ্লব

পঞ্চাঙ্ক 'রাষ্ট্রবিপ্লব'-এর প্রথম অঙ্কে চারটি, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি, তৃতীয় অঙ্কে চারটি, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি, পঞ্চম অঙ্কে একটি দৃশ্য রয়েছে।

রাষ্ট্রবিপ্লব-এ লোকনাট্য সুলভ সংগীত ও সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে।

- **ঘটনা-সংযোজন**

গৌড়ের প্রান্তবর্তী পল্লীতে অমৃত কর্মকার নামে এক কৃষক কুসীদজীবী ঈশ্বর দত্তের কাছে ঋণ করেন কিন্তু সময়মত ঋণ শোধ করতে না পারায় ঈশ্বর তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির দখল নিতে আসেন। সে সময় গরীবের বন্ধু গোপালের অনুচর জীমূতবাহন সে কাজে বাধা দিলে তাঁকে আহত করে ঈশ্বর অমৃতের সর্বস্ব নিয়ে চলে যান। জীমূতবাহন অমৃতকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, একদিন গোপালদেবের নেতৃত্বে এই অত্যাচারের অবসান হবে। (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

গরীব বিধু প্রধানের সুন্দরী যুবতী কন্যা সোমাকে বাগানবাড়ীতে নিয়ে ভোগ করার জন্য লম্পট অত্যাচারী নীলু চক্রবর্তী তাঁর বাড়ী এসেছেন। বিধু প্রতিরোধ করতে গেলে নীলু তাঁকে পদাঘাত করে সরিয়ে দেন ও সোমাকে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে চলেন। সেই মুহূর্তে সোমার রক্ষাকল্পে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী দেদ্দা এসে নীলুর হাতের কব্জি কামড়ে দিলে প্রচণ্ড আক্রোশে তিনি তাঁকে ধাক্কা দেন। সে সময় সেখানে গোপালদেব উপস্থিত হন, দেদ্দা ছিটকে তাঁর বুকের ওপর পড়েন। গোপালদেব দেদ্দাকে সরিয়ে দিয়ে নীলুকে প্রচণ্ড প্রহার করেন ও সোমাকে মাতৃসম্বোধন করাতে তাঁকে বাধ্য করান। কৃতজ্ঞতায় সোমা গোপালদেবকে প্রণাম করেন। এরপর গোপালদেব দেদ্দাকে বলেন, যে নারী নিরস্ত্র হয়েও এক অবলাকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন, তিনি ভিখারিণী নন, মহারাণী, তিনি জাতির অধিনায়িকা হবার যোগ্য। দেদ্দাও গোপালদেবের রূপে গুণে শৌর্যে বীর্যে মুগ্ধ হন। (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

গৌড়ের মহারাজার ছয়মাস হল মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পক্ষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী সুদীপ্তা সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর অত্যাচারে রাজ্যের সর্বত্র অশান্তি ধূমায়িত হয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ প্রজা গোপালদেবের জয়ধ্বনি করে। সেই কারণে সুদীপ্তা গোপালকে শাস্তি দেবার জন্য দলের শ্রেষ্ঠ লাঠিয়াল ভৈরবকে পাঠিয়েছেন। ভৈরব দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাভূত হয়ে ফিরে এসেছে। ক্রুদ্ধা মহারাণী তাকে ভীরু বেইমান বললে অপমানিত ভৈরব সেই মুহূর্তে মহারাণীর চাকুরী ত্যাগ করে। এরপর মহারাণী গোপালকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রসেনকে নির্দেশ দেন। ইন্দ্রসেন তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে শেষ পর্যন্ত তাঁর নির্দেশ মেনে নেন। (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

গোপালদেব জীমূতবাহনের মুখে ঈশ্বর দত্তের অত্যাচারের কথা শুনে বলেন, মাৎস ন্যায়ের যুগ চলেছে বলে দেশে ধনী ব্যক্তিরা গরীবদের লাঞ্ছনা করছেন। তাঁদের অত্যাচার

থেকে দরিদ্রকে বাঁচাবার জন্য দেশের যুবশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। এরপর তিনি জীমূতবাহনকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন দেশের যুবকদের কাছে গিয়ে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে বলেন। তিনি আরো বলেন, তাঁর রাণীর সঙ্গে কোন বিবাদ নেই, তিনি শুধু অত্যাচারী ধনীদের নির্মূল করতে চান। সে সময় ভৈরব এসে তাঁর দলে যোগ দেয়। কথা বলতে বলতে গোপালদেবের জলতৃষ্ণা পেলে তিনি জীমূতবাহনকে জল আনতে বলেন। গোপল সেই জল মুখে দিতে যাবেন সেই মুহূর্তে দেদ্দা ছুটে এসে তাঁর হাত থেকে জলের ঘটি কেড়ে নেন এবং বলেন, মহারাণীর নির্দেশে তাঁর জলে তীব্র বিষ মেশানো হয়েছে—সেই সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটে এসেছেন। সে কথা শুনে গোপাল স্তম্ভিত হয়ে যান। দেদ্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় তাঁর মন ভরে ওঠে। তিনি দেদ্দাকে বলেন, তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য তবে দেদ্দার সামান্যতম উপকারে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

রাণী প্রদত্ত বিষে গোপালদেবের মৃত্যু হয়নি জেনে সুদীপ্তা প্রতিশোধস্পৃহায় আরো ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠেন। তিনি নানা পরিকল্পনা করতে থাকেন। তাঁর আদেশে নীলু চক্রবর্তী ও ঈশ্বরদত্ত আসেন। বিভিন্ন পানশালায় গিয়ে বিদ্রোহী ও চক্রান্তকারীরা কি ষড়যন্ত্র করছে সে সংবাদ আনার জন্য তিনি নীলুকে আদেশ দেন। গোপালকে মিথ্যা ঋণের দায়ে উৎখাত করার জন্য ঈশ্বরকে বলেন। তাঁরা বিদায় নিলে তাঁর নির্দেশে দেদ্দাকে তাঁর সামনে আনা হয়। দেদ্দা তাঁকে বলেন অন্যায়ভাবে তাঁকে ধরে আনার জন্য গোপালদেব মহারাণীকে উপযুক্ত জবাব দেবেন। মহারাণী সে কথা অগ্রাহ্য করে দেদ্দাকে কারাগারে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

গোপালের অন্য অনুচর গোবিন্দ গোপালদেবকে জানালেন, দেশের প্রজাদের মনোগত ইচ্ছা, গোপালদেব রাজা হয়ে অত্যাচারের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করুন। তিনি এর উত্তরে বললেন, তাঁর রাজা হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। ধনীদের শায়েস্তা করা ব্যতীত রাণীর সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ নেই। রাণীর শুভানুধ্যায়ী মন্ত্রী ইন্দ্রসেন রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ইন্দ্রসেন তাঁরও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তিনিই রাণীর বিষ পাঠানোর কথা দীনু পাগলা মারফৎ দেদ্দাকে জানিয়েছিলেন। সে সময় ঈশ্বরদত্ত এসে গোপালদেবকে মিথ্যা ঋণের দায়ে বাড়ী থেকে উঠে যেতে বলেন। সে কথা শুনে ভৈরব ঈশ্বরের ঘাড় ধরে বের করে নিয়ে যায় তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য। ইতোমধ্যে সোমা এসে দেদ্দার কারাবাসের কাহিনী জানান। সে সংবাদে গোপালদেব ক্রোধে চিৎকার করে বলে ওঠেন, তিনি এতদিন মহারাণীর সঙ্গে কোন শত্রুতা করতে চাননি কিন্তু মহারাণীর দেদ্দার প্রতি আচরণ তাঁকে মহাশত্রুতে পরিণত করল। তিনি তৎক্ষণাৎ মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, সঙ্গে গোবিন্দ ও সোমা গেলেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

সুদীপ্তা ইন্দ্রসেনকে বরখাস্ত করে নীলু চক্রবর্তীকে মন্ত্রীত্বপদে বরণ করলে ইন্দ্রসেন সে আদেশ মাথা পেতে নিলেন এবং প্রস্থানের পূর্বে দেদ্দাকে কারামুক্ত করতে অনুরোধ করে বললেন, তিনি যেন গোপালের সঙ্গে শত্রুতা না করেন, তাতে তাঁর ক্ষতি-ই হবে—সে কথা শুনে ক্রুদ্ধা মহারাণী তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। এদিকে দীনুপাগলা গান গাইতে গাইতে সেখানে চলে আসেন এবং বিরক্ত রাণীকে বলেন, তিনি গানের সুরে দেশের অসুরকে তাড়াবার চেষ্টা করছেন। তিনি প্রস্থান করলে সুদীপ্তার আদেশে দেদ্দাকে আনা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে গোপালের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে দেদ্দা বলেন, তিনি কিছুই জানেন না। তিনি শুধু জানেন, গোপালের মহারাণীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ

নেই, তিনি কেবল দেশের মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটাতে চান। সুদীপ্তা সে কথায় অবিশ্বাস করে দেদ্দাকে চাবুক মারতে লাগলেন। সেই মুহূর্তে গোপালদেব প্রবেশ করে সেই চাবুক ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ও সুদীপ্তাকে বন্দী করলেন। তিনি তাঁকে অন্যত্র চলে যেতে বললেন এবং সহচরী হিসেবে তাঁর সঙ্গে সোমাকে যেতে নির্দেশ দিলেন। চলে যাওয়ার পূর্বে সুদীপ্তা বলে গেলেন, তিনি সুযোগ পেলেই এর প্রতিশোধ নেবেন। এরপর ইন্দ্রসেনের অনুরোধে গোপালদেব সিংহাসন আরোহণে রাজী হলেন। দেদ্দাকে মহারাণী রূপে অভিষিক্ত করা হল। গোবিন্দ মহাবলাধ্যক্ষ, জীমূতবাহন কোষাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হলেন। প্রজারা জয়ধ্বনি করে উঠলেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

রাজা গোপাল ছয়মাস হল সিংহাসনে বসেছেন। এর মধ্যে তিনি রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন। প্রজারা তাই খুব খুশি। বর্তমানে দশদিন রাজা অজ্ঞাতকারণে নিরুদ্দেশ। সে সংবাদ জীমূতবাহন ও গোবিন্দ দেদ্দাকে জানালে তিনি সে ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করতে বারণ করলেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস ভগবান তথাগত তাঁকে সর্ব অবস্থাতেই রক্ষা করবেন। হঠাৎ জীমূতবাহনের মনে হল রাজার অন্তর্ধানের পশ্চাতে সুদীপ্তার হাত আছে। গোবিন্দ সে কথা শুনে বললেন, সুদীপ্তা যদি রাজার কোন ক্ষতি করেন তবে তিনি তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

এদিকে গোপালদেব ছদ্মবেশে বোধিগ্রামে গিয়ে গ্রামের লোকদের সঙ্গে দশদিন ধরে পুকুর কেটে তাঁদের দীর্ঘদিনের জলকষ্ট দূর করলেন। মহামাত্য ইন্দ্রসেন খুঁজতে খুঁজতে সেই গ্রামে উপস্থিত হয়েছেন। গোপালদেব বললেন, তিনি শীঘ্র রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছেন। ইন্দ্রসেন স্মারকচিহ্ন হিসেবে তাঁর অঙ্গুরীয় নিয়ে বিদায় নিলেন। গোপালদেব সেই গ্রামের কালিদাস নামে এক প্রজাকে (যার ছদ্মবেশী গোপালের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল) রাজবিদূষকরূপে নিযুক্ত করলেন। (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

সুদীপ্তা নীলু চক্রবর্তীর ভোগের আহুতি দেবার জন্য সোমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললে সোমা অস্বীকৃত হন। নীলু বলপ্রয়োগ করতে গেলে তিনি আত্মরক্ষার্থে ছুরিকা দিয়ে আক্রমণ করতে যান। সেই মুহূর্তে গোবিন্দ গোপালদেবের খোঁজে এসে সেই অবস্থা দেখে নীলুকে বন্দী করেন ও কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেন। এরপর ব্যর্থ সুদীপ্তা একটি পরিকল্পনা নেন। তিনি গোপালদেবকে তাঁর বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানান। গোপালদেব তাঁর কাছে এলে তিনি দুটি গ্লাসে সরবৎ এনে বিষ মেশনো সরবৎ তাঁকে খেতে দেন। গোপালদেব শুভকামনা করে পরস্পরের মধ্যে গ্লাসের পরিবর্তন করতে চাইলে সুদীপ্তা গোপালদেবের গ্লাস নিতে অস্বীকার করেন। গোপালদেবের কাছে তখন রাণীর ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। তিনি সুদীপ্তাকে বন্দী করেন। (তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

গোপালদেব নীলু চক্রবর্তী ও ঈশ্বর দত্তের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন এবং তাঁদের আবাস গৃহ অনাথ আশ্রমে পরিণত করতে বললেন। এরপর তাঁদের নির্বাসনদণ্ড দিলেন। যে কঞ্চুকী বোধিগ্রামের লোকদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন তাঁকে উৎকোচের মূল্য হিসেবে সেই গ্রামের কূপ খনন করতে আদেশ দিলেন। সুদীপ্তার শাস্তি স্বরূপ বললেন, গোপালদেব ও দেদ্দার মা হিসেবে সুদীপ্তা রাজবাড়ীতে অবস্থান করবেন। তিনি ইন্দ্রসেনকে আদেশ দিলেন, দেশের সমস্ত অনাথ আশ্রম, ভিক্ষাজীবীদের আশ্রম, প্রাকারের নাম সুদীপ্তার নামে যেন দীপ্তিময়ী হয়ে ওঠে। (তৃতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

গোপালদেব সমতট-বিদ্রোহ দমন করে রাজধানীতে ফিরে এসেছেন। ইত্যবসরে সুদীপ্তা রাজবাড়ী থেকে পলায়ন করেছেন। গোপালদেব যুদ্ধ থেকে ফিরেই অন্তঃপুরে দেদ্দার কাছে এসেছেন। সেখানে সোমাকে অবিবাহিত অবস্থায় দেখে গোবিন্দের সঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা করে দিলেন। সে সময় ইন্দ্রসেন সংবাদ দিলেন, স্বাধীন পার্বত্যরাজ রঘুবর্মা গৌড়ের সীমান্ত প্রদেশের কিছু অংশ দখল করে প্রজাদের অত্যাচারে জর্জরিত করছেন এবং তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সুদীপ্তা, নীলু ও ঈশ্বর। গোপালদেব তাঁদের শায়েস্তা করার জন্য প্রস্তুত হলেন। (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

রঘুবর্মার সঙ্গে যুদ্ধে গোপালদেব জয়ী হয়েছেন। নীলু ও ঈশ্বরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। সুদীপ্তা গোপালদেবের কাছে তাঁর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা চাইলেন। তারপর তিনি রঘুবর্মাকে ডেকে বললেন তাঁর রাজ্য গৌড়ের অঙ্গীভূত করা হল এবং রঘুবর্মা যদি প্রার্থনা করেন তবে তিনি তাঁকে ক্ষমা করবেন। রঘুবর্মা মৃত্যুদণ্ড চাইলে গোপালদেব তাঁকে হত্যার আদেশ দিলেন। (চতুর্থ অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

গোপালদেব সুদীপ্তার বিচার করছেন। তিনি ঘোষণা করলেন, সুদীপ্তার হাত পা মুখ বেঁধে তাঁর দেহের সঙ্গে বিরাট প্রস্তরখন্ড যুক্ত করে অন্ধকারে নৌকো করে মাঝ নদীতে বিসর্জন দেওয়া হবে। তেজস্বিনী সুদীপ্তা সেই আদেশ মাথা পেতে নিলেন কিন্তু দেদ্দা এসে প্রাণভিক্ষা চাইলেন। স্ত্রী হত্যার কলঙ্ক যাতে স্বামীকে স্পর্শ না করে সেজন্য তিনি সুদীপ্তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা রহিত করতে গোপালদেবকে অনুরোধ করলেন। তিনি আরো বললেন, তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হলে তিনি আমরণ অনশনের সংকল্প নিয়ে বুদ্ধের মন্দিব প্রাঙ্গণে বসে থাকবেন। দেদ্দার মহত্ত্বে অভিভূত সুদীপ্তার মানসিক পরিবর্তন হল। তিনি দেদ্দার কাছে তাঁর শেষ জীবন কাটাতে চাইলেন। এই ঘটনায় গোপালদেব বুঝলেন, রাজা হিসেবে তাঁর চরম পরাজয় হয়েছে। তিনি সিংহাসন ত্যাগকল্পে পুত্র ধর্মপালকে ডাকার জন্য গোবিন্দকে বললেন। (চতুর্থ অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

গোপালদেব তাঁর পুত্র ধর্মপালের হাতে গৌড়ের শাসনভার অর্পণ করে দেদ্দাকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থস্থানে চলে যাচ্ছেন। সেজন্য নাবালক পুত্র ধর্মপালকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেকে আনা হয়েছে। গোপালদেব ঘোষণা করলেন, ধর্মপাল যতদিন সাবালক না হন ততদিন একটি শাসন-পরিষদ রাজ্য পরিচালনা করবে। সেখানে থাকবেন মহামাত্য ইন্দ্রসেন, মধাবলাধ্যক্ষ গোবিন্দ, কোষাধ্যক্ষ জীমূতবাহন ও সোমা। আর থাকবেন প্রজাদের দুজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। যদি কোন কারণে ধর্মপাল রাজকার্যে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন তবে শাসন-পরিষদের তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার অধিকার থাকবে। এরপর গোপালদেব ও দেদ্দা সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। (পঞ্চম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

● **বৃত্ত গঠন**

এই নাটকের দুটি বৃত্ত—আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক।

সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণকারী গোপালদেব সৎসাহস ও কর্তব্যপরায়ণতায় গৌড়দেশে মাৎস্যন্যায় রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে যোগ্যতার সঙ্গে যে রাজত্ব পরিচালনা করেন সেই কাহিনী অবলম্বনে আধিকারিক বৃত্ত গড়ে উঠেছে।

● **প্রাসঙ্গিক বৃত্ত হল**

(ক) সুদীপ্তা-ইন্দ্রসেন-নীলু-ঈশ্বর-রঘুবর্মা-উপকাহিনী।
(খ) দেদ্দা-সোমা-উপকাহিনী
(গ) জীমূতবাহন-গোবিন্দ-উপকাহিনী।

● **অপ্রয়োজনীয় অংশ চরিত**

এই নাটকে কোন অপ্রয়োজনীয় অংশ বা চরিত্র নেই।

● **নাট্যক্রিয়ার বিভাগ**

Gustav Freytag-এর নাট্যগঠনতত্ত্ব (pyramid structure) এই নাটকের গঠনরীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কুসীদজীবী ঈশ্বরদত্তের অমৃত কর্মকারের প্রতি অত্যাচার, গরীবের বন্ধু গোপালদেবের অনুচর জীমূতবাহন বাধা দিলে তাঁকে আহত করে অমৃতের সর্বস্ব নিয়ে ঈশ্বর দত্তের গমন, সুন্দরী যুবতী সোমাকে ভোগ করার জন্য লম্পট নীলু চক্রবর্তীর বিধুপ্রধানের বাড়ীতে আগমন, সোমার হস্ত আকর্ষণকালে বৌদ্ধভিক্ষুণী দেদ্দার প্রতিরোধ চেষ্টা, তথায় গোপালদেবের আগমন ও নীলুকে শাস্তি দান, দেদ্দা গোপালদেবের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ, গৌড়ের মহারাজার বিধবা যুবতী স্ত্রী সুদীপ্তার প্রজাদের প্রতি অত্যাচার, প্রজা কর্তৃক গোপালদেবের প্রশংসায় রাণীর ঈর্ষা-র মাধ্যমে কাহিনীর সূচনা (exposition) হয়েছে। এই অংশটি প্রথম অঙ্কের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যের প্রথমাংশ জুড়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কাহিনী ঊর্ধ্বমুখী (rise) হয়েছে। মাৎস্যন্যায় রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য গোপালদেবের প্রচেষ্টা, বিষপ্রয়োগে গোপালদেবকে হত্যার পরিকল্পনা-সংবাদ দেদ্দা কর্তৃক সংগৃহীত এবং আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে গোপালকে দেদ্দার রক্ষা করা, গোপালদেবের সর্বনাশ সাধনের জন্য রাণীর নীলু ও ঈশ্বরকে নিয়োগ, রাণীর নির্দেশে দেদ্দাকে কারাগারে বন্দী করে রাখা, ঈশ্বর দত্ত মিথ্যা ঋণের দায়ে গোপালদেবকে উৎখাত

করতে এলে তাঁকে শায়েস্তা করা—এইসব ঘটনায় কাহিনী এগিয়ে গেছে। এই অংশটি প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের মধ্য ও শেষাংশ, চতুর্থ দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের মাঝামাঝি স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

দেদ্দার বন্দী সংবাদে গোপালদেবের ক্রোধ (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), রাণী সুদীপ্তাকে গোপালের পদচ্যুত করা, সুদীপ্তাকে নির্বাসন দান, সর্বসম্মতিক্রমে গোপালদেবকে গৌড়ের রাজারূপে মনোনয়নে (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)—নাট্যকাহিনীর চূড়ান্তরূপ (climax) এসেছে।

গোপালের রাজত্বকালে রাজ্যে শৃঙ্খলা, প্রজাদের দুঃখকষ্ট দেখার জন্য গোপালের আকস্মিক অন্তর্ধান, জীমূতবাহন ও গোবিন্দর উদ্বেগ প্রকাশ (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য), বোধিগ্রামে জলকষ্ট দূরকল্পে গোপালের প্রজাদের সঙ্গে পুকুরকাটা, মহামাত্য ইন্দ্রসেনের সেখানে গমন ও গোপালদেবের পুনরায় রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার আশ্বাস দান (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), সুদীপ্তার প্ররোচনায় নীলু সোমার ওপর বলপ্রয়োগ করতে গেলে গোবিন্দ কর্তৃক বাধাদান ও নীলুকে কারাগারে প্রেরণ, সুদীপ্তার পুনরায় গোপালদেবকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও গোপালদেবের বুদ্ধিমত্তায় সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়া ও সুদীপ্তাকে বন্দী করা (তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য), নীলু ঈশ্বরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, সুদীপ্তাকে মারূপে সম্মানদান ও তাঁর নামে সমস্ত আশ্রম ও প্রাকারের নামকরণের মাধ্যমে তাঁকে শাস্তিদানের অভিনব পন্থা (তৃতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য), সুদীপ্তার রাজবাড়ী থেকে পলায়ন ও সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহী রাজা রঘুবর্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে গোপালদেবের বিরুদ্ধাচরণ করা, তাঁদের শায়েস্তা করার জন্য গোপালদেবের প্রস্তুতি (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য), যুদ্ধে রঘুবর্মার পরাজয় ও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা লাভ (চতুর্থ অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)—এই ঘটনাগুলি কাহিনীকে পরিণামমুখী (return or fall) করেছে।

বন্দী সুদীপ্তাকে গোপালদেবের মৃত্যুদণ্ডাদেশ, সেই আদেশ রহিত করার জন্য দেদ্দার আমরণ মৃত্যু সংকল্প ঘোষণা, দেদ্দার মহত্ত্বে সুদীপ্তার মানসিক পরিবর্তন ও দেদ্দার কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ, সেজন্য গোপালদেবের মনে পরাজয়ের গ্লানি (চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য) ও নাবালক পুত্র ধর্মপালকে রাজ্যভার সমর্পণ করে দেদ্দাসহ রাজ্যত্যাগের (পঞ্চম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য) মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনীর পরিণতি (catastrophe) নেমে এসেছে।

মাইকেল মধুসূদন

পাঁচ অঙ্কের মিলনে রচিত নাটকটির প্রথম অঙ্কে চারটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, পঞ্চম অঙ্কে দুটি দৃশ্য। পঞ্চম অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যান্তর থাকায়, নাটকে উল্লেখ না থাকলেও, অঙ্কটিকে তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত করা হল।

মাইকেল মধুসূদন লোকনাট্য হওয়ায় সংলাপের ক্ষেত্রে আবেগময়তা লক্ষ্য করা যায়।

● ঘটনা-সংযোজন

মুন্সী রাজানারাযণ দত্তের ভৃত্য ব্রজ এসে সংবাদ দিল, পুত্র মধুসূদন দুদিন আগে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। মধুসূদনের বন্ধুরা তাকে এই খবর জানিয়েছেন। একমাত্র পুত্র ধর্মান্তরিত হওয়ায রাজনাবায়ণ অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। জাত্যাভিমানী রাজনারায়ণ স্ত্রী জাহ্নবীকে বললেন, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোরাসাহেবের প্ররোচনায় মধুসূদরনের মত পিতৃমাতৃভক্ত সন্তান খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। সেজন্য তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। এমন সময় সাগরদাঁড়ি থেকে তাঁর মামা হরিহর মিত্র দৌহিত্রীর বিবাহ উৎসবে যাওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। বাজনারায়ণ তাঁর মানসিক অবস্থার বর্ণনা করে সে অনুষ্ঠানে যেতে অসম্মতি জানালেন। এদিকে মধুসূদনের খ্রীষ্টান হওয়ার সংবাদে হরিহর রাজনারায়ণকে পুত্রত্যাগ করার উপদেশ দিলেন। রাজানারায়ণ সে প্রস্তাবে স্বীকৃত না হলে হরিহর বলেন, সে প্রস্তাবে সম্মত না হলে সামজ তাঁকে পতিত করবে। রাজনারায়ণ উত্তরে বললেন, সমাজকে তিনি অর্থ দিয়ে কিনে নেবেন এবং তিনি জানেন, হরিহরের নাতনীর বিয়েতে যদি তিনি পর্যাপ্ত অর্থ দেন তবে হরিহরও তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে করতে প্রস্থান করবেন। এই দম্ভোক্তিতে ক্রুদ্ধ হরিহব তাকে নির্বংশ হওযাব অভিশাপ দিয়ে বিদায় নিলেন। হরিহরের শেষ উক্তি রাজনারাযণকে বিচলিত করল। (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

মধুসূদনেব বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু সেদিন গৌরদাস বসাককে বলছিলেন, মধুসূদন কোঁচানো ফরাসডাঙ্গা ধুতি, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, গায়ে চাদর, পায়ে শাদা লপেটা পরে খাঁটি বাঙালী সেজে কলেজে উপস্থিত হলে সাহেব সন্তানরা কলেজের অধ্যক্ষের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ কবেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে মধুসূদনের বাঙালী পোষাকে কলেজে আসা উচিত হয়নি সেকথা অধ্যক্ষ বললে মধুসূদন উত্তর দিলেন তিনি প্রথমে বাঙালী, তারপর খ্রীষ্টান। মধুসূদন যে ভবিষ্যতে বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠবেন সে বিষয়ে তিন বন্ধুর দ্বিমত নেই। ইতোমধ্যে ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত মধুসূদন এলেন। মধুসূদন জানালেন, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন কথা দিয়েছেন, তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর কন্যা দেবকীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেবেন ও ইংল্যান্ড পাঠাবেন। তিনি ভাবছেন, কবে সেই স্বপ্নের দেশ ইংল্যান্ড যাবেন। তাঁর বন্ধুরা মধুসূদনকে বাবা-মার সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে অনুরোধ করলেন। মধুসূদন বললেন, তিনি প্রায় দুমাস বাড়ী যাননি। বাবা মাকে দেখার জন্য তাঁর মন উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু পিতা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করবেন সেকথা ভেবে তিনি সেখানে যেতে ভরসা পাচ্ছেন না। অবশ্য কৃষ্ণমোহন ইংল্যান্ড যাওয়ার জন্য অর্থ দিতে রাজী না হলে হয়তো অর্থের জন্য তাঁকে পিতার কাছে যেতেই হবে। সে সময় একজন বৈষ্ণব ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইলেন। মধুসূদন বললেন, বৈষ্ণব

ভিক্ষুক যদি 'জয় গৌরহরির' পরিবর্তে তিনবার 'জয় যীশুখ্রীষ্ট' বলেন তবে তিনি তাঁকে পাঁচটাকা দান করবেন। কিন্তু ভিক্ষুকটি লক্ষ টাকার বিনিময়ে যীশুখ্রীষ্টের নাম করতে রাজী হলেন না। মধুসূদন বন্ধুদের বললেন, একদিনের উপবাসী ভিক্ষুক অধর্ম হবে জেনে পাঁচটাকার বিনিময়ে যীশুখ্রীষ্টর নাম উচ্চারণ করলেন না, অথচ তিনি বিবাহ বা ইংল্যান্ড যাওয়ার কথা নিশ্চিতভাবে না জেনেই বাবা মাকে কাঁদিয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলেন। তিনিই বোধহয় এমন ব্যক্তি যিনি কোন কিছু না পেয়ে সম্পূর্ণ শূন্য হাতে কাজ করেছেন। (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন মধুসূদনকে বললেন, তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা দেবকীকে তাঁর হাতে একটি মাত্র শর্তে সমর্পণ করতে পারেন। সেটি হল, মাইকেলকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তিনি যেন কোনদিন মদস্পর্শ না করেন। মধুসূদন বললেন, তিনি সে ধরণের প্রতিজ্ঞা কবতে পারবেন না। তিনি মদ ত্যাগ করতে পারবেন না কারণ মদ তাঁর জীবনের অনুপ্রেরণা। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ কৃষ্ণমোহন দেবকীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্মতি দিলেন না। সব কথা শুনে দেবকী বললেন, মধুসূদন যে মিথ্যার সঙ্গে সন্ধি করেননি তাতেই তিনি আনন্দিত। তাঁদের বিবাহ না হলেও তিনি বিশ্বাস করেন মাইকেল তাঁর গুরু, তিনি শিষ্যা। মাইকেল তাঁর প্রথম প্রেম, তাঁর ইহকাল-পরকার, তাঁর সর্বস্ব। দেবকীকে না পাওয়ার বেদনায় যন্ত্রণাদগ্ধ মধুসূদন খুব শীঘ্র স্বদেশ ত্যাগ করবেন বলে স্থির করলেন। (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয দৃশ্য)

জাহ্নবী দেবী মধুসূদনের শোকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। একদিন মধুসূদন দেখা করতে এলেন। মা পুত্রকে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন। জাহ্নবী পুত্রকে খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে তাঁর নির্বাচিত কন্যাকে বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করলেন এবং ধর্মত্যাগের দোষ কাটাবার জন্য তিন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন বলে জানালেন। মধুসূদন রাজী হলেন না। তিনি বললেন, তিনি হিন্দুধর্মের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ধর্মত্যাগ করেননি। তাঁর আরাধ্য কবি খ্রীষ্টান বলে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি যদি মা'র কথায় প্রায়শ্চিত্ত করে লক্ষীছেলের মত ঘরে ফিরে এসে মা'র নির্বাচিত পাত্রীকে বিবাহ করেন তবে সাগরদাঁড়ির লোকের কাছে তিনি ছোট হয়ে যাবেন। সেই সময় রাজনারায়ণ এলেন। মধুসূদন তাঁর কাছে বিলেত যাওয়ার জন্য পাঁচহাজার টাকা চাইলেন ও বিলেত পৌঁছে গেলে আরো পাঁচ হাজার টাকা যেন পাঠান সেই অনুরোধ করলেন। রাজনারায়ণ রূঢ়ভাষায় সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, তিনি তাঁকে ত্যাজ্য পুত্র করেছেন এবং তিনি সমাজবদ্ধ জীব সুতরাং তাঁকে মধুসূদন যেন ভবিষ্যতে কখনো বিরক্ত না করেন। মধুসূদন উত্তরে বললেন, যে জাতি আর ধর্ম নিয়ে রাজনারায়ণ গর্ববোধ করছেন, সেই জাতিভেদ ভবিষ্যতে থাকবে না। শুধু তাই নয়, এমন একদিন আসবে যেদিন মুন্সী রাজনারায়ণ দত্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতারূপে সমাজে পরিচিত হবেন। মাইকেল দ্রুত প্রস্থান করলে জাহ্নবী

পুত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাজনারাযণকে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, সেদিনই মধুসূদনকে ফিরিয়ে আনবেন যেদিন তিনি মধুসূদনের বাবা রূপে সকলের কাছে পরিচিত হবেন। (চতুর্থ দৃশ্য। প্রথম অঙ্ক)

রাজা যতীন্দ্রমোহনকে গৌবদাস জানালেন, পিতা অর্থসাহায্য না করায় মধুসূদন বিলেত যেতে পারলেন না। সাহেবরাও সে ব্যাপারে তাঁকে কোন সাহায্য করলেন না। অগত্যা তিনি মাদ্রাজ চলে গেলেন এবং সেখানে বর্তমানে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। গৌরদাসকে লেখা একটি পত্রে মধুসূদন তাঁর যে প্রাত্যহিক জীবনচর্যার বিবরণ দিয়েছেন তাতে জানা যায়, তিনি শিক্ষকতা করা ব্যতীত হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইংরেজী ও বাংলা ভাষা অভ্যাস করছেন। ইতোমধ্যে 'ক্যাপটিভ লেডি' লিখে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেও আর্থিক সুবিধা বিশেষ কিছু হয়নি। গৌরদাস আরো জানালেন, মধুসূসদন মাদ্রাজে গিযে রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস নামে এক স্কচ নীল দুহিতাকে বিবাহ করেন কিন্তু কিছুদিন পর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে এরপর তিনি হেনরিয়েটা নামে এক ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করেন। বর্তমানে তাঁরা সুখে সংসার করছেন। গৌরদাস তাঁর বন্ধুদের বলেন, তিনি মধুসূদনকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন তবে বন্ধুবান্ধব সকলকে তাঁর সংসারের কথা চিন্তা করে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। যতীন্দ্রমোহন তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করার আশ্বাস দিলেন। একটু পরে সেখানে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ও দেবকী প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণমোহন বললেন, মধুসূদনের 'ক্যাপটিভ লেডি' ও 'ভিসন অব দ্য পাস্ট'-এর অসামান্য সাফল্যের জন্য মধুসূদনকে তিনি বাংলায় ফিরিয়ে আনতে চান কারণ সেখানেই তাঁর প্রতিভার সার্থক প্রকাশ ঘটবে। কৃষ্ণমোহন কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মধুসূদনকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কৃষ্ণমোহন ও দেবকী চলে গেলে যতীন্দ্রমোহন গৌরদাসকে জানালেন, তাঁদের বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরী ঠাকুর মধুসূদনের জন্য তাঁর বাগানবাড়ী ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছেন। এবং চাকুরি সম্পর্কে কিশোরী বলেছেন, মধুসূদন যদি রাজী হন তবে তিনি কোর্টে একশত কুড়ি টাকা মাহিনায় দোভাষীর পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারেন। গৌরদাস সেই সংবাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, মধুসূদনকে যেভাবেই হোক সেই ব্যবস্থায় রাজী করাতে হবে। (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

পুত্রশোকে রাজনারায়ণ দিনরাত মদ্যপান করেন। তাঁর কাছে ডাকযোগে মধুসূদন তাঁর লেখা দুখানি বই পাঠিয়ে দিয়েছেন। পুত্রের কৃতিত্বে তাঁর গর্বের সীমা নেই, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে পুত্রকে না পাওয়ার বেদনা অনুভব করেন। রাজনারায়ণ প্রেরিত এক হাজার টাকা মধুসূদন প্রত্যাখ্যান করেছেন—প্রত্যাখ্যাত অর্থ তাঁর হাতে তুলে দিয়ে ভূদেব সেই সংবাদ দিলে রাজনারায়ণের মনে ব্যথা আরো বেড়ে যায়। ভূদেব চলে গেলে জাহ্নবী তাঁর কাছে সব শুনে বললেন, তাঁদের অতিরিক্ত আদরেই মধুসূদন বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। তবে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, তাঁর পুত্র যেখানেই থাকুন, তিনি

যেন সুখী হন। তারপর তিনি রাজনারায়ণকে পুত্রলাভার্থে পুনরায় বিবাহ করতে অনুরোধ করেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

মাদ্রাজে মা'র সম্পর্কে দুঃস্বপ্ন দেখে মধুসূদনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি হেনরিয়েটাকে ডেকে বললেন, তাঁকে যেন তক্ষুনি ব্র্যান্ডি দেওয়া হয়, কারণ তিনি লেখার মধ্যে ডুবে থেকে বাস্তবকে ভুলতে চান। ইতোমধ্যে কৃষ্ণমোহন ও দেবকী এলেন। তাঁদের দেখে মধুসূদন যুগপৎ আশ্চর্য ও আনন্দিত হলেন। তাঁরা জানালেন, বেথুন সাহেব তাঁকে একটা চিঠি দিয়েছেন, চিঠিতে তিনি বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনা করতে মাইকেলকে অনুরোধ জানিয়েছেন। সে কথা শুনে হেনরিয়েটা তাঁকে বাংলাভাষায় কাব্য সৃষ্টি করার জন্য উৎসাহ দিলেন। দেবকী গৌরদাসের দেওয়া দুশো টাকা ও রামায়ণ মহাভারত তাঁর হাতে তুলে দিলেন। কলকাতায় যে তাঁর বাসস্থান ও চাকুরীর ব্যবস্থা হয়েছে সেকথা দেবকী মাইকেলকে জানালেন। তাছাড়া ইচ্ছে করলে বাংলা থিয়েটারে সংস্কৃত নাটক ইংরেজীতে অনুবাদের কাজটা তিনি অনায়াসে করতে পারেন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সে কথায় মাইকেল উৎসাহবোধ করলেন। তিনি স্থির করলেন, তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন। হঠাৎ তিনি গৌরপ্রদত্ত খাম খুলে চিঠি পড়তে শুরু করলেন। চিঠি পড়ে জানতে পারলেন, মা'র খুব অসুখ করেছে। সে সংবাদে মাইকেল কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে যান। (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

রাজনারায়ণ পুনরায় বিবাহ করেছেন। কিন্তু মনে তাঁর শান্তি নেই। তিনি পুত্রের কথা স্মরণ করেন আর মনের জ্বালা মেটাতে মদের আশ্রয় নেন। জাহ্নবী পুত্রশোকে উন্মাদপ্রায় হয়ে গেছেন। মধুসূদন মাকে দেখতে এলেন। ঠিক কিছুক্ষণ পূর্বে জাহ্নবী দেবী দোতলা থেকে গড়িয়ে পড়ে প্রাণ হারান। মধুসূদন মাকে দেখার জন্য অগ্রসর হতেই রাজনারায়ণ বাধা দিলেন। তিনি বললেন, মধুসূদন খ্রীষ্টান বলে জাহ্নবীকে স্পর্শ করার অধিকার নেই, শুধু তাই নয়, তিনি স্পর্শ করলে তাঁর মা স্বর্গে যেতে পারবেন না। জল ভরা চোখে মধুসূদন বেরিয়ে গেলেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

মধুসূদন আদালতে দোভাষীর কাজ নিয়েছেন। অর্থ উপার্জন করছেন। কিন্তু অমিতব্যয়িতার জন্য তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে তিনি কাব্য রচনা করে চলেছেন। গৌর বসাক এসে জানালেন, 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যটি তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়েছেন। মধুসূদন বললেন, তিনি 'মেঘনাদবধ' নামে একটি মহাকাব্য খুব শীঘ্র রচনা করবেন। কথাপ্রসঙ্গে মাইকেল বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' অভিনয় দেখার নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন বলে জানালেন। তিনি সেই নাটকের ইংরেজী সারাংশ লিখেছেন। গৌর বললেন, তিনি সেই নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন সুতরাং মধুসূদন যেন অভিনয় দেখতে যান। মাইকেল সেখানে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইতোমধ্যে জানা গেল, অর্থের অভাবে হেনরিয়েটা তাঁদের বেয়ারাকে বিদায় করেছেন। (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

মধুসূদন তাঁর বন্ধুদের বললেন, তিনি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বস্তু গ্রহণ করে বাংলা নাটক রচনা করবেন, তাঁর প্রথম নাটক হবে 'শর্মিষ্ঠা' এবং সেই নাটক সাতদিনে সমাপ্ত করবেন। এত অল্প সময়ে তিনি নাটক লিখতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে ভূদেব, রাজনারায়ণ সংশয় প্রকাশ করলেন। কিন্তু গৌর বললেন, মধুসূদন যে নাটক রচনায় রাজী হয়েছেন তার মধ্যে কোন শুভ ইঙ্গিত রয়েছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাইকপাড়ার রাজভ্রাতাদ্বয়ের পক্ষ থেকে পাঁচশো টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন ও অগ্রিম আড়াইশো টাকা মধুসূদনকে দিলেন। (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

মাইকেল অর্থের সন্ধানে গেছেন। ঘরে খাবার নেই। সন্তানরা অভুক্ত। হেনরিয়েটা মাইকেলের জন্য অপেক্ষা করছেন। সে সময় দেবকী এলেন। তিনি তাঁদের দুরবস্থার কথা শুনে হেনরিয়েটাকে একশত টাকা দিলেন। দেবকী চলে গেলে মধুসূদন মত্তাবস্থায় এসে বললেন, তিনি দুটি প্রহসন লিখে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে আড়াইশত টাকা দিয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি হেনরিয়েটার জন্য একট গাউন কিনেছেন এবং বারে ঢুকে খাবার ও মদ্যপান করে প্রায় সব অর্থ নিঃশেষ করে মাত্র তিনটাকা ও কিছু পয়সা ফেরৎ এনেছেন। হেনরিয়েটা সে কথায় চিন্তিত হন। তাঁদেব কিছু খাওয়া হয়নি শুনে মধুসূদন লজ্জিত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দিলেন। হেনরিয়েটা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, এক বান্ধবীর কাছ থেকে কিছু অর্থ নিয়ে তিনি খাবারের বন্দোবস্ত করেছেন। কিছুক্ষণ পর পাওনাদার এসে অর্থ চাইলে কোনক্রমে বুঝিয়ে তাঁদের ফেরৎ পাঠানো হল। ঠিক সে সময় বাড়ীওয়ালা রসিক এলেন। দীর্ঘদিন বাড়ীভাড়া বাকি থাকায় লোকজন নিয়ে তিনি মধুসূদনকে সপরিবারে বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করতে এসেছেন। ঠিক সেইক্ষণে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হল। তিনি আটশো টাকার চেক লিখে বাড়ীওয়ালাকে দিলেন। বিস্মিত স্বামী স্ত্রীকে বিদ্যাসাগর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, গৌরদাস তাঁকে মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভবে'-এর পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়েছেন কিন্তু সে কাব্যের ছন্দ ধরতে না পারায় মধুসূদনের মুখে কাব্যটি শুনবেন বলে তিনি তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন। মুগ্ধ অভিভূত মধুসূদন বিদ্যাসাগরের মহানুভবতায় তাঁকে তাঁর হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। (তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক, 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য ও 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্য একই সময় একসঙ্গে রচনা করে চলেছেন। তিনি মুখে বলছেন, তিনজন পণ্ডিত তা লিখে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে তিনি হেনরিয়েটাকে জানালেন, তিনি ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলেতে যাবেন বলে স্থির করেছেন। একদিন সকালে তিনি যখন রচনাকর্মে ব্যাপৃত সে সময় দেবকী এলেন। দেবকী মাইকেলের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হলেন। মধুসূদন সেদিন তাঁকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করলেন। দেবকী মাইকেলের 'পদ্মাবতী' নাটক থেকে একটি গান গেয়ে শোনালেন। মুগ্ধ মাইকেল আনন্দে আবেগে দেবকীকে জড়িয়ে ধরলেন এবং উচ্ছ্বাসভরে জিজ্ঞাসা করলেন, দেবকী বর্তমানে তাঁকে ভালবাসেন কিনা। দেবকী স্বীকার করলেন, তিনি মধুসূদনকে পূর্বে যেমন ভালবাসতেন, বর্তমানেও সেইরূপ ভালবাসেন। আনন্দে মাইকেল হেনরিয়েটাকে সে কথা বলতে অন্তঃপুরে গেলেন। দেবকী লজ্জায় সে স্থান ত্যাগ করলেন। (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

গৌরদাস এসে বিদ্যাসাগরকে জানালেন, লন্ডনে মাইকেল ব্যারিস্টারী পড়তে যাওয়ার কিছুদিন পরেই কলকাতায় অবস্থিত হেনরিয়েটা পুত্রকন্যাসহ অর্থ কষ্টে দিনযাপন করছিলেন। কারণ মাইকেল তাঁদের জন্য কলকাতায় যে অর্থের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, কিছু ব্যক্তির অসাধুতার কারণে সেই অর্থ পাওয়া যাচ্ছিল না। দেবকী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের আর্থিক সহায়তায় তাঁদের কোনক্রমে দিন গুজরান হচ্ছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত হেনরিয়েটা স্বামীর কাছে যাওয়া মনস্থির করায় গৌরদাস তাঁদের সেস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর সব শুনে বললেন, যখন কোন উপায় নেই তখন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৌরদাস সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। (চতুর্থ অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

হেনরিয়েটা ও পুত্রকন্যাকে নিয়ে সংসার চালাতে না পারায় মাইকেল লন্ডন ত্যাগ করে ফ্রান্সে চলে এসেছেন। অর্থের অভাবে ব্যারিষ্টারী পড়া অসমাপ্ত রইল। বর্তমানে তিনি ভার্সাই শহরে আছেন। চারিদিকে পাওনাদার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জেলে যাওয়ার ভয়ে মাইকেল সব সময় তটস্থ হয়ে আছেন। বন্ধু মনোমোহন এলে তাঁর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে সেদিনের খাবারের বন্দোবস্ত করলেন। মাইকেল মনোমোহনকে জানালেন, তিনি সেই অবস্থার মধ্যে ফরাসী জার্মানী ও ইটালী ভাষা শিখে ফেলেছেন, পর্তুগীজ শিখছেন এবং বিদেশী সনেটের অনুসরণে বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতাবলী লিখেছেন। তাঁদের কথোপকথনের মধ্যে বাইরে ঘন্টার শব্দ হল। পাওনাদার এসেছেন ভেবে মধুসূদন প্রথমে দরজা খুলতে চাইলেন না। তখন মনোমোহন দরজা খুললেন এবং পোষ্টম্যানকে দেখে মধুসূদনকে ডেকে দিলেন। মধুসূদন ফিরে এসে জানালেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক বিরাট অঙ্কের ড্রাফ্‌ট পাঠিয়েছেন। সেই অর্থে তিনি নূতন করে বাঁচবেন, ব্যারিষ্টারী পড়তে যাবেন এইভেবে এক অপরিসীম আনন্দে মধুসূদন চিৎকার করে উঠলেন। (চতুর্থ অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

মাইকেল ব্যারিষ্টারী পাশ করে হাইকোর্টে চর্চা করছেন এবং অতি অল্প সময়ে পশার জমিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তিনি ঋণগ্রস্তই হয়ে রইলেন। একদিন কোর্টে তাঁর রক্তবমি হল। তারপর থেকে মাঝে মাঝে কাশি ও রক্তবমি হচ্ছে। এসব সত্ত্বেও তিনি মদ্যপান বন্ধ করেননি। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য তাঁর বন্ধুরা উদ্বিগ্ন। হেনরিয়েটাও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খবর পেয়ে অসুস্থ শরীর নিয়ে বিদ্যাসাগর মাইকেলকে দেখতে এলেন। (পঞ্চম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

আলিপুর হাসপাতালে মধুসূদন ও হেনরিয়েটা মৃত্যুশয্যায়। তাঁর অসুস্থতার সংবাদে বন্ধুবান্ধব দেখা করতে এসেছেন। কিছুক্ষণ পর হেনরিয়েটার মৃত্যু হল। মধুসূদনও ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি কবিতা দেবকীকে উপহার দিয়ে বললেন, তিনি যেন সেই কবিতা প্রকাশের ভার নেন। সেই বিখ্যাত কবিতাটি হল----

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ...."

(পঞ্চম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

মধুসূদনের মৃত্যু হয়েছে। তার সমাধি স্থাপিত হয়েছে। সেখানে মাইকেলের বিখ্যাত কবিতাটি রয়েছে— "দাঁড়াও পথিকবর .....।" (পঞ্চম অঙ্ক। শেষ দৃশ্য)

● **বৃত্ত গঠন**

এই নাটকের দুটি বৃত্ত।

অদূরদর্শিতার জন্য প্রতিভাধর মাইকেল মধুসূদনের জীবনে বিষাদময় পরিণতি নেমে আসে—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তকে সহায়তা করেছে নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক বৃত্ত—

রাজনারায়ণ দত্ত-জাহ্নবী-উপবৃত্ত

দেবকী- রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন-উপবৃত্ত

রেবেকা-হেনরিয়েটা-উপবৃত্ত

গৌরদাস-রাজনারায়ণ-ভূদেব-যতীন্দ্রমোহন-মনোমোহন-বিদ্যাসাগর-উপবৃত্ত।

● **অপ্রয়োজনীয় অংশ ও চরিত্র**

এই নাটকে কোন অপ্রয়োজনীয় অঙ্ক বা দৃশ্য নেই। তবে চিন্তাহরণ-বিদ্যাসাগর কথোপকথন নাট্যক্রিয়ার কোন সহায়তা করেনি।

● **নাট্যক্রিয়ার বিভাগ**

John Howard Lawson-এর তত্ত্বানুসারে এই নাটককে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

পিতৃমাতৃভক্ত মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্মগ্রহণ ও সেই সংবাদে রাজনারায়ণ দত্ত'র মানসিক অস্থিরতার (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য) মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার প্রথম পর্যায় অর্থাৎ সূচনা অংশ (exposition) প্রকাশিত।

খ্রীষ্টান হওয়ার পর বাঙালী পোষাকে মধুসূদনের কলেজে যাওয়া, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে মাইকেলের সংশয় প্রকাশের (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য) মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার অগ্রগতি (rising action) ঘটেছে।

তৃতীয় পর্যায়ে সংঘাতের (clash) সৃষ্টি হয়েছে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের মধুসূদনের হাতে কন্যা দেবকীকে সমর্পণে অস্বীকৃতি (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য), বিলেত গমনের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থ না পাওয়ায় পিতার কাছে মধুসূদনের অর্থপ্রার্থনা ও রাজনারায়ণের সে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান এবং তাকে ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য), মাইকেল কর্তৃক রাজানারায়ণ প্রেরিত অর্থ প্রত্যাখ্যান (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), রাজনারায়ণ কর্তৃক মাইকেলকে জাহ্নবীর মৃতদেহ দেখতে না দেওয়া (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)—এর মধ্যে সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। অমিতব্যয়ী মাইকেলের আর্থিক দুরবস্থা (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য) তাঁকে মাঝে মাঝে মানসিক সংঘাতের সম্মুখীন করেছে।

চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে হেনরিয়েটা ও মাইকেলের অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে মৃত্যুর দ্বারা নাট্যক্রিয়ার চূড়ান্তরূপ (climax) সাধিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে।

কালভৈরব বা ভক্তভৈবর গিরিশচন্দ্র

চার অঙ্ক যুক্ত বর্তমান নাটকটির প্রথম অঙ্কে চারটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি দৃশ্য আছে। এটি লোকনাট্যের শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় এখানে আবেগমূলক সংলাপ ও সংগীতের প্রয়োগ রয়েছে।

- **ঘটনা-সংযোজন**

বোসপাড়া লেনে গিরিশচন্দ্র শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথের একটি অংশ আবৃত্তি করছেন। প্রতিবেশী গোবর্ধন বসু এলে তিনি আবৃত্তি বন্ধ করে তাঁর দিকে তাকালেন। গোবর্ধনবাবু নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্রের সুখ্যাতির কথা উল্লেখ করে তাঁকে সাধুবাদ জানালে গিরিশচন্দ্র বলেন, নাম যশের মূল্য তাঁর কাছে বড় বলে মনে হয় না। মানুষের পরমায়ু সীমিত। সীমিত সময়ের মধ্যে নানা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। একমাত্র গুরু পারেন ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে। তিনি মনে মনে সেই গুরুর সন্ধান করছেন। গোবর্ধনবাবু চলে গেলে এক পুরুষমূর্তি গিরিশের সামনে আবির্ভূত হলেন। তাঁর গায়ে লাল ফতুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে মদের বোতল। তিনি ভক্ত-ভৈরব বলে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, গুরু গিরিশচন্দ্রকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, গিরিশ খুব শীঘ্র তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন। তিনি প্রস্থান করলে রামকৃষ্ণ সেখানে এলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর মনে আজকাল এত অস্থিরতা জাগে কেন। রামকৃষ্ণ বলেন, মন-আকাশে চাঁদ উঠেছে বলে মন-সমুদ্র চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গিরিশ বললেন, তিনি একজন ভালো গুরু খুঁজছেন। রামকৃষ্ণ বললেন, গিরিশ তাঁকে খুঁজে বের করুন। এরপর তিনি গিরিশকে দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণ পর রামকৃষ্ণের শিষ্য রাখাল ছুটতে ছুটতে এসে জানালেন, রামকৃষ্ণ তাঁকে ডাকছেন। গিরিশ বললেন, পরীক্ষা না করে কোন বিষয় তিনি গ্রহণ করবেন না। শুধুমাত্র রামকৃষ্ণের কথা শুনে তাঁকে গুরুতে বরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে তিনি রামকৃষ্ণের ডাকে সাড়া দিতে পাচ্ছেন না। (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের দুই নট অতুল ও নবীনকে বললেন, পরমহংসকে দেখার পর থেকে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাঁরা বিদায় নিলে গিরিশচন্দ্র আপনমনে কৃষ্ণ

বিষয়ক গান করতে লাগলেন। ঠিক সে সময় একটি মেয়ে এসে বললেন, তাঁর নাম মহামায়া, তিনি বড় রাস্তার ধারে বামুন বাড়ীতে কাজ করেন। তিনি বামুনবাড়ীর সকলের জন্য থিয়েটারের পাশ চাইতে এসেছেন। গিরিশচন্দ্রকে অন্যমনস্ক দেখে মহামায়া তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে গিরিশ বললেন, তিনি গুরুর কথা ভাবছেন বলে এত অন্যমনা। শুনে মহামায়া বললেন, তিনি তাঁর গুরুকে গিরিশের রকে বসে থাকতে দেখেছেন। তিনি গুরুকে বসে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, গিরিশের থিয়েটার দেখার জন্য তিনি বসে আছেন। মহামায়া চলে গেলে বিবেকানন্দ এসে বললেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁর থিয়েটার দেখতে চেয়েছেন। সে কথা শুনে গিরিশচন্দ্র চমকে উঠলেন। তিনি বললেন, ঠাকুরের যেদিন খুশি সেদিন এসে থিয়েটার দেখতে পারেন। বিবেকানন্দ প্রস্থান করলে গিরিশচন্দ্র পরিচারিকা আতার কাছে মহামায়ার খোঁজ করলেন কারণ মহামায়া ঠাকুরের থিয়েটার দেখার ইচ্ছার কথা আগে তাঁকে জানিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে সেই ঘটনা কেমন যেন অলৌকিক বলে মনে হল। আতা বলল, মহামাযা বলে কোন মেযেকে সে আসতে দেখেনি। গিরিশচন্দ্র বিস্মিত হলেন। এমন সময় তিনি যেন নেপথ্য থেকে একটি মেয়েলি হাসি শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন, হয় তিনি স্বপ্ন দেখছেন, নয় পাগল হয়ে যাচ্ছেন। (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)।

গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের চিত্রশিল্পী নিতাই দাসের মুখে যখন শুনলেন, নিতাই যে প্রসাদ গৌরসুন্দরের নামে নিবেদন করেন তাতেই তাঁর দাঁতের দাগ দেখতে পান তখন তিনি নিতাই-এর ভক্তির গভীরতা বুঝতে পারলেন এবং তাঁর তুলনায় নিজেকে নিতান্ত ভক্তিহীন বলে মনে হল। গিরিশ তাঁর রঙ্গমঞ্চের কর্মী জীবন ও জুড়নকে বললেন, তিনি একজন গুরু খুঁজছেন সেজন্য মন অস্থির থাকায় নাটকের মহলায় যেতে পারেননি। তবে কাল দুপুরে তিনি অবশ্যই যাবেন। তাঁরা চলে গেলে ভৈরব এসে বললেন, সব কিছু বিসর্জন দিয়ে গিরিশ যেন মাকে ডাকেন। গিরিশ বলেন, মা'র চেয়েও তাঁর কাছে থিয়েটার বড়। ঈশ্বরের ওপরে তাঁর থিয়েটার, তাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারবেন না। (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)।

অভিনেত্রী বিনোদিনীর বাড়ী এসে অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি জানালেন, মুস্তফী সাহেব বলেছেন, গিরিশবাবু মহলায় আসছেন সুতরাং ক্ষেত্রমণি যেন বিনোদিনীকে মহলায় আসতে বলে দেন। কথাপ্রসঙ্গে ক্ষেত্রমণি বললেন, গিরিশ বাবু নাকি গুরুলাভের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। সেকথা শুনে বিনোদিনী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এরপর বিনোদিনী বললেন, নূতন নাটক 'চৈতন্যলীলা'য় অভিনয় করতে তাঁর কেমন ভয় ভয় করছে। তাঁর মনে হচ্ছে একটা কিছু অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। ক্ষেত্রমণি চলে গেলে মহামায়া আবির্ভূত হলেন। বিনোদিনীকে বললেন, তিনি পাড়ার শিবমন্দিরের মধ্যে থাকেন। তিনি বিনোদিনীর কাছে 'চৈতন্য লীলা'র প্রথম দিনের অনেক গুলি পাশ চাইলেন। তিনি বললেন, নাটকের প্রথমদিন একটা মজা হবে। তিনি আরো বললেন, যে মন্দিরে বিনোদিনী পুজো দিতে গিয়ে 'মহেশ' না বলে 'গিরিশ' বলে কাঁদেন সেই মন্দিরে যেন থিয়েটারের পাশ পাঠিয়ে দেন। মহামায়া অন্তর্হিত হলে বিনোদিনী যেন অন্তরের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের আদেশ শুনতে পেলেন। গিরিশচন্দ্র আদেশ করলেন, পরের দিন থেকে তিনি যেন গঙ্গাস্নান, হবিষ্যান্ন

গ্রহণ করেন এবং গিরিশের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা ভাবেন কারণ তিনি চৈতন্য লীলায় চৈতন্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। সে আদেশ পালন করা বিনোদিনীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বলে মনে হল। (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ-শিষ্য অভেদানন্দ, বিবেকানন্দ ও রাম দত্ত গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। বিবেকানন্দ বললেন, গিরিশচন্দ্র প্রতিভাধর সন্দেহ নেই তবে তাঁর প্রতিভা ঠিকমত চালিত হচ্ছে না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হলে তাঁর প্রতিভা ফুলের মত ফুটে উঠতো। রাম দত্ত বললেন, গিরিশের ওপর ঠাকুরের আকর্ষণ বেড়েছে কারণ তিনি গিরিশের কয়েকবার নাম করেছেন এবং বলেছেন গিরিশ যে থিয়েটার যাত্রা করেন তা ভালো জিনিস, এতে লোকশিক্ষা হয়। সেই সময় রামকৃষ্ণ এসে বললেন, তিনি দুপুরে দেখলেন একটি উলঙ্গ ছেলে বাঁ হাতে মদের বোতল আর ডান হাতে সুধার পাত্র নিয়ে নাচতে নাচতে মা কালীর ঘরে ঢুকল। তিনি তার পরিচয় জানতে চাইলে সে বলল তার নাম ভৈরব এবং তার সঙ্গে রামকৃষ্ণের বসুপাড়ায় দেখা হয়েছে। সে কথা বলে সেই ছেলেটি মায়ের দেহে মিলিয়ে গেল। সকলে বলে উঠলেন তিনি গিরিশবাবু। ইতোমধ্যে ভৈরব এসে বললেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁর জন্মজন্মান্তরের ঈশ্বর, তিনি যেন তাঁকে কৃপা করেন। ভৈরব গান গাইতে গাইতে চলে গেলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে বললেন, গিরিশ ঘোষ কাল যে নূতন থিয়েটার করবেন সেটা তিনি দেখতে যাবেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

বিনোদিনীর বাড়ীতে মহামায়া এসেছিলেন। বিনোদিনী তাঁকে বলছেন, যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ 'চৈতন্যলীলা' দেখতে এসে তাঁর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, "মা, তোমার চৈতন্য হোক" সেদিন থেকে তাঁর মধ্যে তিনি বিরাট পরিবর্তন অনুভব করছেন। সংসারের কাজে তাঁর মন নেই, সব সময় অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন ও কাঁদেন। মহামায়া বললেন, রামকৃষ্ণের স্বভাবই ওরকম, তিনি সংসারী নরেনকে গেরুয়া পরিয়ে সন্ন্যাসী সাজিয়েছেন। তিনি আরো বললেন, সেদিন গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর কাছে এলে তাঁর বিশেষ দর্শন হবে। মহামায়া চলে গেলে গিরিশচন্দ্র এলেন। বিনোদিনীর মুখে মহামায়ার কথা শুনে গিরিশচন্দ্র মহামায়ার প্রকৃত স্বরূপ জানার জন্য মহামায়া প্রদত্ত ঠিকানায় বসবাসকারী পুরোহিত দীনু ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠান এবং দীনু ভট্টাচার্যের কাছে জানতে পারেন, মহামায়া বলে কোন মেয়ে সেই বাড়ীতে থাকেন না। সেকথা শুনে গিরিশচন্দ্র ও বিনোদিনী বুঝতে পারেন দেবী মহামায়ার রূপ ধরে তাঁদের কাছে এসেছিলেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ ও রাখালসহ রামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের 'নিমাই সন্ন্যাস' দেখেছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁদের সকলকে যত্ন করে খাইয়েছেন। রামকৃষ্ণ মহাখুশী। কিছু পরে মদমত্ত গিরিশ রামকৃষ্ণের কাছে এসে বললেন রামকৃষ্ণ যদি তাঁর পুত্র হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন তবে তিনি প্রাণভরে তাঁর সেবা করেন। রামকৃষ্ণ বললেন, তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে কায়স্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করতে রাজী নন। একথা শুনে ক্রোধে উন্মত্ত গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণকে ভণ্ড বলে অপমান করলে মর্মাহত বিবেকানন্দ সেখান থেকে প্রস্থান করেন। বিনোদিনী দ্রুত এসে গিরিশকে সেখান থেকে নিয়ে চলে যান। (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের শিষ্য মহেন্দ্রকে গিরিশের রামকৃষ্ণকে অপমানের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে রামকৃষ্ণ সেখানে এলেন। বিবেকানন্দ বললেন, এরপর গুরুদেবের গিরিশের মুখদর্শন করা উচিত নয়। মহেন্দ্র বললেন, অন্তত কিছুদিন গিরিশকে তাঁর দর্শন দেওয়া ঠিক হবে না। হয়তো এর ফলে তাঁর মনে অনুতাপ আসতে পারে। রাম এসে বললেন, গিরিশ রামকৃষ্ণের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার করেছেন। ঠাকুর গিরিশকে যা দান করেছেন গিরিশ তাই তাঁকে উপহার দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ঠাকুরের উচিত অনুতপ্ত গিরিশেব কাছে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া। রামকৃষ্ণ যেন সেই কথাই আশা করেছিলেন। তিনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

পরদিন নেশার ঘোর কাটলে রামকৃষ্ণকে অপমান করার আত্মগ্লানিতে গিরিশচন্দ্র আত্মহত্যা করার জন্য গঙ্গাতীরে এসেছেন। সেখানে অতুল তাঁকে বাধা দিয়ে বাড়ীতে ফিরে যেতে বললেন। গিরিশচন্দ্র কিছুতেই বাড়ী ফিরে যেতে রাজী না হলে অতুল ব্যর্থ মনোবথ হয়ে চলে যান। গিরিশচন্দ্র গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হলে মহামায়া একটি বৌ-এর বেশে কলসী কাঁখে সেখানে আসেন। তিনি বললেন, নিজের ইচ্ছায় যেমন মানুষ জন্মগ্রহণ করে না, তেমনি মানুষ স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে পারে না, সুতরাং তিনি যেন ঘবে ফিরে যান। মহামায়া চলে গেলে গিরিশচন্দ্র তাঁকে চিনতে পেরে বুঝতে পারেন, মহামায়া নানাকথার ছলে কালহরণ করে তাঁর মন থেকে আত্মহত্যার ইচ্ছা দূর করে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মনে পুনরায় গুরুকে অপমান করার গ্লানিবোধ ফিরে এল, তিনি আবার আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় সশিষ্য রামকৃষ্ণ তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। রামকৃষ্ণের ক্ষমাসুন্দব মুখের দিকে তাকিয়ে গিরিশ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। গিরিশ বললেন, ঈশ্বর যুগে যুগে নানা মূর্তি ধরে ভক্তের সঙ্গে খেলা করে থাকেন। (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

বিনোদিনীর বাড়ীতে মহামায়া এসেছেন। মহামায়া বিনোদিনীকে সংসার ত্যাগ করে দক্ষিণেশ্বরে চলে যেতে বললেন। বিনোদিনী প্রথমে মনঃস্থির করলেও পরে থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসার টানে সে সংকল্প ত্যাগ করলেন। (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, রাম দত্তের সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ গিরিশের নূতন নাটক দেখতে এসেছেন। তিনি এসেই গিরিশের খোঁজ করলেন। গিরিশ এসে রামকৃষ্ণের কাছ থেকে টিকিটের পয়সা চাইলেন। এতে রামদত্ত ভিন্ন অন্যান্য শিষ্যরা অপমানিত বোধ করলেন। রামকৃষ্ণ টিকিটের মূল্য হিসেবে প্রথমে চারজনের জন্য চার আনা দিতে চাইলে গিরিশ তা নিতে রাজী হলেন না। তিনি পুরোপুরি ষোলআনা আদায় করলেন। বিবেকানন্দ গিরিশের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। তিনি গিরিশকে বললেন, গিরিশের কার্যে তিনি চমৎকৃত। গুরু কখনো কাউকে ষোলআনা দেন না, কিন্তু তিনি গিরিশকে তা দিয়েছেন এবং সেই আশীর্বাদ গিরিশ নিজ কৃতিত্বে লাভ করেছেন। তাই তিনি বিবেকানন্দর নমস্য। গিরিশ হাতে ধরা সেই পয়সাগুলোর দিকে তাকিয়ে আবেগে উন্মত্তের মত কেঁদে উঠলেন। (তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

বিনোদিনীর মনে সব সময় অস্থিরতা। অভিনয়ে তাঁর মন নেই। সেজন্য থিয়েটারের লোকেরা চিন্তিত। সেদিন থিয়েটারের এক অভিনেত্রী কালীতারা বিনোদিনীর খবরাখবর

নিতে বিনোদিনীর বাড়ী আসেন এবং পয়লা জানুয়ারীতে যে 'বিল্বমঙ্গল' অভিনীত হবে, সেখানে বিনোদিনী চিন্তামণির ভূমিকায় অভিনয় করছেন, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিনেল। বিল্বমঙ্গলের কথা শুনতেই বিনোদিনী ভাবাবেশে চিন্তামণির সংলাপ বলতে শুরু করলেন। ইতোমধ্যে গিরিশ ঘোষ এসে বিল্বমঙ্গলের সংলাপ বলতে লাগলেন। কালীতারা গিরিশ ঘোষকে প্রণাম করে চলে গেলেন। বিল্বমঙ্গলের কিছু অংশ বলার পর দুজনে চুপ করলেন। বিনোদিনী গিরিশকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে গেছেন কিনা। গিরিশ বললেন, পরশু রাতে কিছু থিয়েটারের মেয়ে ও মদের বোতল নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন তাঁর সহ্যশক্তি পরীক্ষা করার জন্য। অসুস্থ থাকায় শিষ্যরা তাঁকে যেতে বারণ করলেন। কিন্তু সে সময় স্বয়ং রামকৃষ্ণ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। গিরিশের নির্দেশে মেয়েরা গীত সহযোগে নৃত্য করতে শুরু করলে বিস্মিত গিরিশ দেখলেন, ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে উম্মাদের মত নাচছেন। গিরিশও সেই নৃত্যে যোগ দিলেন। সে সময গিরিশের মনে হলো, ঠাকুরের চরণ দোলায় বিশ্বসংসার দুলছে, গিরিশের জন্মমৃত্যু, কামনা বাসনা সব দুলছে। তারপর একসময় সেই নৃত্য শেষ হল, ঠাকুরের চোখে ভাব-সমাধির ঘোর। শিষ্যদের চোখে নীরব ভর্ৎসনা। কে যেন তাঁকে বাড়ী ফিরে যেতে বললেন। তিনি মাথা নীচু করে মেয়েদের নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি আরো বললেন, গিরিশ ঘোষের ছোঁয়া লেগেছে বলে ঠাকুরের মত পরশমণিকে বেশীদিন ধরে রাখা যাবে না। সে কথা বলে তিনি দ্রুত প্রস্থান করলেন। (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে রামকৃষ্ণ বসে আছেন। তাঁর গলায় ব্যথা বেড়েছে। সেদিন পয়লা জানুয়ারী। ভৈরব রামকৃষ্ণকে প্রণাম করতে এসেছেন। রামকৃষ্ণ গিরিশের থিয়েটারের মেয়ের সঙ্গে তাঁর নৃত্য করার ঘটনা ভৈরবকে বললেন। ভৈরব তাঁর কাছে চিরবিদায় নিয়ে বললেন, তিনি গিরিশকে বলেছেন, তিনি যেদিন বিদায় নেবেন সেদিন গিরিশ স্বয়ং ভক্ত-ভৈরব হয়ে যাবেন। বিবেকানন্দ এসে বললেন, ঠাকুর যখন এত গলাব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন তখন তিনি মা'র কাছে গলা সারাবার জন্য না হোক, অন্তত খাবার খেতে পারেন সেই অবস্থার জন্য যেন প্রার্থনা করেন। ঠাকুর বললেন, তিনি সেই প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন কিন্তু মা হেসে বললেন, পৃথিবীর এত লোকের গলা দিয়েই তো তিনি খাচ্ছেন, এতেও তাঁর ক্ষিধে মিটছে না কেন। সে কথা শুনে লজ্জায় তিনি মা'র কাছ থেকে পালিয়ে এসেছেন। তিনি ইঙ্গিতে শিষ্যদের বললেন, তাঁর যাবার সময় হয়েছে। তিনি গিরিশের জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণ পর গিরিশ এলেন। গিরিশ বললেন, তাঁর পাপ ধারণ করার জন্য ঠাকুরের গলায় দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ দুরন্ত রোগকে ডেকে এনেছেন। রামকৃষ্ণ বললেন, তিনি শুনেছেন, গিরিশ নাকি তাঁকে মহাত্মা, মহাপুরুষ বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। গিরিশ বললেন, ব্যাস বাল্মীকি যাঁর কথা লিখে শেষ করতে পারেনি, নারদ যাঁর মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে অন্ত করতে পারেননি, সেই মহাপুরুষের কথা তিনি কতটুকু জানেন এবং কিই বা বলতে পারেন। সে কথা শুনে ঠাকুরের মধ্যে ভাব-সমাধির পূর্বলক্ষণ দেখা গেল। তিনি সকলকে বললেন, তিনি কল্পতরু হয়েছেন। যার যা মনস্কামনা তা তিনি পূর্ণ করবেন। রাম, মহেন্দ্র তাঁদের ইচ্ছা জানালেন। ঠাকুর প্রস্থান করলেন। গিরিশ বললেন, তিনি ঠাকুরের কাছে কিছু চাইবেন না। তিনি ঠাকুরের স্পর্শ পেয়েছেন সুতরাং তাঁর মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটবেই। (চতুর্থ অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)।

রামকৃষ্ণদেব কল্পতরু হয়েছেন শুনে দলে দলে লোক দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সামনে এসে ভিড় করতে লাগল। বিনোদিনীও এসেছেন শুধু ঠাকুরকে দেখার জন্য, তাঁর কাছে কিছু চাইতে নয়। গিরিশ দক্ষিণেশ্বরেই রয়েছেন। বিনোদিনী তাঁকে বললেন, তিনি ঠাকুরের কাছে কি চেয়েছেন। গিরিশ বললেন, না চাইতেই তাঁর জীবনের পাত্র ঠাকুর পূর্ণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর আর চাইবার কিছু নেই। বিনোদিনী তখন বললেন, তাঁর ঠাকুরকে দর্শন করারও দরকার নেই। গিরিশকে প্রণাম করে বললেন, গিরিশ তাঁর তীর্থ, তাঁর ঈশ্বর। তাঁর মধ্য দিয়ে ঠাকুর বিনোদিনীর প্রণাম গ্রহণ করবেন। বিনোদিনী চলে গেলেন। বিবেকানন্দ গিরিশকে বললেন, তিনি আর রাম ঠাকুরকে খাওয়াবার জন্য ঘরে ঢুকতে গিয়ে কী এক অজানা ভয়ে ধাক্কা খেযে বেরিযে চলে এসেছেন। গিরিশচন্দ্র তখন তিনটি অর্ঘ্য সাজাতে বললেন। অর্ঘ্য সাজানো হলে গিরিশ একে একে বিবেকানন্দ, কালি'র কাছ থেকে অর্ঘ্য নিয়ে ঠাকুরের সামনে কালী বন্দনা করতে শুরু করলেন। প্রতিবারই কালীমূর্তি ঝলসে উঠতে লাগলেন। শেষে রাখালের কাছ থেকে অর্ঘ্য নিযে বললেন—"ইদমর্ঘ্যং, ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমঃ"। ঠাকুর 'জয় মা' 'জয় মা' বলতে লাগলেন এবং গিরিশচন্দ্র উন্মাদের মত ক্রমাগত "ওঁ ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমঃ" বলে নাচতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকে এবং কালি, রাখাল গিরিশচন্দ্রকে ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। (চতুর্থ অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য—যবনিকা)।

- বৃত্ত-গঠন

এই নাটকে দুটি বৃত্ত।

অনেক দ্বিধা সংশয়ের পথ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র কাঙ্ক্ষিত গুরুকে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে খুঁজে পেলেন—এটি আধিকারিক বৃত্ত।

আধিকারিক বৃত্তকে নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক বৃত্ত সহায়তা করেছে :

(ক) ভৈরব-মহামায়া-উপবৃত্ত

(খ) বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ-রাম-মহেন্দ্র-উপবৃত্ত

(গ) বিনোদিনী-উপবৃত্ত।

- অপ্রয়োজনীয় অংশ

এই নাটকে কোন অপ্রয়োজনীয় অঙ্ক বা দৃশ্য নেই। তবে তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে জুড়ন ও জীবনের কথোপকথন অংশটি নাটকের অগ্রগতিতে কোন সহায়তা করেনি।

- নাট্যক্রিয়ার বিভাগ

John Howard Lawson-এর নাট্যগঠনরীতি এই নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রথম পর্যায়ে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য গুরুর সন্ধানে গিরিশচন্দ্রের মানসিক অস্থিরতা, ভক্ত ভৈরবের গিরিশকে আশ্বাস দান, গিরিশের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ,

গিরিশের রামকৃষ্ণের আহ্বান প্রত্যাখ্যান (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)-এর মাধ্যমে নাট্যক্রিয়ার সূচনা (exposition) হয়েছে।

রামকৃষ্ণকে দেখার পর গিরিশের মানসিক চঞ্চলতা, গিরিশের কাছে মহামায়ার সাধারণ নারীবেশে আগমন ও তাঁর গুরু যে তাঁর থিয়েটার দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন সে সংবাদ জ্ঞাপন, পরমুহূর্তে গিরিশের কাছে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্য বিবেকানন্দর থিয়েটারের পাশ চাওয়া, মহামায়ার অলৌকিকত্ব সম্পর্কে গিরিশের মনোভাব (প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), গুরুকে পাওয়ার জন্য গিরিশেব অস্থিরতা ও সেইহেতু মহলায় তাঁর অনুপস্থিতি (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য), বিনোদিনীর কাছে ক্ষেত্রমণির গিরিশ চন্দ্রের মানসিক অবস্থা বর্ণন, বিনোদিনীকে নূতন নাটক 'চৈতন্যলীলা'র এক গাড়ী পাশ মন্দিরে পাঠিয়ে দেবার জন্য মহামায়ার অনুরোধ, বিনোদিনীর অন্তরে গিরিশের আদেশ পাওয়া (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য), গিরিশের প্রতি রামকৃষ্ণের যে বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে সে বিষয়ে রামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দের মধ্যে আলোচনা, রামকৃষ্ণের বিবেকানন্দের কাছে গিরিশের নূতন নাটক দেখার ইচ্ছাপ্রকাশ, (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য), বিনোদিনীর রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ, গিরিশ ও বিনোদিনীর কাছে মহামায়ার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)—এ সব ঘটনায় কাহিনীর অগ্রগতি (rising action) ঘটেছে।

তৃতীয় পর্যায়ে এসেছে সংঘাত (clash)। গিরিশচন্দ্রের পুত্ররূপে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণে রামকৃষ্ণের অস্বীকৃতিতে মদমত্ত গিরিশের রামকৃষ্ণকে ভণ্ড বলে অপমান, মর্মাহত বিবেকানন্দর সে স্থান ত্যাগ (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)-এর মধ্যে সংঘাতের রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিনোদিনীকে মাহামায়া সংসার ত্যাগ করতে বললেও থিয়েটারের আকর্ষণ তাঁর কাছে বড় হওয়ায় তাঁর মধ্যে মানসিক সংঘাত এসেছে, (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য), রামকৃষ্ণের কাছে থিয়েটারের টিকিটের মূল্য হিসেবে গিরিশের ষোলআনা আদায় করার মধ্যে (তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য) তীব্র সংঘাত লক্ষ্য করা যায়।

চতুর্থ পর্যায়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে শেষ পরীক্ষা করার জন্য গিরিশচন্দ্রের কিছু থিয়েটারের মেয়ে ও মদ নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন, মেয়ে ও গিরিশের সঙ্গে ঠাকুরের নৃত্য এবং ঠাকুরের ভাবসমাধি (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য) ঠাকুরের গলায় ব্যথাবৃদ্ধি, সেই ব্যাধির জন্য গিরিশের নিজেকে অপরাধী মনে হওয়া, ঠাকুরের মধ্যে গিরিশের প্রকৃত গুরুলাভ (চতুর্থ অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য) ও গিরিশের ঠাকুর রামকৃষ্ণকে পূজার মধ্য দিয়ে (চতুর্থ অঙ্ক। শেষ দৃশ্য) কাহিনীর চূড়ান্ত রূপ (climax) পরিলক্ষিত হয় ও এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে।

সূত্র পরিচিতি

1. Aristotle Horace Longinus, Classical Literary criticism, Translated by T.S. Dorsch, P. 43, Great Britain, 1974.
2. Aristotle : On the Art of Poetry, Translated by Ingram Bywater, P. 82, Delhi, Oxford University Press, 1987.

3. ..... a tragedy has the following parts : Prologue, Episode, Exode, and a choral portion, distinguished into Parode and Stasimon; .....

—Aristotle : On the Art of Poetry, Translated by Ingram Bywater, P. 48, Delhi, Oxford University Press, 1987.

4. ..... the Elizabethans, and Shakespeare in particular, frequently made the sub-plot a duplication or an explanation of the main theme of the play.

—The Theory of Drama, Allardyce Nicoll, P. 133, Delhi, 1969

5. ... . the drama possesses. a pyramidal structure. It rises from the introduction with the entrance of the exciting forces to the climax, and falls from here to the catastrophe.....

—The Technique of Drama, Dr. Gustav Freytag, P. 114-115, Chicago, 1894.

6. The real plot of a play begins with the beginning of a conflict, such conflict arises out of ...,. a certain existing condition of things and certain relations among the characters ..... these conditions and relations have to be explained to us, since otherwise the story will be unintelligible.

—An Introduction to the study of Literature, William Henry Hudson, P. 201, Delhi, 1976.

7. I should rather compare the rise and fall of tragic intensity to a parabola.

—Tragic Drama in Aeschylus, Sophocles and Shakespeare, An Essay, Lewis campbell, P. 79, London, 1904.

8. I have constantly referred to the climax as the controlling point in the unification of the dramatic movement. I have assumed that this event is the end of the action.

—Theory and Technique of Playwriting and Screen-writing, John Howard Lawson, P. 267, New York, 1949.

9. নাট্য শাস্ত্র, ভরত : শ্লোক সংখ্যা-৩, একবিংশ অধ্যায়

10. ঐ -৩৬ ঐ

11. ঐ -৮ ঐ

12. ঐ -২১ ঐ

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

নাট্যচরিত্র বিষয়ক তত্ত্ব

নাটক জীবন-চিত্র। বিভিন্ন ও বিচিত্র চরিত্র অবলম্বনে এই জীবন চিত্রের পরিচয় নাটকে তুলে ধরা হয়। চরিত্র হচ্ছে চিন্তা (thought), কথা (speech) ও বিভিন্ন ক্রিয়ার (action) বাহক। নাট্য ঘটনার মাধ্যমে এই চরিত্র-চিত্রণ করা নাটকের অন্যতম লক্ষ্য। তবে নাটকে চরিত্রের গুরুত্ব কতখানি সে সম্পর্কে নানা মত আছে। কেউ ঘটনা, কেউ চরিত্র আবার কোন কোন তাত্ত্বিক উভয়কে সমান মর্যাদা দিচ্ছেন। প্রথম শ্রেণীর মতে, ঘটনাকে কেন্দ্র করেই চরিত্র আবর্তিত হয় সুতরাং চরিত্র ঘটনার অধীন। একটি বৃত্ত রচিত না হওয়া পর্যন্ত চরিত্র-বিশ্লেষণ ও তার রহস্য উন্মোচন সম্ভব নয়। অনেকে ঘটনা অপেক্ষা চরিত্রকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন।[১] তাদের মতে, চরিত্র ব্যতীত নাট্য কাহিনী লেখা সম্ভব নয়। চরিত্রের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার প্রয়োজনে নাট্যঘটনা আসে, চরিত্র নাটকের পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, চরিত্র প্রসূত আচার আচরণ নাট্য ঘটনার গতি ও পরিণতি নির্ণয় করে। চরিত্র নিয়ন্ত্রিত ঘটনা বিন্যাস-ই নাটকে কাম্য। সুতরাং যে নাটকে চরিত্র ঘটনাকে চালিত করে তা-ই সজীব নাটক (live play) এবং ঘটনা যেখানে চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটি প্রাণহীন (dead one) বলে প্রতিপন্ন হবে।[২] বর্তমানে এই একমুখী চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে। অধিকাংশ তাত্ত্বিক উভয়কে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে নিটোলবৃত্ত ও সুন্দর চরিত্র-চিত্রণ ব্যতীত একটি নাটক সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট নাট্যকাহিনী নয়, চরিত্রের নানা কৌতূহলোদ্দীপক উত্থানপতনমূলক সুখ-দুঃখ নাটকে প্রকাশ করতে হয় এবং তারই ওপর নাটকের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে।[৩]

নাট্য চরিত্রের স্বরূপ ও প্রকারভেদ :

নাট্যচরিত্র্যকে প্রধানত পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) protagonist

গ্রীক্ কমেডিতে বাক্‌যুদ্ধ অংশটিকে (agon) বলা হয়। সুতরাং Agon শব্দটি দ্বন্দ্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। Prota বলতে প্রথম বা প্রধান বোঝায়। Agon-এর সঙ্গে Prota যুক্ত করে Protagonist শব্দ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বাক্‌যুদ্ধের একপক্ষে ন্যায়

(just discourse) অন্য পক্ষে অন্যায় (unjust discourse) থাকে। ন্যায়পক্ষ অবলম্বনকারীকে Progatonist বা প্রধান চরিত্র বলা হয়। Aristotle চরিত্র সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তাকে প্রধান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলা যায়। তাঁর মতে, ভাল (good), যুক্তিযুক্ত (appropriate), বাস্তব (like the reality), সঙ্গত (consistent) চরিত্র-ই নাট্য চরিত্র বলে বিবেচিত হবে।[৪] প্রকৃতপক্ষে মূল চরিত্র (নায়ক বা নায়িকা) হচ্ছে নাট্য ঘটনার মূল ভাব বা ফলশ্রুতির ধারক। জীবনের নানা ঘটনা, বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে সে একটি স্থির লক্ষ্য রূপ ফলশ্রুতির দিকে এগিয়ে যেতে চায়। প্রধান চরিত্র দুই ধরণের। প্রথম শ্রেণীর চরিত্র নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। তাকে সক্রিয় (active) নায়ক বলে। যেমন, William Shakespeare রচিত 'Macbeth' নাটকের Macbeth, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' নাটকের কর্ণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র নিষ্ক্রিয় (passive) প্রকৃতির হয়। এই ধরণের চরিত্র বিরুদ্ধশক্তির আঘাতে নিজেকে জর্জরিত করে, সক্রিয়ভাবে প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় না। যেমন, William Shakespeare-এর King Lear নাটকের Lear, গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) নাটকের যোগেশ।

Protagonist-এর বিরোধী চরিত্রকে (খ) Antagonist (Agon-এর সঙ্গে Anta যুক্ত হয়েছে) অর্থাৎ প্রতিনায়ক বলে। সে প্রধান চরিত্রের সর্বকাজে বাধার সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। যেমন, William Shakespeare-এর 'Othello, The Moor of Venice'-নাটকের Iago, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' (১৯০৯) নাটকের ঔরঙ্গজেব।

যে চরিত্র নাট্য-ঘটনায় গতিসঞ্চার করে তাকে (গ) Pivotal Character অর্থাৎ নাট্য কাহিনীর চালক চরিত্র বলে।[৫] সাধারণতঃ অন্য চরিত্রের তুলনায় এই চরিত্রের পরিবর্তন কম হয়। সে একটি নির্দিষ্ট মনোভাব নিয়ে নাট্য কাহিনীতে প্রথম থেকে আবির্ভূত হয় এবং তার সেই বিশিষ্ট মনোভাব কাহিনীতে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখে। এই চরিত্র বিশেষ পরিবর্তিত না হলেও অন্য চরিত্র পরিবর্তনে সাহায্য করে।[৬] Pivotal character কখনো Protagonist, কখনো Antagonist আবার কখনো স্বতন্ত্র চরিত্ররূপে বিরাজ করে। যেমন, William Shakespeare রচিত 'Hamlet, Prince of Denmark' নাটকে Hamlet, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নূরজাহান' (১৯০৮) নাটকের নূরজাহান, একাধারে Protagonist ও Pivotal, অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতি, Henrik Ibsen-এর Ghosts নাটকের Mr. Manders Pivotal চরিত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছে। আবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' ,নাটকের চন্দ্রগুপ্ত Protagonist, নন্দ Antagonist ও চাণক্য Pivotal Character। Protagonist, Antagonist ও Pivotal character হবে সবল (strong) চরিত্র। কারণ দুর্বল (weak) চরিত্র নাটকের দ্বন্দ্বের ভার বহন করতে পারে না এবং এর ফলে নাটক দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রবল সংকল্প শক্তি (strength of will) সম্পন্ন ব্যক্তিই দ্বন্দ্বসংঘাত ও প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে।

দ্বন্দ্বসংঘাত নাটককে আকর্ষণীয় করে তোলে। বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে দুটি বিরুদ্ধশক্তির মধ্যে সচেতন ইচ্ছাশক্তি (conscious will) থেকে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং

আপোষহীন চরিত্র (uncompromising character) এই দ্বন্দ্বসংঘাতকে তীব্ররূপ দান করে। লক্ষ্য ও ফললাভ, উদ্দেশ্য ও কার্যসম্পাদনের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্ট হলে দ্বন্দ্ব আসে।[৭]

কোন চরিত্রে পরস্পরবিরোধী মনোভাবে সংঘর্ষ ঘটলে তাকে অন্তর্দ্বন্দ্ব (Inner conflict) বলে। চরিত্রের অভ্যন্তরে কর্তব্যবোধের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে সমাজানুগত্য, আদর্শবোধের সঙ্গে কঠোর বাস্তব, দুই ভিন্ন মানসিক প্রবৃত্তির সংঘাত প্রভৃতি থেকে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হয়।[৮] যেমন William Shakespeare রচিত 'Hamlet, Prince of Denmark' নাটকে Hamlet-এর পিতার প্রেত (Ghost) তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নিতে তাঁর ভাই Claudius-কে হত্যা করতে Hamlet-কে বললে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পিতার আদেশ পালন করা সে অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করে। কিন্তু Hamlet উচ্চশিক্ষিত, দার্শনিক হওয়ায় শুধুমাত্র আবেগ তাড়িত হয়ে সেই ভয়ঙ্কর কাজ করতে পারে না। তার যুক্তি, বিচারশক্তি ও সূক্ষ্মরুচিবোধ তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে।[৯] দুই মানসিকতার টানাপোড়েনে ("To be, or not to be: that is the question:") Hamlet গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।

নাট্যচরিত্র যখন বহির্জগতের শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন তাকে বহির্দ্বন্দ্ব (extrnal conflict) বলে। এই বহির্দ্বন্দ্ব মূলতঃ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতির আবার ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের হতে পারে। যেমন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' নাটকে কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে বহির্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে।

দ্বন্দ্বের জন্য নাটকে বিরুদ্ধশক্তিযুক্ত চরিত্রের উপস্থাপনা করতে হয়। একে 'Unity of opposites' বলে। সেজন্য দেখা যায়, দুটি চরিত্র পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয় (united to destroy each other)। এর ফলে একজন অপরজনের দ্বারা নিহত হতে পারে (শারীরিক ভাবে) অথবা একজনের দৈহিক মৃত্যু না হলেও তার মানসিক জগতে বিরাট পরিবর্তন আসতে পারে অর্থাৎ তার স্বভাবের বিশিষ্টতম ধর্মের (deminent quality) সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে পারে। (যেমন, Henrik Ibsen-এর 'A Doll's House '(1879) নাটকে Helmar-এর জন্য Nora-র মানসিক জগতে বিরাট পরিবর্তন ঘটল।

নাটকে চাররকমের দ্বন্দ্ব দেখা যায়— স্থিতিধর্মী (static) আকস্মিক লম্ফনধর্মী (jumping) ধীরারোহণধর্মী (slowly rising) আভাসধর্মী (foreshadowing) দ্বন্দ্ব।[১০]

স্থিতিধর্মী দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্ব অগ্রসর হয় না। সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তবাক্যের (premise) অভাবে দ্বন্দ্ব একই আবর্তে ঘুরতে থাকে ও সেই কারণে চরিত্র গতিহীন হয়ে পড়ে। চরিত্রের প্রবল ক্রিয়াশক্তি না থাকায় সে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। ফলে চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটে না।

উপযুক্ত কার্যকারণ ব্যতীত অকস্মাৎ যে দ্বন্দ্ব আসে তাকে আকস্মিক লম্ফনধর্মী দ্বন্দ্ব বলে। এখানে দ্বন্দ্বের ক্রমবিকাশ দেখানো হয় না। উপযুক্ত লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তন (proper transition)-এর অভাবে এটি ঘটে থাকে। এজন্য দর্শকমনে ধাক্কা (jerk) লাগে। এ ধরণের দ্বন্দ্ব মূলতঃ Melodrama-তে দেখানো হয়।

কার্যকারণযুক্ত ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বকে ধীরোরোহণধর্মী দ্বন্দ্ব বলে' এই ধরণের দ্বন্দ্বে দুই বিপরীতশক্তি তাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়। এখানে দ্বন্দ্ব ক্রমে ক্রমে (step by step) অগ্রসর হয় এবং সুস্পষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়। এই ধরণের দ্বন্দ্বই নাটকে একান্ত কাম্য।

আভাসধর্মী দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্ব-আগমনের ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু দ্বন্দ্ব আসে না এবং একসময় দ্বন্দ্ব ব্যতীতই নাট্য কাহিনী সমাপ্ত হয়। যেমন, দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য দুটি দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এই ঘটনা নিয়ে নাটকে অগ্রসর হচ্ছে। এখানে দ্বন্দ্বের আভাস রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বসংঘাত ব্যতীত নাটকটি সমাপ্ত হল। এ প্রসঙ্গে 'Thirty Seconds over Tokyo'-চলচ্চিত্রের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

নাটকে কিছু চরিত্র Protagonist-এর এবং কিছু চরিত্র Antagonist-এর সহযোগীরূপে বিরাজ করে। এদের (ঘ) Allied Agent বলে। শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তর (১৮৮৭-১৯৫৪) সিরাজদৌল্লা (১৯৩৮) নাটকে 'Protagonist' সিরাজের সহযোগী চরিত্ররূপে আলেয়া, মোহনলাল, গোলাম হোসেন প্রমুখ ব্যক্তির নাম করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের Antagonist ঔরঙ্গজেবকে জিহনআলি, মহম্মদ প্রমুখ সহযোগিতা করেছে।

নাটকে সহ সহযোগী চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বা বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে না। অনেক গৌণ চরিত্রকে (minor character) নাট্য কাহিনীর প্রয়োজনে আনয়ন করা হয় এবং এই গৌণ চরিত্র নাট্য ঘটনায় অত্যাবশক ভূমিকা পালন করে।[১১] কোন কোন নাটকে এ ধরণের চরিত্র মূক হয় অর্থাৎ তাদের মুখে কোন সংলাপ থাকে না। প্রাচীন গ্রীক নাটকেও এই ধরণের নির্বাক (Mute) চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন, Euripides (485-406 B. C.)-এর 'Orestes' (408 B. C.) নাটকের Pylades চরিত্র।

উপরিউক্ত চারশ্রেণীর চরিত্র ব্যতীত আর এক ধরণের চরিত্র আছে যারা হয় নাটকের নেপথ্যে থাকে, নয় পরিস্থিতির (বাজারের দৃশ্য, সভার দৃশ্য প্রভৃতি) বা পটভূমি রচনা (যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যের কুচকাওয়াজ প্রভৃতি) করে। এদের (ঙ) Back ground Agent বলে। নাট্য কাহিনীর প্রয়োজনে সাময়িকভাবে এ সব চরিত্রের আগমন ঘটে।

অনেকে কোন চরিত্রের চাল চলন, কথাবার্তায় অস্বাভাবিকতা (Abnormality) দেখে তাকে type চরিত্র নামে ভূষিত করেন। কিন্তু এটি ঠিক নয়। নাটকে Type চরিত্র বলে কোন বিশেষ শ্রেণীর চরিত্র নেই। প্রত্যেকটি চরিত্রই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে এক একটি type বা class—"each is distinct class or type."

নাট্য চরিত্রে (মূলতঃ Protagonist, Antagonist, Pivotal Character) কর্মপ্রচেষ্টার বাসনা ('wish') থাকবেই।[১২] তবে অনেক সময় চরিত্রে বাসনা থাকলেও প্রবল ইচ্ছাশক্তি ('Will বা 'Volition') না থাকায় তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি একটি চরিত্রকে দ্বন্দ্ব মুখর সজীব ও সক্রিয় করে তোলে। এর মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ বিকাশমান চরিত্রের প্রকাশ ঘটে।[১৩] গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের (Protagonist) মধ্যে 'Wish' আছে, কিন্তু 'Will' বা 'Volition' নেই। অন্য দিকে Sophocles-এর 'Oedipus Tyrannas' নাটকের Oedipus (protagonist ও

Pivotal Character), William Shakespeare-এর 'Hamlet, Prince of Denmark' নাটকের Hamlet (Protagonist ও Pivotal Character), 'Othello, The Moor of Venice'—নাটকের Othello (Protagonist) Iago (Antagonist ও Pivotal Character), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চন্দ্রগুপ্ত (Protagonist), নন্দ (Antagonist) ও চাণক্য (Pivotal Character) প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে 'Wish' এর সঙ্গে 'Will' বা 'Volition' রয়েছে।

নাটকে কোন চরিত্রই অকস্মাৎ পরিবর্তিত হতে পারে না। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে চরিত্রটি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। সার্থক চরিত্রেই সুষ্ঠু ক্রমপরিণতি (transition) ও পূর্ণ পরিণতি (growth) লক্ষ্য করা যায়।

মানুষ সামাজিক জীব। সে তার নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টায় জীবনপথে এগিয়ে চলে। প্রত্যেকটি মানুষ আবার স্বতন্ত্র মানসিকতার অধিকারী এবং এই মানসিকতা তার কর্মপন্থা তথা জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে সমাজে নানাধরণের চরিত্র দেখা যায়। একটি নাটককে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে এই ধরণেব বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটানো প্রয়োজন এবং প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পরস্পর বিরুদ্ধ চরিত্রের (contrasted Character) সমাবেশে ঐকতান Orchestration-এর সৃষ্টি করা নাটকে একান্ত বাঞ্ছনীয়। এর ফলে নাটক দ্বন্দ্বমুখর হয়ে বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। সুন্দর চরিত্র-ঐকতান যে কোন নাটকের দ্বন্দ্বকে ঊর্ধ্বমুখী করে তুলতে সহায়তা করে।[১৪] নাটকে দ্বন্দ্বসংঘাতময় চরিত্র না থাকলে সুষ্ঠু যৌথচরিত্র (well orchéstrated Cháracter) যুক্ত নাট্যকাহিনী গড়ে ওঠে না।

আর একটি কথা, নাট্য চরিত্রের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ (situation) চাই। কারণ পরিবেশ যদি কৃত্রিম হয় তবে চরিত্র সার্থকভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। তাই চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে যথাযথ পরিবেশ রচনা করা প্রয়োজন।

মানব চরিত্র মাত্রই ত্রৈমানিক (tridimensional)। এই ত্রৈমানিকতা গড়ে ওঠে চরিত্রের শারীরিক দিক (physiology), সামাজিক দিক (sociology) ও মনস্তাত্ত্বিক দিক (psychology) নিয়ে।[১৫] নাটকে অঙ্কিত চরিত্রগুলি তাই ত্রৈমানিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বংশানুগতি Heredity-র ওপর নির্ভর করে মূলতঃ মানুষের শারীরিক গঠন গড়ে ওঠে। এই গঠনের বিভিন্নতার জন্য প্রত্যেকটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য হয়ে থাকে। খঞ্জ, অন্ধ, বধির, কুৎসিত, সুন্দর, দীর্ঘকায়, খর্বকায়, স্থূলকায়, শীর্ণকায়, সবল, দুর্বল, রুগ্ন, স্বাস্থ্যবান প্রত্যেকটি চরিত্র শারীরিক বিভিন্নতার জন্য সমাজ-সংসারকে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে। আমাদের শারীরিকগঠন আমাদের জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এটি আমাদের ধৈর্যশীল, নম্র, বিনয়ী, উদ্ধত, দুর্বিনীত, সহনশীল, স্থির, অস্থির করে তুলতে সাহায্য করে। তাই আমাদের মানসিক বিবর্তনে এর বিশেষ স্থান আছে।

যে সমাজ ও পরিবেশে মানুষ জন্ম নেয় ও বড় হয়ে ওঠে তার প্রভাব নিয়ে মানবজীবনের সামাজিক দিক গড়ে ওঠে। মানবজীবনে চলার পথে এর প্রভাব এড়ানো যায় না। যে রাস্তায় জন্মেছে ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বড় হয়েছে উঠেছে তার সঙ্গে

সুসজ্জিত ধনীগৃহে প্রতিপালিত শিশুর একটা দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য থাকবেই। পারিবারিক রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, বন্ধুবান্ধব, চাকুরীস্থল, ধর্মচর্চা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক মতবাদ, আমোদ প্রমোদ, সংস্কৃতিচর্চা এই সামাজিক দিকের অন্তর্গত।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য মনস্তত্ত্বগত। এটি প্রথম দুটি বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। শরীরগত ও সমাজগত প্রভাবে একটি চরিত্রের মনোজগৎ সৃষ্ট হয় এবং এদের সম্মিলিত প্রভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, হতাশাগ্রস্ত, ধার্মিক, অধার্মিক, দয়ালু, নিষ্ঠুর, মেজাজী, কোমলস্বভাব, স্নেহপ্রবণ, সুযোগসন্ধানী, সমাজবিরোধী, সামাজিক, অসামাজিক প্রমুখ নানাস্বভাবের চরিত্র গড়ে ওঠে। এইভাবে প্রতিটি মানুষ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে।[১৬]

এসব ব্যতীত চরিত্রের ত্রৈমানিক মানের প্রভাবে মানুষ বহির্মুখী (extrovert), অন্তর্মুখী (introvert) বা উভয়মুখী (ambivert) ব্যক্তিসত্তা-সম্পন্ন হয়। যখন কোন ব্যক্তি বাইরের কাজকর্মের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে তখন তাকে বহির্মুখী চরিত্র বলে এবং যখন কেউ শুধু আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায় নিজের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করে আত্মতৃপ্তি পায় তখন তাকে অন্তর্মুখী চরিত্র বলে। আবার এমন কোন ব্যক্তি আছে যে তার ব্যক্তিসত্তার কিছু অংশ বাহ্যিক আচার আচরণের মধ্যে প্রকাশ করে ও কিছু অংশ তার নিজস্ব মানসিক জগতে প্রেরণ করে। এই ব্যক্তি উভয়মুখী চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।[১৭]

আমাদের মনোজগৎ চেতন (conscious), প্রাক্ চেতন (pre-conscious) ও অচেতন (unconscious) মন নিয়ে তৈরী হয়। চেতন মন অচেতনের তুলনায় অনেক ছোট। আবার চেতন মনের একটি বড় অংশ অচেতন প্রক্রিয়া থেকে আসে।[১৮] চেতনেব ঠিক নীচের স্তরে রয়েছে প্রাক্চেতন। যে সব ঘটনা সাধারণত চেতন মনে থাকে না কিন্তু স্মরণ করতে তা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তাকে প্রাক্চেতন বলে। প্রাক্চেতনের পরবর্তী পর্যায় অচেতন। মনের অনেকখানি স্থান জুড়ে এটি রয়েছে। আমাদের সজ্ঞান চিন্তার বাইরে এর অবস্থান। কিন্তু এটি আমাদের বাহ্যিক আচরণ ও সচেতন চিন্তাধারাকে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রিত করে। চেতন মনে শৃংখলা থাকে, অচেতন বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। নগ্ন কামনা বাসনার উৎস হচ্ছে অচেতন মন। এই আদিম প্রবৃত্তি অনেক সময় জন্ম থেকে অচেতনে বসবাস করে আবার কখনো এটি প্রথমাবস্থায় চেতনে অবস্থান করে পরবর্তীকালে তার অস্বাভাবিক স্বভাবের জন্য অহম (ego) কর্তৃক অবদমিত হয়ে অচেতনে আশ্রয় নেয়। এ থেকেই মনের তিনটি অধিবাসীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এ তিনটি হল—ইদম্ (id), অহম্ (ego) অধিসত্তা ও অধিশাস্তা (super ego)।

অচেতন দেশে ইদম্-এর অবস্থান। এটি প্রকৃতিতে বন্য। এটি লিবিডো (libido)র আদিম আশ্রয়স্থল। লিবিডো হচ্ছে একটি গতিশীল তেজঃপ্রবাহ। মানুষের জন্মমুহূর্তে এর চলা শুরু হয় এবং বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে একটি বিশেষ লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। এটি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যতম সহায়ক। ফলে ইদম্ ব্যক্তির সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কামনার শক্তিসঞ্চারকারী বলে পরিগণিত। এটি সামাজিক কোন ন্যায়নীতিকে মূল্য দেয় না।

অহম্-এর কিছু অংশ চেতন ও কিছু অংশ অচেতনে রয়েছে। অহম্ বাস্তববুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় ও পবিত্রতা (sanity) রক্ষার চেষ্টা করে। অন্য দিকে ইদম্ কামনাকে কেন্দ্র করে তার জগৎ গড়ে তোলে।[১৯]

এর পরের স্তর অধিসত্তা বা অধিশাস্তা (super ego)। কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নীতিবোধ, কিছুটা সামাজিক দিক থেকে অর্জিত নীতিশিক্ষা মিলে এটি গড়ে ওঠে। অধিশাস্তার অনেকখানি অচেতনে থাকে। ফলে ইদমের কার্যাবলী সম্পর্কে সে অহমের চেয়ে বেশি খবর রাখে এবং এর প্রধান কাজ হল, তিক্ত সমালোচনার দ্বারা অহম্‌কে ইদমের প্রবৃত্তিগুলি দমন করতে বাধ্য করানো। এক কথায় অধিশাস্তাকে বিবেক বলা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে তিনটি শক্তিকে মানিয়ে নিয়ে অহম্‌কে চলতে হয়। বাস্তবতা অর্থাৎ সামাজিক আচার আচরণ মেনে চলা, ইদমের বাসনা কামনা তৃপ্তির জন্য নানাকৌশলের আশ্রয় নেওয়া ও অধিশাস্তার চাপে সামঞ্জস্য বিধান করে চলা অহমের কাজ। এ কাজটি ঠিকমত চললে মানসিক ভারসাম্য থাকে কিন্তু ত্রিশক্তির মধ্যে যে কোন একটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পরিপন্থী যে কোন মানসিক প্রক্রিয়াই অস্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন হয়।[১০]

মানুষের মধ্যে আবার Eros ও Thanatos নামে দুটি শক্তি কাজ করে। Eros হচ্ছে জীবনের প্রতীক, Thanatos মৃত্যুর। এই দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি মানুষের মধ্যে অনবরত কাজ করে চলে। মানুষ শিক্ষার দ্বারা সেই বিপরীতমুখী শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে। কিন্তু অনেকের পক্ষে এ ধরণের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয় না বলে স্ববিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে এবং সেই মনোভাব তার আচরণকে প্রভাবিত করে। আবার মাতাপিতার অনুশাসন, সামাজিক নানা বাধানিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের ফলে মানুষ শৈশব থেকে নিজের ইচ্ছা, চিন্তাভাবনাকে অবদমন (repression) করতে বাধ্য হয়। ফলে অচেতন মনে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন মাত্রা ছাড়ায় তখন মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যায় নাটকে চরিত্র রচনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে।[১১] এ প্রসঙ্গে Arther Miller-এর উক্তি স্মরণীয় :

> .... the new social dramatist, if he is to do his work, must be an even deeper psychologist than those of the past........[১২]

আধুনিক নাট্যচরিত্র বিশ্লেষণকালে Tragedy সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। ইউরোপীয় নাটক থেকে আমাদের দেশে Tragedy এসেছে। প্রাচীন ভারতীয় নাটকে Tragedy-র সন্ধান পাওয়া যায় না। কারণ ভারতীয় জীবনদর্শনে Tragedy-র স্থান নেই। আমাদের দর্শনে বলা হয় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের একটি অংশ এবং মৃত্যু থেকে পুনর্জন্ম পর্যন্ত জীবনের আর একটি অংশ। মানুষ কর্মানুসারে মৃত্যুর পর সুখ অথবা দুঃখ পেতে পারে অর্থাৎ ইহজীবনে সে সুখ পেলেও মৃত্যুর পর তার দুঃখ আসতে পারে অথবা বিপরীত ব্যাপার ঘটতে পারে। জীবনের সুখদুঃখ চক্রের মত আবর্তিত হওয়ায় সুখ বা দুঃখ জীবনের শেষ কথা নয়। ফলে ভারতীয় নাটক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় না। এজন্য ভবভূতি তাঁর 'উত্তররামচরিতম্' নাটকে রামসীতার বিচ্ছেদ দেখালেও শেষ পর্যন্ত উভয়ের মিলন দেখিয়েছেন। ভাসের 'কর্ণভারম্' নাটকে মৃত্যু আছে বটে কিন্তু Tragedy বলতে যা বোঝায় তা সেখানে নেই।

Tragodia থেকে Tragedy-র উদ্ভব। Tragodia বলতে বোঝায়—

> "Chorus originally dressed in goatskin or dressed like goats; or because a goat was sacrificed; or because a goat was once the prize."[১৩]

Tragedy-র সংজ্ঞায় Aristotle বলেছেন—

"Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in seperate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions."[২৪]

Tragic character মোটের ওপর ভালো হবে। তারমধ্যে সম্ভাব্যতা (true to life) থাকবে, সে ন্যায়নীতিবোধসম্পন্ন (scrupulous) হবে এবং তার চিন্তাভাবনার মধ্যে স্থিরতা (constancy) থাকা প্রয়োজন। চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য তার জীবনের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি (disastrous end) নেমে আসে। তার এই পরিণতিতে দর্শকমনে করুণা ও ভয় (pity and fear) জাগে। একটি বিরাট চরিত্রের দুঃখজনক পরিণতিতে তার প্রতি দর্শকের করুণা এবং সেই ধরণের ঘটনা তার জীবনে ঘটতে পারে বলে দর্শকের মনে ভীতির উদ্রেক হয়। এই মানসিক অবস্থার পর দর্শকের মোক্ষণ (purgation or chatherses) হয়।

Tragedy-র তিনটি ধারা Classical, Romantic, Modern. Classical Tragedy বলতে Greek Tragedy বোঝায়। এই ধরণের নাটকে দৈবের দ্বারা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে দৈবের জন্য পুরুষকার কখনো জয়ী হয় না। তবে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে পুরুষকার থাকবে। পুরুষকার ব্যতীত কোন চরিত্রে Tragedy আসতে পারে না। কেন্দ্রীয় চরিত্র উচিত কারণে (just cause) বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। Tragedy তে "Hubris followed by Dike" অর্থাৎ ভুল করতে শাস্তি পেতে হয়। এই ধরণের নাটকে গাম্ভীর্যপূর্ণ Solemn বিষয়ের অবতারণা করতে হয়। এর সঙ্গে হাস্যরসাত্মক (ludicrous) বিষয় যুক্ত হয় না। সেজন্য যেদিন গ্রীক নাটক অভিনীত হত সেদিন সকালবেলা ডায়োনিসাসের উৎসবে সকালে তিনটি Tragedy-র অভিনয় হত এবং বিকেলের দিকে পৃথকভাবে হাস্যরসাত্মক নাটক পরিবেশিত হত।

Greek Tragedy-র প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন Simple tragedy, Complex Tragedy, Pathetic Tragedy, Tragedy of Spectacle, Ethical Tragedy, Tragedy of Character.

Simple Tragedy-তে একটির পর একটি ঘটনা এসে দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি করে। যেমন, Aeschylus-এর 'Agamemnon.'

Complex Tragedy-তে reversal of situation থাকে। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র আনন্দময় উন্নতজীবন থেকে দুঃখজনক পরিবেশে পতিত হয় ও তার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। এর সঙ্গে recognition থাকবে। এখানে recognition অর্থে revealation অর্থাৎ দর্শক প্রথমে ঘটনা জানতে পারে না, কিন্তু ধীরে ধীরে নাট্য কাহিনী অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ঘটনা তার সামনে উদ্ঘাটিত হয়—দর্শক অন্ধকার থেকে আলোয় আসে। Sophocles-এর 'Oedipus Tyrannus' নাটকে Oedipus তার পিতাকে হত্যা করে মাতাকে বিবাহ করে এবং মাতার গর্ভে নিজের সন্তান উৎপন্ন করে—এই ঘটনা প্রথমে দর্শকের কাছে অজ্ঞাত ছিল। পরে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে মূল বক্তব্য উন্মোচিত (revealed) হয়।

Pathetic Tragedy তে দুঃখকষ্টের (suffering) কথাই প্রাধান্য পায়। কারুণ্য সৃষ্টি করা এর মূল লক্ষ্য। এখানে আবেগ সৃষ্টির ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। (motive is passion) Euripides-এর 'The Trogan Women' নাটক এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

".........one long lament over the consequences of war and an eloquent lyrical cry of despair.[১৫]

Sophocles-এর Ajax নাটকও এই শ্রেণীভুক্ত। Ajax বিখ্যাত গ্রীক যোদ্ধা ছিলেন। তিনি তাঁর বীরত্বের জন্য পুরস্কার পাবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু সেই পুরস্কার Odysseus-কে দেওয়া হলে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হন। তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তিনি এজন্য Agamemnon ও Menelaus-কে দায়ী করেন এবং অপমানের জ্বালায় উন্মত্ত হয়ে শত্রুদের ধ্বংস করছেন মনে করে নিরীহ মেষশাবকদের হত্যা করেন—

"........he falls upon the army's flock of sheep in the fond delusion that he is slaying his enemies.[১৬] শেষ পর্যন্ত উন্মত্ততা দূরীভূত হলে নিজের অপরাধের জন্য তিনি লজ্জিত হন ও পরম গ্লানিতে আত্মহত্যা করেন।

Tragedy of Spectacle-এ নানাধরণের ঘটনাবহুল দৃশ্যের অবতারণা করে Tragedy-র সৃষ্টি করা হয়। এখানে ঘটনার ওপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয় হয়। যেমন, Aeschylus-এর 'Prometheus Bound.'

Ethical Tragedy-র অন্যতম উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা দেওয়া। যেমন 'Peleus' নাটক, 'Phthiotidy' নাটক।

Tragedy of Character-এ ভাগ্যের চেয়ে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব পায়। যেমন, Sophocles-এর 'Electra' নাটক। Electra-র মাতা clytemnestra তাঁর স্বামী অর্থাৎ 'Electra-র পিতা Agamemnon কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ষড়যন্ত্রে Agamemnon-এর মৃত্যু হলে Electra তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য ভ্রাতা Orestes-কে মাতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে এবং উত্তেজিত Orestes তার মাতাকে হত্যা করে। এই ভয়াবহ পরিণতি-ই Electra-র জীবনের Tragedy। এখানে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের জন্য Electra-র জীবনে Tragedy নেমে এসেছে, দৈব এখানে বড় হয়ে ওঠেনি। শুধু তাই নয়,—

"In Electra, however, there is a psychological study such as appears no where in any of Aeschylus' works."[১৭]

পরবর্তীকলে Lucius Annoeus Seneca Classical Tragedy-র অনুসরণে Roman Tragedy রচনা করলেও তিনি তাঁর নাটকে কিছু নূতনত্ব আনলেন। গ্রীক নাটকে মঞ্চে যুদ্ধ দৃশ্য নিষিদ্ধ ছিল। তিনি সেই ধরণের দৃশ্যের অবতারণা করলেন, এর সঙ্গে মঞ্চে Ghost উপস্থাপিত করলেন। তিনি Greek Tregedy-র অনুসরণে দশটি Tragedy লেখেন— Hercules Furens, Medea, Troades, Phoedra, Agamemnon, Oedipus, Hercules Oetoeus, Phoenissoe, Thyestes, Octavia, Roman

Tragedy—তেই Romantic Tragedy-র সূচনা হয় এবং William Shakespeare-এর দ্বারা এটি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮]

Romantic Tragedy-তে Classical Tragedy-র প্রায় কোন বৈশিষ্ট্যই মানা হয়নি। সেখানে গুরুগম্ভীর ভাবের সঙ্গে হাস্যরসাত্মক চরিত্র স্থান পেয়েছে। এখানে নিয়তি বা দৈবের কারণে নয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কেন্দ্রীয় চরিত্রে Tragedy নেমে আসে,—'Character is destiny.' Greek Tragedy-র মত এখানেও মৃত্যু, থাকে তবে সেই মৃত্যু, শারীরিক ও মানসিক দুইভাবে হতে পারে।

পরবর্তীকালে Henrik Ibsen Realistic নাটকে যে Tragedy আনলেন তাকে Modern Tragedy বলে। এখানে Classical Tragedy-র কোন নিয়ম রক্ষিত হয়নি। এর মধ্যে Romantic Tragedy-র লক্ষণই বেশি। উপরন্তু এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ করা যায়। এখানে মৃত্যু, Tragedy-র অপরিহার্য অঙ্গ নয়। "The strongest man in the world is he who stands most alone " (An Enemy of the People, 1882) অর্থাৎ Tragey-র জন্য মৃত্যুর প্রয়োজন নেই, বেঁচে থেকেই জীবনে Tragedy-গভীর বেদনা অনুভব করা যায়। সেখানে জীবনের গভীরতম প্রদেশে এমন অন্তহীন যন্ত্রণা ও ব্যথার সৃষ্টি হয় যা কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না, অতলান্ত শূন্যতায় মন হাহাকারে ভরে ওঠে।

নাট্যচরিত্র বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে শুধু Tragedy নয়, Comedy আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জীবনের অনতি গভীর অসামঞ্জস্যপূর্ণ কাহিনী নিয়ে Comedy রচিত হয়। Comedy-র বিষয় অসংগতি এবং এই অসংগতির মধ্য দিয়ে হাস্যরস পরিবেশিত হয়। এখানে জীবনের সহজ ও হালকা দিকটি উজ্জ্বলরেখায় তুলে ধরা হয়। Comedy গ্রীক 'Comus' শব্দ থেকে এসেছে। 'World Drama'-য় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"Comedies were first admitted to the Dionysiac Festivals in the year 486 B. C., but for many decades before that the comic form had been slowly evolving out of a diverse series of popular entertainments and rituals......

Its foundation was the Attic comus, a popular ritual where in a group of revellers organized processions and sang songs of doubtful propriety in honour of Dionysus. From this comus comedy takes its name."[১৯]

কমেডিতে মানব চরিত্রের ভুলভ্রান্তি, অসংগতি প্রদর্শিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, "আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি সুযুক্তিসংগত নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য ; সমস্তই চিরাভ্যস্ত চির প্রত্যাশিত ; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমি মধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন তাহাকে বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারিনা—ইতিমধ্যে

হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসংগত ব্যাপারের অবতারণা হয় তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা, পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।[৩০] অবশ্য কমেডির মত ট্রাজিডির বিষয়ও অসংগতি। তবে উভয়ের পার্থক্য মাত্রাগত। অসংগতি আমাদের হৃদয়ের উপরিস্থলে অর্থাৎ অনতিগভীর স্তর আঘাত করলে আমরা কৌতুক অনুভব করি এবং গভীরতর স্তরে আঘাত করলে দুঃখবোধ করি।[৩১]

Comedy-র কাহিনী হালকা ও চরিত্র লঘুপ্রকৃতির হয়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একপ্রকার অজ্ঞতার ফলে এই ধরণের চরিত্র তার কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে করে উঠতে পারে না। ফলে চরিত্রটি তার নানা অসংগতিপূর্ণ কর্মের জন্য হাস্যরসের আধার হয়ে ওঠে। নানা অসঙ্গত পরিস্থিতি ও অদ্ভুত অতিরঞ্জিত চরিত্রের আচার আচরণ আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে।[৩২] তার এই অজ্ঞানতাজনিত আচার আচরণের জন্য নাট্যকার তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন এবং হাস্যরসসৃষ্টির মাধ্যমে তার চরিত্রকে ভুলভ্রান্তিমুক্ত করার দিকে যত্নবান হন। নাট্যকারের উপস্থাপনাগুণে চরিত্রের এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যাবলী কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমাজের বৃহৎ অসংগতির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এবং সেই অসংগতি দূর করার প্রচেষ্টাতে নাট্যকারের সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব কাজ করায় তিনি 'চরিত্র শোধন' কার্যে ব্যাপৃত হন। ফলে নাটকের মধ্যে 'চরম আনন্দ' প্রবাহিত হয়। সেইজন্য Comedy-র পরিণতি সুখজনক হয় (happy ending) Shakespeare-এর comedyতে একদিকে চরিত্রের অসংগতির প্রতি চরিত্রকে সচেতন করা, অন্যদিকে সেই অসংগতি দূরীভূত করাব ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা—এই উভয়দিক চবম সার্থকতা লাভ করেছে।[৩৩]

ভবতেব নাট্যশাস্ত্রে হাস্যরস সম্পর্কে বলা হয়েছে—

বিপরীতালঙ্কারৈর্বিকৃতাচারাভিধানবেষৈশ্চ।
বিকৃতৈরঙ্গবিকারৈর্হসতীতি রসঃস্মৃতো হাস্যঃ ॥
বিকৃতাকারৈর্বাক্যৈরঙ্গবিকারৈর্বিকৃতবেষৈশ্চ।
হাসয়তি জনং যস্মাৎ তস্মাদ্ জ্ঞেয়ো রসো হাস্যঃ ॥

অর্থাৎ "বিপরীত অলংকার, বিকৃত আচার, কথা, বেষ, বিকৃত অঙ্গভঙ্গী হেতু কেউ হাসলে যে রস হয় তা হাস্য নামে কথিত। বিকৃত রূপ, বাক্য, অঙ্গভঙ্গী ও বেষের দ্বারা লোককে হাসায় বলে (এই) রস হাস্য নামে জ্ঞাত।"[৩৪]

হাস্যরসের চারটি ধারা— নির্মল হাস্য (humour), মার্জিত বাক্ চাতুর্যময় হাস্য (wit), বিদ্রূপাত্মক হাস্য (satire) এবং প্রহসন (farce)। নাটকে হাস্যরস যে কোনভাবেই পরিবেশিত হোক না কেন, ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপ হাস্যরসসৃষ্টির সহায়ক হলে এবং উপস্থাপনাগুণে ঘটনা ও চরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্যে বৈচিত্র্যময় চমক সৃষ্টির ক্ষমতা লক্ষিত হলে তা দর্শকমনে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে। নাট্যচরিত্রের সঙ্গে দর্শক প্রায় একাত্মীভূত হয়ে নাট্যরস আস্বাদন করার ফলে হাস্যরসাত্মক নাটকটি সার্থক হয়ে ওঠে।

● প্রাচীন ভারতীয় নাট্য-চরিত্র বিষয়ক তত্ত্ব

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রেও চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

আলম্বনং নায়কাদিস্তমালম্ব্য রসোদ্‌গমাৎ।।[৩৫]

নায়কাদি হচ্ছে আলম্বন বিভাব, তাকে আশ্রয় করে রসসৃষ্ট হয়। ত্যাগী, কর্মকুশল, কুলীন, বুদ্ধিমান, রূপবান, তরুণ, উৎসাহী, অনলস, লোকানুরক্ত, তেজী, বৈদগ্ধ্য-সম্পন্ন ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি নায়করূপে প্রতিপন্ন হয়।

নায়কের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে—নায়কের মূলতঃ চারটি ভেদ—

ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধতস্তথা ধীরললিতশ্চ।
ধীর প্রশান্ত ইত্যয়মুক্তঃ প্রথমশ্চতুর্ভেদঃ।।[৩৬]

এই নায়কদের প্রত্যেকে শৃঙ্গার রস অনুসারে দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল ও শঠ এই চারিভাগে বিভক্ত হওয়ায় নায়কের প্রকারভেদ হচ্ছে ষোড়শ—

এভিদক্ষিণ ধৃষ্টানুকূলশঠরূপিভিস্ত ষোড়শধা।।[৩৭]

নায়িকা ত্রিবিধ—স্বা, অন্যা ও সাধারণী স্ত্রী।

—"অথ নায়িকা ত্রিবিধা, স্বাহন্যা সাধারণী স্ত্রীতি।"[৩৮]

স্বা হচ্ছে স্ব-স্ত্রী, অন্যা অন্যের স্ত্রী, সাধারণী সাধারণ স্ত্রী। বিনয় ও সাবল্য প্রভৃতি বিবিধগুণসম্পন্না, গৃহকর্মে পারদর্শিনী পতিব্রতা স্ত্রীকে স্বীয়া নায়িকা বলে। স্বীযা ত্রিবিধ—মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগলভা। মুগ্ধাব কোন ভেদ নেই। ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীবাভেদে মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ছয় প্রকাব। সুতরাং স্বকীযা বা স্বীয়া নায়িকা ত্রয়োদশ। অন্যা বা পরকীয়া নায়িকা দুই প্রকাব—

পরোঢা ও কন্যকা। সাধারণীর একশ্রেণী। ষোড়শ শ্রেণীতে বিভক্ত এই নায়িকাগণ অষ্ট অবস্থাভেদে অষ্টপ্রকার। যেমন, স্বাধীনভর্তৃকা, খণ্ডিতা, অভিসারিকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্তৃকা, বাসকসজ্জা ও বিরহোৎকণ্ঠিতা। এই একশত অষ্টবিংশতি নায়িকা উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে তিনশত চুরাশি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রতিনায়ক প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

প্রতিনায়ক হবেন ধীরোদ্ধত, অধর্মাচারী ও ব্যসনাশ্রয়ী।
"ধীরোদ্ধতঃ পাপকারী ব্যসনী প্রতিনায়কঃ।"[৩৯]

অনেক সংস্কৃত নাটকে বিদূষক চরিত্র উপস্থাপিত করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের মাধব্য, শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকের মৈত্রেয়, শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের বসন্তক চরিত্রের নাম উল্লেখ করা যায়। এই ধরণের চরিত্র বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গী, বিচিত্র পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতি নিয়ে 'হাস্' ভাব পরিবেশন করে। আবার কিছু সংস্কৃত নাটকে বিদূষক চরিত্র অনুপস্থিত। যেমন, ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্', ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহারম্', নাটক।

আলোচিত তত্ত্বানুসারে বিধায়ক-নাট্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

॥ চরিত্র বিশ্লেষণ ॥

(ক) প্রধান চরিত্র :

মেঘমুক্তি

অণিমা : স্বামী স্ত্রীর সহযোগিতায় সুন্দর গৃহ রচিত হয়—এই মূলভাব অবলম্বনে রচিত 'মেঘমুক্তি' মিলনাত্মক নাট্যকাহিনীর প্রধান চরিত্র অণিমা।

অণিমা চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার মধ্যে মানব চরিত্রের ত্রৈমানিক (tri dimentional) বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অণিমা সুন্দরী, সে বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। এটি সে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে।

সে শিক্ষিতা। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মসচেতনতা সে পরিবার থেকে অর্জন করেছে। শিক্ষিত উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির (প্রদ্যোত) সঙ্গে তাব বিবাহ হয়েছে। এগুলি তার সামাজিক দিক।

উপরিউক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য তার মনোজগৎ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তাই সমাজে নারীর মূল্য সম্পর্কে সে সচেতন এবং এই সচেতনতা তাকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীতে পরিণত করেছে।

সমাজে পুরুষেব মত নারীর সব বিষয়ে সমান অধিকাব আছে এই চিন্তাধারায় বিশ্বাসী অণিমা দেরী করে বাড়ী ফেরা নিয়ে স্বামীকে প্রশ্ন করে কোন সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়। সে তার মনোভাব স্বামীকে জানাতে দ্বিধাবোধ করে না। স্বামীর যে স্ত্রীকে সব কিছু জানানো কর্তব্য সে বিষয়ে সে স্বামীকে সচেতন করে দেয়।[৪০]

শুধু তাই নয়, স্বামী স্ত্রীর কথাকাটাকাটির সময় রাগত প্রদ্যোত তার বন্ধুদের সঙ্গে অণিমার অবারিত মেলামেশা বন্ধ করান কথা বললে অণিমা স্বামীর প্রভুত্বস্পৃহা ও অন্যায় অধিকারবোধের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানায়—

"তোমার আদেশ আমি মানবো না, আমি এইখানেই থাকবো, আর এইখানেই তোমার বন্ধুদের সঙ্গে মিশবো।" (মেঘসঞ্চার)

অণিমা যেদিন স্বামী-বন্ধু সুযোগসন্ধানী দুশ্চরিত্র স্বপন রায়ের মাধ্যমে জানতে পারে প্রদ্যোত গীতা রায় নামে এক মহিলার কাছে যায় তখন পুরুষলাঞ্ছিত মূক নারীর

মত সে বসে থাকতে পারে না। সে স্বামীর কাছে অভিযোগ করে। মানসিক উত্তেজনায় মনের কোণে সঞ্চিত অভিমানের কালো মেঘ অণিমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তার মুখ থেকে রূঢ় মন্তব্য বেরিয়ে আসে। প্রদ্যোতও কঠোর উক্তি করে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ ঘটনায় অণিমা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে না। তার আত্মসম্মানবোধ, স্ত্রীর অধিকারবোধ তাকে প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে (পরে অবশ্য জানা যায়, মৃত্যু পথযাত্রী অধ্যাপকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে প্রদ্যোত জ্যেষ্ঠভ্রাতার মত অধ্যাপক-কন্যা গীতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, উভয়ের মধ্যে কোন অবৈধ সম্পর্ক নেই।) এইভাবে অণিমা নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে।

অণিমার মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি (will or volition) থাকায় সে যেখানে বাধা পেয়েছে সেখানেই প্রতিবাদ জানিয়েছে ও নানা কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সে বাধা অতিক্রমের চেষ্টা করেছে। এজন্য অণিমাকে সক্রিয় (active) চরিত্র বলা যায়।

অণিমার মধ্যে বহির্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে। গীতাকে কেন্দ্র করে স্বামীর সঙ্গে বচসা, প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধানে স্বপন রায়ের সঙ্গে গীতার বাড়ী গমনের মধ্য দিয়ে তার বহির্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। অণিমার দ্বন্দ্বের স্বরূপ দেখে একে ধীবারোহণধর্মী দ্বন্দ্ব (slowly rising conflict) বলা যায়।

অণিমা বহির্মুখী (extrovert) চরিত্র। তাই সে বাহ্যিক কার্যাবলীর মাধ্যমে তার মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

অহম্ (ego) বোধ অণিমার চিন্তাভাবনা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট নারীতে পরিণত করেছে।

মাটির ঘর

সত্যপ্রসন্ন : তিন কন্যার দুর্ভাগ্য স্নেহশীল পিতার জীবনকে হাহাকারে ভরিয়ে তুলেছিল—এই বক্তব্য নিয়ে সৃষ্ট 'মাটির ঘর' বিষাদান্ত নাটকের প্রধান অবলম্বন সত্যপ্রসন্ন। তাই সত্যপ্রসন্ন এই নাটকের প্রধান চরিত্র।

সত্যপ্রসন্নর মধ্যে মানব চরিত্রের ত্রৈমানিকতা লক্ষ্য করা যায়। সত্যপ্রসন্ন বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমবাংলার সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে তাঁর বংশানুগতির পরিচয় পাওয়া যায়।

যে সমাজে তিনি জন্মেছেন ও প্রতিপালিত হয়েছেন তাতে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে। তিনি শিক্ষিত, ভদ্র, রুচিশীল ও উদার।

বংশানুগতি ও সামাজিক প্রভাবে তাঁর মনোজগৎ সৃষ্ট হয়েছে এবং সেটি তাঁর কর্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তিনি উদার মনোভাবাপন্ন বলে স্ত্রীশিক্ষা (তিনকন্যা তন্দ্রা,

নন্দা ও ছন্দাকে শিক্ষিত করেছেন), নারী স্বাধীনতায় (তন্দ্রা-অলক ও ছন্দা-উৎপলের বন্ধুত্বে বাধা দেননি) বিশ্বাসী। মধ্যবিত্ত পরিবার প্রধানতঃ আধুনিক ভাবধারাকে সর্বাগ্রে গ্রহণ করে। সত্যপ্রসন্ন সে যুগের আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিবাহ-পূর্ব প্রেমকে স্বাগত জানিয়েছেন (যদিও কোন প্রেমই সার্থকতা লাভ করেনি)। আবার নূতনকে গ্রহণ করলেও পুরাতন ধ্যান ধারণা ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে থাকেননি। এটিও মধ্যবিত্ত সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেজন্য তিনি কন্যাদের সুপাত্রে সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহ দেবার চেষ্টা করেছেন এবং কন্যার পিতা হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করে চরম সহ্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সেই হিসেবে তিনি বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের কন্যার পিতার প্রতিনিধিস্বরূপ। সত্য প্রসন্নর সংলাপের মধ্য দিয়ে পিতার গভীর অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসা অসীম বেদনাই ঝরে পড়েছে—

"ওরে নন্দা, বাংলাদেশের মেয়ের বাপেরা হচ্ছে মোটা চামড়ার জীব। কোন আঘাত, কোন অপমানই তাদের গায়ে বেঁধে না। জামাইয়ের অপমান তো তাদের গলার মালা।" (তৃতীয় দৃশ্য)

অন্য দিকে তিনি প্রথাগত সংস্কারে বিশ্বাসী, তিনি নন্দাকে বলেছেন—

"তোমার এই অন্ধকার দুঃখরাত্রির পারে যে প্রসন্ন প্রভাত প্রতীক্ষা করছে, এ বিশ্বাস তুমি হারিয়ো না।" (তৃতীয় দৃশ্য)

অন্যত্র,

"আমাদের প্রত্যেক কার্যের মূলে তাঁর শুভেচ্ছা রয়েছে।" (পঞ্চম দৃশ্য)

সত্যপ্রসন্নর মধ্যে কোনা প্রকার দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেনি। বিবাহিতা কন্যা তন্দ্রার কাছে পূর্বপ্রেমিক অলকের আগমন, নন্দার প্রতি স্বামী চঞ্চলের অত্যাচার, নন্দার আত্মহত্যা, তন্দ্রার মস্তিষ্কবিকৃতি, প্রেমিক কর্তৃক ছন্দাকে প্রত্যাখ্যান—এই অবাঞ্ছিত ঘটনার আঘাতে সত্যপ্রসন্নর মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ছিল ঠিকই কিন্তু এখানে তা ঘটেনি। কারণ তিনি আঘাতজনিত মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বাইরে প্রকাশ করতে পারেননি। কেবলমাত্র নিজের অপরিমেয় ক্ষতিতে গভীর বেদনা অনুভব করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ জামাতা কল্যাণের মৃত্যুতে তাঁর দুঃখের পাত্র পূর্ণ হওয়ায় ভগবানের বিরুদ্ধে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন—

"স্টুপিড। তুমি স্টুপিড। আমি তোমাকে চালেঞ্জ করছি— আমাকে তুমি কাঁদাও। আমি কাঁদবো না-আমি কাঁদবো না।" (ষষ্ঠ দৃশ্য)

কিন্তু তিনি নিজেকে আর বশে রাখতে পারলেন না—দীর্ঘদিনের জমে থাকা বেদনা নিজের অজান্তে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে লাগল—তিনি হু হু করে কেঁদে উঠলেন। এই বিষয়ে খ্যাতনামা অভিনেতা, নাট্য সমালোচক সত্যপ্রসন্নর ভূমিকায় অবতরণকারী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিমত উল্লেখযোগ্য—

"উপর্যুপরি দুটি দুর্ঘটনার মধ্য দিয়েও সত্যপ্রসন্নকে দেখতে পাই, ভগবানে বিশ্বাস না-হারাবার শক্তি প্রার্থনা করছেন।

কিন্তু শেষ আঘাতে, সংসারের একমাত্র ভরসাস্থল জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যুতে বৃদ্ধ আর্তনাদ করে ওঠেন—।"[৩১]

এ প্রসঙ্গে John Millington Synge (1871-1909)-এর 'Riders to the Sea' নাটকের (1904) Maurya চরিত্র স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে Maurya অসহায়ের মত প্রকৃতির নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করেছেন কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেননি।

সত্যপ্রসন্নর মধ্যে বাসনা (Wish) থাকলেও প্রবল ইচ্ছাশক্তি (Will)-র অভাব রয়েছে। তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন তাঁর কন্যাদের দুঃখ কষ্টের অবসান হোক, তারা সুখীজীবন যাপন করুক। কিন্তু কন্যাদের দুঃখ দূর করার জন্য তাঁর কোনা কর্মপ্রচেষ্টা নেই অর্থাৎ তাঁর মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি নেই। সে ধরণের দৃঢ় মানসিকতা তাঁর ছিল না। সেই কারণে তিনি একটির পর একটি আঘাত গ্রহণ করেছেন। আঘাত প্রতিহত করার শক্তি তাঁর ছিল না। সত্যপ্রসন্ন তাই Tragic Hero নন। তবে তাঁর মধ্যে দিয়ে "Tragic sense of life" প্রকাশিত হয়েছে।[৪২] সত্যপ্রসন্ন William Shakespeare-এর 'King Lear' নাটকের Lear-এর মত নিষ্ক্রিয় (Passive) চরিত্র এবং এই নিষ্ক্রিয়তা আধুনিক নাটকের নায়কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।[৪৩]

সত্য প্রসন্ন অন্তর্মুখী (introvert) চরিত্র। সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া অন্তরের মধ্যে সংঘটিত হওয়ায় তিনি তা আত্মস্থ করেছেন, সহ্য করেছেন। এর কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। একমাত্র শেষ দৃশ্যে ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করতে গিয়ে তাঁর নীরব বেদনাব ধারা দুচোখ বেয়ে নেমে এসেছে।

এই চরিত্র সম্পর্কে বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক ডঃ অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়—

"এক একটি কন্যার জীবনের ব্যর্থতার সহিত তাঁহার বক্ষের এক একখানি হাড় খসিয়া যাইতেছে অথচ তাঁহার শূন্য বক্ষ-পঞ্জরের মধ্যে তাঁহার প্রাণটা তবুও ধুক ধুক করিতেছে; ইহার যেন মুক্তি নাই, নিষ্কৃতি নাই, ঐখানে বাঁচিয়া থাকিয়া যেন তাহাকে লক্ষ কোটী পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"[৪৪]

বিশ বছর আগে

দীপক : তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশে প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়—এই বিষয় অবলম্বনে গড়ে ওঠা বর্তমান বিষাদান্ত নাটকের প্রধান চরিত্র দীপক।

দীপকের মধ্যে চরিত্রের ত্রৈমানিকতা লক্ষ্য করা যায়। দীপকের জন্ম-ইতিহাস কলঙ্কময়। সে অবৈধ সন্তান। তার মা নিজের লজ্জা লুকোতে তাকে রাস্তায় ফেলে আসেন (মহাভারতের কুন্তীও লোকলজ্জাভয়ে নিজের সন্তান কর্ণকে মঞ্জুষায় রেখে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন)। এটি তার বংশানুগতির দিক।

পরবর্তীকালে সে অনাথ আশ্রমে বড় হয়ে ওঠে। সে স্কুল কলেজে পড়াশুনো করে এবং অভিনয় নৈপুণ্য থাকায় অভিনেতার জীবন বেছে নেয়। এর মধ্য দিয়ে তার সামাজিক পরিবেশের কথা জানতে পারা যায়।

উপরিউক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে তার মানসিকরূপ গড়ে উঠেছে। সে মাতৃপরিত্যক্ত সন্তান হওয়ায় সমস্ত নারীজাতির প্রতি তার প্রবল অশ্রদ্ধা ছিল—"নারীর ভালোবাসায় আমি বিশ্বাস করি না" (চতুর্থ দৃশ্য) অথবা, "কোন নারীকে ভালোবাসতে আমি পারিনে, আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে সেই নিষেধ" (সপ্তম দৃশ্য) এবং জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে মদের আশ্রয় নিয়েছিল—"আমি সে আনন্দ নিয়ে আসিনি—তাই আমি ....ভালবাসিনা, আমি শুধু মদ খাই" (সপ্তম দৃশ্য)। সে কারণে তাকে বহুনারী প্রেম নিবেদন করলেও সে তাদের প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে কলেজ জীবনে সহপাঠিনী তমসার সংস্পর্শে এসে তার অবিশ্বাসী মন নতুন করে এই পৃথিবীকে দেখল : উপলব্ধি করল অন্য জীবনের স্বাদ। সে সেই প্রথম অনুভব করল, সে একজন নারীকে ভালবেসেছে। পারিপার্শ্বিকতার চাপে তার যে ভালোবাসা মনের গহনে সুপ্ত ছিল, তমসার ভালবাসার ছোঁয়ায় তা জেগে উঠল। William Shakespeare-এর 'Hamlet, Prince of Denmark' নাটকের নায়ক Hamlet পিতার প্রতি মায়ের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে সমগ্র নারীকুলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল কিন্তু পরে Ophelia-র সান্নিধ্যে সেই হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস সে নূতন করে লাভ করল, সে Ophelia কে ভালবাসল। কিন্তু দীপকের সহপাঠী বন্ধু প্রদীপের আবির্ভাবে (দীপক ও তমসা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসত) সে প্রেম ব্যর্থ হল। ব্যর্থতা ঢাকতে সে মদের মধ্যে নিজেকে আরও ডুবিয়ে দিল। সে তার জীবনের নানা অপ্রতুলতায় হতাশ হয়ে পড়ায় মদকে সঙ্গী করে সেই ব্যর্থতা পরিহার করার পথ খুঁজেছিল।[৪৫]

দীপক অভিনেতা, শিল্পী, তাই সে আবেগপ্রবণ। সে অনেক কাজ আবেগের বশে করে ফেলে, কোন যুক্তি বা বিচারের কথা ভাবে না। তাই প্রদীপের তমসার প্রতি গভীর আকর্ষণের কথা জেনে সে বন্ধুকে সুখী করতে তার হাতে প্রেমিকা তমসাকে তুলে দিতে ইতঃস্তত করেনি। অবশ্য এজন্য তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। সেই একই আবেগের বশবর্তী হয়ে অভিনেত্রী মনীষার বোন তন্বীকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য তাকে বিবাহের অঙ্গীকার করেছিল (যদিও তাদের সেই বিবাহ সংঘটিত হয়নি)।

দীপক অন্তর্মুখী চরিত্র বলে সে তার মনোভাব, মানসিক যন্ত্রণা সব সময় গোপন করে রেখেছে ও অসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছে। অবশ্য মাঝে মাঝে মদে আচ্ছন্ন হয়ে সে তার হৃদয়ের ক্ষতকে তন্বীর কাছে ব্যক্ত করেছে। সে কারণেই বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনায় আহত হয়ে সে নিজেকে বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে এনে হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়েছে।[৪৬] এবং একটা ব্যর্থতাবোধ তাকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে দুঃখবাদী (pessimist) করে তুলেছে।

দীপকের মধ্যে কোন বহির্দ্বন্দ্ব বা অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে সে নিজেকে কেবল ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তার কলঙ্কময় জন্ম-ইতিহাস,

অনাথ আশ্রমে প্রতিপালন, প্রেমিকা তমসাকে বন্ধু প্রদীপের কারণে জীবনসঙ্গী করতে না পারা, তার প্রতি তন্বীর নিবেদিত প্রেমকে গ্রহণ করতে না পারা, প্রদীপের প্রতারণার কাহিনী জ্ঞাত হওয়ায় সে গভীর আঘাত পেয়েছে মাত্র, এর জন্যে তার মধ্যে বাহ্যিক বা মানসিক দ্বন্দ্ব নেই।

দীপকের মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি না থাকায় তার কোন মানসিকশক্তি গড়ে ওঠেনি। সে তার মানসিক প্রতিক্রিয়াকে কর্মে রূপ দেবার চেষ্টা করেনি। নিষ্ক্রিয় চরিত্রের মত দীপকের মধ্যে কোন কর্মপ্রচেষ্টা নেই। সে শুধু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু বিরুদ্ধ ঘটনাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেনি। এমনকি সে যখন প্রদীপ কর্তৃক তমসাকে প্রতারণা ও তন্বী-অপহরণ সংবাদ জানতে পারে তখনও সে চূড়ান্ত কর্মপন্থার কথা ভাবতে পারেনি। শুধু বিপথগামী বন্ধুকে ফিরিয়ে আনতে সে গুলিবিহীন পিস্তল দিয়ে বন্ধুকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছে মাত্র।

Hanrik Ibsen-এর নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে Una Ellis-Fermon বলেছিলেন—

" . . Ibsen is no longer concerned so much with man in relation to society as with man alone with his own mind ..."[২]

—দীপক চরিত্র সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। দীপকের হৃদযযন্ত্রণা, একাকীত্ববোধ, আত্মসমীক্ষা তাকে নিঃসঙ্গ নায়কে পরিণত করেছে।

মালা রায়

মালা রায় ॥ পুরুষ নারীর অসংযমের ফলে সন্তানের জীবন ব্যর্থ হয়— মালা রায় চরিত্রকে ঘিরে এই বক্তব্য ফুটে ওঠায় সে উক্ত বিষাদান্ত নাটকের মূল চরিত্র।

মালা উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। সে জন্মসূত্রে অনিন্দ্যসুন্দরী।

মালা পিতৃমাতৃহীন ও মামার কাছে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে প্রতিপালিত। প্রগতিশীল স্বচ্ছল মামা তাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার মত শিক্ষা সে মামার কাছ থেকে পেয়েছে।

উপরিউক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য মালার মনোজগৎ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। মালা একদিকে যেমন স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টির অধিকারী অন্যদিকে সমাজ সচেতন ও দৃঢ়চেতা। তার সুশিক্ষিত মন, রুচিবোধ রূপমুগ্ধ পুরুষেরলোলুপ দৃষ্টিকে অবজ্ঞা করতে শিখিয়েছিল।

প্রগতিশীল পরিবেশে বড় হয়ে ওঠায় তার মধ্যে একটা স্বাধীন মনোভাব গড়ে উঠেছিল। সে নিজের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। তাই সে মামার অমতে নিজের পছন্দ করা পাত্রকে বিবাহ করেছে। এজন্য মামা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেও তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। পরে মালার মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী সুবিনয়ের অসুস্থতা উপলক্ষে

মামা স্বয়ং মালার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাদের পুরোনো সম্পর্ক ফিরে আসে। প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার মত মানসিকতা গড়ে ওঠায় সে স্বামীর মৃত্যু (বিবাহের দুই বছরের মধ্যে), স্বামী-বন্ধু অনুপমের তার প্রতি উন্মত্ত প্রেম, অনুপমের মাসতুত ভাই বিজনের তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ—এই ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনায় মানসিক স্থৈর্য হারায়নি।

মালার মধ্যে ছিল প্রবল আত্মবিশ্বাস ও নিজের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ। ফলে তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল প্রবল মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বময়ী নারীরূপ। কোন অবস্থাতেই সে তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি।

তবে নানা দুঃখজনক ঘটনা তার মধ্যে মানসিক চাপের সৃষ্টি করে তাকে সংসার সম্পর্কে কিছুটা নির্লিপ্ত ও উদাসীন করে তুলেছিল—

"আশা-ও নেই, নিরাশাও নেই, ইচ্ছেও নেই, অনিচ্ছেও নেই।" (দ্বিতীয় দৃশ্য) আবার কখনো সে দুঃখবাদী হয়ে ওঠে—

"আমি হচ্ছি শরীরী বাঁশীর সুর। ও বাঁশীর সুর যেমন উন্মত্ত দুপুরের জ্বালা গায়ে মেখে কাঁদতে কাঁদতে শূন্যে মিলিয়ে যায় আমিও তেমনি দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে অজানায় মিলিয়ে যাব।" (চতুর্থ দৃশ্য)

পারিপার্শ্বিকতার চাপে সে যেন ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাই সে একদিন অনুপমের গৃহত্যাগ করে বেদেনী মায়ার তাঁবুতে চলে যায়। কিন্তু সেখানেও স্থির থাকতে পারে না। মনের শান্তি পাওয়ার আশায় সে ফিরে আসে পরম নির্ভরস্থল মামার কাছে। কিন্তু সেখানে সে চূড়ান্ত আঘাত পায়। সে জানতে পারে, যাকে সে এতদিন মামা বলে গভীর শ্রদ্ধা করে এসেছে ("আমার মামা সেই মহাসমুদ্র, অগাধ, গভীর, উদার, অনন্ত"....দ্বিতীয় দৃশ্য) তিনি তার অবৈধ পিতা। সেই মুহূর্তে সে ভেঙ্গে পড়ে। সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তানের স্থান সম্পর্কে চিন্তা করে প্রবল আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মালা কেঁপে ওঠে, সে আত্মহত্যা করে চরম অসম্মানের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়,[৪৮] —"আমি পৃথিবীতে এসেছি অনিমন্ত্রিত আজ সেই ভুল আমি সংশোধন ক'রবো।" (ষষ্ঠ দৃশ্য)

এই প্রসঙ্গে Henrik Ibsen-এর নাটক 'The Wild Duck' (1886)-এর নাম উল্লেখ করা যায়। এই নাটকের Gregers Werle সত্যবাদী। তার পিতার রক্ষিতা Gina Ekdal-এর গর্ভজাত কন্যা Hedwig Werle। সত্য রক্ষার জন্য Hedwig কে সে তার জন্মবৃত্তান্ত জানিয়ে দেয়। এর ফলে Hedwig আত্মহত্যা করে।

মালার মধ্যে বহির্দ্বন্দ্ব রয়েছে, অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। মনোনীত পাত্রকে বিবাহ করা উপলক্ষে মামার সঙ্গে সংঘাত, বিবাহিত অনুপমের তার প্রতি তীব্র আকর্ষণের জন্য তার সঙ্গে মালার সংঘর্ষে বহির্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে। এই দ্বন্দ্ব স্থিতিধর্মী দ্বন্দ্ব (static conflict)-এর পর্যায়ে পড়ে।

মালার মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকায় সে সক্রিয় চরিত্র। তাই সে নান কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা প্রতিকূলশক্তিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে।

মালা উভয়মুখী (ambivert) চরিত্র। তাই তার মধ্যে অন্তর্মুখীনতা ও বাহ্যিক আচরণের প্রকাশ—উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। তার মধ্যে অহম্ শক্তি বিশেষভাবে কাজ করেছে।

কুহকিনী

রত্না : প্রেম সমাজের বীভৎসতা দূর করে—আলোচ্য মিলনাত্মক নাটকের এই মূল ভাব রত্না চরিত্র অবলম্বনে প্রকাশিত হয়েছে বলে রত্নাকে প্রধান চরিত্র বলা যায়।

রত্না চরিত্রের ত্রৈমানিকতা আলোচনা করলে দেখা যায় কামরূপ রাজ্যের অধিবাসী রত্না সুন্দরী। তন্ত্রসিদ্ধ পুরোহিত বিপ্রদেব তাঁকে প্রেমভালবাসাহীন নিষ্ঠুর নারীতে পরিণত করে সে রাজ্যের রাণীপদে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং নিজস্বার্থে ব্যবহার (তাঁর নির্দেশে রত্না যাদুদণ্ডের সাহায্যে সভ্য দেশের মানুষকে পশুতে পরিণত করতেন) করতেন। অথচ রত্নার মধ্যে নারীসুলভ স্বাভাবিক গুণাবলী ছিল। এ সব গুণাবলী বিপ্রদেবের কঠিন শাসনে চাপা পড়ে গিয়েছিল। ফলে তাঁর মনোজগতে নানা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

রত্নার মধ্যে যে সুপ্ত সুকোমল বৃত্তি ছিল মাঝে মাঝে সেগুলি তাঁর মনে আলোড়নের সৃষ্টি করত। তাই পুরোহিত নির্দেশিত নিষ্ঠুর ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁর মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠত,—

"এই মানুষকে পশু করার ব্যবসা আর আমার ভালো লাগছে না। "(প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)"

সেই কারণে তিনি কাঞ্চীরাজ রূপবান জয়ন্তকুমারের সান্নিধ্যে এলে জয়ন্ত কুমারের অনুপ্রেরণায় তাঁর মধ্যে শাশ্বত নারীসত্তা জেগে ওঠে। তিনি বর্তমান জীবন ত্যাগ করে জয়ন্তকে নিয়ে নূতন জীবন শুরু করতে চাইলেন এবং অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সেই ব্যাপারে কৃতকার্য হন।

কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে বিপ্রদেবের প্রভাব থাকায় তিনি বিপ্রদেবের অসীমশক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি এবং সেই কারণে তাঁর স্বামী জয়ন্তকুমার বিপ্রদেবের কুপ্রভাব দূর করার জন্য বিপ্রদেবের হত্যাকল্পে কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করতে চাইলে আতঙ্কিতা রত্না স্বামীকে বার বার যেতে নিষেধ করেন।[৪১] তিনি স্বামীকে বিপ্রদেবের শক্তি সম্পর্কে সচেতন করে দেন—

"তাঁর শক্তি, তাঁর মন্ত্রগুণের সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই, তাই তুমি এ দুঃসাহস করছো। আমি জানি পৃথিবীর কোন শক্তি তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না।" (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

রত্নার মধ্যে বহির্দ্বন্দ্ব বা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর মধ্যে একবার মাত্র 'বাসনা' দেখতে পাওয়া যায় জয়ন্তর প্রতি প্রেমাকৃতি প্রকাশে। তবে তাঁর মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি অনুপস্থিত। তাই তিনি কোন কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেননি; কেবল বিপ্রদেব জয়ন্ত-সৃষ্ট ঘটনার গতিপথে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। রত্না দুর্বল (weak) চরিত্র।

রত্না উভয়মুখী চরিত্র। সেজন্য তাঁর মনের অভ্যন্তরে যেমন ঘটনার প্রতিক্রিয়া হয়েছে তেমনি তিনি মাঝে মাঝে তাঁর ভাবনাকে উন্মুক্ত করেছেন।

রক্তের ডাক

শতাব্দী (বুলু) : সামাজিক সংস্কার নরনারীর মিলনে অনেক সময় বাধার সৃষ্টি করে—এই বক্তব্য 'রক্তের ডাক' নামক নাটকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শতাব্দী প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

শতাব্দী একটি গ্রামের দরিত্র শিক্ষিত উদার-ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। জন্মসূত্রে সে অসামান্য সৌন্দর্যের অধিকারী।

শতাব্দীর পিতা তাকে পড়াশুনো শিখিয়েছেন। পিতার স্বচ্ছ মুক্তদৃষ্টির আলোকে সে নিজেকে বিশেষভাবে দেখতে শিখেছে। কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে সে বিপত্নীক নেশাগ্রস্ত শরৎকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর শিক্ষা রুচি ও সৌন্দর্যের তুলনায় শ্বশুরবাড়ীর লোক এত নিকৃষ্ট যে তারা তাকে নানাভাবে নির্যাতন করে তাদের হীনম্মন্যতার শোধ নিতে থাকে।

বংশগত ও সামাজিক কারণে শতাব্দীর মনোজগতে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সত্যনিষ্ঠ পিতার প্রভাবে তার মধ্যে গড়ে ওঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মানসিকতা এবং প্রবল আত্মসম্মানবোধ।[৫০]

শতাব্দী (বুলু) গ্রাম্য বধূ। তাই অধিকাংশ গ্রাম্যবধূর মত সে সামাজিক বিধিনিষেধ, শাশুড়ী ননদের অত্যাচার মেনে নিয়েছে। কিন্তু যেদিন বাল্যবন্ধু শুভেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে শ্বশুর বাড়ীর লোক হীন ইঙ্গিত দেয় ও সেই উপলক্ষে তার স্বামী তাকে প্রহার করে (সেটি স্বামীর কাছ থেকে তার প্রথম প্রহার লাভ) সেদিন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শতাব্দী সেই অন্যায়ের শুধু মৌখিক প্রতিবাদই নয়, স্বামীগৃহ ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্যে শুভেশের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে এবং একই কারণে সে একদিন শুভেশের আনুকূল্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে—শুভেশ এক সময় তার ওপর অন্যায় অধিকারের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাইলে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও শুভেশের আশ্রয় ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য অভিনেত্রী-জীবন গ্রহণ করে।

চারিত্রিক বলিষ্ঠতা তাকে বিশিষ্ট নারীর মর্যাদাদান করেছে। সে নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র বলে ভাবতে পারেনি। সেই কারণে সে একদিকে যেমন শুভেশের স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করতে পারেনি ("আমি কি পাথর? চিরকাল আমি তোমার হাতে হাতে ঘুরবো? আমার নিজস্ব কোন মতামত নেই?" (চতুর্থ অঙ্ক) অন্যদিকে নারীজাতির প্রতি পুরুষের অবজ্ঞায় ব্যথিত হয়েছে, তার অন্তরের ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ("বাংলাদেশে—ভারতবর্ষে, নারী তার যথার্থ সম্মান আজও পায়নি। নারী যত বড় বিদুষীই হোক না কেন, যত বড় জ্ঞানী, যত বড় গুণীই হোক না কেন, এদেশের পুরুষ মানুষ তাকে আজও সম্মান করতে শেখেনি। তারা নারীকে শয্যাসঙ্গিনী ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না।" (পঞ্চম অঙ্ক)

শতাব্দী আমাদের চিরাচরিত সমাজের মধ্যে বড় হয়েছে বলে তার মধ্যে সামাজিক সংস্কারের শিকড় গভীরভাবে প্রথিত রয়েছে।[২১] সেই শিকড়ের শক্তি এত দৃঢ় যে পরবর্তীকালের আধুনিক জীবনযাত্রাও সেই সংস্কার থেকে তার মনকে দূরে সরাতে পারেনি। তাই শুভেশকে গভীরভাবে ভালবাসলেও নিজে বিবাহিতা ও ভিন্নজাতের (শতাব্দী ব্রাহ্মণ, শুভেশ কায়স্থ) বলে তার মনে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। তাই চিরন্তন হিন্দুনারীর মত শুভেশকে বলেছে—"আশীর্বাদ করো.....যেন পরজন্মে তোমার স্ত্রী হয়ে ফিরে আসতে পারি।" (পঞ্চম দৃশ্য)।

বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব শতাব্দীর হৃদয়কে রক্তাক্তময় করে তুলেছিল। শুভেশকে কেন্দ্র করে স্বামীর সঙ্গে সংঘাত, শুভেশের তার প্রতি মাত্রাতিরক্ত অধিকারবোধের জন্য শুভেশের সঙ্গে সংঘাত তার বহির্দ্বন্দ্বের পরিচায়ক। অন্যদিকে বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও শুভেশের প্রতি নিবিড় ভালবাসা অথচ সামাজিক সংস্কারবোধের জন্য তাকে স্বামীরূপে না পাওয়ার ব্যর্থতায় তার মনে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এই মানসিক টানাপোড়েনে সে শেষ পর্যন্ত শুভেশের কাছ থেকে নিজেকে অনেকদূরে সরিয়ে নিয়েছে। শতাব্দীর দ্বন্দ্বকে ধীরারোহণধর্মী দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

শতাব্দীর মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকায় তার কার্যাবলীর মধ্যে দৃঢ়তার প্রকাশ ঘটেছে। সে নানা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটি পরিস্থিতির সামনে সে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে গেছে ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইজন্য শতাব্দীকে সক্রিয় চরিত্র বলা যায়।

শতাব্দী উভয়মুখী চরিত্র। তাই তার মধ্যে দ্বৈতমনোভাব রয়েছে। কখনো সে অনেক অযৌক্তিক, অপ্রিয় আচরণ নীরবে সহ্য করেছে (শাশুড়ী-ননদ-স্বামীর অত্যাচার, শুভেশের কিছু ব্যবহার) আবার কখনো সে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে (মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে স্বামী গৃহত্যাগ, মানসিক চাপ-সৃষ্টির জন্য শুভেশের আশ্রয় ত্যাগ ইত্যাদি।)

শতাব্দীর মধ্যে অহম্ ভাব প্রবল হওয়ায় সে ব্যক্তিত্বময়ী নারীতে পরিণত হয়েছে।

মনের জ্বালা, ক্ষোভ, ব্যর্থতাবোধ ও দ্বন্দ্ব নিয়ে আবির্ভূত শতাব্দী বিশেষ আকর্ষণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে।

তাইতো

মল্লিকা : নারী অগ্রণীর ভূমিকা নিলে বিবাহসমস্যার মাঝে মাঝে সমাধান হয়—'তাই তো' হাস্যরসাত্মক নাটকে নাট্যকার এই বক্তব্য পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন এবং এর কেন্দ্রবিন্দুতে মল্লিকা অবস্থান করায় সে-ই এই নাট্যকাহিনীর প্রধান চরিত্র।

প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত পরিবারে মল্লিকার জন্ম। সে সুন্দরী, শিক্ষিতা। নারীস্বাধীনতা সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন। পরিবার ও পরিবেশ তার মনোজগৎ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

নারীর অধিকারবোধ সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাভাবনা তাকে কিছুটা উগ্র স্বভাবের করে তুলেছিল। পুরুষদের কোন অশোভন আচরণ দেখলে সে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করত। (প্রয়োজনে পুরুষদের চপেটাঘাতও করত)।

তার স্পষ্টবাদিতা ও উগ্রস্বভাবের জন্য প্রতিবার বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যেতে থাকে। অথচ তার মধ্যে একটি নারীমন বর্তমান যে ঘর বাঁধতে চায়, সংসার করতে চায়। তাই যেদিন এক পাত্র পিতাসহ মল্লিকা ও তার বিবাহ যোগ্য বোন বল্লিকাকে অপমান করে যায় সেদিন সে তার পূর্ব আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং বিবাহ ব্যাপারে সে নিজেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সমর নামে এক যুবককে বিবাহ করতে সক্ষম হয়।

মল্লিকার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। তবে কিছু কিছু ঘটনায় সে মানসিক আঘাত পায়। বার বার বিবাহ সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়ায় সে মনে মনে আহত হয়—

"এই বিয়ের ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। ছিঃ ছিঃ—বার বার ওদের সামনে বার হওয়া—বারবার গান শোনানো।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

আবার এক যুবক (সুহাস) এক পত্রে তাদের (মল্লিকা বল্লিকা) মত কন্যা হওয়ার অপরাধে তার পিতাকে আত্মহত্যা করার প্রস্তাব দিলে মল্লিকা মর্মাহত হয়।

মল্লিকার মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকায় সে কর্মতৎপর। তাই সে স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে নিজের বিবাহের ব্যবস্থা করে সামাজিক জীবনে নিজেকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মল্লিকা বহির্মুখী চরিত্র। তাই তার সমস্ত চিন্তাভাবনা বাহ্যিক আচরণে স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে।

অহম্ শক্তি মল্লিকার মানসিক জগৎ ও কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

তেরশো পঞ্চাশ

তারিণী মণ্ডল : প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে—এই মূলভাব অবলম্বনে বিষাদান্ত নাটকটি রচিত হওয়ায় তারিণী মণ্ডলকে প্রধান চরিত্র বলা যায়।

তারিণী মণ্ডল সম্পন্ন কৃষক গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি সচ্ছলতার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছেন এবং এর ফলে তাঁর মধ্যে বিশেষ মানসিকতা গড়ে উঠেছে,—এগুলিই তারিণী চরিত্রের ত্রৈমানিক বৈশিষ্ট্য।

তারিণী পূর্বে কখনো অর্থনৈতিক দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হননি, এ ধরণের বিপর্যয়ে কি করণীয় তা তিনি জানেন না। তাই চন্দনা নদীর বন্যায় তাঁর সর্বস্ব ভেসে গেলে তিনি খুব ভেঙ্গে পড়েন—

"হাঃ হাঃ হাঃ, জানলে বোষ্টুমী, কিছু নেই। একদম ধুয়ে মুছে সাফ্। ....বাঃ। বা-রে আমি।" (ঘরে । চার) শেষ পর্যন্ত পুত্র শিবুর চেষ্টায় তিনি কন্যাসহ জলমগ্ন গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন ও কলকাতায় উপস্থিত হন।

সহায় সম্বলহীন অবস্থায় অপরিচিত কলকাতায় এসে তিনি যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। নিজের ভাগ্য বিপর্যয়ে তিনি তখন ঈশ্বরকে দোষারোপ করেন—

"লক্ষ্মী আমার কোন্ উপকারটা করেছেন শুনি? আমি ময়না গাঁয়ের তারিণী মণ্ডল, গত বছর এই সময় আমি দু'হাজার বিঘে জমির মালিক, আর আজ? এক চন্দনার বানে আমার সব পয়সা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।" (বাইরে । দুই)

আবার বর্তমান অবস্থাব কোন প্রতিকার করতে না পারার বেদনায় মাঝে মাঝে তিনি আত্মধিক্কার দেন—

"ফুটপাতে এসে বাসা বেঁধেছি, ধোয়া কাপড় পড়া ভদ্দরলোক দেখি, আর তার কাছে গিয়ে লাজলজ্জাব মাথা খেযে হাত পেতে দাঁড়াই। ভিখিরী নয় তো কী?" (বাইরে । দুই)

এইভাবে ধীরে ধীরে একটা গভীর হতাশাবোধ তাঁকে পেয়ে বসে। এই হতাশাবোধ তাঁকে জীবন্মৃত অবস্থায় নিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত গাড়ীচাপা পড়ে তাঁর মৃত্যু হলে তিনি সব জ্বালা যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে চলে যান।

তারিণীর মধ্যে বহির্দ্বন্দ্ব বা অন্তর্দ্বন্দ্ব পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্ব ভেসে যাওয়া, কলকাতায় এসে অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে দিনযাপন, নিজের অসহায়তা তাঁকে মানসিক কষ্ট দিয়েছে কিন্তু সেজন্য তাঁর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় না।

তারিণীর বাসনা থাকলেও (বেঁচে থাকার আগ্রহ) প্রবল ইচ্ছাশক্তি না থাকায় তিনি কখনই বিপদ ও বাধা অতিক্রমের চেষ্টা করেননি এবং তাঁর জীবনে নানা ধরণের আঘাত এলেও চরিত্রের অন্তর্মুখীনতার জন্য তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি।

খবর বলছি

দীপা :অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে দুষ্কর্মকারীরা মানুষের চরম ক্ষতি করে—'খবর বলছি' বিষাদান্ত নাটকের এটি প্রধান বক্তব্য। দীপা চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় সে নাটকের প্রধান চরিত্রের মহিমা লাভ করেছে।

দীপার ত্রৈমানিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখা যায় সে অসামান্য সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। সে পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) মেয়ে।

পূর্ববাংলার এক গ্রামের জমিদার চন্দ্রমোহনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় সর্বস্বান্ত হয়ে স্বামীর সঙ্গে সে কলকাতায় শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রয় নেয়।

বংশের ধারা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে দীপার মধ্যে বিশেষ মানসিকতা গড়ে উঠেছে। সে জানে, তার রূপের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ আছে। তাই সে তাদের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। সব ত্যাগ করে স্বামীর হাত ধরে পথে বেরিয়ে আসায় যে কোন বিপদের সম্মুখীন হবার মত তার মানসিক প্রস্তুতি ছিল। এর ফলে তার চরিত্রের মধ্যে একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায়। এই দৃঢ়তাই তাকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলেছিল। তার আত্মপ্রত্যয় ও বুদ্ধিমত্তা বিপদে সাহস ও শক্তি জুগিয়েছে। তাই সুযোগসন্ধানী ভবতোষ, শিপ্রা ও মহাদেব মহান্তর কু-মতলব বুঝতে পেরে সে তাদের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, আশ্রয়দাতা অধ্যাপক বরেন মিত্রের স্ত্রীর চক্রান্তে তার দুশ্চরিত্র মদ্যপ মাসতুত ভাই অনুপমের মাধ্যমে সে যখন একটি দুষ্টচক্রের শিকার হচ্ছিল সে সময় উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহসিকতা বলে নিজেকে বিপন্মুক্ত করেছে।

দীপা চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য স্বামীর প্রতি গভীর প্রেম। সেই ভালোবাসা-ই নানা বিপর্যয়ের মধ্যে তাকে প্রাণশক্তি জুগিয়েছে। শুধু তাই নয়, হিন্দু নারীর মত সে বিশ্বাস করত, তার ভালবাসার জোরে সে একদিন তার পুরোনো স্বামীকে (ভবতোষের চক্রান্তে চন্দ্রমোহন দীপার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল) ফিরে পাবেই। সেজন্য সে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করতে থাকে। একদিন সে প্রতীক্ষা সফল হয়—সে স্বামীর দেখা পায়—গভীর সুখে স্বামীকে বলে—

> "আমিও তোমার জন্য আলো জ্বেলে বসে থেকেছি গো; কত ঝড়, কত দুর্যোগ গেছে মাথার উপর দিয়ে। তোমার নাম করে সব পার হয়ে গেছে। ....আমাকে আশীর্বাদ কর, আমাকে তোমার পায়ের ধূলা দাও, আমি তোমাকে ফিরে পেয়েছি।"
> (চতুর্থ অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীসঙ্গসুখ থেকে সে বঞ্চিত হয়। দীর্ঘদিন অনাহার ও মানসিক কষ্টে থাকার জন্য সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগতে থাকে।[৫২] এবং এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে স্বামীকে দেখামাত্রই প্রবল উত্তেজনায় সিঁড়ি থেকে পড়ে যায়। ঝলকে ঝলকে মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে ও সে মারা যায়।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকার জন্য দীপা সক্রিয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। সে প্রতি মুহূর্তে বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। ভবতোষ, শিপ্রা, মহাদেব মহান্তর দুষ্কার্যের বিরোধিতা, বরেন মিত্রর স্ত্রী মদ্যপ ভাই-এর সঙ্গে সিনেমায় যেতে অনিচ্ছাপ্রকাশ, কুচক্র থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রতিরোধ, অনুপমের মনে বিবেকবুদ্ধি জাগিয়ে তার সঙ্গে ভাই-এর সম্পর্ক স্থাপন করে স্বতন্ত্র বাড়ীতে অবস্থান, অন্নসংস্থানের জন্য এক বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ নেওয়া, সে বাড়ীর ছোটবাবুর কু-ইঙ্গিতের জন্য সে চাকুরী ত্যাগ, স্বামীর খোঁজে মুরারী ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা—সবই তার কর্মপ্রচেষ্টার পরিচায়ক। এইভাবে সে বাইরের প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ দেখে একে ধীরারোহরণধর্মী দ্বন্দ্বের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

দীপা বহির্মুখী চরিত্র। তাই নানা কার্যাবলীর মধ্যে তার মনের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

অন্ধদেবতা

প্রশমন : সহায়হীন দরিদ্র ব্যক্তি অনেক সময় নির্মম স্বার্থপর ধনীর অন্যায় ক্রিয়া-কলাপের যন্ত্রে পরিণত হয়—আলোচ্য বিষাদান্ত নাটকের এই মূলভাবের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রশমন।

প্রশমন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পারিবারিক সূত্রে সে পরোপকারী, পরদুঃখকাতর, কিন্তু সে সমাজের কাছ থেকে কোন সুবিচার পায়নি। দুর্নীতিগ্রস্ত ধনীব্যক্তিরা তাকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এরফলে তার মধ্যে এক বিশেষ মানসিকতা গড়ে উঠেছে।

সংসারে কোনক্রমে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে সে নানাধরণের অন্যায় অসামাজিক কার্যে লিপ্ত হয়েছে। যেমন, পাঁচহাজার টাকার বিনিময়ে ব্যবসায়ী ডি. ভি-র ব্যবসা সংক্রান্ত গোপন ফাইল চুরির চেষ্টা, ডি. ভি-কে গুলিতে হত্যা, ডিটেকটিভ অতীন করের ভাবী বধূ বেবীকে ভয় দেখিয়ে একটি বাগান বাড়ীতে বন্দী করে রাখা। প্রকৃতপক্ষে এক গভীর হতাশা থেকে তার মধ্যেও এ ধরণের ভয়ঙ্কর কাজ করার প্রবৃত্তি জেগেছিল।[৫৩]

কিন্তু এর মধ্যে তার অন্তরের সুকোমল বৃত্তিগুলি মনে যায়নি। সে শিয়ালদহ স্টেশনে কতকগুলি গুণ্ডার হাত থেকে লতা নামে একটি যুবতীকে উদ্ধার করে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে। লতার কাছে তাই সে অসাধারণ মানুষ হিসেবে পূজা পেয়েছে—

"সতীত্বহারা বাংলার মেয়ের চোখে যেদিন সমস্ত জগৎ অন্ধকার হয়ে এসেছিল, সেইদিন সেই বেদনার রাত্রিতে তুমি দেখা দিলে নবোদিত সূর্যের মতো।" (তৃতীয় দৃশ্য) সেই একই মানসিকতার বশবর্তী হয়ে সে একটি কুসঙ্গ থেকে কানু নামে একটি ছেলেকে উদ্ধার করে তার কাছে এনে রেখেছে।

সমাজের নানা প্রতিকূল শক্তি ও বিরুদ্ধ পরিবেশ প্রশমনকে কখনো স্থির জীবনযাপন করতে দেয়নি। বাইরের আঘাতে সে বিভ্রান্তের মত শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে।

—"অদ্ভুত জীবন। সহায় নেই, সম্বল নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই। পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।" (একাদশ দৃশ্য) এবং সেই কারণে তার মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অবিশ্বাস ও তীব্র হতাশাবোধ জেগেছে—

"সত্যিই কি ভগবান বলে কিছু আছে জগতে ?" (একাদশ দৃশ্য)

প্রশমন সক্রিয় চরিত্র। সে তাই বিপদে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না। তার ক্ষমতা অনুসারে সে নিজের কাজ করে গেছে। নানারকম বাইরের কাজ কর্মদ্বারা নিজের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করায় প্রশমনকে বহির্মুখী চরিত্র বলা যায়।

সেই তিমিরে

স্বাহা : সুখী সংসার রচনার পশ্চাতে নারীপুরুষ উভয়ের পরস্পরের সহযোগিতা প্রয়োজন—স্বাহা চরিত্রের মাধ্যমে এই ভাব প্রকাশিত হওয়ায় এই চরিত্র উক্ত হাস্যরসাত্মক নাটকের প্রধান চরিত্র। স্বাহা মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। সে সুশ্রী যুবতী, অতি আধুনিক পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে। নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে সে সময় যে বিশেষ ধ্যান ধারণা গড়ে উঠেছিল সেই চিন্তাধারায় স্বাহার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে।[৫৪] চরিত্রের এই ত্রৈমানিকতা তার কর্মধারাকে প্রভাবিত করেছিল।

স্বাহা বিবাহিতা। সে প্রেম করে রুদ্রেশ্বের নামে এক যুবককে বিবাহ করেছে। বিবাহের পূর্বে সে স্বামীর সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছিল উভয়ের কেউ পরস্পরেব স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। তাই সে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করত। কিন্তু যেদিন সে তার পুরুষ বন্ধু মিঃ চাউডুরীর সঙ্গে সিনেমা দেখে ও রাস্তায় বেড়িয়ে রাত দুটোর সময় বাড়ী ফেরে, সেদিন রুদ্রেশ্বর বিরক্তি প্রকাশ করে। স্বাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে পরদিন স্বামীগৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র স্বাধীনভাবে বসবাস করার জন্য কিছু মহিলাকে নিয়ে 'জাগরণী সম্মিলনী' গড়ে তোলে। নিজের অধিকার সম্পকে অতিসচেতনতা তাকে এই ধরণের কাজ করতে প্ররোচিত করেছিল।

কিন্তু স্বাহার মধ্যেই চিরন্তন নারীমন লুকিয়ে ছিল। অতি আধুনিক হওয়ার মোহে সে সেটি বিস্মৃত হয়েছিল। গৃহত্যাগ করার কিছুদিনের মধ্যে সে সেই সত্য উপলব্ধি করে। সেজন্য রুদ্রেশ্বর স্বাহাকে ফিরিয়ে নিতে এলে সে বিনা প্রতিবাদে স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

স্বাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে এবং সেগুলো বহির্দ্বন্দ্ব। পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে অনেক রাতে বাড়ী ফেরা নিয়ে রুদ্রেশ্বরের সঙ্গে সংঘাত, জাগরণী সম্মিলনীতে অতনুর সঙ্গে কিছু কিছু সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে স্বাহাকে।

স্বাহার মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকায় সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পুরুষের বিরোধিতা করে গেছে। বহির্মুখী চরিত্রের লক্ষণাক্রান্ত এই নারী তার চিন্তাভাবনা, নানা ধরণের মানসিক ক্রিয়াকলাপ বাইরের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে প্রকাশ করেছে। স্বাহা অহম্‌বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করেছে।

পিতাপুত্র

প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রিয়জন বিপথগামী হলে মানুষের কষ্টের শেষ থাকেনা নাট্যকার 'পিতাপুত্র' বিষাদান্ত নাটকে প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্র অবলম্বনে এই ভাব ব্যক্ত করেছেন। তাই তিনি নাট্য কাহিনীর মূল চরিত্র।

সুস্থ সবল প্রদীপ্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছেন। পরবর্তীকালে তিনি কর্তব্য পরায়ণ পুলিশ অফিসার রূপে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র সমীর। তিনি তাঁকে প্রাণের অধিক স্নেহ করেন। এই বংশধারা ও সামাজিকধারা তাঁর মনোজগৎ গঠন করে পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণে সাহায্য করেছে।

প্রদীপ্তর পুত্র সমীর বিপথগামী। বর্তমানে সে মৃত বলে ঘোষিত। সেজন্য পিতার দুঃখের শেষ নেই। পুত্রের জন্য তাঁর পিতৃহৃদয় সর্বদা হাহাকারে করে। তাই যখন তিনি ডাকাতদলের একজন সদস্যকে অনুমানে পুত্র বলে মনে করলেন সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম বিস্তৃত হলেন, তাঁর সন্তানস্নেহ জেগে উঠল ; তিনি তাকে পলায়নে সাহায্য করলেন।

পুত্র ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছে—এটি সমাজের যে কোন পিতার মত তাঁর ক্ষেত্রে দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রদীপ্ত যেদিন মুখোশধারী পুত্রকে চিনতে না পেরে তাকে পুত্রবধূর অবৈধ প্রেমিক ভেবে গুলিতে হত্যা করলেন সেদিন তাঁর জীবনে চরম আঘাত নেমে এল। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকে পিতারূপে প্রদীপ্তর পরিচয়ই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কর্তব্যের তুলনায় পিতৃস্নেহ বড় হয়ে উঠেছে। স্নেহময় পিতা হওয়ার জন্য পুত্রের বিপথগামিতার ফল—তার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু জনিত আঘাত তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে।

প্রদীপ্ত প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হওয়ায় প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। ডাকাতদল ধরার জন্য তাঁর বিভিন্ন কার্যাবলী, পুত্রকে পলায়নে সহায়তা করা, পুত্রকে চিনতে না পেরে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তাঁর সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

প্রদীপ্ত বাইরের শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও তা কোথাও তীব্রতা লাভ করেনি। ডাকাতদলের নেতারূপে পুত্রকে অনুমান করে তাঁর মধ্যে মানসিক আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং পুত্রকে চিনতে না পেরে তাকে হত্যা করলে সেটি তীব্ররূপ ধারণ করে,—[৫৫]

"হ্যাঁ, আমার পুত্র। আমি তাকে নিজের হাতে হত্যা করেছি। এর জীবন আমাকে কে ভিক্ষা দেবে মিঃ মুখার্জী ?" (চতুর্থ অঙ্ক। সংঘাত)

প্রদীপ্তর মধ্যে যে বহির্দ্বন্দ্ব দেখা গেছে সেটি আকস্মিক-লক্ষনধর্মী দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত।

প্রদীপ্ত বহির্মুখী ও অহমবোধ সম্পন্ন চরিত্র। এই মানসিকতা তাঁর কর্মপদ্ধতি ও আচার আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

ক্ষুধা

রমেন : আর্থিক দুর্গতি মানুষকে প্রার্থিত সুখ থেকে বঞ্চিত করে—এই বিষয় নিয়ে রচিত 'ক্ষুধা' বিষাদান্ত নাটকের প্রধান চরিত্র রমেন।

রমেন পূর্ববঙ্গের জমিদার-সন্তান। দাঙ্গার সময় তার পরিবারের সকলে মারা যায়। সে কোনক্রমে পালিয়ে কলকাতায় আসে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আত্মসম্মানবোধ তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দাঙ্গায় কলকাতায় পালিয়ে আসার মধ্যে মানসিক বল ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত কারণে রমেনের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলিই তার মানসিকরূপকে ধরিয়ে দেয়। রমেন "নম্র, বিনয়ী, দু'কথা বললে চুপ করে শোনে" (পঞ্চম দৃশ্য)। সে বাঁচার প্রয়োজনে কোন অন্যায় কাজ করতে চায় না। তাই তার দুইবন্ধু স্বদেশ গজেন সারাদিন অভুক্ত থাকার পর মরীয়া হয়ে মিথ্যা পরিচয়ে একটি উৎসব বাড়ীতে প্রবেশের প্রস্তাব দিলে সে সসঙ্কোচে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করে—

"মানে—আমি বলছি, বরযাত্রী সেজে ঢুকে পড়াটা ঠিক হবে না। মানে—কাজটা তো অন্যায়।" (ষষ্ঠ দৃশ্য) অবশ্য দুইবন্ধুর বিশেষ অনুরোধে সে শেষ পর্যন্ত সেই উৎসববাড়ীতে যায় এবং ধরা পড়ে প্রবল প্রহার লাভ করে।

কিন্তু এই ঘটনা তার আত্মসম্মানবোধকে জাগিয়ে তোলে ও অপমানজনক জীবন থেকে মুক্তি লাভের আশায় সে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেয়। এবং একদিন সে আপন যোগ্যতা বলে একটি খনির উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রমেনের মধ্যে চারিত্রিক গভীরতা ছিল বলে পরবর্তী কালে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য তাকে ন্যায় ও সততাভ্রষ্ট করতে পারেনি। তাই আশ্রয়দাতা ধনী শ্যামলালের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সে ফিরে এসেছে তার দরিদ্র প্রেমিকা মানবীর কাছে। সে শ্যামলালকে মানবী ও তার সম্পর্কের সম্বন্ধে বলেছে—

"আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। আমি মানুষ হয়ে তার কাছে ফিরে যাব বলে......তাকে অপেক্ষা করতে বলে—চলে এসেছি।" (ষষ্ঠ দৃশ্য) অবশ্য মানবীর আকস্মিক মৃত্যুতে তাদের প্রেম সার্থকতা লাভ করতে পারেনি।

রমেনের ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, কর্তব্যবোধের সঙ্গে আর একটি গুণ ছিল। সেটি হল বন্ধুপ্রীতি। সেই কারণে অভুক্ত দুই বন্ধুর কথা চিন্তা করে মানবীর দেওয়া খাবার সে প্রত্যাখ্যান করেছে—

"যারা তাদের মুখের খাবার ভাগ করে আমায় খাওয়ায়, তাদের বাদ দিয়ে আমি কিছু খেতে পারবো না।" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

রমেনের মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। তাই সে বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা জীবনের বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। রমেন সক্রিয় চরিত্ররূপে তার কাজকর্ম সম্পাদন করেছে।

রমেনের মধ্যে কোনপ্রকার দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। ধনীগৃহের উৎসবে অনাহূত হয়ে প্রবেশ করার অপরাধে প্রহার লাভ করলে তার মানসিক জগতে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং তার মধ্যে নূতন চেতনা জাগে। সে জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় দূর দেশে গমন করে। আবার শ্যামলালবাবু তাঁর কন্যার সঙ্গে রমেনের বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে প্রেমিকা মানবীর কথা স্মরণ করে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে শ্যামলালের সঙ্গে তার মনান্তর হয়। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকলেও কোথাও দ্বন্দ্ব দানা বেঁধে ওঠেনি।

রমেন উভয়মুখী চরিত্র। তাই সে কখনো ঘটনার পরিস্থিতিতে নীরব থেকেছে, আবার কখনো সরব হয়ে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে।

তোমার পতাকা

অনুকূল বিশ্বাস : আদর্শবান দেশপ্রেমিকের অনুপ্রেরণায় মানুষ দেশের কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে—নাটকের এই ভাবনার প্রধান চরিত্র অনুকূল বিশ্বাস।

অনুকূল মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠেছেন এবং দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। উত্তরাধিকার সূত্র ও সামাজিক প্রভাবে তাঁর যে মানসিক জগৎ গড়ে উঠেছে তা-ই তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে।

অনুকূল দেশপ্রেমিক। তাই তাঁর মধ্যে আদর্শ চরিত্রের বিশেষ গুণগুলি লক্ষণীয়। তিনি গান্ধীবাদী। তাঁর আদর্শানুসারে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এবং সে বিষয়ে তিনি অনেকটা কৃতকার্য হয়েছেন।

তিনি চিরদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাই তাঁর কন্যা মায়া দলীয় নীতি ভঙ্গ করে আত্মরক্ষার্থে হিংসাত্মক কাজ করলে (পুলিশের অনুচর স্বার্থান্বেষী বিশ্বম্ভর চক্রবর্তীকে গুলি) তিনি তাঁকে ক্ষমা করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দেন। আবার পুলিশ সুপার মহীতোষ মজুমদারের হুমকি শুনে তিনি যে কথা বলেন, তা একান্তভাবেই এক নিবেদিত দেশপ্রেমিকের উক্তি—

"নির্বিচারে গুলি করে মানুষ মারা যায় মিঃ মজুমদার, আগুন নেবানো যায় না।"

(প্রথম অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য)

শুধু তাই নয়, একজন সুদক্ষ দেশনেতার মত তিনি মহীতোষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন—

"নেমে আসুন আমাদের দলে—বন্দুক ফেলে দিয়ে তুলে নিন ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা। জোর করে বলুন দিকি—চাকরির বন্দনা আর করবো না।"

(প্রথম অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ)

তাঁর মধ্যে ক্ষমার আদর্শ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর দলের ছেলেরা পুলিশ সুপার মহীতোষ, পুলিশ ইন্সপেক্টর বিভূতি ও বিশ্বম্ভরকে তাদের আশ্রমে বন্দী করে রাখলে তিনি খবর পাওয়া মাত্রই তাদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন।

তিনি গান্ধীজীর অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁর অনুগামীদের নিরস্ত্র হয়ে ইংরেজ কালেক্টরি অধিকার করার নির্দেশ দেন। তাঁর মতে, তাঁদের অস্ত্র মনের শক্তি, দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা। সেই কারণে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে মানসিক শক্তি বলে তাঁর দল অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করেছে।

অনুকূলের মধ্যে যে পিতৃহৃদয় ছিল যা রাজনৈতিক কাজকর্মের চাপে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায়নি সেই আচ্ছাদিত স্নেহধারা গুলিবিদ্ধ কন্যার মৃতুতে প্রবাহিত হল। তিনি সে সময় সব ভুলে মৃতকন্যার সামনে শোকস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

আদর্শগত কারণে অনুকূলের সঙ্গে অন্যের সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বম্ভর চক্রবর্তীকে গুলি করা নিয়ে কন্যা মায়াকে তিরস্কার, মহীতোষের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে মতান্তর, বিভূতি, মহীতোষ, বিশ্বম্ভরকে বিপ্লবীদল অবরুদ্ধ করলে তাদের সঙ্গে বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তাঁর বহির্সংঘাত প্রকাশিত হয়েছে। ধীরারোহণধর্মী দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

তবে অনুকূলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। কন্যা ও কিছু বিপ্লবী হিংসানীতির আশ্রয় নিলে তাঁর মানসিক জগত আলোড়িত হয়, কিন্তু সেই কারণে তাঁর অন্তর্জগতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় নি।

অনুকূল বহির্মুখী চরিত্র। সেজন্য তিনি তাঁর মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকায় তিনি নিজ আদর্শানুসারে বিপ্লবাত্মক কাজ করে গেছেন; জনতার একটি বিশাল অংশকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন; তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই কার্যাবলী তাঁকে সক্রিয় নায়কের মর্যাদা দিয়েছে।

অনুকূলের মধ্যে অহম্‌ভাব প্রবল। তাই তিনি শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নিজস্ব মত থেকে মুহূর্তের জন্য সরে দাঁড়াননি।

মন্দাক্রান্তা/জয়-পরাজয়

মন্দাকিনী : স্বামীপ্রেমে দ্বিধাগ্রস্ত স্ত্রীর অবিমৃষ্যকারী কাজ তার জীবনে করুণ পরিণতি নিয়ে আসে—বর্তমান করুণ রসাত্মক নাটকের এই মূলভাব ব্যক্ত হয়েছে মন্দাকিনী চরিত্র অবলম্বনে। তাই মন্দাকিনী এই নাটকের প্রধান চরিত্র।

মন্দাকিনী সুন্দরী শিক্ষিতা। সে যে সমাজে বড় হয়ে উঠেছে সেখানে নারীরা নিজেদের সম্পর্কে সচেতন। তারা নিজেদের পুরুষের সমান বলে ভাবতে শিখেছে, তারা তাদের পুরুষের খেলার পুতুল বলে মনে করে না। তাদেরও যে স্বাধীন সত্তা আছে, পুরুষ সম্পর্কে নানা অভাব-অভিযোগ আছে সে কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। মন্দাকিনীর মানসিকতা এরই প্রভাবে গড়ে উঠেছে। সে তাই সদাব্যস্ত নাট্যপরিচালক স্বামী সুমিত্রকে (যদিও সুমিত্র একান্তভাবে পত্নীপ্রেমিক) নিজের কাছে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়, স্বামীর আচরণকে সে নারী মর্যাদার পক্ষে অপমানজনক বলে মনে করে। ফলে স্বামীর বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রতিবাদ ভেতরে ভেতরে গড়ে উঠেছে—

"তিনি সাতদিন থিয়েটারে কাটিয়ে বাড়ি আসবেন। ....একটা কিছু করতে হবে। এমন কিছু, যাতে চিরকালের জন্য এই দার্শনিকের আক্কেল হয়ে যায়।" (প্রথম দৃশ্য)

এই মানসিক অবস্থা এক সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে সে এক সর্বনাশা খেলায় মেতে ওঠে। স্বামীর বহির্মুখী মনকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য স্বামী-বন্ধু নীলাদ্রির সঙ্গে পরামর্শ করে কিছুদিন বাইরে কাটাবার জন্য নীলাদ্রির সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে। আসলে মন্দাকিনী এমন একটি সংসার চেয়েছিল যেখানে শুধু নারী দাসী বা স্বামীর খামখেয়ালীপনার পাত্রী নয়, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মিলিত প্রচেষ্টায় সুন্দর সুখী গৃহ রচিত হয়। এই মনোভাব একান্তভাবে বিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতির চিন্তাধারার ফসল। মন্দাকিনীর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ চরম বিক্ষোভের রূপ নিয়ে অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত নিতে তাকে প্ররোচিত করল।

এই অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত তাকে এক করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। নীলাদ্রি শর্তভঙ্গ করে মন্দাকিনীকে প্রেম নিবেদন করলে সে যেন তার জীবনের বিরাট এক ফাঁকিকে দেখতে পায়। সে উপলব্ধি করে, স্বামীগৃহ ত্যাগ করে সে বিরাট ভুল করেছে। শেষ পর্যন্ত নীলাদ্রি তার কাছে ধিক্কৃত হয়ে আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করলে মন্দাকিনী নিজের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের বিষময় পরিণতি উপলব্ধি করে। সে সুমিত্রর অনুরোধে স্বামীর কাছে ফিরে এলেও নীলাদ্রির আত্মহত্যায় এক প্রকাণ্ড শূন্যতাবোধ তাকে হাহাকারে ভরিয়ে তোলে।

মন্দাকিনী প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সক্রিয় চরিত্র। সে প্রতি পদক্ষেপে স্বয়ং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ও নিজের মতানুসারে সংসারক্ষেত্রে এগিয়ে চলার চেষ্টা করেছে।

মন্দাকিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই। তবে সে নানা ধরণের আঘাত পেয়েছে। স্বামীর অদর্শনে তার মানসিক প্রক্রিয়া ও তাকে কেন্দ্র করে স্বামীর সঙ্গে সংঘাত, স্বামীগৃহত্যাগের পর নিজের হটকারিতার জন্য মানসিক যন্ত্রণা, শর্তভঙ্গ করে নীলাদ্রি তাকে প্রেম নিবেদন করলে তার মানসিক আঘাত, তার কাছে ভর্ৎসিত হয়ে আত্মধিক্কৃত নীলাদ্রির আত্মহত্যাজনিত চরম আঘাত তার মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

মন্দাকিনী বহির্মুখী চরিত্র। তাই সে সর্বত্র সরব ছিল। যেখানে সে আত্মঅবমাননাকর ঘটনা ঘটতে দেখেছে সেখানেই সে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে এবং বাহ্যিক আচরণে তার মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

মন্দাকিনীর মধ্যে অহম্‌বোধ প্রাধান্য পাওয়ায় সে একমাত্র নিজের সিদ্ধান্তকেই মূল্য দিয়েছে।

অতএব

দোলগোবিন্দ : প্রয়োজনে কৌশল অবলম্বন করলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়— 'অতএব' হাস্যরসাত্মক নাটকটির এই মূলভাব। এই মূলভাবের অবলম্বন দোলগোবিন্দ। কারণ তাঁকে ঘিরে নাটকের চরিত্র ও ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। তাই দোলগোবিন্দ উক্ত নাটকের প্রধান চরিত্র বলে গণ্য হযেছেন।

দোলগোবিন্দর ধনী পরিবারে জন্ম। তিনি বর্তমানে সতীগড়ের জমিদার। পিতৃমাতৃহারা,-ভ্রাতুষ্পুত্র সুমিত্রকে মানুষ করতে গিয়ে তিনি আর বিবাহ করেননি। পুরুষানুক্রমে ও সামাজিক সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলী তাঁর মনোজগৎ গঠনে সাহায্য করেছে।

তিনি জমিদার, তাই অর্থব্যয়ে তাঁর কোন কার্পণ্য নেই। ভ্রাতুষ্পুত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করেন বলে তার সব আবদার তিনি মেনে নিয়েছেন। তিনি সুমিত্রর অমিতব্যয়িতাকে পরোক্ষে প্রশ্রয় দেন। তাঁর জমিদারীসুলভ ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁকে সকলে মান্য করে। এমনকি সুমিত্রও প্রকাশ্যে তার অবাধ্যতা করতে পারে না।

তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী। বুদ্ধির খেলায় তিনি অনায়াসেই অন্য পক্ষকে পরাজিত করতে পারেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা তাঁকে লোকচরিত্র সম্পর্কে পারদর্শী করে তুলেছিল। তাই সুমিত্র ও তার বন্ধু কালাচাঁদ তাঁকে অন্য ব্যক্তি (সুমিত্রর প্রেমিকা অমিতার প্রতি আসক্ত বৃদ্ধ) ভেবে হত্যা করতে গেলে তিনি অতি সহজেই তাদের গ্রেপ্তার করেন। শুধু তাই নয়, অমিতা ও সুমিত্র নয়নের (অমিতার মাসতুত বোন) সাহায্যে অত্মহত্যার অভিনয় করলে তিনি সেই কৌশলও ধরে ফেলেন।

দোলগোবিন্দ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর মানসিক দৃঢ়তা। এর ফলে তিনি যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে সক্ষম হতেন। সেই কারণে তিনি বহুদিনের একটি সমস্যার (বিবাহ দ্বারা সুমিত্রর বহির্মুখী মনকে গৃহমুখী করা) খুব সুন্দর সমাধান করেছেন। অবশ্য এই ব্যাপারে তাঁকে নানাপ্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি বুদ্ধি ও সাহসের সঙ্গে সব বাধা অতিক্রম করে স্বকর্মে কৃতকার্য হয়েছিলেন।

দোলগোবিন্দর মধ্যে বহির্দ্বন্দ্ব বা অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। তবে তাঁকে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিবাহ-ব্যাপার নিয়ে সুমিত্রর সঙ্গে মতানৈক্য, সুমিত্রর প্রেমিকা অমিতাকে বিবাহের নাটকীয় কৌশল অবলম্বন করলে অমিতার বিরূপ মনোভাব এবং অমিতা ও তার মাসতুত বোন নয়নেব নানা কার্যাবলী, সুমিত্র ও কালাচাঁদের ষড়যন্ত্র তাঁকে নানা অসুবিধার মধ্যে ফেলেছিল। এ ছাড়া হোটেলে অবস্থানকালে তাঁর বৃদ্ধবয়সে বিবাহের ইচ্ছার কথা (যদিও ব্যাপারটি তিনিই ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য সাজিয়েছিলেন) প্রচারিত হলে হোটেলের কিছু ব্যক্তির বিরূপ মন্তব্য তাঁকে মানসিক আঘাত দেয়। তিনি সব কিছুই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অতিক্রম করেছিলেন।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি দোলগোবিন্দকে প্রচণ্ড মানসিকশক্তি জুগিয়েছে। যে অদ্ভুত ও বিচিত্র পরিস্থিতির তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই সব বিরুদ্ধ কার্যাবলী ও নানা সমস্যা তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে সমাধানে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং সে কারণেই তিনি সক্রিয় চরিত্র।

তাঁর মানসিব গা ও বিভিন্ন কার্যাবলীর জন্য তাঁকে বহির্মুখী চরিত্ররূপে চিহ্নিত কবা যায়। তাঁর মধ্যে অহম্‌ভাব প্রধান হয়ে ওঠায় তিনি অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন না ও নিজের ইচ্ছানুসারে সব কাজ কবতেন।

এন্টনী কবিয়াল

এন্টনী কবিয়াল : নারীর অনুপ্রেরণায় অনেকে নিজেকে শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন—এটি উক্ত মিলনাত্মক নাটকের মুখ্য বিষয় এবং এই বিষযটি এন্টনী কবিয়াল চরিত্র অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি প্রধান চরিত্র।

পর্তুগীজ পরিবারের সন্তান এন্টনী বাংলায় জন্মগ্রহণ কবেন। জন্মসূত্রে তিনি কবিত্বেব অধিকারী। বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ হওয়ায় তাঁর মধ্যে বাঙালীসুলভ অনেক গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়। বাংলার প্রকৃতি, মানুষ তাঁর মনের অনেকখানি অধিকার করে ছিল। এই বংশানুগতি ও সামাজিক পরিবেশ এন্টনীর মনোজগতে গভীর প্রভাব বিস্তার

বাংলায় জন্মগ্রহণ ও প্রতিপালিত হওয়ায় তিনি ভিন্নজাত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে সম্পূর্ণ বাঙালীররূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাধনা শুরু করেন। বাংলার বিধবা মেয়ে সৌদামিনীর প্রতি গভীর প্রেমের মধ্য দিয়ে সেই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি তাঁর প্রেমের শক্তিতে সৌদামিনীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করেন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিনি নিজেকে কবিয়ালরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

এন্টনী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তিনি বাংলার প্রকৃতি, মানুষকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে অনেক সামাজিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিন্তু তিনি নিজ চেষ্টায় সব কিছু অতিক্রম করে সার্থকতার পথে এগিয়ে গেছেন। অবশ্য তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে সৌদামিনীর অবদান অনস্বীকার্য। সৌদামিনীর ভালবাসার সুবাসে এন্টনীর মনপ্রাণ ভরে উঠেছিল, তাঁর ভেতরের শিল্পীসত্তা ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে শুরু করেছিল—

"সৌদামিনী, তুমি আমার গুরু হও। তুমি আমাকে গান গাইতে শেখাও। আমার গলায় হয়তো সুর আছে, কিন্তু তাতে বাংলাদেশের মাটির গন্ধ নেই। সেই বাংলার গান, বাঙালীর গান—তুমি আমাকে শেখাও।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

এবং এইভাবে সৃষ্ট হল নূতন কবিয়াল—এন্টনী কবিয়াল।

এন্টনীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, বহির্দ্বন্দ্ব খুব সামান্য। সৌদামিনীকে কেন্দ্র করে লিন্ডা (এন্টনীর প্রতি আকৃষ্ট) জয়গোপালের (সৌদামিনীর কাকা) সঙ্গে তাঁর সংঘাতের সামান্য চিত্র পাওয়া যায়। তবে তাঁর জীবনে নানাধরণের আঘাত এসেছে। জয়গোপালের তাঁর প্রতি বিরূপ আচরণ (জয়গোপালের প্ররোচনায় বিবাহ রাত্রিতে এন্টনীর আটচালায় আগুন লাগানো, কিছু ব্যক্তি কর্তৃক এন্টনীকে প্রহার, শ্রীরামপুরের গোঁসাইবাড়ীর গানের আসরে গোরক্ষনাথের এন্টনীর বিরুদ্ধাচরণ) তাঁকে অনেক সময় বিপন্ন করে তুলেছিল। কিন্তু তিনি মানসিক শক্তি ও সাহস বলে সে সব অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। লিন্ডার তাঁর প্রতি ব্যবহার, প্রথম অবস্থায় কবি গান বাঁধতে না পারার যন্ত্রণা, ফিরিঙ্গি কালীমন্দির প্রাঙ্গণে কবি আসরে ভোলাময়রার কটূক্তি (অবশ্য ভোলাময়রা এন্টনীর অন্তর্নিহিত কবিত্ব শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য এ ধরণের আচরণ করেছিলেন) তাঁকে মানসিক আঘাত দিয়েছিল।

এন্টনীর সব আচরণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাঁর বাহ্যিক আচরণে ধরা পড়ায় তাঁকে বহির্মুখী চরিত্র বলা যায়। প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এন্টনী সমস্ত আঘাত ও বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার মত দৃঢ় মনোভাব পোষণ করতেন এবং নিজ প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতেন। এন্টনী সেই হেতু সক্রিয় চরিত্র।

অধিশাস্তা (super-ego)-র প্রভাবে এন্টনী ক্ষুদ্রতা, নীচতার অনেক উর্ধ্বে উঠে নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দ্বিধা

রত্না : অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ জীবনকে ব্যর্থতায় ভরিয়ে দেয়—এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে গড়ে ওঠা করুণ রসাত্মক নাটকটির প্রধান চরিত্র রত্না।

রত্না চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায়, সে সুন্দরী, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম। অনেক ভাই বোনের সংসারে সে ভালোভাবে পড়াশুনোর সুযোগ পায়নি। যথাসময়ে তার বিবাহের ব্যবস্থা হয় কিন্তু বিবাহের রাত্রে অর্ধবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর পাত্র সেফিলিটিক ইরাপ্‌সন-এ আক্রান্ত হওয়ায় সেই বিবাহ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রত্না একদিনের জন্যেও স্বামীগৃহে যায়নি। কারণ সে একে বিবাহ বলেই মনে করে না। তার বড়দা সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে ভিন্ন সংসার করতে শুরু করায় রত্না সংসার বাঁচাতে স্কুলফাইনাল পাশ করে স্টেনোগ্রাফী শিখে একটি বেসরকারী অফিসে চাকরী নিয়েছে। সেখানে অফিসের কাজকর্ম ব্যতীত অফিসের অধিকর্তাকে অন্যভাবে খুশী করতে হয়।

রত্নার পরিবার ও পরিবেশ তাকে বিশেষ মানসিকতার অধিকারী করেছে। জন্মসূত্রে পাওয়া সৌন্দর্যকে সে পারিবারিক স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। বিবাহে বাধা, দাদার স্বার্থপরতা

অসহায় পরিবারকে বাঁচাতে তার অবমাননাকর চাকুরিগ্রহণ—একটির পর একটি ঘটনা তার জীবনকে সঙ্কটময় করে তুলেছিল।[২৬]

রত্নার মধ্যে ছিল প্রবল কর্তব্যবোধ। সেজন্য অনেক সময় তাকে অপমান, নানা অপ্রীতিকর ব্যবহার সহ্য করতে হয়েছে এবং সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য সে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করেছে—

"দোষ কারো নয় ছোড়দা। আমার ভাগ্যের দোষ।" (১ম পর্ব। ৬)

এই পুরুষশাসিত সমাজে যে নারী যথাযোগ্য স্থান ও সম্মান পায় না সে তা নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছে কিন্তু অসহায়ের মত সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। তবু তার মধ্যে যে যুক্তিবাদী শিক্ষিত নারীসত্তা আছে সেটি মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করে—

"আজ আমার Boss এই কাজ করেছে বলে আশ্চর্য হচ্ছো ? ..... গোটা পৃথিবীটা আজ যেন মেয়েদের নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে।" (৩য় পর্ব। ১)

পুরুষের এই মানসিকতার জন্য সে পুরুষ-নিবেদিত প্রেমকে অবহেলায় উপেক্ষা করেছে।

অথচ তার মধ্যেও রঙীন স্বপ্ন ছিল, একটি মনের মানুষকে ঘিরে তার প্রেম প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক এটি তার একান্ত কাম্য ছিল। সামাজিক বাধা ও বিপর্যয়ের জন্য তার সেই কামনা প্রকাশ পাবার সুযোগ পায়নি। একদিন সাগর নামে একটি পুরুষের সান্নিধ্যে তার সুপ্ত ভালবাসা বিকশিত হল। কিন্তু সে প্রেম সার্থকতা লাভ করল না। সাগরকে সীতা নামে একটি মেয়ে ভালবাসত। সীতার অনুরোধে সে সাগরকে তার কাছে ফিরিয়ে দিল। এই আত্মত্যাগ (যা সে পরিবারের জন্যও করেছে) রত্না চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে সে শুধু নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নেয়—

"আমাদের কী কেউ নেই ছোড়দা ? আমরা দান করবো— প্রতিদান পাবো না ? .....তবে তাই হোক ছোড়দা, তাই হোক" (৪র্থ পর্ব। ৪)

রত্নার মধ্যে বাসনা আছে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি নেই। তাই সে নিষ্ক্রিয় চরিত্র। সে প্রতিকূলশক্তির কোন বিরুদ্ধাচরণ না করে তাকে নীরবে মেনে নিয়েছে।

রত্নার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। নানা ঘটনার সংঘাতে তার মনের মধ্যে তীব্র বেদনার সৃষ্টি হয়েছে। যৌনরোগে আক্রান্ত পাত্রের সঙ্গে অর্ধসমাপ্ত বিবাহ, অসহায় বাবা মা ভাইবোনকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অবাঞ্ছিত চাকুরীগ্রহণ, প্রার্থিত ব্যক্তিকে জীবনে না পাওয়ার ব্যর্থতা তার মনের গভীরে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। শেষ পর্যন্ত নিজের দুভার্গ্যকে মেনে নিয়ে মনের জ্বালার ওপর সান্ত্বনার প্রলেপ দেবার চেষ্টা করেছে।

রত্না উভয়মুখী চরিত্র। সে মাঝে মাঝে নিজেকে প্রকাশ করেছে (বিশেষতঃ ছোড়দার কাছে) আবার সে নিজের ব্যথা মনের গভীরে ধরে রেখেছে।

।। যাত্রা-নাটক/লোকনাট্য ।।

সুরা-নারী-সিংহাসন

দ্বিতীয় মহীপাল : সুরা ও নারীর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি রাজনীতি পরিচালনার পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে—নাট্যকার উক্ত বক্তব্যকে দ্বিতীয় মহীপালের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাই দ্বিতীয় মহীপাল প্রধান চরিত্র।

দ্বিতীয় মহীপাল রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি সুস্থ সবল প্রবল পরাক্রমী। তিনি রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠেছেন এবং উপযুক্ত সময়ে রাজপদ লাভ করেছেন। রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করলে সুরা ও নারী অধিকাংশ রাজার নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। কিন্তু এর মধ্যে থেকেই রাজারা তাঁদের রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করেন। আবার অনেকে সুরা নারীতে নিমজ্জিত হয়ে রাজকার্য বিস্মৃত হন। দ্বিতীয় মহীপাল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। পুরুষানুক্রমিক গুণ বিশেষতঃ পরিবেশ তাঁর মানসিক গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।[৫৭]

নিজের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে অতিরিক্ত বিশ্বাস এবং সুরা নারীতে প্রবল আকর্ষণ দ্বিতীয় মহীপালকে উচ্ছৃঙ্খল, অত্যাচারী রাজাতে পরিণত করেছিল। তিনি তাঁর চারিত্রিক ত্রুটির জন্য সকলকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছিলেন, রাজনৈতিক কূটকৌশল বিস্মৃত হয়েছিলেন (এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, পরবর্তীকালে কৈবর্তরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল), স্তাবকপরিবৃত হয়ে ন্যায়-অন্যায়বোধ (উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজারা কোন অভিযোগ করতে পারবেন না বলে তাঁর সদম্ভ ঘোষণা) হারিয়ে ফেলেছিলেন।[৫৮] সেজন্য তিনি কোন হিতৈষীর কথায় কর্ণপাত করতেন না। এ প্রসঙ্গে তাঁর পরম হিতৈষী মন্ত্রী চক্রপাণির কথা স্মরণীয়। শুধু তাই নয়, কেউ তাঁর কার্যের সমালোচনা করলে তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। তাই স্ত্রী কঙ্কাবতী সুন্দরী কৈবর্ত-বউ ময়নাকে মহীপালের কবল থেকে উদ্ধার করলে অপমানিত রাজা স্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর রক্ষাকর্তা ভ্রাতা রামপালকে নির্বাসন দণ্ড দেন। এখানেই শেষ নয়। তাঁর প্রতিহিংসাস্পৃহা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে নির্বাসন দণ্ডপ্রাপ্ত স্ত্রী ও ভ্রাতা যাতে প্রজাদের কোন সাহায্য না পান তার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু তাঁর মধ্যে সদ্‌গুণ ছিল, ছিল সত্য নিষ্ঠ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। পাপ ও অন্যায়ের মধ্যে ডুবে গেলেও তিনি খাঁটি মানুষ চিনতেন। তাই তাঁর কুকর্মের সঙ্গী সেনাপতি বজ্রসেন মন্ত্রী চক্রপাণির সততায় সন্দেহ প্রকাশ করলে তিনি জ্বলে উঠলেন—

"বিচার হবে তোমার। যে আমার মন্ত্রীর নামে এত বড় স্পর্ধার কথা উচ্চারণ করতে পারে। ....তুমি আমার অন্তরঙ্গ বলে— আমার পিতৃপ্রতিম মন্ত্রীকে অপমান করবে? চুরি? আরে, চক্রপাণি যদি চুরি করতো তবে তো সেদিন বালক মহীপালকে চুরি করে সে গৌড়ের সিংহাসনেই বসতে পারতো।" (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

সতীলক্ষ্মী স্ত্রী কঙ্কাবতীকে প্রেমিকারূপে তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করতে না পারলেও তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তাই কঙ্কাবতীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ রাজা স্বগতোক্তি করেন—

"তোমাকে আমি ভালবাসতাম কিনা জানি না। কিন্তু শ্রদ্ধা করতাম।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

দ্বিতীয় মহীপাল প্রকৃতবীর ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন রাজা ছিলেন। বেহিসেবী জীবন যাপনের জন্য তাঁর বীরত্ব চাপা পড়ে গিয়েছিল কিন্তু যেদিন কৈবর্তরা দিব্বোক দাসের নেতৃত্বে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করল সেদিন তার সুপ্ত বীরত্ব জেগে উঠল এবং তিনি পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃতুবরণ করলেন। (অবশ্য দীপঙ্কর নামে এক ব্যক্তি পূর্ব প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁকে অকস্মাৎ পশ্চাৎ থেকে আঘাত করলে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।)

তাঁর মধ্যে বহির্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রী চক্রপাণির সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে সংঘাত, ময়নাকে কেন্দ্র করে স্ত্রী কঙ্কা ও ভ্রাতা রামপালে সঙ্গে সংঘাত, ভ্রাতৃবধূ অঙ্গনার সম্মানার্থে তাঁর কুকর্মের সঙ্গী শ্যালক শেখরের সঙ্গে সংঘাত এবং কৈবর্তদের সঙ্গে সংঘর্ষে এই বহির্দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়েছে। চক্রপাণির সঙ্গে মতানৈক্য, শেখরের বিশ্বাসঘাতকতা, কঙ্কার মৃত্যু তাঁকে মানসিক আঘাত দিয়েছে। এই আঘাতই তাঁকে মৃত্যুমুখে জীবনের প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিয়েছে—

"হ্যাঁ হরিদাস, আমি কাঁদছি। জীবনে কখনো মুখের ওপর লবণাক্ত চোখের জলের আস্বাদ পাইনি। আজ পাচ্ছি। আর মনে হচ্ছে, আমাকে কেন্দ্র করে যে হাজার হাজার নরনারী দিনরাত কেঁদেছে, তাদের অশ্রুকে আমি ব্যঙ্গ করেছি। ভাল করিনি, ভাল করিনি হরিদাস।" (তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য)

—এই সত্য উপলব্ধিতে চরিত্রটির উত্তরণ ঘটেছে।

দ্বিতীয় মহীপালের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টবাদিতা। তিনি যা বিশ্বাস করতেন বা যে মত পোষণ করতেন তা তিনি সরবে দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যে প্রমাণিত করতেন। তাই তিনি বহির্মুখী চরিত্র। প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মহীপাল যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে ইতঃস্তুতবোধ করেননি। এই কারণে চরিত্রটি সক্রিয় নায়কের গৌরব লাভ করেছে।

বহু কুকর্মের নেতা দ্বিতীয় মহীপালের মধ্যে ইদম্ (id) বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।

রাষ্ট্রবিপ্লব

গোপালদেব : কর্তব্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি জীবনে উন্নতি করতে পারে— এই মূল বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে গোপালদেব অবস্থান করায় তাঁকে "রাষ্ট্রবিপ্লব' নামক মিলনাত্মক যাত্রা-নাটকের প্রধান চরিত্রের মহিমায় ভূষিত করা যায়।

গোপালদেব চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি গৌড়ের দরিদ্র গৃহে সৎপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী, কর্মঠ ও সত্যনিষ্ঠ। বংশধারা ও সামাজিক প্রভাব তাঁর মনোজগতে নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাঁর বিশেষ কর্মপদ্ধতিকে রূপায়িত করতে সাহায্য করেছে।

দয়া, সেবাপরায়ণতা, পরদুঃখকাতরতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সামাজিক সচেতনতাই তাঁকে মহৎকাজে অনুপ্রাণিত করেছে।[৫১] তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। তাই গৌড়ের মহারাজার মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয়পক্ষের সুন্দরী যুবতী রাণী সুদীপ্তা সিংহাসনে আরোহন করে অত্যাচার শুরু করলে তিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে থাকেন। দেশের সাধারণ লোক যাতে শান্তি ও স্বস্তিতে থাকতে পারে সেটাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাঁর সিংহাসনের প্রতি কোন মোহ বা আকর্ষণ ছিল না। তিনি বার বার বলেছেন, সুদীপ্তা সিংহাসন অধিকার করে থাকুন কিন্তু সেই সঙ্গে প্রজাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করা তাঁর কর্তব্য। দেশে যে মাৎস্যন্যায়ের যুগ চলছে তার অবসান ঘটাবার জন্য তিনি দেশের যুবশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করেন।

কিন্তু সুদীপ্তা তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন না। শুধু তাই নয়, গোপালদেবের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তিনি তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে চাইলেন। অবশ্য তিনি প্রতিবারই ব্যর্থ হন। ফলে শুরু হয় গোপালদেবের সঙ্গে সংঘাত। কিন্তু গোপালদেব কোন প্রতিহিংসার পথ না নিয়ে রাণীকে বার বার ক্ষমা করেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের ঔদার্য ও বিশালতা প্রমাণিত হয়।

গোপালদেব নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যেখানেই নারী অত্যাচারিত হয়েছে সেখানেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে অত্যাচারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিধু প্রধানের সুন্দরী যুবতী কন্যা সোমার কাহিনী স্মরণীয়। এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে রাণী সুদীপ্তাকে ক্ষমা করেছেন ও বারবার তাঁর ক্ষতি করা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে মা'র মর্যাদা দিয়ে তাঁর কাছে রাখতে চেয়েছেন। ভিক্ষুণী দেদ্দাকে রাণীর মর্যাদা দানের মধ্য দিয়ে ত্রাণকর্ত্রী দেদ্দার প্রতি গোপালদেবের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাই প্রকাশিত হয়েছে।

গোপালদেব ধীর শান্ত প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু প্রয়োজনে তিনি যে কঠোর হতে পারেন তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। তাই তিনি যেদিন জানতে পারেন, সুদীপ্তা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাঁর প্রেমিকা নিরপরাধ দেদ্দাকে বন্দী করে অত্যাচাব কবছেন সেদিন তিনি ক্রোধে গর্জে উঠলেন—

"না—না—অন্যায় করে যে—আর সেই অন্যায় সয় যে—দুজনেরই সমান অপরাধ। আমি রাণীর শত্রু হ'তে চাইনি। নারীর শত্রু হ'তে আমি ঘৃণাবোধ করি। কিন্তু জেনে শুনে রঙ্গ দেখবার জন্য মহরাণী মৌচাকে খোঁচা মেরেছেন। যে মৌচাকে তাঁর জন্য মধু সঞ্চিত ছিল— এবার তিনি তার হুলের স্বাদ পাবেন। চল্ গোবিন্দ ডাক্ ভৈরবকে। সবাই মিলে এগিয়ে চল্। দেদ্দাকে অসহায় মনে ক'রে যদি নির্যাতন করবার জন্য রাণী ধরে নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে আজ তিনি বুঝতে পারবেন যে, রাণীর আসনে বসে নিজের খেয়াল নিয়ে খেলা করা চলে না, তাতে রাণী রাণী খেলারই শেষ হয়। আয় গোবিন্দ।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

এবং সেদিনই ক্ষুব্ধ গোপালদেব রাজবাড়ীতে গিয়ে রাণীকে সিংহাসনচ্যুত করে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এ ব্যাপারে তিনি জনতার পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন।

গোপালদেব আত্মসচেতন রাজা ছিলেন। এই সচেতনতাই জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। গোপালদেব কর্তৃক মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত সুদীপ্তাকে বাঁচাবার জন্য মহারাণী দেদ্দা আমরণ অনশনের সংকল্প নেবার কথা ঘোষণা করলে অনমনীয়, কঠোরস্বভাব সুদীপ্তা তাঁর মহত্বে অভিভূত হযে প্রথম মাথা নত করলেন। গোপালদেব সুদীপ্তাকে ক্ষমা করলেন কিন্তু তিনি আত্মসমীক্ষা করে দেখলেন, তিনি যেন জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছেন। সুশাসন করতে গেলে প্রচলিত রাজনীতির কঠোর নিয়মের বাইরে যে একটি নীতি প্রয়োগ করতে হয়— সেটি হল প্রেম ভালবাসা দিয়ে শত্রুকে জয় করা। তাঁর মনে হল, সেদিনের বিচারে তিনি তা প্রদর্শন করতে পারেননি। এই ঘটনার পর তিনি নাবালক পুত্র ধর্মপালকে সিংহাসন দিয়ে রাজ্যত্যাগ করে দূরে চলে যেতে চাইলেন—

"পুত্র ধর্মপালকে আনতে লোক পাঠিয়ে দে। ....এই রাজা রাজা খেলা আর ভাল লাগছে না।" (চতুর্থ অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

গোপালদেব-এ বহির্দ্বন্দ্ব রয়েছে। সোমাকে নীলু চক্রবর্তীর হাত থেকে রক্ষা করা, সুদীপ্তা গোপালদেবের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করলে তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া, সুদীপ্তাকে সিংহাসনচ্যুত করা, সীমান্ত রাজ্যের বিদ্রোহী রাজা রঘুবর্মা ও সুদীপ্তার মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংঘাতের মধ্য দিয়ে এই বহির্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত।

গোপালদেবের মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকায় তিনি সক্রিয় চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তাঁর বিভিন্ন কার্যাবলীই এর প্রমাণ। গোপালদেব বহির্মুখী চরিত্র হওয়ায় তাঁর নানা মানসিকতা, ভাবনাগুলি বাইরের কাজকর্মের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

গোপালদেবের মধ্যে অধিশাস্তা/অধিসত্তা প্রধান হয়ে ওঠায় তিনি স্থূলবাসনা কামনাকে দূরে সরিয়ে রেখে উচ্চাদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন।

মাইকেল মধুসূদন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত : অপরিণামদর্শী মানুষের জীবন দুঃখময় হয়— এই মূল ভাবের অবলম্বন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সুতরাং তিনি উক্ত বিষাদান্ত নাটকের প্রধান চরিত্র।

মধুসূদন যশোহরজেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ী গ্রামের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। জন্মসূত্রে তিনি সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি মাতা জাহ্নবী দেবীর গভীর স্নেহ ও পিতা রাজনারায়ণ দত্তের অত্যধিক প্রশ্রয়ে বড় হয়ে ওঠেন। পিতার অনমনীয় মনোভাব পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। বংশানুগতি ও সামাজিক কারণে তিনি মনের দিক থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অমিতব্যয়ী, উচ্ছৃঙ্খল ও অনন্য মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন।[৬০]

অত্যন্ত প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত হওয়ায়, কোন বিষয়ে বাধা না পাওয়ায় এবং নিজের কবিত্বশক্তি সম্পর্কে প্রবল আস্থা থাকায় তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিলেন।[৬১] শেলী কীট্স বায়রণের মত কবি হতে হবে এবং সেজন্য তাঁকে তাঁদের দেশ ইংল্যান্ডে যেতে হবে এটি ছিল তাঁর স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্ন সফল করার জন্য পিতামাতার মনে তীব্র আঘাত দিয়ে খ্রীষ্ট-ধর্মগ্রহণ করলেন। এই অপরিণামদর্শিতা তাঁকে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন করল। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে তিনি পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন। যে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্ররোচনায় তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরাও শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড যাওয়ার অর্থ না দেওয়ায় তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন ব্যর্থ হল। পরে অবশ্য তিনি নিজের চেষ্টায় লন্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়তে যান। পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য তাঁকে অত্যন্ত আর্থিক কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করতে হয়। অবশ্য পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতার সম্পত্তি লাভ করেন। তবুও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য তাঁর কোনদিন দারিদ্র্য ঘোচেনি।

অমিতব্যয়িতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও অত্যন্ত ব্যয়ের জন্য আমৃত্যু তাঁকে ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। তবে বিদ্যাসাগরের আর্থিক সাহায্য তাঁকে নানা সামাজিক অপমান, অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করেছিল।

বাধাহীন জীবনযাপনে বিশ্বাসী মধুসূদন অতিরিক্ত মদ্যপান, বেহিসেবী দিনযাপনে তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিলেন এবং মাত্র উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।[৬২]

জ্ঞানস্পৃহা তাঁকে নূতন নূতন ভাষাশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছে। তাই তিনি শত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অজস্র ভাষা শিখেছেন। যেমন, বাংলা, ইংরেজী, হিব্রু, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত, ল্যাটিন, জার্মানী, ইটালী, পর্তুগীজ।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হওয়ায় তিনি বাংলা ভাষায় শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য ; ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনের মত অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।

প্রবল আত্মসম্মানবোধ, আত্মবিশ্বাস ও বংশগত কারণে তিনি অনমনীয় মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তাই যেদিন রাজনারায়ণ দত্ত খ্রীষ্টধর্মগ্রহণ করার অপরাধে তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র হিসেবে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন, সেদিন তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন—

"আমি জানি, আমি কোন অন্যায় করিনি। খ্রীষ্টান হ'য়ে—আমি যে অসাধারণ—সেটাই প্রমাণ করেছি। আজ যেভাবে আপনি আমাকে অপমান ক'রে নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন—সামনেই এমন দিন আসবে—যেদিন আপনি আমাকে ছেলে বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করবেন।" (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

মা'র প্রতি মাইকেলের ছিল গভীর ভালবাসা, আর পিতার প্রতি প্রবল অভিমান। তাই পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হবার পর প্রতিটি দিন তিনি মার জন্য সুতীব্রবেদনা অনুভব করেছেন। অভিমানী মধুসূদন অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও পিতৃপ্রেরিত অর্থগ্রহণ করেননি।

মধুসূদনের জীবনে বহু বহির্দ্বন্দ্ব এসেছে। মদ ত্যাগ না করার অপরাধে রেভারেন্ড কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কন্যা দেবকীর সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহ দিতে সম্মত না হলে তাঁর সঙ্গে মধুসূদনের সংঘাত হয়। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা নিয়ে পিতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব, বিলাত গমনের জন্য তাঁকে ক্রুদ্ধ পিতার অর্থদানে অস্বীকৃতি, পরবর্তীকালে অভিমানে মাইকেলের রাজনারায়ণপ্রেরিত অর্থ প্রত্যাখ্যান, পিতা কর্তৃক মাতা জাহ্নবীর মৃতদেহ মধুসূদনকে দেখার অনুমতি না দেওয়া, প্রথমা স্ত্রী রেবেকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ—এগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর বহির্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত।

মধুসূদন প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সক্রিয় চরিত্র। অসাধারণ মানসিক শক্তি বলে তিনি অধিকাংশ সামাজিক বাধাবিপত্তি ও অসুবিধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নানা ধরণের বিরুদ্ধশক্তি তাঁর প্রাণের রসপ্রবাহকে নিঃশেষ করতে পারেনি। উপরন্তু প্রতিকূল শক্তির আঘাতে তাঁর কবিমন শতধারায় উৎসারিত হয়ে উঠেছিল।

মধুসূদন উভয়মুখী চরিত্র হওয়ায় একদিকে তিনি যেমন নিজের বিশ্বাস ও মতকে কার্যে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন অন্যদিকে কখন কখন সকলের থেকে দূরে সরে গিয়ে মনের গহনে ডুবদিয়েছেন।

মধুসূদনের মধ্যে অহম্‌ভাব প্রবলভাবে থাকায় তিনি নিজের মতামতকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

কালভৈরব/ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : মানুষের অবিশ্বাসী মন, সাধকের সান্নিধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়ে ওঠে—গিরিশচন্দ্র ঘোষকে কেন্দ্র করে এই ভাব প্রস্ফুটিত হওয়ায় তাঁকে নাটকের মূল চরিত্র বলা যায়।

গিরিশচন্দ্র মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি অভিনেতা। দেশে হিন্দুধর্মের যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল সেই সামাজিক পটভূমিকায় তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। এই বংশানুগতি ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়।

নাটকের সূচনাতেই গিরিশচন্দ্রের মানসিক অস্থিরতা দেখানো হয়েছে। তিনি এমন একজন গুরুর সন্ধান করছেন যিনি ভবযন্ত্রণা ও মানসিক অতৃপ্তি থেকে মুক্তির পথ বলে দেবেন।[৬৩] কিন্তু তিনি কাউকে আবেগের বশে গুরু বলে মানতে রাজী নন। যিনি তাঁর ঈশ্বর-অবিশ্বাসী মনে উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবেন তাঁকেই তিনি গুরুপদে বরণ করবেন বলে স্থির করেছেন। তাই রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে গুরু বলে স্বীকার করতে পারেননি। অনেক পরীক্ষার পর তাঁর মনের সংস্কার দূর হয় এবং শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণকে গুরু বলে স্বীকার করেন।[৬৪] এবং তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেন—

"পরশ পাথর এমন একটা বস্তু যে যখন তখন যেখানে সেখানে তা পাওয়া যায় না। কত জন্ম ঘুরে তবে দৈবাৎ একটির খোঁজ পাওয়া যায়। এই জন্মে সেই খোঁজ পেয়েছি।" (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

নাটকের শুরু থেকে গিরিশচন্দ্রের এই মানসিক রূপটি লক্ষ্য করা যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সত্যই সাধক কিনা এবং তাঁকে গুরুপদে বরণ করা যাবে কিনা সেই সংশয় গিরিশচন্দ্রের মানসিক জগতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় তিনি কখনো রামকৃষ্ণকে দোষারোপ করেছেন—

"ভক্তের মনোবাঞ্ছাই যদি পূর্ণ করতে না পারো তা হ'লে কোন কলার সাধু তুমি।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

আবার মাঝে মাঝে তাঁর গাঢ় অভিমান বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়েছে—

"ওঁকে তোমরা গুরু ব'লো না। গুরু হবার যোগ্যতা ওঁর নেই। তোমাদের গেরুয়া পরিয়েছেন। উনি নিজে গেরুয়া পরেন না কেন? সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসীর কোন লক্ষণ ওঁর মধ্যে নেই। ......এখনো বামুন শূদ্দুরের ভেদজ্ঞান যায়নি তোমার মন থেকে— পরমহংস হয়েছো? যাও আর কোনদিন আমার সামনে এসো না।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

ঠাকুর রামকৃষ্ণকে নানাভাবে আঘাত করে তিনি কিন্তু নিজেও কম কষ্ট পান না। তিনি একবার সেই কারণে আত্মগ্লানিতে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করতে গিয়েছিলেন। (অবশ্য সেখানে রামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সে কার্যে বিরত হন)। তিনি রামকৃষ্ণের সাধকসুলভ মহানুভবতা ও সহ্যশক্তির পরীক্ষা করার জন্য দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে অসুস্থ রামকৃষ্ণের দরজার সামনে কয়েকজন থিয়েটারের মেয়ে নিয়ে মত্ত অবস্থায় নৃত্য করতে শুরু করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন রামকৃষ্ণ স্বয়ং দরজা খুলে তাঁদের সঙ্গে নৃত্যে যোগদান করলেন। সেদিনই গিরিশ পরমজ্ঞান লাভ করলেন— তাঁর মন সম্পূর্ণ রূপে ভগবৎমুখী হয়ে উঠল—

"নাচের তালে তালে অপরূপ ভঙ্গিমায় ঠাকুরের শরীর দুলছে—দুলছে—দুলছে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির দুলছে, হঠাৎ আমার মনে হল এই নাচের তালে তালে স্বর্গ দুলছে—মর্ত্য দুলছে, বিশ্বসংসার দুলছে। ঠাকুরের চরণ-দোলায় দুলছে নোটো গিরিশ ঘোষের জন্ম মৃত্যু, কামনা বাসনা। আলো-আলোয় আলোময় হয়ে উঠছে পৃথিবী।" (চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

গিরিশচন্দ্রের মধ্যে বিশেষ কোন দ্বন্দ্বের অবতারণা করা হয়নি। একবার তাঁর বহির্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। পরজন্মে তাঁর পুত্ররূপে রামকৃষ্ণ জন্মাবেন কিনা সে প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্ণ অসম্মতি জানালে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাঁধে। এছাড়া থিয়েটারের দর্শনী হিসেবে পুরোপুরি রামকৃষ্ণের কাছ থেকে ষোল আনা আদায়ের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের অন্তরের জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়েছে। (এ ব্যাপারে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কোন দ্বন্দ্ব হয়নি)।

প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী সক্রিয় চরিত্র গিরিশচন্দ্র নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে নানারকম ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নানা বাধা ও মানসিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তাঁর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন এবং পরমগুরুর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

গিরিশ উভয়মুখী চরিত্র। তাই তিনি কখন তাঁর মনোভাবকে বিভিন্ন বাহ্যিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন এবং কখন স্তব্ধ হয়ে নিজের অন্তরে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন।

(খ) বিরোধী চরিত্র

মেঘমুক্তি

স্বপন রায় : স্বামী-স্ত্রীর (প্রদ্যোত-অণিমা) সংসারে অশান্তির মেঘ নিয়ে আসায় স্বপন রায়কে বিরোধী চরিত্র বলা যায়।

এক মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বপন রায়ের জন্ম। সে বিলেত ফেরৎ ডাক্তার, চাল-চলনে অত্যন্ত পরিচ্ছন্নযুবক। বিলেতে অবাধ নারীসঙ্গ লাভ করায় নারী সম্পর্কে তার একটা চারিত্রিক দুর্বলতা গড়ে উঠেছে। এই দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য তার মানসিকতা গঠনে সহায়তা করেছে।

নারী-হৃদয় জয় করার মধ্যে স্বপন আনন্দ পায়। সে কিছুদিন পূর্বে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে এসেছে। বর্তমানে তার বন্ধু প্রদ্যোতের সুন্দরী পত্নী অণিমার প্রেমলাভের আশায় সে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গল ধরাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে প্রদ্যোতের গীতা নামে এক অবিবাহিতা যুবতীর বাড়ী যাওয়া নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলে স্বপন সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজ কামনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। সে ক্রমাগত অণিমার কাছে প্রদ্যোত সম্পর্কে নানা মিথ্যা কথা বলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে আরো তিক্ত করে তোলে (যেমন, গীতার সঙ্গে প্রদ্যোতের অবৈধ সম্পর্ক, স্ত্রীর অন্তরালে প্রদ্যোতের মদ্য পান ইত্যাদি) শুধু তাই নয়, সে অণিমাকে স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে—

"আপনি তার প্রতি নির্মম হয়ে উঠুন। আপনি তাকে বুঝতে দিন যে তার ভিক্ষে দেওয়া প্রেম ছাড়াও আপনার দিন চলবে।" (মেঘসঞ্চার)

মিথ্যাভাষণ দান তার স্বভাবগত। সে নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সর্বত্র মিথ্যা কথা বলেছে (গীতাকে প্রদ্যোতের মদ্যপানের কাল্পনিক কাহিনী ও গীতার প্রেমিক বিজয়ের মিথ্যা পূর্ব-প্রেমের কাহিনী বর্ণন)। সে প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে সপ্রতিভ রাখতে পারত। তার উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। কোথায় কখন কিভাবে কথা বললে কার্যসিদ্ধি হবে সে কৌশল তার করায়ত্ত ছিল। পরিত্যক্তা স্ত্রী অপর্ণাকে অণিমার (অপর্ণা অণিমার বান্ধবী) বাড়ীতে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেও সে তার মানসিক চাঞ্চল্য কাউকে বুঝতে দেয়নি। শুধু তাই নয়, নিজ মনোভাব গোপন করে অনুতপ্ত স্বামীর মত অভিনয় করে

অপর্ণাকে তার কাছে ফিরে যাওয়ার কথা বলে। প্রয়োজনে সে যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে, তার প্রমাণ, অপর্ণা যখন তার কাছে যেতে অস্বীকার করে সে সময় তাব সব গুপ্তকথা প্রকাশিত হওয়ার ভয়ে সে অপর্ণার গলা চেপে ধরে। অবশ্য অপর্ণা বাধা দিলে সে নিরস্ত হয়।

যে কোন পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার মত তার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। অপর্ণা অণিমার জন্মতিথিতে ভণ্ড, প্রতারক স্বপনের মুখোশ খুলে দেবার চেষ্টা করলে সে কাজেব অজুহাতে বিদ্যুৎবেগে সে স্থান ত্যাগ করে। কিন্তু দূরে চলে যাওয়ার পূর্বে জন্মদিন উপলক্ষে অণিমার শুভকামনা করে একটি চিঠি পাঠিয়ে দেয়। এই বেপরোযাভাব ও দুঃসাহসিক কাজকর্ম স্বপন রাযকে সজীব করে তুলেছে।

প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন স্বপন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নানা বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করে গেছে। এই সক্রিয় চরিত্রটি বহির্মুখী মনোভাবাপন্ন।

স্বপনকে ইদম্ (id) নিযন্ত্রিত করায় সে নিজের কামনা চরিতার্থ করতে নানাবকম ঘৃণ্য আচরণ করেছে।

মাটির ঘর

চঞ্চল ॥ সত্যপ্রসন্ন-সৃষ্ট মাটির ঘর ধ্বংস করার পশ্চাতে প্রধান ভূমিকা চঞ্চলের। তাই সে সত্যপ্রসন্নর বিরোধী চরিত্র।

সত্যপ্রসন্নর মধ্যমকন্যা নন্দার স্বামী চঞ্চল সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। অত্যন্ত শাসনহীনতার মধ্যে বড় হয়ে ওঠায় তার চরিত্রের মধ্যে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল। চরিত্রের এই দ্বিমাত্রিকতা চঞ্চলের মানসিক জগৎ গঠনে সহায়তা করেছিল।

অর্থের মাধ্যমে সে নারীসঙ্গ লাভ করত বলে সে কোন নারীকে শ্রদ্ধা করতে শেখেনি। নারী তার কাছে ভোগের বস্তু ব্যতীত কিছু নয়। নারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করে সে একধরণের বিকৃত আনন্দ লাভ করত। তাই শিক্ষিতা, রুচিসম্পন্না নন্দাকে পীড়ন করে সে তার পৌরুষ প্রদর্শনের চেষ্টা করত। তার অত্যাচার চরম অবস্থায় পৌঁছলে নন্দা পিত্রালয়ে চলে আসে। এর ফলে চঞ্চল নিজেকে চরম অপমানিত বোধ করে ও নিজের অধিকার বলে তাকে স্বগৃহে নিয়ে আসতে চায়—

"বেত মেরেছি—তাই খুকুমণির রাগ হয়েছে। মেরেছি তার হবে কি ? .....আচ্ছা, তোমার এই অবাধ্যতার শাস্তি আমি দেবই, এখন নয়—আগে নিয়ে যাই। তুমি এটা ঠিক জেনো, তোমাকে নিয়ে আমি যাবই।" (দ্বিতীয় দৃশ্য) শুধু তাই নয়, সে পিতৃপ্রতিম সত্যপ্রসন্নকে অপমানের চূড়ান্ত করে এবং শেষ অস্ত্র হিসেবে সে বিষ পাঠিয়ে নন্দাকে আত্মহত্যা করার নির্দেশ দিলে দুঃখের ভার সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে নন্দা বিষপানে

আত্মবিসর্জন দেয়। এই আত্মহত্যার সংবাদেই তন্দ্রা মানসিক ভারসাম্য হারায়। এদিকে নন্দার আত্মহত্যার সংবাদে সত্যপ্রসন্নর কনিষ্ঠ কন্যা ছন্দার প্রেমিক উৎপল পিতার নির্দেশে তাকে বিবাহ করতে অসম্মত হয়। এইভাবে চঞ্চল সত্যপ্রসন্নর মাটির ঘর বিধ্বস্ত করার পথ সুগম করেছে।

চঞ্চল অন্তর্দ্বন্দ্বহীন। সে নন্দা, সত্যপ্রসন্ন ও অলকের সঙ্গে বহির্দ্বন্দ্বে যুক্ত হয়েছে। নন্দার চঞ্চলেব সঙ্গে গৃহে যাওয়ার অস্বীকৃতি ও সত্যপ্রসন্নর অসম্মতি, নন্দার ব্যাপারে চঞ্চলের সঙ্গে কল্যাণ ও অলকের সংঘাত, চঞ্চলের স্বয়ং বিষ পাঠিয়ে নন্দাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার সংবাদ আবিষ্কৃত হলে অলকের সঙেগ সংঘর্ষ-এর মধ্য দিয়ে এই বহির্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত।

প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী চঞ্চল সক্রিয়ভাবে তার ভূমিকা পালন করেছে।

চঞ্চল বহির্মুখী চরিত্র। তার মনোভাব বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে সে প্রকট করেছে।

চঞ্চলের মধ্যে ইদম্ প্রাধান্য লাভ কবায় সে আত্মসুখ ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তা করেনি।

বিশ বছর আগে

প্রদীপ : কেন্দ্রীয় চরিত্র দীপকের সব কাজে বিরোধিতার সৃষ্টি করায় প্রদীপকে বিরোধী চরিত্র বলা যায়।

প্রদীপ জমিদার-সন্তান। প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়ে ওঠায় ও কোন ব্যাপারে বাধা না পাওয়ায় সে অসংযমী হয়ে ওঠে। যুবক হয়ে জমিদারী লাভ করার পর সে অর্থের দ্বারা সবকিছু করায়ত্ত করতে চেয়েছিল। চরিত্রের এই দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য তার চিন্তাধারা তথা জীবনযাত্রাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

নাট্যকাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সহপাঠিনী তমসা ও সহপাঠী-বন্ধু দীপকের পরস্পরের প্রতি অনুরক্তির কথা জেনেও সে তমসাকে বিবাহ করতে চায় (প্রদীপ স্বয়ং বিবাহিত—সে সংবাদ সে গোপন করেছিল) এবং তমসাকে লাভ করতে না পারার ব্যর্থতায় সে ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে।[৬৫] শুধু তাই নয় এই মনোভাব তাকে দীপকের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। সে একটির পর একটি ঘটনা ঘটিয়ে দীপকের জীবনে বাধার সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। যেমন, দীপকের রোজগারের পথ বন্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা ("আমি থিয়েটার তুলে দিয়েছি শুধু দীপককে জব্দ করবার জন্য।"— পঞ্চম দৃশ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য দীপক প্রদীপের থিয়েটারে অভিনয় করত)। দীপকের স্নেহের পাত্রী তন্বীকে (তন্বীকে দীপক পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করলে তন্বী তাকে স্বামীজ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করত) অপহরণ করে বাগানবাড়ীতে আনয়ন।

উপরিউক্ত কার্যের জন্য সে বহির্দ্বন্দ্বে নিজেকে লিপ্ত করেছে। প্রদীপের মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকায় সে নিজকার্য সিদ্ধির চেষ্টায় বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়েছে। এজন্য তাকে সক্রিয় বিরোধী চরিত্র বলা যায়। প্রদীপ বাহ্য আচরণ দ্বারা তার মনোভাব ব্যক্ত করায় সে বহির্মুখী চরিত্র।

প্রদীপ ইদম্ দ্বারা চালিত হয়ে জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়েছিল।

মালা রায়

মিঃ সেন : নাটকের মূল চরিত্র মালা রায়ের জীবনের দুঃখময় পরিণতির জন্য মিঃ সেনের বিশেষ ভূমিকা থাকায় তিনি উক্ত নাটকের বিরোধী চরিত্র।

মিঃ সেন মালার অবৈধ পিতা। যদিও মালা দীর্ঘদিন সে কথা জানতে পারেনি। মালা জানত, মিঃ সেন তার মামা এবং সে মাতৃপিতৃহীন হওয়ায় তাকে মিঃ সেন লালন-পালন করেছেন। মালা মিঃ সেনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত এবং জীবনের শেষ আশ্রয় বলেও মনে করত। তাই নানা প্রতিকূল ঘটনায় সে যখন অত্যন্ত মানসিক কষ্ট পাচ্ছিল সে-সময় শান্তির আশায় মিঃ সেনের কাছে ছুটে আসে। কিন্তু সেখানে সে নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হয় এবং জানতে পারে মিঃ সেন ও তাঁর বিধবা শ্যালিকার অসামাজিক মিলনের ফলে তার জন্ম। মালা এত বড় আঘাত সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

এইভাবে মিঃ সেন মালার জীবনে অবাঞ্ছিত দুঃখ ডেকে এনে তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিলেন।

মিঃ সেনের মধ্যে ইদম্-শক্তি ক্রিয়াশীল হওয়ায় তিনি এই ধরণের বিবেচনাহীন অসামাজিক কাজ করেছিলেন।

কুহকিনী

বিপ্রদেব : বিপ্রদেব নাটকের প্রধান চরিত্র রত্নার বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁকে বিরোধী চরিত্রের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

অনার্যদেশ কামরূপের অধিবাসী বিপ্রদেব তন্ত্রসিদ্ধ পুরোহিত। তিনি অন্তর্যামী ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলে সে দেশের লোকের বিশ্বাস। বিপ্রদেবের মধ্যে মানবিক বৃত্তির লেশমাত্র নেই।

বিপ্রদেব তন্ত্রবলে সেইদেশের রাণীদের মন থেকে নারীসুলভ কোমলতা মুছে দিয়ে তাঁদের কঠিন-হৃদয় নারীতে রূপান্তরিত করতেন। যিনি তাঁর অবাধ্য হতেন তিনি তাঁকে কঠোর শাস্তি দিতেন। তিনি ক্ষমাহীন। একবার এক রাণী (বর্তমান রাণী রত্নার পূর্ববর্তিনী) কথায় কথায় বলেছিলেন—

"এ জীবন আমার ভাল লাগে না। সে কথা অন্তর্যামী বিপ্রদেব জানতে পারেন। তার ফলে রাণীকে তিনদিন বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা সহ্য করতে হয়।" (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য) এবং বর্তমান রাণী কাঞ্চীরাজপুত্র জয়ন্তব প্রেমে পড়লে ক্রুদ্ধ বিপ্রদেব তাঁর আদেশ অমান্যকারী রাণীকে চরম শাস্তি দেন—মৃত্যুদণ্ড।

বিপ্রদেব অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাই রত্না তাঁর সহচরী শীলার সহায়তায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে জয়ন্তসহ পলায়নে সক্ষম হলে তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কাঞ্চীদেশে গমন করেন (রত্না কাঞ্চীরাজ্যে জয়ন্তর স্ত্রীরূপে অবস্থান করছিলেন) এবং রত্নাকে অপহরণ কবে কামরূপে নিয়ে আসেন। তিনি তাঁকে হত্যা করবেন বলে মনস্থির করেন। অবশ্য শীলাব সহায়তায় জয়ন্তর সহচর সুন্দর মহাকালীর পূজার নৈবদ্য উচ্ছিষ্ট করে দিলে বজ্রাঘাতে বিপ্রদেব মারা যাওয়ায় তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না।

বিপ্রদেবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব। সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দ্বারা তিনি সমগ্র কামরূপের প্রজাকে আপনার করতলগত করে রেখেছিলেন। রাণী রত্না সে রাজ্য ত্যাগ করলেও তাঁর অসীম শক্তিকে সর্বদা ভয় পেয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর অশুভ শক্তি যে তাঁর স্বামী ও স্বামীর রাজ্য ধ্বংস করতে পারে— এরূপ একটা প্রবল বিশ্বাস তাঁর ছিল।

বিপ্রদেব তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন বলে মা কালীর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল দেবী রুষ্ট হলে তাঁর সর্বনাশ অনিবার্য। তাই পুজোর নৈবেদ্য উচ্ছিষ্ট হওয়ায় নানারূপ বীভৎস চীৎকার শুনে তিনি আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন—

"আমার মায়ের পূজাকে অপবিত্র করে দিয়েছে— আমার সর্বনাশ করবার জন্য কে এই কাজ করেছে ......মা—মা—সর্বসন্তাপহারিণী মহাকালী! সন্তানের অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জনা কর মা!" (চতুর্থ অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

বিপ্রদেব সর্বদা বহির্দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি বলে তিনি প্রবল প্রতাপের সঙ্গে সব কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে তিনি সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। বিপ্রদেব বহির্মুখী চরিত্র। তাঁর মধ্যে ইদম্ বিশেষভাবে কার্যকরী হওয়ায় তিনি নানাধরণের ভয়ঙ্কর কাজ করেছেন।

রক্তের ডাক

এই নাটকে কোন চরিত্র শতাব্দীর (প্রধান চরিত্র) স্পষ্ট বিরোধিতা করেনি। তবে শাশুড়ী, ননদ ও স্বামী তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদের অত্যাচারে শতাব্দী একদিন বাল্যবন্ধু শুভেশের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। পরবর্তীকালে অভিনেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থের লোভে শ্বশুরকুল তার জীবন বিড়ম্বিত করার চেষ্টা করলে সে চিরদিনের মত তার গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেয়।

আবার শতাব্দীর সংস্কার (সামাজিক) তাকে জীবনের অভিষ্ট প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। সে বিবাহিতা তাই স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে (শুভেশ) ভালবাসলেও তাকে বিবাহ করতে পারেনি। তাছাড়া উভয়ের জাতগত ভিন্নতাও তার মনে বাধার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং এখানে মনের সংস্কারও শতাব্দীর বিরোধী শক্তিরূপে কাজ করেছে।

তাইতো

এই নাটকে প্রধান চরিত্রের বিরোধী চরিত্ররূপে কাউকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না।

তেরশো পঞ্চাশ

প্রাকৃতিক শক্তি এখানে বিরুদ্ধ শক্তিরূপে চিত্রিত হয়েছে। বন্যায় কেন্দ্রীয় চরিত্র তারিণীর ঘরবাড়ী জমি ধন-সম্পদ ভেসে যাওয়া, কলকাতায় অসহায় অবস্থায় অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটানো এবং শেষ পর্যন্ত গাড়িচাপা পড়ে তাঁর মৃত্যুতে প্রাকৃতিক শক্তি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

খবর বলছি

ভবতোষ : বিশেষভাবে কোন শক্তিশালী চরিত্রকে নাট্যকার বিরোধী চরিত্ররূপে দাঁড় করাতে পারেননি। তবে ভবতোষ নামে এক ব্যক্তির কার্যকলাপ দীপার (প্রধান চরিত্র) জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

ভবতোষ অসৎ, চোরাকারবারী ও নারী ব্যবসায়ে জড়িত। দেশে উদ্বাস্তু সমস্যার সময় অনেকে অর্থোপার্জনের জন্য অসহায় নারীদের নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। ভবতোষ সেই পথই বেছে নিয়েছিল। তাই সুন্দরী দীপাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনের উদ্বাস্তু শিবিরে দেখে সে তাকে নিজস্বার্থে ব্যবহারের পরিকল্পনা করে। সে বাড়ী দেখাবার ছল করে দীপার স্বামী চন্দ্রমোহনকে দীপার কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। যদিও শেষ পর্যন্ত দীপার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য সে তাকে করায়ত্ত করতে পাবেনি। কিন্তু এর ফলে দীপার জীবনে নেমে আসে ঘন দুর্যোগ।

ভবতোষ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অকৃতজ্ঞতা। সে একবার দীপার দেবর অনাথের সঙ্গে চন্দ্রমোহন-দীপার বাড়ীতে দুর্গোৎসব দেখতে যায় ও অত্যন্ত যত্ন ও আপ্যায়নের মধ্যে সেখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসে। অথচ দীপার দৈব বিপর্যয়ে সে তাকে সহায়তা করার পরিবর্তে তার সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করে। তার ষড়যন্ত্রে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় দীপাকে একটির পর একটি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যেমন, অসৎ শিপ্রা ও মহাদেবের ফাঁদ, আশ্রয়দাতা বরেন মিত্রের স্ত্রী অরুন্ধতীর চক্রান্তে মদ্যপ লম্পট অনুপমের সঙ্গে যেতে বাধ্য হওয়া, জীবনধারণের জন্য একটি বাড়ীতে রাঁধুনীর চাকরী গ্রহণ, সে বাড়ীর ছোটবাবুর কুদৃষ্টি পড়ায় সে চাকরী ত্যাগ, দীর্ঘদিনের অর্ধাহার অনাহার ও স্বামীর চিন্তায় দেহমনে ভাঙ্গন ও দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়া। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুব মধ্য দিয়ে তার জীবনের চবম পরিণতি নেমে এসেছে।

ভবতোষের মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। তাই সে বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে দীপার জীবনকে দুঃখভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। ভবতোষ বহির্মুখী চরিত্র।

ইদম্ ভবতোষকে চরম স্বার্থপরে পরিণত করেছিল।

অন্ধদেবতা

রায়বাহাদুর পি. পি. : রায়বাহাদুর পি. পি. নাট্যকাহিনীতে বিরোধী চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছেন।

স্বার্থপরতা, মিথ্যাচারিতা, অসাধুতা, নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চণা পি.পি.'র চারিত্রিক বিশিষ্টতা। তাই ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে যেদিন বাল্যবন্ধু ও ব্যবসায়ী রায়বাহাদুর ডি.ডি.কে তার বিপজ্জনক বলে মনে হল সেদিন তিনি তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। একই ভাবনার বশবর্তী হয়ে প্রশমনকে (তিনি প্রশমনকে দিয়ে ডি.ডি.কে হত্যা করিয়েছিলেন) চুক্তি অনুসারে পাঁচ হাজার টাকা দেন এবং সেই টাকা ফেরৎ পাওয়ার জন্য পূর্ব পরিকল্পনামত তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবার নির্দেশ দেন।

এ ধরণের চরিত্র সাধারণতঃ নিজের অবৈধ গোপন কাজের সাক্ষী রাখতে চান না। পি.পি.-ও সেই কারণে তাঁর অন্যায়ের সাক্ষী প্রশমনকে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে হত্যা করেন। অবশ্য হত্যাপরাধে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য

তিনি যে কোন নীচ ও নিষ্ঠুর কাজ করতে সঙ্কোচবোধ করেননি। প্রশমনের একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি সে কথাই বলেছেন—

"হত্যা করিয়েছি আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। হত্যা করিয়েছি তোমার মত fool-কে ফাঁসীকাঠে ঝোলাবার জন্যে আর বিজনের মত একটা idiot-কে fool বানাবার জন্যে।" (ত্রয়োদশ দৃশ্য)

পি. পি. র মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি কাজ কবায তিনি নিজকার্য সিদ্ধির জন্য নানা অসামাজিক আচরণ করে গেছেন। যদিও নাটকের একটি স্থান ব্যতীত তাঁর কোথাও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, তবু তিনি-ই পরোক্ষে সব কিছু চালনা করেছেন। তাঁর-ই নির্দেশে সব কাজ সংঘটিত হয়েছে। পি. পি. নিঃসন্দেহে বহির্মুখী চরিত্র।

পি.পি.র মধ্যে ইদম্ ভাব প্রবল হযে ওঠায তিনি কেবল নিজ বাসনা তৃপ্ত করারই চেষ্টা করেছেন।

সেই তিমিরে

অতনু : অতনু উক্ত নাটকের বিরোধী চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে।

অতনু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। সে সুপুরুষ, জাপান থেকে সদ্য পাশ করে ফিরেছে। তার মধ্যে প্রাণপ্রাচুর্য রয়েছে। সে অত্যন্ত সপ্রতিভ, যে কোন ব্যাপারে অংশগ্রহণে আগ্রহী। তার এই বৈশিষ্ট্যগুলি তার কর্মপন্থাকে প্রভাবিত করেছে।

সক্রিয়তা ও সহযোগিতার মনোভাব থাকায় সে তার বন্ধু রুদ্রেশ্বরের বিপদের দিনে এগিয়ে এসেছে। সেইজন্য সে রুদ্রেশ্বরের গৃহত্যাগী স্ত্রী স্বাহাকে ফিরিয়ে আনতে সংকল্প করে। এই কাজ সম্পন্ন করতে স্বাহা ও আনন্দবাবুর নাতনী শিপ্রা (আনন্দবাবু সম্পর্কে রুদ্রেশ্বরের দাদু) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'জাগরণী সম্মিলনী'র কেরাণীর চাকুরী নেয় ও আপন চাতুর্যে সেখানে অবস্থানকারী মহিলাদের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাহা ও শিপ্রাকে যথাস্থানে নিয়ে আসে। শুধু তাই নয়, শিপ্রার মন জয় করে তাকে ভবিষ্যতে আপন ঘরণী পদে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি সে আদায় করে।

অতনু তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক। তাই সে গৃহত্যাগী মহিলাদের গৃহমুখী করার জন্য স্ত্রী পরিত্যক্ত স্বামীদের নিয়ে 'স্বামী সংরক্ষণ সংসদ' গঠন করে ও সেখানে সে তার পরিকল্পনামত কাজ করে। যেমন, স্ত্রীদের সব খবর স্বামীদের জানানো, স্ত্রীদের বাড়ী ফিরিয়ে আনার জন্য প্রত্যেক সদস্যের স্ত্রীকে সেই সদস্যের নাম করে চিঠি লেখা।

অতনুর মধ্যে রসবোধ ও সঙ্গীতপ্রিয়তা ছিল। তাই সে কথায় কথায় সরস মন্তব্য করত ও মাঝে মাঝে গানের সুরে যেসব কথা পরিবেশন করত (যেমন, "সখিলো, বলিতে বিদরে হিয়া/আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া/বিয়ে-করা বউ সাথে ফেরে কেউ—আমারি গাড়ীটা নিয়া"—ইত্যাদি)।

অতনু নিজ কার্যসিদ্ধির জন্য জাগরণী সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট শিপ্রা, সেক্রেটারী স্বাহা ও অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে বহির্দ্বন্দ্বে নিযুক্ত হয়। সে প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিজ পরিকল্পনামত কাজ করে গেছে ও কৃতকার্য হয়েছে।

অতনু বহির্মুখী ও অহম্‌বোধ সম্পন্ন চরিত্র— তার কর্মসূচিই এর প্রমাণ।

পিতাপুত্র

সমীর : সমীর তার বিভিন্ন কার্যাবলীর দ্বারা পিতা প্রদীপ্তর (মূল চরিত্র) স্বাভাবিক জীবনধারাকে ব্যাপৃত করে পরোক্ষে তার অসুবিধার সৃষ্টি করায় তাকে বিরোধী চরিত্র বলা যায়।

সমীর উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান। সে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে। সে শিক্ষিত ও কিছুটা বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন। তার মনোজগতে অ-সাধারণ কোন কাজ করার প্রবণতা গড়ে ওঠায় সে বেপরোয়া ও বেহিসেবী হয়ে ওঠে।[৬৬] তার এই ধরণের আচরণ পিতার মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুন্দরী স্ত্রী তাকে সংসারে বেঁধে রাখতে পারেনি। সব ত্যাগ করে সে বিশেষ একটি ব্রতে (দলনেতার নির্দেশে ধনী ব্যক্তিদের অর্থ লুট করে মধ্যবিত্তদের বিলিয়ে দেবার ব্রত) নিজেকে নিয়োজিত করে। সেই ব্রত সাধনের জন্য সে সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পরোক্ষে পুলিশ অফিসার-পিতা প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধশক্তিতে পরিণত হয়।

ডাকাতদলের মধ্যে পুত্রকে আবিষ্কার করে প্রদীপ্ত মানসিক আঘাত পান। সমীরের অবিমৃষ্যকারী কাজের জন্য প্রদীপ্তর জীবনে করুণ পরিণতি নেমে আসে (মুখোশধারী পুত্রকে চিনতে না পেরে নিজ হাতে হত্যা ও প্রকৃত পরিচয় জানার পর স্নেহশীল পিতার হাহাকারে ভেঙ্গে পড়া)। এইভাবে সমীর পরোক্ষে প্রদীপ্তর বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সমীর নিজ পরিকল্পনা ও মতানুযায়ী কাজ করেছে। আইন বা সমাজ তাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি।

সে সর্বদা বহির্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। তবে যে ব্যক্তির নির্দেশে সে ডাকাতি করত, সেই ব্যক্তি প্রতারক বলে প্রমাণিত হলে সে মনে নিদারুণ আঘাত পায়।

সমীর মূলতঃ বহির্মুখী চরিত্র। অহম্ শক্তি সমীরের মধ্যে বিশেষ ভাবে কাজ করেছে ও তার জীবনধারাকে পরিচালিত করেছে।

ক্ষুধা

ক্ষুধা : ক্ষুধা মূল চরিত্র রমেনের বিরুদ্ধশক্তির ভূমিকা নিয়েছে।

নাট্যকাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রমেন ক্ষুধার জ্বালায় দিনের পর দিন চাকরীব সন্ধান করে বেড়িয়েছে, অনেক সময ইচ্ছাব বিরুদ্ধে প্রেমিকা মানবীর কাছ থেকে খাদ্যগ্রহণ করেছে, একবার অনিমন্ত্রিত অবস্থায় বন্ধুদের সঙ্গে উৎসব বাড়ীতে খেতে গিয়ে অপমানিত ও প্রহৃত হয়েছে।

এই ক্ষুধার কালগ্রাসে পড়ে মানবী নিজের দেহের রক্ত বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। ফলে রমেন মানবীর সঙ্গে ঘর বাঁধার সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং ক্ষুধা এই নাটকে একটি প্রতিশক্তিরূপে কাজ করেছে।

তোমাব পতাকা

বিভূতি ভড় : বিভূতি ভড় প্রধান চরিত্র অনুকূল বিশ্বাসেব বিরোধী চরিত্ররূপে নাটকে অবতীর্ণ হয়েছেন।

বিভূতি ভড় পুলিশ ইন্সপেক্টর। তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে কাজ করেন ও পদোন্নতির আশায় যে কোন কাজ করতে ইতঃস্তত করেন না। প্রয়োজনে তিনি নিষ্ঠুর কাজ করতে কুণ্ঠিত হন না। আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক অনুকূল ও তাঁর অনুগামীদের শায়েস্তা করার জন্য ইংরেজ সরকার গ্রামে সৈন্য পাঠালে তাদের খাদ্য সরবরাহ করতে তিনি গৃহস্থ বাড়ীর ধান চাল জোর করে কেড়ে নিয়ে যান। অনুকূল বিশ্বাসও তাঁর অত্যাচার থেকে রেহাই পান না।

বিভূতি তাঁর বিভিন্ন কর্মের মধ্যে নীচপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রধান কাজই হল অনুকূলের বিরোধিতা করা। সেজন্য তিনি তাঁকে নানাভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছেন, বিপ্লবীদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেছেন।

বিভূতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। তাঁর মধ্যে কোমল অনুভূতির লেশমাত্র নেই। ইংরেজ সৈন্যের খাদ্য হিসেবে অনুকূল বিশ্বাসের গাভীটি তাঁর কাছে দাবী করলে অনুকূল বিশ্বাস বলেন, গাভীটি অন্তঃসত্ত্বা সুতরাং ওটিকে যেন বিভূতি না নেন। বিভূতি সেই অনুরোধ অগ্রাহ্য করে বলেন—

"একদিন পর ওর কোন সত্ত্বারই অস্তিত্ব থাকবে না মশাই, তার অন্তর আর বাহির।" (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

—এ ধরণের উক্তি শুধু নীচতারই নয় অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনের পরিচয় বহন করে।

তবে তিনি কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে তাব করণীয় কার্য করে গেছেন। তিনি জানেন, ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরী করতে গেলে সরকারকে সন্তুষ্ট রাখতে স্ব-ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাঁকে অনেক অমানবিক কাজ করতে হয়। সরকার বিরোধী কাজ করলে তাঁকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে—সে কথা তিনি জানেন—

"নুন খাওয়ার মজা জানেন তো? গুণ গাওয়াটি যেমন বন্ধ করলেন — অমনি দেখবেন, এ যাবৎ যতখানি নুন গিলেছেন— সবটুকু ওঁরা বার করে নেবেন।" (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

অনুকূলের উদারতায় তাঁর অনুগামীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে অনুকূল নির্দেশিত কর্মসূচি (ইংরেজ কালেক্টরী অধিকার) ব্যর্থ করার চেষ্টাব পশ্চাতে এই মানসিকতাই কাজ করেছিল।

কিন্তু বিভূতির মনেও মাঝে মাঝে আত্মগ্লানি আসে। অনুকূল বিশ্বাসের বিরোধিতা করলেও তাঁকে মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারেন না এবং অনুকূলের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর নিজেকে অত্যন্ত ছোট বলে মনে হয়—

"আমি নিজেকে মানুষ বলি না। যদি কেউ বলে, আমি তাকে মিথ্যেবাদী বলবো। মানুষ বলবো এই বিশ্বাস মশায়ের মত মানুষকে।" (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

বিভূতির মধ্যে প্রবল কর্মপ্রচেষ্টা থাকায় তিনি কখনো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেননি ও কর্তব্যকর্মে অবহেলা করেননি। তিনি অত্যন্ত সক্রিয় চরিত্র।

বিভূতি অধিকাংশ সময় বহির্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। তিনি অনবরত অনুকূল বিশ্বাস ও অনুগামীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। চরিত্রটি বহির্মুখী হওয়ায় তাঁর চিন্তাভাবনা নানা বাহ্যিক আচরণের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

মন্দাক্রান্তা/জয়-পরাজয়

এই নাটকে স্বামী সৌমিত্রর আচরণ মন্দাকিনীর চিন্তা-ভাবনা ও প্রত্যাশার বিরোধিতা করেছে সত্য কিন্তু সৌমিত্র সক্রিয়ভাবে এই আচরণ করেনি। স্ত্রী মন্দাকিনীকে সঙ্গ দিতে না পারার মধ্যে সদাব্যস্ত নাট্য পরিচালক সৌমিত্রর ইচ্ছাকৃত বিরোধিতা নেই। হয়তো কিছু পরিমাণে উদাসীনতা ছিল যা মন্দাকিনীকে আঘাত করে ও চরম সিদ্ধান্ত নিতে প্ররোচিত করে। নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে মূল চরিত্র মন্দাকিনীর বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে তাকে স্পষ্ট সক্রিয় বিরোধী চরিত্র বলা যায় না।

অতএব

এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র দোলগোবিন্দ এত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী যে নাট্যকার তাঁর বিরুদ্ধে কোন চরিত্র দাঁড় করাননি। তাই কোন বিশেষ ব্যক্তিকে এখানে বিরোধী চরিত্রের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না।

এন্টনী কবিয়াল

জয়গোপাল : জয়গোপাল প্রধান চরিত্র এন্টনীর জীবনে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করায় তাঁকে বিরোধী চরিত্র বলা যায়। ইনি কাল্পনিক চরিত্র।

জয়গোপাল ব্রাহ্মণ, গ্রামের সমাজপতি। এ দুটি কারণে তাঁর মধ্যে বিশেষ মানসিকতা গড়ে উঠেছিল।

জাত্যাভিমান তাঁকে নানা দোষদুষ্ট করে তুলেছিল। সমাজপতি হওয়ার জন্য অন্যের প্রতি ক্ষমতা প্রদর্শন তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—

"আমরা বামুন— সে খেয়াল আছে? আমি এখানকার সমাজপতি, সে খেয়াল আছে? দৈনিক দুবেলা পথ দিয়ে যেতে আসতে শত খানেক লোক পায়ের ওপর মাথা রেখে পেয়াম করে— সে খেয়াল আছে।" (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

তাই ফিরিঙ্গি এন্টনীর সঙ্গে তাঁর বিধবা ভাইঝি সৌদামিনীর প্রেমের খবরে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ও জাতের দোহাই দিয়ে সৌদামিনীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করে দেন। শুধু তাই নয়, এন্টনী বিতাড়িত সৌদামিনীকে বিবাহ করলে তিনি নানাভাবে তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করেন। যেমন, বিবাহরাত্রে এন্টনীর আটচালা ঘরে আগুন লাগান, এন্টনীকে একা পেয়ে লোকজন দিয়ে তাঁকে প্রবল প্রহার, শ্রীরামপুরের গোঁসাই বাড়ীর গানের আসরে এন্টনীকে অপদস্থ করার জন্য গোরক্ষনাথকে প্ররোচনা।

নীচতা জয়গোপাল চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি পুরুষশাসিত সমাজে নারীনির্যাতনকারীর মূর্ত প্রতীক। তাই এন্টনী বিধবা সৌদামিনীকে রক্ষিতা না করে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত—

"তুই ব্যাটা ফিরিঙ্গী, ম্লেচ্ছ—একটা বামুনের মেয়েকে ভালবাসলি। আচ্ছা বাসলি বাসলি, নিয়ে গিয়ে তাকে ইয়ে করে রাখ। তুইও সুখে থাক্ সেও সুখে থাক্। তা না, শালার হিন্দুধর্মে মতি হল— বিয়ে করলো ....." (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

জয়গোপালের প্রবল ইচ্ছাশক্তি তাকে প্রত্যক্ষভাবে এন্টনীর সঙেগ সংঘর্ষে লিপ্ত করেছে। বহির্মুখীনতাই চরিত্রটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইদম্ জয়গোপালকে উদ্ধত ও অ-বিনয়ী করে তুলেছে।

দ্বিধা

উক্ত নাটকে কোন প্রবল বিরোধী চরিত্র নেই।

।। যাত্রা-নাটক ।।

সুরা-নারী-সিংহাসন

দিব্বোক দাস : দিব্বোক দাস উক্ত নাটকের প্রধান চরিত্র। দ্বিতীয় মহীপালের বিরোধী চরিত্র।

দিব্বোক দাস ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি যে কৈবর্ত বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেছিলেন সে তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়।[৬৭]

দিব্বোক জন্মসূত্রে কৈবর্ত সন্তান। তাঁর মধ্যে দৈহিক শক্তি, সাহস, সত্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেম রয়েছে। এর ফলে তাঁর যে মনোজগৎ গড়ে উঠেছে সেটি তাঁকে একটি জাতির নেতা হবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

তিনি দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৈবর্তজাতিকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর নেতৃত্বে কৈবর্তজাতি দ্বিতীয় মহীপালকে পরাভূত করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহাসন আরোহণের পর তিনি কিছুদিন বেঁচেছিলেন এবং নিজবুদ্ধি ও কর্মদক্ষতাবলে বলে আমৃত্যু রাজত্ব করে যান।

দিব্বোকের মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকায় তিনি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন এবং সফলকাম হয়েছেন।

দিব্বোক অন্তর্দ্বন্দ্বহীন। তাঁর বহির্দ্বন্দ্ব একবারই দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় মহীপালের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময়। চরিত্রটি সক্রিয় হওয়ায় দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে কৈবর্তজাতিকে নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন। বহির্মুখী মনোভাবের জন্য বহিঃকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে ব্যক্ত করেছেন।

রাষ্ট্রবিপ্লব

সুদীপ্তা : সুদীপ্তা 'রাষ্ট্রবিপ্লব' নাটকে বিরোধী চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছেন। ইনি নাট্যকার-সৃষ্ট কল্পিত চরিত্র।

সুদীপ্তা সুন্দরী যুবতী, গৌড়ের মৃত মহারাজার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। বর্তমানে তিনি গৌড়ের রাণী। কিন্তু রাজকার্যে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা নেই। উক্ত বংশানুগতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁর মানসিকতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তিনি সুন্দরী। তাঁর সৌন্দর্যদ্বারা তিনি যে মানুষের মন জয় করতে পারেন সে কথা তিনি জানতেন। তিনি এইভাবে বৃদ্ধ মহারাজাকে তাঁর করতলগত করেছিলেন। পরবর্তীকালে রাজ্যপরিচালনার সুবিধার্থে তিনি তাঁর সৌন্দর্যের পশরা সাজিয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করেছেন। তাই রাজ্যে প্রজার বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্রের গোপন সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করার জন্য তিনি দুশ্চরিত্র জমিদার নীলু চক্রবর্তীকে নিজের রূপ যৌবন দিয়ে প্রলোভিত করেছেন—

"শোন নীলু, তুমি আমাকে চারদিক থেকে প্রজার বিদ্রোহ, অসন্তোষ আর ষড়যন্ত্রের গোপন খবর এনে দাও। পুরস্কার তো এর জন্যে তোমাকে দেবই, তাছাড়া আরও বলে রাখছি, পট্টমহাদেবীর ব্যক্তিগত অনুগ্রহের দান থেকে তুমি বঞ্চিত হবে না।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতার জন্য তিনি সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে পারছিলেন না। সুশাসনের জন্য যে সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন সে সত্যটুকু বোঝার মত তাঁর কূটনৈতিকবুদ্ধি ছিল না। শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির প্রতি তাঁর রূঢ় আচরণ ও অবিশ্বাস তাঁর পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। তাঁর অক্ষমতা তাঁকে অত্যাচারীতে পরিণত করেছিল। তিনি যত অকৃতকার্য হচ্ছিলেন ততই উন্মত্তের মত তাঁর আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি তাঁর অনুগত ধনিকশ্রেণীকে নানা সুযোগ-সুবিধা দান করে গরীবদের শোষণের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। অবশ্য সুদীপ্তার স্বামী গৌড়রাজের শাসনের শেষ পর্যায়ে দেশে মাৎস্যন্যায়ের রাজত্ব শুরু হয়ে যায়। সুদীপ্তার সময় সেটি চরম অবস্থায় পৌঁছয়। গরীবের বন্ধু গোপালদেব এই অরাজকতার অবসানের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করলে সুদীপ্তা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। গোপালকে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে তিনি তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করলেন। একবার দেশের সবচেয়ে দক্ষ লাঠিয়াল ভৈরবকে পাঠালেন গোপালদেবকে হত্যা করার জন্য। ভৈরব গোপালের কাছে পরাভূত হয়ে ফিরে এল। এ কাজে ব্যর্থ হয়ে তিনি গোপালদেবকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা করেন কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুণী (পরে গোপালদেবের স্ত্রী) দেদ্দার তৎপরতায় তা সম্ভব

হল না। এরপর কুসীদজীবী ঈশ্বর দত্তের মাধ্যমে মিথ্যা ঋণের দায়ে গোপালদেবকে গৃহ থেকে উৎখাতের ব্যবস্থা করে ব্যর্থ হন। গোপালদেবের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে দেদ্দাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।" কিন্তু এত চেষ্টা করেও তিনি সিংহাসন ধরে রাখতে পারলেন না — অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে গোপালদেব তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে গৌড়ের রাজা হলেন।

সুদীপ্তার মধ্যে ছিল এক ধরণের অনমনীয়তা। তিনি আপোষ করতে শেখেননি। তিনি তাঁর পদমর্যাদা সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তাই একজন সাধারণ প্রজা গোপালদেবের কাছে পরাজয়কে তিনি কখনই মনেপ্রাণে স্বীকার করে নিতে পারেননি —

"গোপালদেব ....এত সহজে আমি পরাজয় স্বীকার করবো না। আজ থেকে আমার প্রতিমুহূর্তের ধ্যানজ্ঞান হবে তোমার মৃত্যু। আর সে মৃত্যু, আমি ঘটাবো, আজ হোক, কাল হোক অথবা পাঁচ বছর পরে হোক।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

এবং তিনি সেই ইচ্ছা কার্যকরী করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। তিনি আর একবার বিষপ্রয়োগে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু অকৃতকার্য হন। শেষপর্যন্ত একদিন প্রহরীবেষ্টিত গৃহ থেকে পলায়ন করে গৌড়ের সীমান্তপ্রদেশের স্বাধীন পার্বত্যরাজ রঘুবর্মাকে গোপালদেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলেন। পরে রঘুবর্মা পরাজিত হলে রঘুবর্মার সঙ্গে ধৃত সুদীপ্তা আক্ষেপের সঙেগ গোপালদেবকে বলেন—

"আমার দুর্ভাগ্য যে তোমাকে আমি হাতের মধ্যে পেয়েও হত্যা করতে পারলাম না।" (চতুর্থ অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

মহারাণী দেদ্দা গোপালদেবের কাছে মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত সুদীপ্তার প্রাণভিক্ষা চাইলে সুদীপ্তা সেই প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেদ্দার আন্তরিকতা ও তাঁর প্রতি গভীর দরদ সুদীপ্তার মনকে স্পর্শ করে। দেদ্দার ভালবাসার ধারায় সুদীপ্তার সব নীচতা, দম্ভ কোথায় ভেসে যায়। গোপালদেবের বার বার অনুগ্রহ প্রদর্শনে যে চরিত্র ছিল অটল, সেই দৃঢ় কঠিন হৃদয় দেদ্দার সহৃদয়তার যাদু স্পর্শে আশ্চর্যভাবে পরিবর্তিত হল। তাঁর মধ্যে চিরন্তন নারীসত্তা জেগে উঠল। তিনি আকুলভাবে বলে উঠলেন —

"মা দেদ্দা, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও মা ; ....মরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রাজসভায় এসেছিলাম, —জীবনের জন্য নয়। জীবন আমার কাছে এখন বোঝা। বিরাট শাস্তি। যে জীবন তুমি আজ আমাকে দান করলে, সে জীবন তোমার, তোমার কাজেই তা ব্যয় হোক।" (চতুর্থ অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

সুদীপ্তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, তিনি সর্বদা বহির্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছেন— সেই দ্বন্দ্ব গোপালদেবের সঙ্গে। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জন্য তিনি তাঁর বাসনাকে কার্যে রূপান্তরের চেষ্টা করেছেন। সুদাপ্তা বহির্মুখী চরিত্র। ইদম্ তাঁর সমস্ত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করেছে।

মাইকেল মধুসূদন

মুন্সী রাজনারায়ণ দত্ত : মাইকেল মধুসূদনের পিতা মুন্সী রাজনারায়ণ দত্ত মধুসূদনের বিরোধী চরিত্ররূপে উক্ত লোকনাট্যে চিত্রিত হয়েছেন।

রাজনারায়ণ ধনী, শিক্ষিত, অত্যন্ত জেদী, আত্মমর্যাদা-সচেতন ও স্নেহপ্রবণ পিতা। তাঁর জাত্যভিমান প্রবল। এই চারিত্রিক গুণাবলী তাঁর চিন্তাভাবনা ও কার্যাবলীকে প্রভাবিত করেছে।

পুত্রস্নেহ অত্যধিক হওয়ায় তিনি একমাত্র পুত্র মধুসূদনের সমস্ত ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা করতেন। অনেক সময় এ ব্যাপারে ঔচিত্যবোধ হারাতেন। ফলে মধুসূদনও বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল ও জেদী হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ, হিন্দুধর্ম ও জাতি সম্পর্কে প্রাচীন সংস্কারকে গুরুত্ব দিতেন। তাই মধুসূদন হিন্দু ধর্মত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তিনি শুধু মর্মাহত ও অপমানিতবোধই করলেন না, পুত্রকে কঠিন শাস্তি দেবার জন্য চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন— পরম আদরের পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন। অথচ পুত্রকে হারানোর ব্যথা তিনি প্রতিমুহূর্তে গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন— অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতেন। সেই অসীম কষ্ট ভুলতে তিনি উৎসব ও মদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন—

"পাছে লোকে বলে— মুন্সী রাজনারায়ণ দত্ত ছেলের শোকে পাগল হ'তে বসেছে সেইজন্য লক্ষ্ণৌ থেকে বাঈজী আনিয়েছি— রোজ গান হচ্ছে—খাওয়া দাওয়া উৎসব চলছে।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

তবু তিনি পুত্রকে মুহূর্তের জন্য মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না, গোপনে তাঁর সংবাদ নেন। পুত্রের সাহিত্য কৃতিত্বের খবরে গর্ববোধ করেন; পুত্রের আর্থিক কষ্টের কথা শুনে গভীর বেদনায় তাঁর মনের ভেতরটা মোচড় দিতে থাকে। পিতৃহৃদয় সব কিছু ভুলে পুত্রকে কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি মধুসূদনের বই ছাপাবার জন্য মধুসূদনের বন্ধু ভূদেবের মাধ্যমে এক হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন কিন্তু অভিমানী মধুসূদন সেই অর্থ নিতে অস্বীকৃত হলে তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এবং মধুসূদনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন ও আমৃত্যু সেই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করেছিলেন।

প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী রাজনারায়ণ নিজ সিদ্ধান্তে স্থির ছিলেন (অবশ্য একবার তিনি নিজ অঙ্গীকার ভূলে মধুসূদনকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন)।

রাজনারায়ণের জীবনে বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব— উভয়ই রয়েছে। মধুসূদনের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর বহির্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। এই চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। একদিকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য পুত্রের প্রতি তাঁর তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে—

"....মধু যদি ভেবে থাকে যে তার যা ইচ্ছে হয় তাই সে করবে, ধর্মত্যাগ করে কোলকাতা শহরে বেলেল্লাগিরি করে দাপাদাপি করে বেড়াবে— আর আমি নির্বিষ সাপের মতো তার সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করবো— তা হ'লে সে তার বাপকে চিনতে পারেনি।" (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

অন্যদিকে ধর্মত্যাগী পুত্রকে কাছে পাওয়ার জন্য পিতৃহৃদয় হাহাকারে করে উঠেছে—

".....আমি নিজে মাদ্রাজে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনবো। হ'লই বা সে খ্রীশ্চান। সে তার নিজের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে থাকুক। আমার তাতে কিছু বলবার নেই। আমি বাপ— সে ছেলে।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

রাজনারায়ণ উভয়মুখী চরিত্র। তাই কখনো তিনি বাইরের আঘাতে অন্তরের গভীরে যন্ত্রণাভোগ করেছেন অথবা কখনো কখনো বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের চিন্তাভাবনাকে উন্মুক্ত করেছেন।

অহম্ভাব রাজনারায়ণকে পরিচালিত করায় তিনি নিজস্ব মতকে অত্যন্ত মর্যাদা দিয়েছেন।

কালভৈরব/ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র

উক্ত নাটকে কোন বিরোধী চরিত্র নেই।

(গ) নাট্য ঘটনায় গতি সঞ্চারকারী চরিত্র

প্রদ্যোত : প্রদ্যোত 'মেঘমুক্তি' নাট্যকাহিনীর চালক চরিত্র (Pivotal Character)

প্রদ্যোত তার সুখী বিবাহিত জীবনে প্রথম অশান্তির মেঘ নিয়ে আসে। সে স্ত্রী অণিমাকে না জানিয়ে তার অধ্যাপক-কন্যা সুন্দরী যুবতী গীতার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং

অণিমা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সে প্রকৃত ঘটনা জানায় না। এরপর কাহিনী জটিলতার দিকে এগিয়ে যায়। স্বামীর ব্যবহারে স্ত্রীর অভিমান, সন্দেহ, সেই ঘটনার সূত্র ধরে কুচক্রী স্বপন রায়ের অণিমাকে স্বামীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা এবং সেই কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান-সৃষ্টিতে নাট্যকাহিনী জটিলরূপ ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত প্রদ্যোতের আমন্ত্রণে অণিমার জন্মদিনে গীতা প্রদ্যোতের বাড়ী এলে অণিমা জানতে পারে, প্রদ্যোত ও গীতার মধ্যে কোন অবৈধ সম্পর্ক নেই— প্রদ্যোত দাদার মত গীতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। এরপর অশান্তির মেঘ কেটে গিয়ে পরিবারে পুনরায় শান্তি ফিরে আসে এবং সেই সঙ্গে নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি ঘটে।

উপরিউক্ত আলোচনায় ভিত্তিতে বলা যায়, প্রদ্যোত বিশেষ কার্যকারিতার দ্বারা নাটকে যে গতি এনেছে তা সমগ্র নাট্য-কাহিনীতে সঞ্চারিত হয়ে নাটককে বিশেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

মাটির ঘর

অলক : অলক 'মাটির ঘর' এর নাট্য ঘটনার গতিসঞ্চারকারী চরিত্র। তার আগমনে সত্যপ্রসন্নর শান্তশ্রীযুক্ত মাটির ঘরের খুঁটি নড়ে ওঠে এবং এরপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্যপ্রসন্নর সাজানো গৃহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।

অলক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। সে একটি কলেজের অধ্যাপক। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত হয়েও সে শিক্ষার প্রকৃতগুণ আয়ত্ত করতে পারেনি। তার চরিত্রের মধ্যে তাই সংযম ও ভারসাম্যের অভাব। তার মানসিকতার মধ্যে এরই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

তন্দ্রা ও কল্যাণের বিবাহিত জীবন শান্তিতে চলছিল। কিন্তু তন্দ্রার বিবাহ-পূর্ব প্রেমিক অলক তন্দ্রার সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করলে ঘটনার গতি অন্যদিকে মোড় নেয়। তন্দ্রা ও অলকের মধ্যে একসময় গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠলেও উভয়ের বিবাহে মত দানের ব্যাপারে তন্দ্রার ইতঃস্ততভাব দেখে অলক অপমানিত বোধ করে ও পশ্চিমের একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে চলে যায়। পরে তন্দ্রা পিতৃনির্বাচিত পাত্র কল্যাণকে বিবাহ করলে তার অপমানবোধ প্রতিহিংসার রূপ নেয়। তার ভূতপূর্ব প্রেমিকা অন্যের স্ত্রী হয়ে সুখে সংসার করছে— সেই চিন্তা তার বুকে জ্বালা ধরায়। এমনকি সে একদিন সেই জ্বালার কথা স্পষ্টভাবে তন্দ্রাকে জানায়—

"তোমার স্বামী আছেন, এ কথা আমায় বুঝতে পারার জ্বালা তুমি বুঝতে পারো ?" (দ্বিতীয় দৃশ্য) সে ব্যর্থ প্রেমের প্রতিশোধ নিতে তন্দ্রার বিবাহিত জীবন বিড়ম্বিত করতে শুরু করে। পূর্বপ্রেমের কথা স্বামীর কাছে প্রকাশ করে দেবার হুমকি দিয়ে তন্দ্রার কাছ থেকে মাঝে মাঝে অর্থ নিতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, তার মানসিক অস্থিরতা এক সময় এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে সে একদিন দুর্যোগের রাতে কল্যাণের অনুপস্থিতিতে তন্দ্রার শোবার ঘরে প্রবেশ করে ইচ্ছাকৃতভাবে পোড়া সিগারেটের অংশবিশেষ ফেলে আসে।

ব্যর্থপ্রেম তাকে এমন হৃদয়হীন করে তুলেছিল যে সে এক সময় তন্দ্রাকে স্বামী কল্যাণকে ত্যাগ করে তার সঙ্গে ঘর রচনা করার জন্য প্ররোচিত করে। শুধু তাই নয়, তার প্রস্তাবে রাজী না হলে সে তার পিতার সম্মতি নিয়ে ছোট বোন ছন্দাকে বিবাহ করার কথা বলে তন্দ্রাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে।

অলকের কার্যাবলী সত্যপ্রসন্নর শান্তগৃহে ঝড় নিয়ে আসে। তার আচরণ কল্যাণের মধ্যে তন্দ্রা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। একদিকে অলকের প্ররোচনা অন্যদিকে স্বামীর অবিশ্বাস ও সন্দেহ তন্দ্রার মানসিকজগতে বিরাট আলোড়ন ঘটায়। এ অবস্থায় মেজবোন নন্দার আত্মহত্যার খবরে তার মধ্যে মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দেয়। স্ত্রীর অসুস্থতায় পত্নীপ্রেমিক কল্যাণের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে এবং সে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে ও তার মৃত্যু হয়।

শেষ পর্যন্ত মৃত্যুপথযাত্রী কল্যাণের অনুরোধে অলক প্রেমিক পরিত্যক্ত সত্যপ্রসন্নর তৃতীয় কন্যা ছন্দাকে বিবাহ করতে সম্মত হয় এবং অসুস্থ তন্দ্রা ও শোকগ্রস্ত সত্যপ্রসন্নর দায়িত্ব গ্রহণ করলে নাট্য ঘটনার সমাপ্তি ঘটে।

অলকের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। শুধু তন্দ্রার মস্তিষ্ক বিকৃতিতে সে নিজেকে অপরাধী মনে করে মানসিক আঘাত পায় এবং সত্যপ্রসন্নর সংসার-বিপর্যয়ে তার বিশেষ ভূমিকা আছে— এই কথা ভেবে নিজেকে অপরাধী মনে করে—

"......কেবলই আমার মনে হচ্ছে, আমি বুঝি এ সব দুঃখ দুর্দশার মূল। আমারই জন্যে তোমাদের সংসার শ্মশানে পরিণত হয়েছে.....।" (ষষ্ঠ দৃশ্য)

তবে তার মধ্যে বহির্দ্বন্দ্ব বর্তমান। সে তন্দ্রার বিবাহিত জীবন বিড়ম্বিত করার জন্য তন্দ্রার সঙ্গে বারবার বহির্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। এছাড়া নন্দার স্বামী জঘন্য চরিত্র চঞ্চলের সঙ্গে তার বহির্বিরোধ ঘটেছে।

অলক বহির্মুখী চরিত্র। সে তার ক্ষোভ, প্রতিশোধস্পৃহা, অনুশোচনা এ সব মনোভাব বাইরের আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

বিশ বছর আগে

প্রদীপ : উক্ত নাটকের চালক চরিত্র প্রদীপ। সে বিরোধী চরিত্রের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়েছে।

দীপক ও তমসার গভীর প্রেমের কথা জেনেও প্রদীপের তমসাকে লাভ করার ইচ্ছা, তার প্রতি তমসার উদাসীনতায় দীপকের প্রতি তার ঈর্ষা ও প্রতিশোধস্পৃহা, প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে দীপকের অর্থোপার্জনের পথ বন্ধ করে দেবার প্রচেষ্টা, দীপকের স্ত্রীরূপে পরিচিতা তন্বীকে অপহরণ— এসব ঘটনা ঘটিয়ে প্রদীপ নাট্যকাহিনীকে বেগবান করে পরিণতিমুখী করে তুলেছে এবং অপহৃতা তন্বীর আত্মহত্যা সংবাদে গুলিবিহীন পিস্তল

দ্বারা দীপকের প্রদীপকে ভয় প্রদর্শন, অন্তরালবর্তী তন্বীর দিদি মনীষার পিস্তলের গুলিতে প্রদীপের মৃত্যু ও বিশ বছর পর প্রদীপ-হত্যা রহস্য উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। প্রদীপের মৃত্যুর পর ঘটনা অগ্রসর হলেও সেই ঘটনা প্রদীপকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং প্রদীপ নিঃসন্দেহে এই নাটকের গতিসঞ্চারকারী চরিত্র।

মালা রায়

মালা রায় : প্রধান চরিত্র মালা রায় ব্যতীত নাট্যঘটনা কোনক্রমেই অগ্রসর হতে পারত না। স্বামীর মৃত্যু, স্বামী-বন্ধু বিবাহিত অপরূপের তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, নিজেকে অবৈধ সন্তান বলে জানার পর তার প্রতিক্রিয়া এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা—এ সব ঘটনা মালাকে কেন্দ্র করে গতি লাভ করায় তাকে উক্ত নাটকের চালক চরিত্র বলা যায়।

কুহকিনী

জয়ন্ত : কাঞ্চীরাজপুত্র জয়ন্ত 'কুহকিনী' নাট্যকাহিনীতে গতিদান করেছেন।

জয়ন্ত কামরূপের রাণী রত্নার মধ্যে প্রেম সঞ্চারিত করায় উভয়েই তন্ত্রসিদ্ধ অসীম ক্ষমতাশালী পুরোহিত বিপ্রদেবের রোষানলে পড়েন ও তাঁর শত্রুতে পরিণত হন। এরপর তাঁদের প্রতি বিপ্রদেবের হত্যাদেশ, রত্নার সহচরী শীলার সহায়তায় উভয়ের সে রাজ্য থেকে পলায়ন, জয়ন্তর সে রাজ্যে ফিরে আসা, রত্নাকে বিবাহ করা ও প্রজার অনুরোধে রত্নাকে বিপ্রদেবের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য কামরূপ রাজ্য আক্রমণের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় জয়ন্ত সমগ্র ঘটনাকে চালনা করে নাটকটিকে বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী করে তুলেছেন।

রক্তের ডাক

বুলু/শতাব্দী : প্রধান চরিত্র বুলু/শতাব্দীর কার্যাবলী 'রক্তের ডাক' নাটককে বেগবান করে তুলেছে। শ্বশুরবাড়ীর অত্যাচারে বাল্যবন্ধু শুভেশের সঙ্গে গৃহত্যাগ ও কলকাতায় গমন, শুভেশের তার প্রতি অতিরিক্ত অধিকারবোধের জন্য শুভেশের আশ্রয়ত্যাগ করে তার স্বাধীন জীবনযাপন, অভিনেত্রীর জীবিকাগ্রহণ, শুভেশের প্রতি তার প্রবল আকর্ষণবোধ, কলকাতায় তার

বাড়ীতে স্বামী, শাশুড়ী, ননদের আগমনে তার গৃহত্যাগেব সংকল্প, শুভেশকে গভীরভাবে ভালোবাসা সত্ত্বেও বিবাহিতা ও ভিন্নজাত বলে স্বামীরূপে তাকে গ্রহণ করতে না পারা ও চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেওয়া— এ সব ঘটনা শতাব্দী দ্বারা সংঘটিত হওয়ায় কাহিনী গতিময়তা লাভ করেছে। তাই শতাব্দী 'রক্তের ডাক' নাটকের চালকচরিত্ররূপে বিবেচিত।

তাইতো

মল্লিকা : মল্লিকা উক্ত নাটকেব গতিসঞ্চারকারী চরিত্র। মল্লিকা মূল চরিত্রও বটে।

উগ্রস্বভাবের জন্য পাত্রপক্ষের বিরাগভাজন হওযা, বিধবা সেজে এক বিধবা বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিকে বিবাহ করা— এসব ঘটনাকে গতিদান কবার পশ্চাতে মল্লিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

তেরশো পঞ্চাশ

প্রকৃতি : কেন্দ্রীয় চরিত্র তারিণীর ভাগ্যবিপর্যয় (বন্যায় ঘরবাড়ী সম্পদ ভেসে যাওয়া, কলকাতায় অসহায় অবস্থায় দিনযাপন, শেষ পর্যন্ত গাড়ী চাপা পড়ে মৃত্যু) মূলতঃ প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা সংঘটিত হওয়ায় প্রকৃতিকে এই নাটকেব চালকশক্তি বলা যায়।

খবর বলছি

দীপা : প্রধান চরিত্র দীপা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাট্যকাহিনীকে চালনা করেছে। দুষ্কৃতকারী ভবতোষ ও মহাদেব মহান্তর সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি, বরেন মিত্রর আশ্রয় প্রার্থনা, বরেন মিত্রর স্ত্রী অরুন্ধতীর লম্পট, দুশ্চরিত্র ভাই অনুপমের মনে শুভবোধ জাগিয়ে তোলা, অন্নসংস্থানের জন্য এক বাড়ীতে রাঁধুনীর চাকুরীগ্রহণ, সে বাড়ীর ছোটবাবুর কু-প্রস্তাবের প্রতিবাদে সে চাকুরী ত্যাগ, স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা, অর্ধাহারে মাঝে মাঝে অনাহারে মানসিক অশান্তিতে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হওয়া ও শেষ পর্যন্ত স্বামীকে ফিরে পাওয়ায় উত্তেজনায় মৃত্যুবরণ— এ সব ঘটনা দীপা কর্তৃক সংঘটিত হওয়ায় তাকে গতিসঞ্চারকারী চরিত্রের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

অন্ধদেবতা

রায়বাহাদুর পি.।পি. : 'অন্ধদেবতা'র বিরোধী চরিত্র রায়বাহাদুর পি. পি. নাট্যকাহিনীতে একবার (শেষ দৃশ্যে) উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশে নাটকের সমগ্র ঘটনা (ব্যবসার স্বার্থে প্রশমন নামে এক গরীব বেকার যুবককে দিয়ে তাঁর বন্ধু ও ব্যবসায়ী রায়বাহাদুর ডি.ভি.কে হত্যা, চুক্তির পাঁচ হাজার টাকা প্রশমনের কাছ থেকে ফেরৎ পাওয়ার জন্য তাঁর কর্মচারী বিজনের মাধ্যমে পুলিশের কাছে প্রশমনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রশমনকে হত্যা) ঘটায় তাঁকে এখানে চালক চরিত্র বলা যায়।

সেই তিমিরে

স্বাহা : উক্ত নাটকে প্রধান চরিত্র স্বাহার কার্যাবলী আলোচনা করলে দেখা যায়, স্বাহা তার স্বামীগৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকাহিনী অগ্রসর হয়েছে। গৃহত্যাগী নারীদের ফিরিয়ে আনার জন্য রুদ্রেশ্বর ও আনন্দবাবুর অনুরোধে অতনু (রুদ্রেশ্বরের বন্ধু) স্বাহা প্রতিষ্ঠিত 'জাগরণী সম্মিলনী'তে কেরাণীর চাকুরী নিয়েছে। এরপর অতনুর সঙ্গে স্বাহার নানা বিষয়ে মতবিরোধ ও সংঘাত ঘটেছে এবং নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বগৃহে ফিরে এসেছে। সুতরাং স্বাহাকে বর্তমান নাট্যকাহিনীর গতিসঞ্চারকারী চরিত্র বলা যায়।

পিতাপুত্র

সমীর : নাটকের বিরোধী চরিত্র সমীর চালক চরিত্রের ভূমিকা পালন করেছে। মৃত বলে ঘোষিত সমীর ভুলক্রমে শ্বশুর পুলিশ সুপার ভুজঙ্গভূষণ মুখার্জীর বাড়ীতে ডাকাতি করতে এলে নাট্যকাহিনী বিশেষ গতি লাভ করে। এরপর সমীরকে চিনতে পেরে স্ত্রী বিনতির স্বামীর ডাকাত দলে যোগদান, সেই ডাকাতদলকে গ্রেপ্তার করার জন্য ভুজঙ্গভূষণ ও সমীরের পিতা পুলিশ অফিসার প্রদীপ্ত ব্যানার্জীর

বিশেষ তৎপরতা, শেষ পর্যন্ত এক ডাকাতিতে মুখোশধারী সমীরকে চিনতে না পেরে প্রদীপ্তর পুত্রকে হত্যা, স্বামীর মৃত্যুতে বিনতির আত্মহত্যা ও প্রদীপ্তর হাহাকারের মধ্য দিয়ে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমীর নানা কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনীকে সচল ও সজীব করে গতি দান করেছে।

ক্ষুধা

রমেন : প্রধান চরিত্র রমেন উক্ত নাটকের গতি-সঞ্চার করেছে। উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় এসে চাকরী না পাওয়ায় অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থার মধ্যে দিনপাত, এক ধনী ব্যক্তির উৎসব বাড়ীতে অনাহূত হয়ে প্রবেশ করার অপরাধে প্রহার লাভের ফলে আত্মধিক্কার, জীবিকা অর্জনের জন্য কঠোর সংকল্প গ্রহণ, এক ধনী ব্যক্তির অনুগ্রহে ও নিজের যোগ্যতায় চাকুরীক্ষেত্রে উচ্চপদ লাভ, প্রেমিকার কথা স্মরণ করে সেই ধনী ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ ও চাকুরী ত্যাগ এবং প্রেমিকার কাছে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে রমেন সমগ্র কাহিনীকে চালনা করে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে।

তোমার পতাকা

অনুকূল বিশ্বাস : কেন্দ্রীয় চরিত্র অনুকূল বিশ্বাসের আদর্শ ও দেশপ্রেম সমগ্র নাট্যকাহিনীতে গতিদান করেছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর অহিংসনীতি, তাঁর অনুগামীদের ক্রিয়াকলাপ, সেই দলকে শাস্তি দেবার জন্য পুলিশ সুপার মহীতোষ মজুমদারের গ্রামে আগমন, তাঁর আদর্শের দ্বারা মহীতোষকে অনুপ্রাণিত করা, অনুগামীরা কিছু হিংসাত্মক কান্ড (পুলিশ ইন্‌সপেক্টর বিভূতির চর বিশ্বম্ভরকে গুলি করে হত্যা করার চেষ্টা, মহীতোষ বিভূতি-বিশ্বম্ভরকে আটকে রাখা) করলে সে কাজের বিরোধিতা করা, তাঁর নির্দেশে অনুগামীদের নিরস্ত্র অবস্থায় ইংরেজ কালেক্টরী দখল করার মধ্য দিয়ে যে কর্মধারা লক্ষ্য করা যায় তার পশ্চাতে রয়েছে অনুকূলের দেশপ্রেমের আদর্শ। তাই অনুকূলকে নাট্যকাহিনীর গতিসঞ্চারকারীর মর্যাদায় ভূষিত করা যায়।

মন্দাক্রান্তা/জয়-পরাজয়

মন্দাকিনী : সদাব্যস্ত নাট্যপরিচালক স্বামী (সৌমিত্র) কে কাছে পাওয়ার জন্য স্বামীবন্ধু নীলাদ্রির সঙ্গে পরামর্শ করে মন্দাকিনীর গৃহত্যাগ, নীলাদ্রি শর্তভঙ্গ করে তার কাছে প্রেম নিবেদন করলে তাকে ধিক্কার, ফলে আত্মগ্লানিতে নীলাদ্রির আত্মহত্যা, নীলাদ্রির খোঁজে তার স্বামীগৃহে আগমন, সেখানে নীলাদ্রির আত্মহত্যার সংবাদে তার তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া ও স্বামীর অনুরোধে স্বামীর কাছে থেকে যাওয়া— এসব ঘটনা নাটকের প্রধান চরিত্র মন্দাকিনীকে কেন্দ্র করে গতিলাভ করায় তাকে গতিসঞ্চারকাবী চরিত্র বলা যায়।

অতএব

দোলগোবিন্দ : নাটকের প্রধান চরিত্র দোলগোবিন্দ চালক চরিত্রের ভূমিকাও পালন করেছেন।

বিবাহে অনিচ্ছুক ভ্রাতুষ্পুত্র (সুমিত্র)-কে সংসারী করার জন্য সুমিত্রর প্রেমিকা অমিতাকে তাঁর বিবাহ করার সাজানো নাটক তৈরী করা, তাঁর বিরুদ্ধে অমিতা ও অমিতার মাসতুত বোন নয়নকৃত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা, সুমিত্র ও তার বন্ধু কালাচাঁদ দোলগোবিন্দকে অন্য ব্যক্তি ভেবে হত্যা করার চেষ্টা করলে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাদের গ্রেপ্তার করা, সুমিত্র ও অমিতার আত্মহত্যার অভিনয়কৌশল ধরে ফেলা এবং সুমিত্র অমিতার বিবাহ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দোলগোবিন্দর কার্যকারিতা নাট্যকাহিনীতে গতি দান করেছে।

এন্টনী কবিয়াল

এন্টনী কবিয়াল নিজেকে বাঙালী কবিয়ালরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এন্টনীর নানাবিধ প্রচেষ্টা, বাঙালী বালবিধবা সৌদামিনীর প্রতি প্রেম, তাঁকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করার জন্য নানারকম সামাজিক বাধা, বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নানাস্থানে কবিগান পরিবেশন ও শেষ পর্যন্ত কবিয়ালরূপে স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে প্রধান চরিত্র এন্টনী কাহিনীতে গতিসঞ্চার করায় তিনি উক্ত নাটকের গতিসঞ্চারকারী চরিত্র।

দ্বিধা

রত্না : অর্ধবিবাহ, অসহায় বাবা মা ভাই বোনকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য অবাঞ্ছিত চাকরীগ্রহণ, ব্যর্থপ্রেম ও শেষ পর্যন্ত দুর্ভাগ্যময় জীবনকে মেনে নেওয়া—এসব ঘটনায় প্রধান চরিত্র রত্না গতিবেগের সৃষ্টি করে কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় তাকে নাট্যকাহিনীর চালক চরিত্র বলা যায়।

।। যাত্রা-নাটক/লোকনাট্য ।।

সুরা-নারী-সিংহাসন

দ্বিতীয় মহীপাল : মূল চরিত্র দ্বিতীয় মহীপালের বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সমগ্র রাজ্যে অসন্তোষ, রাজকার্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি, নারীদেহ ভোগে বাধা দিলে পত্নী রাণী কঙ্কাবতী ও ভাই রামপালকে তাঁর নির্বাসন-দণ্ড দান, বিদ্রোহী প্রজা কৈবর্তজাতির সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু, কৈবর্তনেতা দিব্বোকের গৌড়ের সিংহাসন লাভ ও শেষ পর্যন্ত রামপাল কর্তৃক কৈবর্তরাজা ভীমদাসকে পরাভূত করে সিংহাসন পুনরুদ্ধার— উক্ত নাটকের বিষয়বস্তু। সমগ্র নাট্যকাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দ্বিতীয় মহীপাল-ই ঘটনাবলীর মধ্যে গতিবেগ দান করে নাটককে পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। তাই তিনি একাধারে মূল ও চালক চরিত্র।

রাষ্ট্রবিপ্লব

গোপালদেব : প্রধান চরিত্র গোপালদেবের কার্যাবলী, যেমন, তাঁর দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, সাহসিকতা, স্বদেশপ্রেম, নারীকে দুষ্কৃতকারীর হাত থেকে

রক্ষা করা, গৌড়ের রাণী সুদীপ্তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুবশক্তি গড়ে তোলা, সুদীপ্তাকে সিংহাসনচ্যুত করে সর্বসম্মতিক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করা, সু-শাসকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য বিদ্রোহিনী সুদীপ্তাকে কঠোর শাস্তি দান, (তিনি ইতঃপূর্বে সুদীপ্তাকে কয়েকবার ক্ষমা করেছিলেন), পরে রাণী দেদ্দার অনুরোধে তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন এবং নাবালকপুত্র ধর্মপালের হাতে সিংহাসন সমর্পণ করে রাণীসহ স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ— উক্ত নাটকে গতি সঞ্চারিত করেছে। সুতরাং গোপালদেব এখানে গতিসঞ্চারকারী চরিত্র।

মাইকেল মধুসূদন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত : প্রধান চরিত্র মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্মগ্রহণ থেকে নাট্যকাহিনী শুরু হয়েছে। ধর্মান্তরের ফলে তার পিতৃসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রথম প্রেমের ব্যর্থতা, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ, দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণ, সাহিত্য রচনা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পিতার মৃত্যুর পর পিতৃসম্পত্তি লাভ ও অমিতব্যয়িতা, বিদ্যাসাগরের সাহায্য, বন্ধুদের অকৃত্রিম ভালবাসা লাভ এবং অকালমৃত্যু— এসব ঘটনা মাইকেল মধুসূদন ব্যতীত সম্ভব হত না। তিনি-ই এই নাটকের গতিসঞ্চারকারী চরিত্র।

কালভৈরব/ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : ইহজগতের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তিলাভের জন্য গিরিশচন্দ্রের একজন গুরুর অনুসন্ধান, রামকৃষ্ণকে গুরুরূপে গ্রহণ করার পূর্বে তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করা এবং শেষ পর্যন্ত মনের দ্বিধা দূর হওয়ায় রামকৃষ্ণকে গুরুপদে বরণ করার মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। প্রধান চরিত্র গিরিশচন্দ্র সমগ্র নাট্যকাহিনীকে চালনা করায় তাঁকে চালক চরিত্রের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

(খ) গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী চরিত্র

কুহকিনী

শীলা : প্রধান চরিত্র রত্নার বিশেষ সহযোগী চরিত্র হিসেবে নাট্যকার শীলাকে চিত্রিত করেছেন।

শীলা কামরূপের রাণী রত্নার সহচরী। তিনি রত্নাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। রত্নার হিতাকাঙ্ক্ষায় তিনি অনেক সময় বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন এবং সাধ্যানুসারে রত্নার কার্যের সহায়তা করেছেন।

একবার রাণী রত্না শীলার কাছে বিপ্রদেব নির্দেশিত যাদুদণ্ডের দ্বারা সভ্যদেশের মানুষকে পশুতে পরিণত করার নিষ্ঠুর কার্যের সমালোচনা করলে তিনি রত্নার ক্ষতি হবার আশঙ্কায় তাঁকে এই ধরণের মন্তব্য করতে নিষেধ করেন। কারণ বিপ্রদেব সেকথা জানতে পারলে রত্নাকে কঠোর শাস্তি দেবেন,—

"বিপ্রদেব যদি শোনেন, তবে আর রক্ষে থাকবে না।" (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

—রত্না শীলার সাবধান বাণীতে ভীত হয়ে এই ধরণের মন্তব্য করবেন না বলে শীলাকে কথা দেন। এইভাবে তিনি রত্নাকে সতর্ক করেছেন।

শুধু তাই নয়, বিপ্রদেব কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রত্না ও তাঁর ভাবী স্বামী জয়ন্তকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তিনি তাঁদের কামরূপ থেকে পলায়নে সাহায্য করেন—

"পুরোহিত বিপ্রদেব আর সোমদেবকে আমি কারণের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছি—তাঁরা বোধহয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এই সুযোগে আপনারা পালিয়ে যান। আমি পথ চিনি, চলুন আমি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসছি।" (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

সর্বশেষে, রত্নার স্বামী জয়ন্তর সৈন্য দলকে ধ্বংস করার জন্য বিপ্রদেব মহাকালীর পুজোর আয়োজন করলে শীলার নির্দেশে জয়ন্তর অনুচর সুন্দর পুজোর নৈবেদ্য উচ্ছিষ্ট করে

দিলে মহাকালীর রোষে বজ্রপাতে বিপ্রদেবের মৃত্যু হয় এবং বিপ্রদেবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সেইসঙ্গে হত্যার জন্য বিপ্রদেব কর্তৃক অপহৃত রত্নার প্রাণরক্ষা পায়।

এইভাবে শীলা প্রতিবারই বিপন্ন রত্নাকে আন্তরিক সহযোগিতার দ্বারা রক্ষা করেছেন।

সেই তিমিরে

শিপ্রা : 'সেই তিমিরে' নাটকের প্রধান চরিত্র স্বাহার অন্যতম সহযোগী রূপে শিপ্রা চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

সুশ্রী যুবতী শিপ্রা বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। সে শিক্ষিতা, আধুনিকা এবং নারী স্বাধীনতার সমর্থক। সে পুরুষ ও নারীর সম-অধিকারে বিশ্বাসী। এই বিশেষ মানসিকতা তার জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাকে সাময়িকভাবে উগ্রপন্থী করে তোলে। পিতৃমাতৃহীন অবিবাহিতা শিপ্রা স্নেহময় দাদু আনন্দবাবুর সঙ্গে বসবাস করে। কিন্তু একদিন তার মনে হয় পুরুষের অধীনে জীবননির্বাহ করা নারী-স্বাধীনতার পরিপন্থী, নারীর পক্ষে অসম্মানজনক। তারমধ্যে যখন এই ভাবনা কাজ করছিল সে সময় স্বাহা স্বামী-গৃহ ত্যাগ করে তার কাছে আসে এবং তাকে স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে বসবাস করার জন্য প্ররোচিত করে। ফলস্বরূপ শিপ্রার দাদুকে পরিত্যাগ এবং স্বাহা ও অন্যান্য কিছু গৃহত্যাগী স্বামীবিদ্বেষী নারীর সহযোগে 'জাগরণী সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু একসময় শিপ্রার মধ্যে শাশ্বত নারী-সত্তা জেগে ওঠে। বিবাহ-বিদ্বেষী শিপ্রা স্বাহার স্বামী রুদ্রেশ্বরের বন্ধু অতনুর (যে গৃহত্যাগী মহিলাদের ফিরিয়ে আনতে 'জাগরণী সম্মিলনী'তে কেরানীর চাকুরী নিয়েছিল) প্রেমে ধরা দেয় ও তার ঘরণী হওয়ার মানসে দাদুর কাছে ফিরে আসে।

শিপ্রার মধ্যে বহির্দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। দাদুর গৃহত্যাগ, সম্মিলনীতে অতনুর সঙেগ নানাধরণের তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে এই বহির্দ্বন্দ্বের রূপটি প্রকাশিত।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এই নারী অত্যন্ত তেজস্বিতার সঙ্গে তার কাজকর্ম করে গেছে। তার বিভিন্ন মানসিকতা নানা বাহ্যিক ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ায় শিপ্রাকে বহির্মুখী চরিত্র বলা যায়। এই চরিত্রের কার্যাবলীর পশ্চাতে অহম্‌বোধ কাজ করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে শিপ্রাকে স্বাহার সার্থক সহযোগী চরিত্র বলা যায়।

তোমার পতাকা

আশিস : কেন্দ্রীয় চরিত্র অনুকূল বিশ্বাসের পুত্র আশিসকে অনুকূলের বিশিষ্ট সহযোগী চরিত্ররূপে উক্ত নাটকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

আশিস গান্ধীবাদী স্বদেশপ্রেমিক পিতার শিষ্য। সে একনিষ্ঠ দেশসেবক। সে পিতার নির্দেশ অনুসারে অহিংসনীতির সাহায্যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। ইংরেজ কালেকটরী দখল করার পূর্বে বিপ্লবীদের সেই আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মধ্যে আশিসের সেই রূপটিই প্রকাশ পেয়েছে—

আশিস- .....আবার মনে করিয়ে দিই। কারো হাতে কোন অস্ত্র থাকবে না। এমনকি একটি লাঠি পর্যন্ত নয়।.....

মায়া- গুলি ওরা করবেই। না দাদা ?

আশিস- হ্যাঁ, গুলি নিশ্চয় চালাবে। কিন্তু প্রত্যেককে নির্দেশ দেবে— যার হাতেই জাতীয় পতাকা থাক্, সে পতাকা যেন মাটিতে না পড়ে। তার আগেই আর একজন এসে যেন তুলে নেয়। (দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

এবং শেষ পর্যন্ত একমাত্র মানসিক শক্তির দ্বারা তারা ইংরেজ কালেক্টরী দখল করতে সক্ষম হয়। এইভাবে সে অনুকূল বিশ্বাসের অহিংস নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

এন্টনী কবিয়াল

সৌদামিনী— প্রধান চরিত্র এন্টনী কবিয়ালকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার জন্য সৌদামিনীকে অন্যতম সহযোগী চরিত্র বলা যায়।

সৌদামিনী বাস্তব চরিত্র। ইনি ব্রাহ্মণকন্যা, এন্টনীর ঘরণী। তবে সৌদামিনী তাঁর প্রকৃত নাম নয়।[৬২]

সৌদামিনী এন্টনী কবিয়ালের স্ত্রী। তিনি বালবিধবা হিন্দু নারী। সমাজের বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে এন্টনী সৌদামিনীকে বিবাহ করেন। সৌদামিনীও ভালবাসার জোরে সব সংস্কার দূরে সরিয়ে দেন এবং বিবাহের পর প্রতিনিয়ত স্বামীর কাব্য সাধনায় প্রেরণা দান করেন। এন্টনী যাতে বাংলার কবিয়ালরূপে প্রতিষ্ঠিত হন সেজন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি এন্টনীর কোন ইচ্ছাকে অপূর্ণ রাখতে চাননি। একবার এন্টনী নিজের বাড়ীতে দুর্গাপুজো ও সেই উপলক্ষে কবিগানের আসর বসানর ইচ্ছা প্রকাশ করলে সৌদামিনী এন্টনীর অজান্তে নিজের গহনা বিক্রী করে সে ইচ্ছাপূরণ করেন।

সৌদামিনী স্বামীর গরবে গরবিনী। তাই যেদিন গোরাহাটির বাগানবাড়ীতে এন্টনী বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রাকে হারিয়ে জয়ী হন সেদিন সৌদামিনীর আনন্দে বুক ভরে ওঠে। কবিয়ালরা অনেক সময় জনপ্রিয় হওয়ার জন্য কবির লড়াই-এ আদিরস পরিবেশন করতেন। ভোলা ময়রা সেই উদ্দেশ্যে এন্টনীকে দু-একটি আদিরসাত্মক গান মাঝে মাঝে গাইবার জন্য উপদেন দেন। সুরুচিসম্পন্না সৌদামিনী সেকথা জানতে পেরে এন্টনীকে নিষেধ করেন—

"......জাত কবিরা আসরে এ সব গান গায় না। বড় নোংরামি হয়।" (তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

আসলে স্বামীর রুচিবোধ ও কবিপ্রতিভা সম্পর্কে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

কবির আসরে এন্টনীর পরাজয়ের অপমান তাঁর কাছে মৃত্যুতুল্য ছিল। তাই যখন এন্টনী প্রতিষ্ঠিত ফিরিঙ্গী কালীমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে কবি-আসরে ভোলাময়রা গানের মাধ্যমে এন্টনীকে 'নিমকহারাম' বলে গালি দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দিতে বলেন সে সময় সৌদামিনী স্তব্ধ এন্টনীকে সবাক্ হতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত সৌদামিনীর হৃদয়ের আবেগ এন্টনীর মধ্যে প্রবাহিত হয়—এন্টনী গেয়ে ওঠেন—

"আমি নিমকহারাম নই মাগো / নিমকহারাম নই।

আমার নুনের নৌকা গঙ্গাজলে / ডুবে গেছে ওই।

এইভাবে সৌদামিনীর গভীর ভালবাসা, ঐকান্তিক চেষ্টা ও অনুপ্রেরণা এন্টনীকে কবিয়ালরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

যাত্রা-নাটক

সুরা-নারী-সিংহাসন

ভীমদাস ও হরিদাস— ভীমদাস ও হরিদাস বিদ্রোহী চরিত্র কৈবর্তনেতা দিব্বোক দাসের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী চরিত্ররূপে অঙ্কিত হয়েছেন। চরিত্র দুটি ঐতিহাসিক।[১০]

ভীমদাস বিদ্রোহী নেতা দিব্বোকদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। দিব্বোক দাস যখন দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৈবর্তজাতিকে সংঘবদ্ধ করে তুলছেন সে সময় ভীমদাস তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁর জীবনের একমাত্র ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা ছিল দ্বিতীয় মহীপালকে সিংহাসনচ্যুত করে দিব্বোক দাসকে সিংহাসনে বসানো—

"......প্রতিজ্ঞা করছি, গৌড়বঙ্গাধিপতি মহীপালকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে— সেখানে আমার কাকা দিব্বোক দাসকে বসাবো।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

এবং সে কার্যে ভীমদাস সফলকাম হয়েছিলেন ও দিব্বোকদাসের মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন সিংহাসন অধিকার করেছিলেন।

হরিদাসও ভীমদাসের মত কৈবর্তবিদ্রোহে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় সেনাপতিরূপে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় মহীপালের সঙ্গে যুদ্ধে যখন কৈবর্তদের বড় বড় বীরযোদ্ধা পরাভূত তখন হরিদাসই সমান বীরত্বের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

হরিদাস প্রকৃত বীর। তাই তিনি দ্বিতীয় মহীপালকে একবার নিবস্ত্র অবস্থায় পেয়ে বন্দী করেননি এবং বিস্মিত মহীপালকে বলেছেন—

"......পরশু প্রকাশ্য যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধে হয় আপনি জিতবেন, আমরা হারবো। অথবা আমরা জিতবো, আপনি হারবেন। একলা হাতে পেয়ে আপনাকে আমরা বন্দী করতে আসিনি মহারাজ। সে অভ্যাস আমাদের নেই।" (দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য) এইভাবে হরিদাস নিজ শৌর্যবীর্য দ্বারা গৌড়ের সিংহাসন অধিকারের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

রাষ্ট্রবিপ্লব

জীমূতবাহন ও গোবিন্দ ॥ জীমূতবাহন ও গোবিন্দ প্রধান চরিত্র গোপালদেবের বিশিষ্ট সহযোগী চরিত্র। এ চরিত্র দুটি কাল্পনিক।

জীমূতবাহন ও গোবিন্দ গোপালদেবের বন্ধু। গোপালদেব যে দেশে মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে প্রজাদের মধ্যে শান্তি স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন জীমূতবাহন ও গোবিন্দ সে ব্যাপারে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন এবং তাঁরা প্রাণপণে গোপালদেবের আদর্শকে কার্যে রূপদান করতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। স্বার্থপর ধনিকশ্রেণীর অত্যাচার থেকে দরিদ্রকে রক্ষা করার জন্য গোপালদেবের নির্দেশে জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে এবং সুদীপ্তাকে সিংহাসনচ্যুত করার সময় গোপালদেবের পার্শ্বসহচর হিসেবে তাঁরা বিরাট ভূমিকা নেন। গোপালদেব রাজা হলে গোবিন্দ মহাবলাধ্যক্ষ ও জীমূতবাহন কোষাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হয়ে গোপালদেবের রাজকার্যে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। গোপালদেব তাঁর নাবালকপুত্র ধর্মপালের হাতে সিংহাসন সমর্পণ করে রাজ্য ত্যাগ করার পূর্বে নাবালক পুত্রের তত্ত্বাবধানের জন্য যে একটি শাসনপরিষদ গঠন করেন সেখানে গোবিন্দ ও জীমূতবাহন সদস্যরূপে মনোনীত হন এবং তাঁরা দুজন গোপালদেব প্রদত্ত গুরুদায়িত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেন। এইভাবে তাঁরা সর্বোতোভাবে গোপালদেবের সহায়তা করেছেন।

মাইকেল মধুসূদন

কেন্দ্রীয় চরিত্র মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনপথে গৌরদাস বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও হেনরিয়েটার সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁরা বাস্তব চরিত্র।

গৌরদাস বসাক : গৌরদাস মধুসূদনের অন্যতম বন্ধু। তিনি মধুসূদনকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তিনি মধুসূদনের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি সব সময় মধুসূদনের মঙ্গল চাইতেন, সাধ্যমত তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। একবার কিশোরী ঠাকুর মধুসূদনের আর্থিক কষ্টের কথা শুনে কোর্টে তাঁর জন্য দোভাষীর কাজের ব্যবস্থা করলে গৌরদাস সেই চাকুরী গ্রহণ করতে মধুসূদনকে রাজী করান।

তিনি অন্যান্য বন্ধুর মত তাঁর সাহিত্য প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন। মধুসূদনের মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা বর্তমান তা তিনি ছাত্রাবস্থায় বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রতিভা যাতে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে সেজন্য তিনি বন্ধুকে খুব অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিতেন। মধুসূদন মাদ্রাজে থাকাকালীন বাংলা ভাষা পড়তে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ দুশো টাকা ও রামায়ণ মহাভারত পাঠিয়ে দেন। মধুসূদন তাঁর প্রথম বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা' সাতদিনের মধ্যে লিখে দেবেন বলে ঘোষণা করলে গৌরদাসই সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন—

"মধুর এই বাংলায় নতুন নাটক লিখতে রাজী হওয়ার মধ্যে নিশ্চয় কেছুর একটা শুভ সূচনা হচ্ছে। তাই হোক, ঈশ্বর করুন যেন তাই হয়।" (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

লণ্ডনে মাইকেল ব্যারিষ্টারী পড়তে যাওয়ার কিছুদিনপর তাঁর স্ত্রী পুত্রকন্যাদের আর্থিক কষ্টের কথা জানতে পেরে তিনি হেনরিয়েটার ইচ্ছানুসারে তাঁদের লণ্ডনে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। মাইকেল যখন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন সে সময় তিনি বন্ধু যতীন্দ্রমোহনকে বলছেন—

"আমাকে তো থাকতেই হবে। আমি যে ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু। উৎসবে-ব্যসনে-রাজদ্বারে ওর সঙ্গে থেকেছি— আর আজ শ্মশানে থাকবো না? নিশ্চয় থাকবো।" (পঞ্চম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

এইভাবে গৌরদাস মধুসূদনের মৃত্যু পর্যন্ত বিশিষ্ট বন্ধু হিসেবে নিজ কর্তব্য পালন করে গেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :

মাইকেলের আর্থিক দুরবস্থার সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অর্থ সাহায্য না করলে মধুসূদনকে হয়তো আরো আগে মৃতুবরণ করতে হতো। এই আর্থিক সাহায্য মধুসূদনকে অনেক অপমানজনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে। বাড়ীওয়ালা যখন দীর্ঘদিনের বাড়ীভাড়া বাকী থাকার জন্য উচ্ছেদ করতে এলেন তখন বিদ্যাসাগর অর্থ দিয়ে সেই বিপন্ন অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। আবার ফ্রান্সে যখন মধুসূদন দেনার দায়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন সে সময় তাঁর অবস্থার কথা জানতে পেরে বিদ্যাসাগর এক বিরাট অঙ্কের ড্রাফ্‌ট পাঠিয়ে দেন। সেই অর্থে তিনি নূতন করে বেঁচে উঠলেন, তাঁর অসম্পূর্ণ ব্যারিষ্টারী পড়া সম্পূর্ণ হল। এইভাবে মাইকেল আমৃত্যু বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে আর্থিক ও মানসিক সাহায্য পেয়েছেন এবং মধুসূদনও উদার মহিমময় বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—

"......তুমি বিদ্যাসাগর। তুমি দয়ার সাগর। যদি কোনদিন আমার জীবনচরিত লেখা হয়, জানি না লেখার মত জীবন কিনা আমার-- তা হ'লে সেই জীবন কাহিনীর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।" (পঞ্চম অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

হেনরিয়েটা : হেনরিয়েটা মধুসূদনের দ্বিতীয়া স্ত্রী। বিবাহের পর তিনি চিরদিন স্বামীর সঙ্গে ছায়ার মত অবস্থান করেছেন। মধুসূদনের কাব্যসাধনায় যাতে কখনো ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। স্বামীর অমিতব্যয়িতা, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনকে তিনি হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন। স্বামীর অসীম গুণরাশির জন্য তিনি গর্ববোধ করতেন ও স্বামীকে সর্বদা অনুপ্রেরণা দিতেন। তিনি নিজের জন্য কিছুই করার চেষ্টা করেননি, তিনি ছিলেন স্বামীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। এই পতিপ্রাণা নারী স্বামীর মৃত্যুর পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই মহীয়সী নারীর ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করে মধুসূদন গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন—

"দুঃখ কোথায় জান আঁরিয়েত্তা ? আমি যখন থাকবো না, কবি মাইকেল মধুসূদনের নাম সবাই করবে, কিন্তু কেউ আঁরিয়েত্তার নাম করবে না। কেউ জানবে না যে কী দুঃখ কী কষ্ট স্বীকার করে, জীবন দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে, একটি ফরাসী মেয়ে কবির জীবনরক্ষা করেছে। নিজে তিল তিল করে মাইকেলকে অমর করেছে।" (পঞ্চম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

(ঙ) নেপথ্য চরিত্র ও পরিস্থিতি-পটভূমি রচনার জন্য ছোট ছোট চরিত্র

নেপথ্য চরিত্র :

(১) 'পিতাপুত্র' নাটকে পুলিশ সুপার ভুজঙ্গভূষণ মুখার্জীর দারোয়ান ছট্টু নেপথ্য চরিত্ররূপে নাট্য ঘটনা অগ্রসরে সহায়তা করেছে,—

নেপথ্যে মিঃ মুখার্জী- ওরে ছট্টু, সদরটা ভাল করে বন্ধ করে দে। শ্যামল এলে খুলে দিস।

নেপথ্যে ছট্টু-জী

বিনতি- (জানালার কাছে গিয়া) শ্যামল এলে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিস তো ছট্টু।

নেপথ্যে ছট্টু- আচ্ছা (সূচনা)

(২) 'সূচনা' অংশের অন্যত্র :

নেপথ্যে মুখার্জী- ছট্টু, সদর দরজা বন্ধ করেছিস ?

নেপথ্যে ছট্টু- জী

নেপথ্যে মুখার্জী- দেখিস, ম'রে থাকিস নে যেন। বুঝলি ?

(বাহিরে আবার সব চুপচাপ হইয়া গেল। একটু পরে পাশের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি বারটা বাজিল। বিনতি আলো কমাইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাহিরে হঠাৎ ছট্টু চীৎকার করিয়া উঠিল)

নেপথ্যে ছট্টু-হুজুর! ডাকু—ডাকু

নেপথ্যে লোক-চোপরাও উল্লুক।

(সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের শব্দ হইল। ছট্টুর আর্তনাদ শোনা গেল)।

নেপথ্যে ছট্টু- আঃ—

ছট্টু চরিত্রটি নাটকের মধ্যে কোথাও দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়নি। সে সর্বদা নেপথ্যে অবস্থান করেছে।

পরিস্থিতি রচনার জন্য চরিত্র :

ক) "তেরশো পঞ্চাশ' নাটকের শুরুতে দেখা যায়, গ্রামের সম্পন্ন কৃষক তারিণী মন্ডলের বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। সেই পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলার জন্য সেখানে কিছু চরিত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে—

সমস্ত স্টেজ অন্ধকার। শুধু এখানে ওখানে মশালের আলো জ্বালিয়ে লোকজন দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। চীৎকার ......আর্তনাদ ....অকস্মাৎ মশালধারী লোকগুলি বাড়ীর

বাহির হইয়া গেল। ....স্তব্ধতা ....বেশ বোঝা গেল বাড়ীটাতে ডাকাতের দল হানা দিয়াছিল। (ঘরে। এক)

খ) 'ক্ষুধা'র অষ্টমদৃশ্যে নেপথ্যে স্বদেশ গজেন রমেনকে প্রহারের শব্দ ও লোকজনের চীৎকার একটি পরিস্থিতি রচনা করেছে।

গ) "তোমার পতাকা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে মঞ্চের বাইরে থেকে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ও মাঝে মাঝে গুলির শব্দ ভেসে আসার মধ্য দিয়ে ইংরেজেব সঙ্গে স্বদেশীদের সংঘর্ষের পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

পটভূমি রচনার জন্য চরিত্র :

১) 'মালা রায' নাটকে কিছু চরিত্র পটভমি রচনা করেছে। যেমন, পঞ্চম দৃশ্যে আছে, গভীর অরণ্যে বেদেনীদের তাঁবুতে মালা, মায়া, কাজল ছোরা খেলা অভ্যাস করছে। এখানে কোন সংলাপ নেই, শুধু চরিত্রগুলি ক্রিযা করে যাচ্ছে।

২) শিয়ালদহ স্টেশনে আশ্রিত উদ্বাস্তুদের জীবনধারার একটি কপ 'খবর বলছি' নাটকে প্রারম্ভিক পটভূমি রচনা করেছে,—

"শিয়ালদহ ষ্টেশনের একাংশ। পিছনে দেওয়াল— দেওয়ালে বিচিত্র বিজ্ঞাপনের নামাবলী। সুবিশাল ষ্টেশনের কর্মব্যস্ততা ও কলরোল এই খন্ড স্থানটুকু হতেই অনুভূত হয। এখানে ওখানে সতরঞ্চি, শীতলপাটি ও মাদুর বিছাইয়া বাস্তহারারা, দেশ ও স্বদেশ বিচ্ছিন্ন নরনারীর দল বাসা বাঁধিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শিশু আছে, প্রৌঢ আছে, বৃদ্ধ আছে, আছে যুবতী নারী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা।" (প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

৩) 'ক্ষুধা'র প্রথম দৃশ্যের শুরুতে একটি পার্কের একাংশে লোকজনের যাতায়াতের মধ্য দিয়ে পটভূমি রচনা করা হয়েছে।

।। যাত্রা-নাটক ।।

নেপথ্য চরিত্র :

ক) 'রাষ্ট্রবিপ্লব' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যের কিছু নেপথ্য চরিত্র নাট্য প্রয়োজনে এসেছে। এইসব চরিত্র মঞ্চের অন্তরালে অবস্থান করে কেবল রাজা গোপালদেবের জয়ধ্বনি ('জয় গৌড় বঙ্গাধিপ শ্রী শ্রী গোপালদেবের জয়') করেছে।

খ) 'ভক্ত ভৈরব গিরিশচন্দ্র' নাটকের শেষ দৃশ্যে নেপথ্যে জন কোলাহলের মধ্য দিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রামকৃষ্ণের দর্শনার্থী অসংখ্য ব্যক্তির উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে।

পরিস্থিতি রচনার জন্য চরিত্র ।।

'সুরা নারী সিংহাসন' এর তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে নেপথ্যে রণকোলাহলের মাধ্যমে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে।

সূত্র পরিচিতি

1. Every great literary work grew from character, even if the author planned the action first. As soon as his characters were created they took precedence, and the action had to be reshaped to suit them.

—The Art of Dramatic writing : Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives, Lajos Egri, P. 88, New York, 1946.

2. The difference between a live play and a dead one is that in the former the characters control the plot, while in the latter the plot controls the characters.

—Play making—A Mannual of Craftsmanship, William Archer, P. 15, New York, 1960.

3. No one would contend that his plays owe their permanent place in literature to the quality of his plots. The interest which keeps them alive is the interest of the men and women in them.

—An Introduction to the Study of Literature, William Henry Hudson, P. 186, Delhi, 1976

4. Aristotle, on the Art of Poetry,-Translated by Ingram Bywater, P.P. 55-56, Delhi, 1987

5. A pivotal character is a driving force,.....

—The Art of Dramatic Writing: Its Basis in the creative Interpretation of Human Motives, Lajos Egri, P. 106, New York, 1946

6. He is the one who forces the other to grow.

—The Art of Dramatic Writing : Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives, —Lajos Egri, P. 108, New York, 1946

7. Indeed the intensity and meaning of the conflict lies in the disparity between the aim and the result, between the purpose and the achievement.

—Theory and Technique of Play writing and Screenwriting, John Howard Lawson, P. 165, New York, 1949

8. ...... The eternal contradiction between man's weakness and his courage, his frailty and his strength.

—Tragedy, F.L. Lucus, P. 65, London, 1972

9. To do nothing about it specially after the intervension of his father's ghost seems unthinkable. On the other hand his finer nature tells him that it is wrong to meet murder with murder, treachery with treachery.

   —Shakespeare and His Plays, H.M. Burton, P. 41, London, 1958

10. We shall devide conflict into four major divisions : The first will be 'static', the second 'jumping,' the third 'slowly rising' and the fourth 'fore shadowing.'

    —The Art of Dramatic writing, Lajos Egri, P. 122, New York, 1946

11. A minor character must play an essential part in the action.

    —Theory and Technique of Play writing and Screen -writing, John Howard Lawson, P. 283, New York, 1949

12. ..... desires come upon us and we cannot help undergoing them. They press or impel the agent with a weaker or stronger force.

    —Mind in Action, C.H. Whitely, P.42, London, 1973

13. Will or Willpower is the expression of fully developed character.. ...

    —Chracters and the conduct of Life, W. Mcdugal, P. 57, London, 2nd Edition.

14. Good orchestration is one of the reasons for rising conflict in any place.

    —The Art of Dramatic Writing, Lajos Egri, P. 111, New York, 1946

15. The Art of Dramatic Writing, Lajos Egri, P. 36, New York, 1946

16. "The personality is a special quality which the individual acquires in society in the sum total of relations of a social kind, in which the individual is involved......."

    —Quoted from A. N. Leontiev's unpublished manuscript, Studies in Psychology, A. V. Petrovsky, P. 215, Moscow, 1985.

17. The extrovert is then by nature a man of action, the introvert a man of thought......

    All temparament might be ranged in a scale, running from the extreme of introversion to the extreme of extroversion, and fortunately perhaps the great majority of men and wemen would stand in the middle part of such a scale,......

    —Character and Conduct of Life, P. 43, W. Mcdugal, London, 2nd Edition.

18. The unconscious is the larger circle which includes the smaller circle of the conscious; everything conscious has a preliminary unconscious stage......

—The Interpretation of Dreams, Sigmund Freud, P. 562, Great Britain, 19 .5

19. The ego represents what we call reason and sanity, in contrast to the Id which contains the passions.

—The Ego and the Id, Sigmund Freud, P. 30, London, 1927

20. Any mental process that differs from the usual is abnormal

—Elements of Psychology : Normal and Abnormal, V K. Kothurkar & L.B. Harolikar, P. 185, Bombay, 1961

21. Psychological approach to the drama is that which seeks to reach, through the drama's special artistic pathway, into the energic nature of mankind and draw therefore better understanding of humanlife in its individual and social needs and activities......

—Psychoanalysis and the drama, Smith Ely Jelliffe and Louise Brink, P. 2, New York, 1922

22. The Theatre Essays of Arther Miller.

—Edited by Robert, A. Martin, P. 62, New York, 1978

23. Greek Drama for Everyman, F. L. Lucus, P. 6, London, 1954

24. The Poetics of Aristotle, Edited with critical Notes and a Translation by S. H. Butcher, P. 23, London, 1936.

25. World Drama, Allardyce Nicoll, P.80, London, 1959

26. Ibid, P. 66

27. Ibid, P. 57

28. It was at the fount of Seneca that the early dramatists of the Renaissance fed, and without the influence of his writings we might never have had, in their existing form, the tragedies of Shakespeare.

—World Drama, Allardyce Nicoll, P. 133, London, 1959

29. World Drama, Allardyce Nicoll, Page 90, London, 1959

30. 'পঞ্চভূত', 'কৌতুকহাস্য' প্রবন্ধ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ৬১৮, বিশ্বভারতী প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৯১

31. "অসংগতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুকবোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখবোধ হয়।"

'পঞ্চভূত', 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ৬২০, বিশ্বভারতী প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৯১

32. "উদ্ভট অবস্থা ও অতিরঞ্জিত চরিত্র কল্পনার সহায়তায় আমাদের হাসির উপলক্ষ সৃষ্টি করে।" —বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, পৃঃ ৪৬, কলকাতা, ১৯৬৮
33. Shkespeare's Comic Theory, A T. Nelson, Page 20
34. নাট্যশাস্ত্র, ভরত, শ্লোকসংখ্যা ৪৯-৫০, ষষ্ঠ অধ্যায়।
35. সাহিত্য দর্পণ : বিশ্বনাথ কবিরাজ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, শ্লোক সংখ্যা-৩৫
36. ঐ, শ্লোক সংখ্যা -৩৭
37. ঐ, ঐ -৪২
38. ঐ, ঐ -৬৯
39. ঐ, ঐ -১৩৩
40 .....Social reform, equality of sexes and psychological problems so frequent in modern playwriting.

—Masters of the Drama, John Gassner, P. 752, Dover Publication, INC, 1954
41. মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য : থিয়েটার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, সম্পাদনা- দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, পৃ. ৬৩, কলিকাতা, ১৯৮৭
42. In a historical view, the clue to its essence is not form but content and purpose. Ultimately, it is the tragic spirit, the tragic sense of life.

—The Spirit of Tragedy, H. J. Muller, P. 14, Chapter-I, New York, 1956
43. The heroes of the new drama—in comparison to the old—are more passive than active, they are acted upon more than they act for themselves; they defend rather than attack; their heroism is mostly a heroism of anguish, of despair, not one of bold aggressiveness. Since so much of the inner man has fallen prey to destiny the last battle is to be enacted within, —The Sociology of Modern Drama, George Lukacs, taken from "The Theory of the Modern Stage", edited by Eric Bentley, P. 429, London, 1976.
44. বাংলা নাটকের ইতিহাস : অজিত কুমার ঘোষ, পৃ. ৪৫৬, কলকাতা, ১৯৭৬ (ষষ্ঠ সংস্করণ)
45. .....so depressed by their inadequacies that they seek refuge in alcohol.....

—Psychology of Personal and Social Adjustment, (2nd edition), Henry Clay Lindgren, P. 456-457, New York, 1959

46. The introverted ones are partly divorced from reality, they find their inspiration not in the outside world but within their own unconscious.....

—Normal and Abnormal Psychology, J. Ernest Nicole, P. 63, London, 1949.

47. Ibsen, The Master Builder and other Plays,

—Una Ellis-Fermor, P. 8, Great Britain, 1967

48. ......Personal suicide was an individual act of protest or declaration against either interpersonal hurts or transgressions against society, The motives were preservation of honor and dignity......

—Suicide in Different cultures. Edited by Norman L. Farberow, P. 2, USA, 1975.

49. Fear is the original reaction to the helplessness in the trauma which is then later reproduced in the danger situation as a signal for help.

—Inhibition, Symptom and Anxiety, Sigmund Freud, P 97, New York, 1927

50. Character is moulded by the family, which is described as the 'psychic agency of society.'

—Freud And the Post Freudians, : The Theories of Erich Fromm, Edited by J. A. C. Brown, P. 161, Great Britain, 1964.

51. The force of 'custom' determines every sphere of a Hindu's life.

—Studies in Indian Social Polity, Bhupendranath Datta, P. 455, Calcutta, 1944.

52, Mind and body are continually interacting in an infinite number of different ways.

—The Mind and its working, C. E. M. Joad, P. 49, Great Britain, 1927

53. Another aspect of reactive violence is the kind of violence which is produced by frustration.

—The Heart of Man, Its Genius for Good and Evil, Erich Fromm, P. 26, USA, 1964

54. It was in these women-only groups that women began to look at themselves through their own eyes rather than through those of men.

—Femininity as Alienation, Ann Foreman, P. 151, London, 1977.

55. ......today the contracts we have made with ourselves and with others are in a state of disequilibrium.

—Women in Transition, Judith M. Bardwick, P. 7, Great Britain, 1980.

56. ......the odd things of daily life do not usually cause a great deal of disturbance, but it is obvious that if they were to become more and more frequent and of gcater strength they would create a serious situation....

—How The Mind Works. David Cox, P. P. 42-43, London, 1964.

57. Environmental factors act to determine behavior at all levels of development.

—Psychology : The Science of Behavior, Robert L. Isaacson, Max L. Hull and Milton L. Blum P. 33, New York, 1965.

58. He lent his ears to advices of bad people.....

—Studies in Ancient India : Provatansu Maity, P. 515, Calcutta, 1982.

59. ......an individual cannot be moral until he develops a social consciousness.

—The Fundamentals of Psychology, Benjamin Dumville, P. 313, Great Britain 1938.

60. পিতার বিদ্যানুরাগ, সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা ও বাক্‌পটুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সহিত বিলাসিতা, অপরিমিতব্যয়িতা, আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি দোষও তিনি পিতার নিকট লাভ করিয়াছিলেন।

—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ১২, কলকাতা, ১৯২৫

61. বালক ও যুবক মধুসূদনের স্বাস্থ্য ছিল অটুট এবং সেই সঙ্গে ছিল অসীম আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা......

—কবিশ্রী মধুসূদন, মোহিতলাল মজুমদার, পৃ. ১৩, কলকাতা, ১৯৬৫

62. ......the calamities and catastrophe follow inevitably from the deeds of men.....

—Shakespearean Tragedy, A. C. Bradley, P. 7, New York, 1969.

63. ....the religion of the individual brings to a focus the mingled motives and desires of an unfulfilled life.

—The Individual and his religion, Gordon W. Allport, P. 10, New York, 1959.

64. গিরিশ মাথা তুলিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন—
তুমিই পূর্ণ ব্রহ্ম : তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা।
—শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীম-কথিত, পৃ. ৭৯৮, কলকাতা, ১৯৮৬ (নবম মুদ্রণ)

65. .....Other fonns of jealousy, as when a person is anxious for fear someone else will deprive him of his loved one
—Introduction to Psychology, Norman L Munn, P. 203, Oxford & IBH Publishing Co. Calcutta, 1969

66 To some extent, the rebellious person is also an immature person He has difficulty in controlling his impulses and lacks a sense of reality and proportion when it comes to real or fancied wrongs
—Psychology of Personal and Social Adjustment (2nd Edition), Henry Clay Lindgren, P. 448, New York, 1959.

67. দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গে এক চাষী-কৈবর্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাহারা দিব্বোক নামে এক নেতার অধীনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে।
—ভারতের ইতিহাস কথা (প্রথম খন্ড) : ডঃ কিরণ চৌধুরী, পৃ. ২৭৮, কলকাতা, ১৯৮৫

68. ....hostility engendered by envy and jealousy.
—The Heart of Man : Erich Fromm, P. 26, USA, 1964

69. প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের মধ্যে কেবল একজন ফিরিঙ্গি কবিওয়ালার পরিচয় পাওয়া যায়, ইহারই নাম এন্টনী, পুরা নাম হেন্সমান এন্টনি, জাতিতে ফিরিঙ্গি। ......হিন্দুঘরের এক ব্রাহ্মণ যুবতীকে লইয়া ইনি গরীটির (গেরুটী) নিকট বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ......বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার সংস্পর্শে আসিয়া এন্টনী প্রায় হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।
—প্রাচীন কবিওয়ালার গান, প্রফুল্ল পাল, পৃ. ৫। ৫ ॥, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮

70. ভীমের বন্দী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীমের বন্ধু ও সহায়ক হরি কৈবর্ত সৈন্য দলকে সংহত করিয়া রামপালের সম্মুখীন হইলেন।
—বঙ্গদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ : প্রথম পর্ব), সুশীলা মন্ডল, পৃ. ৫১, কলকাতা, ১৯৬৩

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

নাট্যসংলাপ

পাশ্চাত্য মত

সংলাপ নাট্য-দেহ রচনা করে।[১] নাটকের রূপাবয়ব মূলতঃ সংলাপ নির্ভর। নাট্যসংলাপ উক্তি প্রত্যুক্তি মূলক। সংলাপের মধ্য দিয়ে একটি কাহিনী গড়ে ওঠে ও সেই কাহিনী অগ্রসর হয়ে অভীষ্ট পরিণতি লাভ করে। সংলাপ নাট্যকাহিনী অগ্রসরের সহায়ক না হলে তার ভূমিকা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।[২] চরিত্রের বিভিন্ন ও বিচিত্র মানসিকতা, তার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ধ্যান ধারণা, অন্য চরিত্রের আচার আচরণ ও নানা ঘটনার সংঘাতে তার মনোজগতের প্রতিক্রিয়া সংলাপের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। তাই Aristotle সংলাপকে ব্যক্তির চিন্তাভাবনার বাহন বলেছেন।[৩] ঘটনার সূত্রপাত, বিস্তার ও পরিসমাপ্তি, চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও ক্রমবিকাশ, সমগ্র নাট্যকাহিনী এবং সর্বোপরি নাট্যকারের মূল বক্তব্য সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং নাট্যরচনার ক্ষেত্রে সংলাপের গুরুত্ব অপরিসীম।[৪] তাই সংলাপ রচনাকালে বিশেষ কতকগুলি রীতি অনুসরণ করা কর্তব্য।

নানা ঘটনার সমন্বয়ে একটি নাটক রচিত হয় এবং নাটকের সিদ্ধান্ত বাক্য গতিশীল ঘটনার দ্বারা নাটককে সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এই ঘটনাপ্রবাহ উপস্থাপনের জন্য সুপরিকল্পিত সংলাপ রচনা করা বাঞ্ছনীয়।

সংলাপের মাধ্যমে অতীতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয়। নাটকে অতীত ঘটনাকে বিশেষ কৌশলে পরিবেশন করতে হয়। উপন্যাসে যেমন ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দেওয়া যায় নাটকে তা সম্ভব হয় না কারণ নাটককে পরিমিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হয়। তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দিয়ে নাটক শুরু হয়। সংলাপের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া একান্ত কাম্য।

সাধারণতঃ নাটক অঙ্ক-দৃশ্য সমন্বিত। প্রত্যেকটি অঙ্ক তথা দৃশ্যে এক একটি বক্তব্য থাকে। কোন অঙ্কে যেমন ভূতপূর্ব ঘটনাকে তুলে ধরা হয়, তেমনি অন্য কোন অঙ্কে ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস থাকতে পারে। পরবর্তী কালে নাট্যঘটনা কি ঘটতে যাচ্ছে তার একটা সূত্র সংলাপের মধ্যে দিতে হয়।

নাটকে ঘটনা ও চরিত্রকে বিশেষ বিশেষ স্থান কাল পরিবেশে উপস্থাপিত করা হয়। চরিত্র ও ঘটনাকে যথাযথভাবে নাট্যোপযোগী করে তোলার পশ্চাতে এ তিনটির বিশেষ ভূমিকা আছে। উপযুক্ত সংলাপ-ই এই ভূমিকা সার্থক করে তুলতে পারে।

ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নাট্যসংলাপের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। আসলে নাটকের সংলাপ মাত্রই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ামূলক। শুধু তাই নয়, নাটকে প্রত্যেকটি সংলাপ উদ্দেশ্যমূলক ক্রমাবলীর দ্বারা নির্ধারিত হয়। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"Dialogue may be, first, a kind of response, consisting if involuntary speech responses to a speech stimulus or to remarks whose

content and sometimes even form have been "imposed" by an earlier remark."[৫]

নাটকে বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য ও তারল্য অনুসারে গভীর ও হালকা চালের সংলাপ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সংলাপ চরিত্রানুগ হবে। সংলাপের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন ধরণের চরিত্র যেমন, অধ্যাপক, কেরাণী, ধনী, চাষী, শ্রমিক প্রমুখ বাস্তবে যেভাবে কথা বলেন সেইভাব ফুটে উঠবে। এজন্য চরিত্রোপযোগী ভাষা ('language of own world') নাটকে সংযোজিত হবে। সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রের মনোগত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ ও সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা দরকার। এজন্য যথোপযুক্ত ও প্রকাশক্ষম নাট্য-সংলাপের ভাষা ('diction') গ্রহণ করা কর্তব্য। তবে এই ধরণের ভাষায় প্রয়োজনাধিক জোর ('over emphasize') দেওয়া অনুচিত এবং সেই সঙ্গে একে প্রয়োজনাতিরিক্ত অলঙ্কৃত ('over brilliant') করাও প্রার্থিত নয়।

বিশেষক্ষেত্রে আবেগের গুরুত্বক্রম অনুসারে সংলাপকে ক্রমোন্নত করে পরিবেশন করতে হয়। এটি নাট্যসংলাপ রচনার বিশেষরীতি। এর দ্বারা অভিনেতা অভিনেত্রী আবেগের চূড়ান্ত রূপটি অভিনয়ে প্রদর্শন করতে পারেন।

সংলাপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য গতিক্রম (tempo) এই গতিক্রম দর্শকমনে সামনে এগিয়ে চলার ভাবের ('sense of moving forward') সৃষ্টি করে। তাই গতিক্রম না থাকলে সংলাপ প্রাণহীন হয়ে পড়ে। নাট্যভাষার মধ্যে গতিময় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বোধ ('a sense of dynamic action') থাকা দরকার।

দার্শনিক George wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) রচিত 'The Science of Logic' গ্রন্থে 'Contradiction' সম্পর্কে আলোচিত 'dialectical' রীতির অনুসরণে বলা যায় নাট্যচরিত্রে দ্বন্দ্বের সৃষ্টির জন্য সংলাপে 'theses,' 'antitheses' ও 'syntheses' নিয়ে গড়ে ওঠা 'dialectical' পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। নাটকে একটি চরিত্র যে মনোভাব ('theses') প্রকাশ করেন, বিরোধী চরিত্র তার বিপরীত মনোভাব ('antitheses') ব্যক্ত করেন এবং এই দুই চরিত্রের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তৃতীয় মনোভাব ('syntheses') গড়ে ওঠে। সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারের এই রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এই পদ্ধতিতে সংলাপ রচিত হলে নাটকে রসঘন দ্বন্দ্ব দেখানো সম্ভব হয় এবং—

"These three steps—theses, antitheses and syntheses—are the law of all movements."[৬]

নাটক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। একে সাহিত্যগুণান্বিত করার জন্য ভাষায় আনন্দদায়ক আনুষঙ্গিক উপকরণ ('pleasurable accessories') থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। এজন্য ক্ষেত্র বিশেষে নাট্যভাষায় কাব্যগুণ আরোপ করতে হয়, আবেগের গভীরতা অনুসারে তাকে অলংকৃত করা দরকার।

নাটকের ভাষায় একটা মূল্যমান থাকবে। এজন্য সাধারণ শব্দ ('ordinary word'), অপরিচিত শব্দ ('strange word') ও অল্প পরিচিত শব্দের ('rare word') ব্যবহার

করা যেতে পারে অর্থাৎ সর্বপ্রকার মনোভাব প্রকাশের জন্য নানা ধরণের শব্দ প্রযোজ্য। তবে অপরিচিত ও অল্পপরিচিত শব্দপ্রয়োগ বেশি না করাই শ্রেয়। কারণ এর ফলে সংলাপ তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। সংলাপে জটিল বাক্য যতটা সম্ভব পরিহার করা কর্তব্য। বাক্য যেন অতিরিক্ত দীর্ঘ না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, প্রত্যেকটি বাক্যে প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ ('rightness of length') থাকবে।[৭] সংলাপ যথাসম্ভব ব্যবহারিক ভাষা-প্রকৃতির ('colloquial rhythm') নিকটবর্তী হওয়া কাম্য। নাট্য সংলাপ চরিত্রের কর্মাবলী ব্যাখ্যার সূত্র ধরিয়ে দেয় ও এটি আবার অন্যকে প্রভাবিত করে।[৮] এইভাবে নাট্যকার দর্শকের শ্রবণযোগ্য কতকগুলি বাছাই করা শব্দ (সংলাপ) নাটকে পরিবেশন করেন। সে শব্দগুলি এতই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যে দর্শক তা শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নাট্যকার এর অতিরিক্ত কিছুই করেন না।[৯] অথচ এর মধ্য দিয়ে নাটকেব ঘটনা, গল্প. চরিত্র এবং নাট্যকারের বক্তব্য সবকিছুই প্রকাশিত হয়।

নাটকে তিন প্রকার ভাষা, যথা, পদ্য সংলাপ ('verse dialogue') অলংকৃত সংলাপ ('rhetorical dialogue') ও সহজ গদ্য সংলাপ ('simple prose dialogue') ব্যবহৃত হয়। সহজ গদ্য সংলাপ কথ্য ভাষার নিকটবর্তী বলে তাকে স্বাভাবিক ভাষার সংলাপও বলা হয়।

নাটকের জন্মলগ্নে পদ্যসংলাপ নাট্য ঘটনা প্রকাশের বাহন ছিল। পরবর্তীকালে সংলাপে গদ্য গৃহীত হলে অলংকারবহুল গদ্যভাষার (rhetorical) ব্যবহার শুরু হয়। মঞ্চে Naturalism-এর প্রবর্তক Emile Zola (1840-1902) র নাটক 'Therese Raquin' (1873)-এর ভাষাও আলংকারিক ছিল। এ জাতীয় ভাষাব সংলাপ কবিতাতুল্য। এখানে অনুভূতি ('feeling') ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে পৌঁছয়। আলঙ্কারিক সংলাপে উদ্দীপক মেজাজ ('spirit of stimulation') থাকে। এ জাতীয় সংলাপে যেমন একদিকে বলিষ্ঠতা ('boldness') বর্তমান, অন্যদিকে সুরের আভাসও লক্ষ্য করা যায়। এ জাতীয় উপমা (simile). রূপক (metaphor) যমক (pun) প্রভৃতির সঙ্গে কখন কখনও বাক্যে চিত্রময়তা (imagery) প্রভৃতি থাকে।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে নাটকে ছন্দোময় সংলাপ পরিত্যক্ত হয়ে সহজ গদ্য সংলাপে নাটক রচনার বিশেষরীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়।

Henrik Ibsen, Swede August Stringberg (1849-1912), Anton Pavlovich Chekhov (1860-1904), Luigi Pirandello (1867-1936) প্রমুখ নাট্যকার এই জাতীয় ভাষায় নাটক রচনা করেন। Henrik Ibsen-এর নাটকে সহজ গদ্য সংলাপরীতি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত তাঁর A Doll's House (1879) গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে।[১০] সুতরাং সংলাপ সহজবোধ্য, সুস্পষ্ট এবং চরিত্রের মানসিক অবস্থা প্রকাশক্রম হওয়া প্রয়োজন।[১১] শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে এটি কাব্যগুণসম্পন্ন হতে হবে।

বর্তমানে কিছু নাটকে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থান ও চরিত্রের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্য নাট্যকার এই ভাষা গ্রহণ করে থাকেন। তবে আঞ্চলিক ভাষায় সম্পূর্ণ নাটকটি রচনা করা সম্ভব নয় কারণ নাটকটি এর ফলে দর্শকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। তাই আঞ্চলিক ভাষার একটা 'Flavour' বজায় রেখে তার ভঙ্গিটুকু শব্দে আরোপ করতে হয়।[১২]

প্রাচীন ভারতীয় মত

প্রাচীন ভারতীয় নাটকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত—দুই ধরণের ভাষা ব্যবহৃত হত। চরিত্রের শিক্ষা দীক্ষা, প্রচলিত দেশীয় ভাষারীতি (dialect) এবং চারিত্রিক স্তর অনুযায়ী চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহারের পদ্ধতি তৎকালীন নাটকে অনুসরণ করা হত। সেজন্য কিছু কিছু চরিত্র সংস্কৃতে আবার কোন কোন চরিত্র প্রাকৃতে সংলাপ বলতেন।

ধীরোদ্ধত, ধীরললিত, ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত চরিত্র, পরিব্রাজক, মুনি, বৌদ্ধ, চৌক্ষ, শ্রোত্রিয়, দ্বিজ, ব্রহ্মচারী, রাণী, বারবণিতা, স্ত্রী শিল্পী প্রমুখ সংস্কৃত সংলাপ ব্যবহার করতেন।[১৩]

প্রাকৃত ভাষার সাতটি শাখা— মাগধী, অবন্তিকা, প্রাচ্যা, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহ্লীকা, দাক্ষিণাত্যা।[১৪] প্রাকৃত সংলাপের ক্ষেত্রে রাজা ও অন্তঃপুরবাসিদের ভাষা ছিল মাগধী, চেট রাজকুমার ও শ্রেষ্ঠীদের ভাষা অর্ধমাগধী, বিদূষক প্রমুখের ভাষা প্রাচ্যা, ধূর্ত'র ভাষা অবন্তিকা, নায়িকা ও সখীদের শৌরসেনী, যোদ্ধা, নাগরিক ও দ্যূতকর প্রমুখের দাক্ষিণাত্যা, উদীচ্য অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলবাসী খসের নিজস্ব ভাষা বাহ্লীক।[১৫]

সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষায় রচিত নাটকে গদ্য ও পদ্য উভয় সংলাপই ব্যবহৃত হত। সংলাপে কখনো গৌড়ীরীতি (সমাসযুক্ত গাঢ়বদ্ধ পদ) আবার কখনো পাঞ্চালীরীতি (সমাসবদ্ধ নয় ও কোমল পদ) প্রযুক্ত হত।

নাট্যশাস্ত্রে কতকগুলি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। যেমন, ভূষণ (ornamental), অক্ষর সংঘাত (compact), শোভা (brilliant), উদাহরণ (parallel), লেশ (wit), সংক্ষোভ (concealed), অনুক্তসিদ্ধি (semi-uttered)[১৬] প্রভৃতি বহুপ্রকার নাট্যভাষা ব্যবহার করার রীতি ছিল। উপমা, দীপক, রূপক, যমক প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগে নাটকের কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হত। শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, সমাধি, মাধুর্য, ওজ, সৌকুমার্য, অর্থব্যক্তি, উদারতা, কান্তি প্রভৃতি কাব্যের দশটি গুণ নাট্যভাষায় একান্ত কাম্য ছিল।[১৭]

এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় নাটকে 'অপবারিতক' (কোন গোপন কথা [secret talk] এক চরিত্র অন্য চরিত্রের কাকে কানে বলছেন এমন ভাব প্রদর্শন করতে হবে, এর ফলে মনে হবে, মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য চরিত্র যেন সেই সংলাপ শুনতে পারছেন না), 'আকাশবচন' (এই রীতিতে মঞ্চে অনুপস্থিত কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে সংলাপ বলা হয় এবং অনুপস্থিত চরিত্রের সংলাপও মঞ্চে উপস্থিত ব্যক্তি বলে দেন [addressing someone who is not present on the stage]), 'জনান্তিক' (মঞ্চে একটি চরিত্র কথা বলছেন অথচ অন্যান্য চরিত্র যেন শুনতে পারছেন না [private personal address]) সংলাপ ব্যবহৃত হত। এছাড়া সে যুগের নাটকে 'আত্মগত' বচনরীতির বহুল প্রচলন ছিল। এই রীতিতে বিস্ময়, ক্রোধ, দুঃখ, ভয় প্রভৃতি যুক্ত আবেগাত্মক সংলাপ নাট্যচরিত্র ব্যবহার করতেন।[১৮] এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা বাঞ্ছনীয়, মঞ্চে যখন কোন চরিত্র একাকী জাগতিক বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত মনের ভাব ব্যক্ত করেন, দুঃখে ক্ষোভে বিস্ময়ে যে সংলাপ বলেন তাই আত্মগত বা স্বগতোক্তি (soliloquy)। আত্মনিরপেক্ষ সত্য (reality) সম্পর্কে যদি মঞ্চে একাকী উপস্থিত চরিত্রটি কিছু ব্যক্ত করেন তবে তাকে ছদ্ম-স্বগতোক্তি (pseudo-soliloquy) বলে। আবার বক্তার দৃষ্ট মৃত (dead)

অথবা অ-মানবিক (non-human) বস্তু সম্পর্কে মঞ্চে কোন ব্যক্তি একাকী সংলাপ বলে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুকে দর্শকের কাছে দৃশ্যমান করে তুললে তাকে ছদ্ম একোক্তি (pseudo-monologue) বলা হয়। এছাড়া একোক্তিও (Monologue) সংলাপে ব্যবহৃত হয়।

নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতও নাট্য-সংলাপ রূপে বিবেচিত। একে সুরেলা সংলাপ বলা যায়। বক্তব্যের স্পষ্টতা ও গভীরতা প্রকাশের জন্য অনেক সময় সঙ্গীতের আশ্রয় নিতে হয়। সহজ গদ্য সংলাপে যে মনোভাব ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না সঙ্গীতের মাধ্যমে তা স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত হয়। তবে নাটকে একই বিষয় একবার সহজ গদ্য সংলাপে এবং পরমুহূর্তে যেন সঙ্গীতে পরিবেশিত না হয়। এরূপ ঘটলে নাট্যসংহতি (dramatic compactness) নষ্ট হবে, নাট্যমিতাচারিতা (dramatic economy) থাকবে না, সংলাপ শিথিল (diffused) হয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় সঙ্গীতের ভাষার মত সঙ্গীতের সুর তাল লয় চরিত্রের মনোভাবের অনুরূপ হবে। করুণভাব প্রকাশ কালে তার মধ্যে চটুল ভাবের সুর ও কথা যেন প্রযুক্ত না হয়। নাটকে পরিবেশ-সৃষ্টির জন্য সঙ্গীত ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, যুদ্ধ, উৎসব, বিদ্রোহ প্রভৃতির পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনে অনেক নাট্যকার সঙ্গীত প্রয়োগ করেন।

যাত্রা-নাটকে সঙ্গীত অপরিহার্য অঙ্গ। এটি চার দেয়ালে বদ্ধ নাটক নয়। সেখানে অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে উন্মুক্ত স্থানে অজস্র দর্শককে সংলাপ শোনাতে হয়। তাই আবেগের গভীরতা যখন উচ্চগ্রামে প্রকাশ করতে হয় তখন গদ্য সংলাপই যথেষ্ট নয়। সে সময় একই বিষয় একবার গদ্য সংলাপে ও পরে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়।[১৯] সংলাপের সূত্র ধরে গান গাওয়ার রীতিকে 'উক্তি গীতি' বলে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লোকনাট্যে জুড়ির গানের ব্যবহার ছিল। জুড়িরা এই 'উক্তিগীতি' গাইতেন। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে জুড়িগানের চল কমে যায় এবং এই রীতি উঠে গেলেও যাত্রা-নাটক/লোকনাট্যে উক্তিগীতি থেকে যায়। বর্তমানে অভিনয় শিল্পীরাই এই গান পরিবেশন করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের কিছু নাটকে এই রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'রক্তকরবী' নাটকে অনেক অংশে বিশু যে মনোভাব সংলাপে ব্যক্ত করেছেন তা-ই গানের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে—

বিশু ।। মাঠের লীলা শেষ হল, খেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল। চলো প্রহরী, আর দেরী নয়—

।। গান ।।

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও বাঁধো আঁটি,
বাকি যা নয়গো নেবার মাটিতে হোক তা মাটি।[২০]

অধিকাংশ লোকনাট্যে বিবেকের গান থাকে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে লোকনাট্যে রূপক-চরিত্র বিবেকের প্রবর্তন হয়।[২১] বিবেক এখানে লোকের পাপপুণ্য ভাল-মন্দর বিচার করে, তাকে সাবধান করে, তার দুঃখকষ্টে সান্ত্বনা দেয়, নৈরাশ্যের মধ্যে আশার আলো জ্বালায়। কখন কখন নাট্যচরিত্রের কোন কার্যকে সমর্থন করে, তারমধ্যে গভীর ভাব জাগিয়ে তোলে, কর্মে উদ্দীপনা জোগায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক সাংকেতিক নাটকগুলিতে বিবেকের মত কিছু চরিত্রের আগমন ঘটেছে। যেমন 'শারদোৎসব' (১৩১৫) নাটকের ঠাকুরদা, 'রাজা' নাটকের বাউল ও পাগল, অচলায়তন (১৩১৮) নাটকের দাদাঠাকুর।

একথা ভুললে চলবে না যে নাটক সাহিত্যে,—কাব্য। তাই প্রয়োজনানুযায়ী তাতে সাহিত্যগুণ আরোপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই জন্যই কবি রাজশেখর প্রাকৃত ভাষায় রচিত 'কর্পূর মঞ্জরী' (একাদশ শতাব্দী) নাটিকার প্রস্তাবনায় বলেছেন— "উক্তিবিসেসো কাব্বা ভাসা জা হোই সা হোদু।"... অর্থাৎ ভাষা যাই হোক, উক্তি বিশেষই কাব্য। নাটকের ভাষাও সেইরূপ বিশিষ্ট উক্তি হওয়া চাই। সে ভাষা এলোমেলো অগোছালো হলে চলবে না। সুতরাং নাটকে সহজ ভাষায় সংলাপ লিখিত হলেও তা যেন বিশৃঙ্খল বা অপ্রয়োজনীয় না হয়। সংলাপকে ছাটাই বাছাই করে সংহতরূপে নাটকীয় প্রয়োজনানুসারে প্রয়োগ করতে হবে।

উল্লেখিত তত্ত্ব অবলম্বনে বিধায়কের থিয়েটারী নাটক ও যাত্রা-নাটকের সংলাপ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত করা হচ্ছে।

সংলাপের মাধ্যমে ঘটনা উপস্থাপনা

'মেঘমুক্তি' নাটকে অণিমা ও প্রদ্যোতের (স্বামী-স্ত্রী) নিম্নলিখিত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে--

অণিমা- তোমার এই রুটিন আর কতদিন কন্টিনিউ করবে ?

প্রদ্যোত- রুটিন ; কোন্ রুটিন ?

অণিমা- এই রাত্রি আটটায় বেরিয়ে, ভোর আটটায় বাড়ি ফেরা ?

প্রদ্যোত- ও—বোধহয় আরও কিছুদিন।

অণিমা- তোমার এই উদাসীনতা কিন্তু সব সময় সাধুতার পরিচয় দেয় না।

প্রদ্যোত নাই বা দিল, সাধুতার পরিচয়ের জন্য আমি তো বিশেষ ব্যগ্র নই। (মেঘসঞ্চার)

সংলাপে অপ্রকাশিত অতীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রকাশ

'দ্বিধা' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রত্নার অতীত জীবনের বিশেষ ঘটনা রত্না ও তার দুই দাদা প্রশান্ত, প্রিয়ব্রতর কথোপকথনের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়েছে,—

রত্না : ......মাঝে মাঝে তোমাদের Socalled ভগ্নীপতি এসে দু একশো করে টাকা নিয়ে যান।

প্রশান্ত : আর তুই তাকে স্বামী বলে স্বীকার করে টাকা দিস ?

প্রিয় : না না বিয়ে একটা হয়েছিল।

প্রশান্ত : হ্যাঁ তা হয়েছিল। কিন্তু বাসি বিয়ে হয়নি। কুশণ্ডিকা হয়নি। ফুলশয্যা হয়নি। এক কথায় কিছুই হয়নি। বিয়ের আগে পণের দেড় হাজার টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও অবিনাশের ওই ছোটলোক বাপটা—আরো এক হাজার

টাকা দেবার জন্য চাপ দিতে লাগলো। ভোরের দিকে বাবা আর সহ্য করতে না পেরে লোকটার পায়ের ওপর পড়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাবার প্যারালিসিস স্টার্ট হয়ে গেল। তারপর ? মনে আছে ছোড়দা ?

প্রিয় : নিশ্চয়। সেদিনের কথা জীবনে ভুলবো ? ভোরবেলায় বাসরে ঢুকে দেখি অবিনাশ জ্বরে অচৈতন্য। সারাগায়ে তার ইরাপ্‌সন বেরিয়েছে। শ্যাম ডাক্তার এসে দেখে বললো, রতুকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ো না। জামায়ের গায়ে এগুলো—

প্রশান্ত : সিফিলিটিক ইরাপ্‌সন। এই তো তোর বিয়ের ইতিহাস। একে তুই যদি বিয়ে বলিস্ তো বল্, আমি বলবো না। No, Never (তৃতীয় পর্ব, দ্বিতীয় দৃশ্য)

সংলাপে ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাস

'তোমার পতাকা' নাটকে গান্ধীবাদী নেতা অনুকূল বিশ্বাসের নেতৃত্বে তাঁর অনুগামী দল যে স্থানীয় ইংরেজ আদালত ও কালেকটরি অধিকার করতে যাচ্ছেন সেই ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা অনুকূল-শিষ্য নবীনের সংলাপে প্রকাশিত—

নবীন : প্রিয় বন্ধুগণ : আগামী কাল ২৯ শে সেপ্টেম্বর, আমাদের মহা অগ্নি-পরীক্ষার দিন। কালকে আমাদের নেতা অনুকূল বিশ্বাসের নির্দেশে ও নেতৃত্বে ইংরেজের আদালত কালেক্টরি দখল করতে হবে। শহর থানা থেকে তিন মাইল দূরে, অতএব আজ ভোর রাতেই আমাদের যাত্রা করতে হবে। (প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

সংলাপের মাধ্যমে পটভূমি রচনা

'পিতাপুত্র' নাটকে দেখা যায়, একদল ডাকাত পীরপুরের জমিদারবাড়ী আক্রমণ করেছে। তাদের আক্রমণের প্রাথমিক পর্বের রূপটি জমিদার বাড়ীর বধূ সরমা ও চাকর মধুর উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে সার্থক পটভূমি রচনা করেছে।

সরমা : কী ? কী খবর মধু ? কী হয়েছে বাইরে ?

মধু : সর্বনাশ হয়েছে বৌরাণী।

সরমা : খালি সর্বনাশ হয়েছে বললে আমি কি বুঝবো ? কি হয়েছে তাই বল্ না ?

মধু : বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, ওরা দেউড়ী ভাঙবার চেষ্টা করছে। পালান বৌরাণী—পালান নইলে—

সরমা : দেউড়ী ভাঙবার চেষ্টা করছে ? আমাদের দারোয়ানগুলো কোথায় ? তারা সব কি করছে ?

মধু : তাদের সব কজনই পালিয়েছে। শুধু জমাদার হরনাম সিং বন্দুক নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল— সে মারা গেছে। (সংঘাত)

সংলাপ দ্বারা স্থান-কাল-পরিবেশ-সৃষ্টি

'ক্ষুধা' নাটকে একটি উৎসব বাড়ীর দৃশ্য রয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সেই উৎসবের স্থান কাল পরিবেশ দর্শকের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

মহেশ : কি রকম হচ্ছে খুড়োমশায়— কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ?

সুবল : নাঃ। সার্থক আয়োজন করেছ মহেশ, কোন কিছুর অভাব নেই।

মহেশ : তাও ইচ্ছেমত যোগাড় করতে পারলুম কোথায় খুড়োমশায়!

সুবল : না বাবা, তাও যা যোগাড় করেছ—আশ্চর্য!

মহেশ : কোন কিছু পাবার উপায় নেই বাজারে খুড়োমশায়; যা চাইবেন, তাই নেই; আপনি ব্ল্যাকের দাম দিন, দেখবেন সবই আছে।
(সদা ও গজার প্রতি)
হ্যাঁ; আস্তে আস্তে খান। কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ?

সদা : না———না

মহেশ : পেট ভরে খান—কেমন ?

সদা : আজ্ঞে, কিছু বলতে হবে না;

মহেশ : ওরে যে ক'জন মেয়েছেলে বাকী আছে, বসিয়ে দে; অনর্থক রাত করে লাভ নেই। আচ্ছা—আমি একবার ওপরটা ঘুরে আসি খুড়োমশায়—।

(অষ্টম দৃশ্য)

চরিত্রানুগ সংলাপ

(ক) 'মাটির ঘর' নাটকের সত্যপ্রসন্ন ধীর স্থির শান্ত ভদ্র। অন্যদিকে তাঁর দ্বিতীয় জামাতা চঞ্চল দুর্বিনীত, উদ্ধত প্রকৃতির। উভয়ের কথোপকনে দুই বিপরীতমুখী চরিত্রের রূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছে—

চঞ্চল : এই রকম আস্পর্ধা দিয়েই তা ওর মাথাটি আপনি খেয়েছেন। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, অথচ স্বামীর ঘর করবার মত করে তার মনকে তৈরী করেননি। খুব শিক্ষা দিয়েছেন তাকে।

সত্য : (শান্ত কণ্ঠে) চঞ্চল, আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা কওয়াটা কি তোমার উচিত হচ্ছে বাবা ? আমি তোমার পিতার তুল্য।

চঞ্চল : পিতৃভক্তি আজ নতুন করে আপনার কাছে না শিখলেও আমার চলবে। কিন্তু এ সব বাজে কথা আলোচনা করবার সময় আমার নেই। এক কথায় আমার জবাব দিন। নন্দাকে আমার সঙ্গে পাঠাবেন কিনা ?

সত্য : না।

চঞ্চল : এই আপনার উত্তর ?

সত্য : শুধু এই আমার উত্তর নয়— এই আমার শেষ উত্তর এবং আজীবনের উত্তর।

(তৃতীয় দৃশ্য)

(খ) 'তোমার পতাকা' নাটকের প্রধান চরিত্র অনুকূল বিশ্বাস গান্ধীবাদী স্বদেশী নেতা। অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী অনুকূলের প্রধান অবলম্বন মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস। স্থানীয় দারোগা বিভূতি ভড় জোর করে তাঁদের সমস্ত চাল, এমন কি গর্ভবতী গাভীকে নিয়ে চলে গেলে অনুকূল তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিম্নলিখিত সংলাপটি বলেন। এই সংলাপে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে,—

অনুকূল- অস্থির হ'য়ো না হিমু। যে বিধাতা ওদের হাতে অত্যাচার করবার অস্ত্র দিয়েছেন, তিনিই আমাদের মনে সহ্য করবার শক্তি জুগিয়ে চলেছেন। অসুরের কাছে মাথা নীচু করলে অসুরের জয় হয় না হিমু— হয় দেবতার পরাজয়। অতএব মনে মনে বলো, আরো আঘাত সইবে আমার, আরো আঘাত।

(প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

সংলাপে আবেগময়তা

'সুরা নারী সিংহাসন'-এ মৃত্যু পথযাত্রী মহীপালের উক্তি—

না। বন্ধুহীন, বান্ধবহীন, অভিশপ্ত রাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিদায় নেবার মুহূর্তে— ভূমিশয্যা হোক তার শয্যা। চোখের জল হোক তার পানীয়। প্রজাদের কাছ থেকে নুন খেয়ে অনেক বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, কিন্তু আজ জীবনদেবতা— চোখের জলের মধ্যে দিয়ে যে জল আমাকে পান করালেন সে তাঁর চরণামৃত। তাই আমাকে আকণ্ঠ পান করতে দাও। (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

আবেগের গুরুত্ব অনুযায়ী ক্রমোন্নত ভাবপ্রকাশক্ষম সংলাপ

(ক) 'মাইকেল মধুসূদন' লোকনাট্যে দেখা যায়, মধুসূদন ভার্সাই শহরে চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েছেন। সে সময় একদিন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রেরিত এক বড় অঙ্কের ড্রাফ্‌ট পান। নূতনভাবে বাঁচার আনন্দে মধুসূদন আবেগ-উদ্বেল হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর মনের আবেগ সেই মুহূর্তে স্ত্রী আঁরিয়েত্তা ও বন্ধু মনোমোহনকে ব্যক্ত করেন। সে সময় তাঁর আবেগ উচ্চ থেকে উচ্চগ্রামে পৌঁছতে থাকে। এই ক্রমোন্নত ভাব তাঁর সংলাপে সার্থকভাবে ধরা পড়েছে।

মধু ।। আঁরিয়েত্তা! আঁরিয়েত্তা! বিদ্যাসাগর আমাকে বিরাট এক অঙ্কের ড্রাফ্‌ট পাঠিয়েছে। আবার সেই-ঈশ্বর নয়-ঈশ্বরচন্দ্র। আবার আমাকে সে রক্ষা করলো। আঁরিয়েত্তা! মনু! Again I am saved (এগেন আই অ্যাম্ সেভ্‌ড্) আবার বেঁচে গেলাম। আবার 'গ্রেজ ইন্‌ন'-এ ভর্তি হবো। দেশে যাবো, নাম করবো, টাকা আনবো, কাব্য লিখবো। আর মরণ নয় আঁরিয়েত্তা, জীবন—স্বচ্ছ সুন্দর সূর্যালোকিত জীবন। সেই জীবনের গান গাইবো আঁরিয়েত্তা। এবার থেকে আমরা সেই বাঁচার গান গাইবো। (চতুর্থ অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

(খ) 'কালভৈরব', অথবা 'ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্র' লোকনাট্যে গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর কাছে ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরিত্র মাহাত্ম্য বর্ণনাকালে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সংলাপের মধ্যে আবেগের ক্রমোন্নত ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে,—

গিরিশচন্দ্র ।। বিনোদ, তারপর যে ঘটনা ঘটলো সে আমি তোমায় বোঝাতে পারবো না। সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে ঠাকুর নাচতে আরম্ভ করলেন— গানে-নাচে মন্দির প্রাঙ্গণ উত্তাল, উদ্দাম হয়ে উঠলো। নেশা করবো কি, ঠাকুরের নেশা দেখে আমার নেশা ছুটে যেতে লাগলো। ঠাকুর নাচছেন, মেয়েরা নাচছে, আমি নাচছি। নাচের তালে তালে অপরূপ ভঙ্গিমায় ঠাকুরের শরীর দুলছে—দুলছে—দুলছে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির দুলছে, হঠাৎ আমার মনে হল, এই নাচের তালে তালে স্বর্গ দুলছে—মর্ত্য দুলছে, বিশ্বসংসার দুলছে। ঠাকুরের চরণ-দোলায় দুলছে নোটো গিরিশ ঘোষের জন্ম-মৃত্যু কামনা বাসনা। আলো-আলোয় আলোময় হযে উঠছে পৃথিবী।

(চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রকাশক্ষম সংলাপ

'ক্ষুধা' নাটকেব ষষ্ঠদৃশ্যে নাট্যকার তিনটি চরিত্রের সংলাপেব মধ্য দিয়ে তাদের পারস্পরিক মানসিক সংঘাতের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। ধনী শ্যামলাল বাবুব অনুকূলো সহায়সম্বলহীন রমেন নিজের কর্মকুশলতার দ্বারা চাকুরী ক্ষেত্রে উচ্চপদ-মর্যাদা লাভ করে। শ্যামলালবাবুর একান্ত ইচ্ছা ছিল, রমেনের সঙ্গে তাঁর একমাত্র কন্যা অনসূযার বিবাহ হোক। কিন্তু একদিন তিনি জানতে পারেন রমেন মানবী নামে একটি মেয়েকে ভালবাসে। সেকথা শোনামাত্র তিনি রমেনকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে রমেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয়। এদের কথোপকথনেব মাঝে অনসূয়াও তার বক্তব্য রাখে। এইভাবে সংলাপগুলি মানসিক জগতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করে নাটককে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

শ্যামলাল : মানবী চৌধুরী বলে কোন মেয়েকে তুমি চেন ?

রমেন : হ্যাঁ চিনি।

শ্যাম : কে মেয়েটি ?

রমেন : তিনি জগৎ চৌধুরী নামে এক দরিদ্র ভদ্রলোকেব নাতনী। আমরা তিনি বন্ধু একখানা ঘর নিয়ে সে বাড়ীতে ভাড়া থাকতাম।

শ্যাম : মেয়েটি তোমার ঘরে আসতেন ?

রমেন : হ্যাঁ।

শ্যাম : কেন ?

রমেন : এ কেন'র জবাব দেওয়া একটু কঠিন। তাহলেও যখন জানতে চাইছেন, তাই বলছি। মাঝে মঝে যখন আমাদের খাওয়া জুটত না, তখন লুকিয়ে সে খাবার দিয়ে যেত।

শ্যাম : তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি— সেই কথা বল।

রমেন : আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। আমি মানুষ হয়ে তার কাছে ফিরে যাব বলে..... তাকে অপেক্ষা করতে বলে-চলে এসেছি।

অনসূয়া : শুনলে বাবা, শুনলে !

শ্যাম : আমায় এ কথা আগে বলনি কেন ?

রমেন : এ-ত ব্যক্তিগত ব্যাপার— আপনাকে জানাবার দরকার হবে— ভাবিনি।

শ্যাম : তোমার জোর করে আমাকে বলা উচিত ছিল।

রমেন : অনুর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব যতবারই করেছেন আমি আপত্তি করেছি। আপনি আমার কথায় কান দেননি।

শ্যাম : এ বিয়ে হলে অনুর কত বড় সর্বনাশ হত, তা বুঝতে পারছো।

অনসূয়া : কত বড় একটা ক্রিমিনাল ঘরে এনে ভাত কাপড় দিয়ে পুষছিলে— আজ বুঝতে পারছো কি বাপী ?

রমেন : কাকে তুমি ক্রিমিনাল বলো ? যে সত্যিকারের মানুষ হবার চেষ্টা করে, সে কি ক্রিমিনাল ? কথা দিয়ে যে কথা রাখতে চায়, সে কি ক্রিমিনাল ? এই যদি তোমাদের অভিধানে ক্রিমিনাল-এর মানে হয়—I would prefer to remain a criminal throughout my life.

'Theses', 'anti-theses' ও syntheses'
নিয়ে গড়ে ওঠা 'dialectical' পদ্ধতি অনুসারী সংলাপ

'মাইকেল মধুসূদন' লোকনাট্যে রেভারেন্ড কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে মনোভাব (theses) ব্যক্ত করেছেন মাইকেল মধুসূদন তার বিরোধিতা করে বিরুদ্ধ মনোভাব (anti-theses) প্রকাশ করেছেন এবং উভয়ের মতবিরোধিতার ফলে তৃতীয় মনোভাব (syntheses)-এর সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নলিখিত নাট্যসংলাপ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণঃ—

রেভারেন্ড : তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে জীবনে আর মদ খাবে না, তাহ'লেই—

মধুসূদন : যে প্রতিজ্ঞা ক'রে রাখতে পারবো না—সে প্রতিজ্ঞা মাইকেল মধুসূদন দত্ত করে না।

রেভারেন্ড : তা হ'লে শুনে রাখো— যে জীবনের উন্নতিব পথে মদ না খাবার প্রতিজ্ঞা করতে পারে না, তার হাতে রেভারেন্ড কৃষমোহন ব্যানার্জী তার একমাত্র মেয়েকে দিয়ে, মেয়ের জীবন নিয়ে জুয়ো খেলতে পারবে না।

মধু : খুব ভালো। তা হ'লে এই আপনার শেষ কথা ?

রেভা : হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা। একটা উচ্ছৃঙ্খল মাতালের হাতে মেয়ে দিয়ে আমি আমার মেয়ের জীবনটা নষ্ট করতে পারবো না। কিছুতেই না। (প্রস্থান)

মধু : প্রতিজ্ঞা না করলে দেবকীকে পাবো না ? কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবো না, তা আমি কেন করবো ? দেবকী আমার প্রথম প্রেম। তাকে না পেলে— কিন্তু— না। মিথ্যে প্রতিজ্ঞা ক'রে তাকে আমি পেতে চাই না। না না না———

(প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

সংলাপে ব্যক্তিচরিত্রের মানসিক অবস্থা ও অনুভূতির প্রকাশ

(ক) 'মাটির ঘর' নাটকে দেখা যায় সত্যপ্রসন্ন একটির পর একটি দুর্যোগে ভেঙ্গে পড়েননি, কিন্তু যেদিন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ও শেষ অবলম্বন জ্যেষ্ঠজামাতা কল্যাণের মৃত্যু হল সেদিন কিন্তু তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। দুঃখের অভিঘাতে জগৎপিতা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাঁর মন অভিমানে ভরে উঠল— আর্তকণ্ঠে, ক্ষুব্ধ আবেগে তিনি বলে উঠলেন—

(উপরের দিকে চাহিয়া ঘুসি তুলিয়া) .....স্টুপিড্। তুমি স্টুপিড্। আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি— আমাকে তুমি কাঁদাও। আমি কাঁদবো না— আমি কাঁদবো না। (হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল) কিছুতেই কাঁদবো না। (২য় দৃশ্য)

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় নাট্যকার যে সত্যপ্রসন্নর মুখ দিয়ে ঈশ্বরকে স্টুপিড বলেছেন অনেকের মতে, এটি অনুচিত। মঙ্গলময়, জ্ঞানময় ঈশ্বরকে স্টুপিড বলে গাল দেওয়াটা নাট্যকারের অজ্ঞানকৃত ধৃষ্টতা বলে তাঁরা মনে করেন। অন্য একজন সমালোচক এই মন্তব্য করেছেন যে, ভগবানে বিশ্বাসী সত্য প্রসন্ন আঘাতে আঘাতে নাস্তিক হয়ে ঈশ্বরকে স্টুপিড্ বলেছেন এবং এটাই 'মাটির ঘর'-এর প্রকৃত ট্র্যাজেডি। এ বিষয়ে সত্য প্রসন্ন চরিত্রে রূপদানকারী, নাট্য সমালোচক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর 'থিয়েটার প্রসঙ্গে' গ্রন্থের অন্তর্গত 'স্টুপিড' নিবন্ধে বলেছেন—

"সত্যপ্রসন্নর শেষ উক্তিকে আমি নাস্তিকের উক্তি মনে করি না, মহাভক্তের উক্তি বলে মনে করি এবং সেই ভেবেই অভিনয় করে এসেছি। .....ভগবানকে কটূক্তি করলেই অভক্তি কিংবা অবিশ্বাস প্রকাশ পায় না, হিন্দুর পুরাণে এর সাক্ষ্যের অভাব নেই। ....ভগবানকে দূর, বিরাট, সম্ভ্রমের বস্তু ভেবে হিন্দুমন তুষ্ট থাকেনি। আত্মীয় করে, আপনজন করে ভেবে তবে তৃপ্তি পেয়েছে। আপনজনকে বোঝবার ভুল হতে পারে, মনোমালিন্য হতে পারে, কিন্তু ব্যবহার শত্রুর মতো হয় না, পরের মতো হয় না, ক্রোধ জন্মায় না, জন্মায় অভিমান। সত্যপ্রসন্নর শেষ উক্তিটি পরিপূর্ণ অভিমানে ভরা।"[২৩]

(খ) 'তেরশো পঞ্চাশ' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারিণী মণ্ডল গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। কিন্তু বন্যায় তার জমি-সম্পত্তি ভেসে যাওয়ায় সে নিঃস্ব অবস্থায় তার পুত্রকন্যার সঙ্গে কলকাতায় এসেছে। সেখানে তাকে অত্যন্ত হীন অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করতে হচ্ছে। তাই তার মনোবেদনার শেষ নেই। তার মনের বিশেষ অবস্থাটি তার সংলাপে সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

গৌরী : তুমি ভিখিরি, অমন কথা বলো না বাবা!

তারিণী : কেন, বলবো না কেন? ......আমি ময়না গাঁয়ের তারিণী মণ্ডল, গত বছর এই সময় আমি দু'হাজার বিঘে জমির মালিক, আর আজ? এক চন্দনার বানে আমার সব পয়সা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল; ফুটপাতে এসে বাসা বেঁধেছি, ধোয়াকাপড় পরা ভদ্দরলোক দেখি, আর তার কাছে গিয়ে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে হাত পেতে দাঁড়াই। ভিখিরি নয়তো কী? (বাইরে। দুই)

'মাইকেল মধুসূদন' লোকনাট্যে রাজনারায়ণ দত্ত'র সংলাপ অংশটি তাঁর বিশেষ অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। মধুসূদন খ্রীষ্টধর্মগ্রহণ করার পর পিতা রাজনারায়ণের যে মানসিক অবস্থা হয়েছিল নিম্নলিখিত অংশে তা মর্মস্পর্শীভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

রাজনারায়ণ : মধুর মনে আঘাত লাগবে বলে ভয় পাচ্ছ বড়বৌ? কিন্তু আমাদের মনে যে আঘাত লেগেছে, —কই, মধু তো সে কথা একবারও ভাবছে না? একবারও তার মনে হচ্ছে না যে তার খ্রীশ্চান হয়ে যাওয়াতে তোমার বুক ভেঙে যেতে পারে,— আমার বয়স হয়েছে— আমার একমাত্র পুত্র, একমাত্র অবলম্বন হারিয়ে আজ আমার মৃত্যু হ'তে পারে?

(প্রথম অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

কাব্যধর্মী গদ্য-সংলাপ

ক) 'বিশ বছর আগে' নাটকের কিছু সংলাপ—

প্রদীপ : চেয়ে দেখ, বাইরে ওই চাঁদের আলো। সমস্ত পৃথিবী নিঃশব্দে ওই আলোতে স্নান করছে। আমাদের ওঘরের জানালা দিয়ে নেমে এসেছে সেই আকাশের আশীর্বাদ। (তৃতীয় দৃশ্য)

(খ) 'দ্বিধা' নাটকে রত্নাকে লেখা বিভাসের চিঠির অংশ বিশেষ—

ঝিনুকের বুকের মধ্যে স্বাতী নক্ষত্রের জল যে লগ্নে পড়লে মুক্তার জন্ম হয়— ঠিক তেমনি করেই নারীর দৃষ্টি পড়লে পুরুষের বুকের মধ্যে প্রেমের জন্ম হয়।

(দ্বিতীয় পর্ব, ৬)

হালকা চালের সংলাপ

ক) 'তাইতো' নাটকে দেখা যায়, সমর নামে এক ব্যক্তি বিধবাবিবাহ করবে বলে বিজ্ঞাপন দিলে মল্লিকা নামে এক মহিলা বিধবা পরিচয়ে সমরের কাছে যায় ও তাকে বিবাহ করার জন্য সমরকে রাজী করায়। কিন্তু বিবাহের পর সমরের সঙ্গে মজা করার জন্য সে কল্পিত স্বামীর সম্পর্কে নানা কথা বলে সমরের মনকে বিষণ্ণ করে তোলে। সমর-মল্লিকার সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার সেই মজাটুকু দর্শকদের উপহার দিয়েছেন,—

সমর : কাঁদছো কেন, না বললে আমি কিছুতেই চা খাবো না।

মল্লিকা : তুমি রাগ করো না, আমার 'আগের উনি'ও অমনি করে বলতেন কিনা, তাই—

সমর : আগের উনি!

মল্লিকা : হ্যাঁ। সকালে আমি চা নিয়ে এলে আমার 'আগের উনি'ও অমনি করে বলতেন কিনা— 'চা এনেছো? রাখো ওইখানে, এই লাইনটা পড়েই যাচ্ছি'— তাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল—

সমর : আগের উনি— মানে প্রথম পক্ষের তিনি? তিনিও এসে জুটেছেন তা হলে?

মল্লিকা : অমন করে বোল না, আমার মনে কষ্ট হয় না?

(চলিয়া গেল। সমর কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল)

সমর : মজা দেখছো ; বিয়ে হয়ে গিয়ে ফুলশয্যাটি যেই পার হয়ে গেল, তার পরের দিন ভোর থেকেই আগের উনিটি এসে জুটেছেন। ব্যাটাচ্ছেলে মোটর চাপা পড়েছে— ওর আত্মার তো গতি হবে না, এখানে চেপে বসে আমার আত্মার দুর্গতি করবে 'আগের উনি'— তাই তো! (তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য)

খ) 'অতএব' নাটকের সংলাপের কিছু কিছু অংশে হালকা আমেজের সৃষ্টি করা হয়েছে—

হেম : না। মন বলে কিছু নেই মেয়েদের। যে সব মেয়ের ওটা আছে বুঝতে হবে জীবন নিয়ে তারা জুয়ো খেলছে। গা থেকে যৌবনের Water Colour যেদিন মুছে যাবে—

নয়ন : Sorry to ইন্টারাপ্ট you আন্টি। ওটা Water Colour হবে না— অয়েল কালার হবে। ঐ যে লোকে বলে না— তোর তেল হয়েছে — জল হয়েছে তো বলে না। (প্রথম অঙ্ক। পঞ্চম দৃশ্য)

গ) 'রাষ্ট্রবিপ্লব' লোকনাট্যের এক স্থানে রয়েছে, কালিদাস নামে এক গ্রামবাসী রাজা গোপালদেবকে চেনে না। এদিকে গোপালদেব ছদ্মবেশে গৌরদাস নাম নিয়ে এক গ্রামবাসী সেজে গ্রামের কাজকর্ম করছেন এবং কালিদাসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। একদিন গোপালদেব প্রসঙ্গ উঠতে কালিদাস গ্রামবাসীর কাছে নিজের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য ছদ্মবেশী গোপালদেব ও অন্য এক গ্রামবাসী অনুকূলকে গোপালদেব ও তাঁর স্ত্রী দেদ্দা সম্পর্কে অলীক কাহিনী শোনাতে শুরু করে। এর ফলে কালিদাসের সংলাপগুলি উপভোগ্য হয়ে ওঠে,—

কালিদাস : তুই ক্যাচ্ ক্যাচ্ করিসনি তো গৌরদাস, রাজাকে চোখে দেখেছিস কখনো?

গোপাল : না। তুই দেখেছিস?

কালিদাস : দেখেছি মানে? এই যেমন তোকে দেখছি, এইভাবে গোপালদেবকে দেখেছি।

গোপাল : কী রকম দেখতে?

কালিদাস : ইয়া লম্বা চওড়া পাহাড়ের মত জওয়ান। ইয়া মোচ, এই রকম গালপাট্টা। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। সব সময় বন্‌বন্ করে ঘুরছে। দিনরাত সুরাপান করে থাকে তো। হঠাৎ রাজা হয়ে সব গোলমাল হয়ে গেছে আর কি।

অনুকূল : আর আমাদের রাণী? তাঁকে দেখেছিস?

কালিদাস : দেখিনি আবার; মহারাণী দেদ্দা হচ্ছে আমার মামাবাড়ীর গাঁয়ের মেয়ে। আমরা একসঙ্গে পড়েছি। (তৃতীয় অঙ্ক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

সংলাপে প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য ও ব্যবহারিক ভাষা

বিধায়কের নাটকে নাট্যঘটনা অনুসারে সংলাপ কখনো দীর্ঘ আবার কখনো হ্রস্ব হয়েছে এবং সংলাপে ব্যবহারিক ভাষার প্রয়োগ করা হয়েছে।

ক) 'মালা রায়' নাটকে নাট্য প্রয়োজনে দুটি চরিত্রের সংলাপ দু ধরণের রূপ লাভ করেছে। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মালা যখন জানতে পারে, সে মিঃ সেন নামক একব্যক্তির অবৈধ সন্তান তখন সে তীব্র যন্ত্রণায় ক্ষোভের সঙ্গে বলে ওঠে,—

মালা : সত্যি !!!....... এই আমার জীবন! ইহকালও নেই— পরকালও নেই, স্বর্গও নেই— মর্ত্যও নেই— জীবনও নেই— মৃত্যুও নেই! মুহূর্তের লালসায় আমার জন্ম, মিথ্যে পরিচয়ে আমার পরিচয়! বারে বারে আমি!

মিঃ সেন : মালা! আমাকে ক্ষমা কর্— আমাকে রক্ষা কর্।

মালা : একটি হতভাগিনী বিধবার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে- - আপনি পৃথিবীতে এনেছিলেন আমাকে! এনে কী দিয়েছেন? দিয়েছেন কলঙ্ক, দিয়েছেন লজ্জা, দিয়েছেন মিথ্যা পরিচয়। ইচ্ছে হচ্ছে আপনার ওই বুকটা ভেঙ্গে আমি চুরমার করে দিই— পিতা হয়ে যে বুকে পিতৃস্নেহ নেই। কিন্তু আমি তা করবো না মিঃ সেন!

মিঃ সেন : মিঃ সেন! আমি তোর পিতা! ওরে আমি তোর পিতা – (ষষ্ঠ দৃশ্য)

খ) 'রক্তের ডাক' নাটকের নিম্নলিখিত অংশে ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে বক্তব্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শুভেশ ও শতাব্দী পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু শতাব্দী বিবাহিতা। তাই উভয়ের মিলন সম্ভব নয়। শতাব্দীকে না পাওয়ার ব্যথায় শুভেশ নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, —এই বিষয়টি সংলাপে ধরা পড়েছে- -

শতাব্দী : আজ বুঝি সারারাত ধরে এই চলছে?

শুভেশ : কী? ......ও! মদ? হ্যা, মদ খাচ্ছি।

শতাব্দী : কেন?

শুভেশ : মদ ছাড়া আর কী খাবো?

শতাব্দী : খাবার মত আর কিছু নেই?

শুভেশ : নাঃ। মদে দুটো ভাল কাজ করে। এক হচ্ছে ভুলিয়ে রাখে, দুই-— আয়ু কমিয়ে দেয়। (পঞ্চম অংক)

সংলাপে বিষয়ের গাম্ভীর্য প্রকাশ

ক) 'মালা রায়' নাটকে মালা রায়ের মৃত্যু পথযাত্রী স্বামী সুবিনয়ের সংলাপে তার হৃদয়মথিত বেদনার স্পন্দন অনুভব করা যায়,—

সুবিনয় : ...মাত্র দু'বছর— মাত্র দু'বছর আমি তোমাকে পেয়েছি। কত যুদ্ধ, কত প্রতিযোগিতা করে আমি তোমাকে লাভ করেছিলাম— কিন্তু আজ কত সহজেই না ছেড়ে যেতে হবে। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) অথচ ভগবান জানেন, কোন সাধ আমার মেটেনি; (প্রথম দৃশ্য)

খ) 'পিতাপুত্র' নাটকে পীরপুরের জমিদার-পুত্র গৌরীশঙ্করকে ডাকাতদলের নেত্রী মীনা বন্দুকের গুলিতে হত্যা করলে তাঁর স্ত্রী সরমা হাহাকার করে ওঠে। এই গম্ভীর বিষয়টি নাট্যকার সরমার সংলাপে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন,—

সরমা : তুমি! নারী হয়ে তুমি আমার এত বড় সর্বনাশ করলে? আমার সিঁথের সিঁদুর মুছে দিলে? তোমার কি ঘর নেই, বাড়ী নেই! তুমি কি মায়ের জাত নও? মায়া, মমতা, দয়া, নারীত্ব বলে তোমার ভিতর কি কিছু অবশিষ্ট নেই? ওগো তুমি কি রক্ত-মাংসে গড়া মানবী নও? নারী হয়ে আর একটা নারীর সিঁথের

সিঁদুর মুছে দিতে তোমার হাত কি এতটুকু কাঁপলো না? বল—তুমি বল। তোমার কি শুধু নারীর চেহরাই আছে? নারীত্ব এক ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই?
(সংঘাত)

সংলাপে মাধুর্যগুণ

ক) 'বিশ বছর আগে' নাটকের অংশ বিশেষ—

দীপক ।। কী চমৎকার তোমাকে দেখাচ্ছে আজ তন্বী। সুন্দর মুখখানি বেয়ে মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু টস্ টস্ করে গড়িয়ে পড়ছে......... আত্মনিবেদনের অশ্রুবিন্দু। অপরূপ অপরূপ! (ধীরে ধীরে তন্বীর কাছে গিয়া তাহার চিবুকখানি তুলিয়া ধরিল) এই ঘন কালো পাঁকের মধ্যে থেকে তুমি কেমন করে ফুটে উঠলে নীলাকমল? তোমাকে দিয়ে আমি কোন্ দেবতার পূজা করবো? (তন্বীর মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিল) বল তন্বী, তোমাকে দিয়ে আমি কোন্ দেবতার পূজা করবো? (চতুর্থ দৃশ্য)

খ) মালা রায় ।।

মালা : .....ওই চেয়ে দেখ সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বটগাছটার মাথায় একটু পরেই চাঁদ উঠবে, সেই আলোতে ওই জনহীন মাঠ ঘাট সব স্বপ্নময় হয়ে যাবে। চলো বিজন আমার সঙ্গে, আমরা ওই চাঁদের আলো গায়ে মেখে ওই মাঠের মাঝখান দিয়ে দীঘির পাশ দিয়ে দূর থেকে দূরে চলে যাই। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

সংলাপে অলংকার প্রয়োগের কিছু দৃষ্টান্ত

অনুপ্রাস ।।

ক) প্রান্তরে কান্তারে কান্ত এলো
কুঞ্চিত কুন্তলে কুন্দ দে লো,
(কুহকিনী, দ্বিতীয় দৃশ্য)

খ) আমার অমিতা তুমি যে মনের মিতা
আমি তব রাম তুমি যে আমার সীতা
(অতএব, দ্বিতীয় অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

যমক ।।

দীপক : মেয়েদের ভালবাসা মানে ভাল বাসা।
(বিশ বছর আগে, চতুর্থ দৃশ্য)

শ্লেষ ।।

অতুল : ......নাতবৌ, মনে রেখো জীবন স্বপন নয়:
(মেঘমুক্তি, মেঘাড়ম্বর)

—এখানে স্বপন এক ব্যক্তির নাম, আবার স্বপ্ন—স্বপন শব্দটির অর্থ নিদ্রিত অবস্থায় কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষবৎ অনুভব। 'মেঘমুক্তি' নাটকে অণিমা স্বপন

নামে এক ব্যক্তির ফাঁদে পড়লে অতুল তাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য ইঙ্গিতপূর্ণ সংলাপটি বলেন। সংলাপটি দুটি অর্থ প্রকাশ করায় এটি শ্লেষ অলংকারের মহিমা লাভ করেছে।

উপমা ॥

ক) দীপক (তন্বীকে) দিনে রাতে যখনি আমি তোমার দিকে চাই, দেখি সূর্যমুখী ফুলের মত তুমি আমার দিকে চেয়ে আছো। (বিশ বছর আগে, চতুর্থ দৃশ্য)

খ) দীপক (তন্বীর মৃতুসংবাদ পেয়ে) ফুলের মত ফুটে উঠেছে মৃত্যু, ধূপের মত মিলিযে গেছে আত্মা। (বিশ বছর আগে, দশম দৃশ্য)

গ) মালা (বিজনকে) পাখীর মত দুই ডানা মেলে দিয়ে মুক্তির আনন্দ উপভোগ কববো। (মালা বায, দ্বিতীয দৃশ্য)

মহোপমা বা এপিক উপমা ॥

এন্টনী (সৌদামিনীকে) ....আমাব সৌদামিনীকে ওই গহন গাঙেব মতো দেখাচ্ছে। সে যেন বর্ষার ভরা নদী। কূলে কূলে ছলছল ঢল ঢল কবছে। যৌবনের স্রোতে সে ছুটে চলেছে তাব প্রেমিক সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

(এন্টনী কবিয়াল দ্বিতীয় অংক। দ্বিতীয় দৃশ্য)

উল্লেখ ॥

ক) মধুসূদন (বিদ্যাসাগরকে) তুমি ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র, তুমি বিদ্যা, তুমি সাগর। দযার সাগর বিদ্যাসাগর।

(মাইকেল মধুসূদন, তৃতীয় অঙ্ক। তৃতীয দৃশ্য)

খ) দেব্দা (গোপালদেবকে) আপনি যে তাদের মুক্তিদাতা, আপনি যে তাদের আপনার আত্মীয়।

(রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রথম অঙ্ক। চতুর্থ দৃশ্য)

দীপক ॥

নমিতা (শুভেশকে) তুমিই তো আমার সেই চুলো, তোমারি আগুনে আমি দেহ পুড়িয়েছি, মন পুড়িয়েছি, তোমারই চুলোর কালি আজ আমার মুখে চোখে— আমার সর্বাঙ্গে। আর কোন্ চুলোয় যাব?

(রক্তের ডাক, পঞ্চম অঙ্ক)

ব্যঙ্গোক্তি ॥

ছন্দা (উৎপলকে) বাবা বলেছেন! কলির ভীষ্মদেব! আমার সঙ্গে আলাপ করবার সময় বাবার মত নেওয়ার কথা মনে ছিল না?

(মাটির ঘর, পঞ্চম দৃশ্য)

স্বভাবোক্তি ॥

মানব (গৌরীকে) .....সমস্ত বাংলা দেশটাই আজ আমার ভাল লাগছে। এর মাঠে মাঠে ধান, ঘরে ঘরে গান, গাছে গাছে ফল, আর নদীভরা জল। এমন নরম আর এমন মৃদু— (তেরশো পঞ্চাশ, ঘরে। দুই)

রূপক ॥

ক) সত্যপ্রসন্ন (নন্দাকে) তোমার এই অন্ধকার দুঃখরাত্রির পারে যে প্রসন্নপ্রভাত প্রতীক্ষা করছে, এ বিশ্বাস তুমি হারিয়ো না নন্দা।

(মাটির ঘর, তৃতীয় দৃশ্য)

খ) প্রশমন (বেবীকে) সন্ধ্যাই তো কুৎসিত রাত্রি হয়ে উষার মহাসমুদ্রে স্নান করে শুচি স্নিগ্ধ হয়।

(অন্ধদেবতা, একাদশ দৃশ্য)

গ) মধুসূদন (দেবকীকে) ......অনেকদিন পরে তোমার সুরের সরোবরে আর একবার অবগাহন করি ;

(মাইকেল মধুসূদন, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

ব্যাজস্তুতি ॥

মহামায়া (বিনোদিনীকে) ও ব্যাটার ওই রকমই ভড়কি। এমন কায়দা ক'রে ছুঁয়ে দেয় যে, একেবারে ইহকাল পরকাল ঝরঝরে করে দেয়।

(কাল ভৈরব। ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

(এখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা করা হয়েছে)

উৎপ্রেক্ষা ॥

মিঃ সেন (অপরূপকে) অন্ধ স্ত্রীর কাছে স্বামীর ভালবাসা চোখের দৃষ্টি মত।

(মালা রায়, চতুর্থ দৃশ্য)

বিষম ॥

রত্না (প্রিয়ব্রতকে) কত স্বপ্ন দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম— ও আর আমি; কিন্তু সব ফুরিয়ে গেল ছোড়দা— সব ফুরিয়ে গেল।

(দ্বিধা, চতুর্থ পর্ব। ৬)

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, বিধায়ক সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে মূলতঃ ইবসেনীয় সংলাপরীতি (simple prose dialague) গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাষা সহজ সরল ও মাধুর্যগুণে ভরা। এ প্রসঙ্গে নাট্য সমালোচক, রূপমঞ্চ পত্রিকার সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—

'বিধায়কের ছোট তীক্ষ্ণ এবং মধুর সংলাপ বাংলা নাট্য সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।"[২৪]

থিয়েটারী নাটকে সংগীত

মানসিক ভাবদ্যোতক সংগীত

ক) 'মেঘমুক্তি' নাটকের গীতা বিজয়কে ভালবাসে। সে তার মনের কথা বিজয়কে সোজাসুজি জানাতে পারছেনা। সেজন্য সে নিম্নলিখিত সংগীতের আশ্রয়ে প্রাণের একান্ত ভাবটি ব্যক্ত করেছে। এই সংগীতটি নাটকে সুপ্রযুক্ত হয়েছে। ছন্দ নির্ণয়সহ সংগীতটি প্রদত্ত হল।

এখন তোমার/সময় হল/ না	মাত্রা ৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ১
সময় হবে/কবে?	মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ২
কবে তুমি/আমার কানে	মাত্রা ৪+৪
গোপন কথা/কবে?	মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ২
কবে তোমার/ফাগুন দিনে	মাত্রা ৪+৪
বৈশাখে মোর/লবে চিনে	মাত্রা ৪+৪
মরুর বুকে/কইবে কথা	মাত্রা ৪+৪
শ্রাবণ ধারা/রবে!	মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ২
শুকতারা গো!/কবে তুমি	মাত্রা ৪+৪
আসবে আমার/আঁধার চুমি	মাত্রা ৪+৪
কবে তোমার/সাগর পানে	মাত্রা ৪+৪
টানবে আমায়/গভীর টানে	মাত্রা ৪+৪
কবে আমায়/ডাকবে তোমার	মাত্রা ৪+৪
জীবন মহোৎ/সবে!	মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ২

(মেঘবিশ্লেষ)

—এর ছন্দ স্বরবৃত্ত। প্রতিটি পর্বে ৪ মাত্রা রয়েছে।

খ) 'বিশ বছর আগে' নাটকে তমসার সংগীতের মধ্য দিয়ে মনের বিশেষ কথাটি প্রকাশ পেয়েছে। তমসাকে তার দুই সহপাঠী দীপক ও প্রদীপ ভালবাসত। কিন্তু তমসা দীপককেই মনেপ্রাণে চাইত, প্রদীপকে নয়। অথচ সে তার মানসিক অবস্থা মুখে স্পষ্ট করে বলতে পারত না। সেজন্য মনের গভীরে সে কষ্ট অনুভব করত, মাঝে মাঝে একটা দুঃখবোধ তাকে ঘিরে ধরত, তার সংগীতের মধ্য দিয়ে সেই ভাবটি ফুটে উঠেছে—

ডাকো ডাকো মোরে/ডাকো	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
প্রিয়তম মোরে/ডাকো	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
ব্যথার কুসুম/গুলি	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
স্মরণ-শিয়রে/রাখো।	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২

কালের প্রবাহ/থামে — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
ডাকো মোরে প্রিয়/নামে — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
আঁধার রজনী/ভরি— — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
অতীতের ছবি/আঁকো — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
বেদনার কালো/ছায়া — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
ভাষাতে লভুক/কায়া — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
স্মৃতির শ্মশান/ভূমি — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
শ্যাম তৃণদলে/ঢাকো। — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২

(তৃতীয় দৃশ্য)

—এটি ৬ মাত্রাবিশিষ্ট মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সঙ্গীত।

গ) 'কুহকিনী' নাটকে দেখা যায়, পুরোহিত বিপ্রদেব প্রবর্তিত যান্ত্রিক জীবনে শীলা তাঁর স্বাভাবিক নারীধর্ম বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে চিরন্তন সংসার রচনা করার আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে ছিল তাঁর গানের মধ্য দিয়ে তা মাঝে মাঝে প্রকাশ পেত। নিম্নলিখিত গানটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ—

জীবন নদীর/স্রোতে ভেসে চলি/নিশিদিন — মাত্রা ৬+৬+অপূর্ণমাত্রা ৪
গতির নেশায়/মেতে শুধু চলা/যতিহীন। — মাত্রা ৬+৬+অপূর্ণমাত্রা ৪
তীরের শ্যামল/তরু ডাকে মোরে/আয় আয় — মাত্রা ৬+৬+অপূর্ণমাত্রা ৪
সংসার ডাকে/তার সুশীতল/গৃহছায়— — মাত্রা ৬+৬+অপূর্ণমাত্রা ৪
সে ডাকে বুকের/মাঝে কাঁদে বেদ/নার বীণ ॥ — মাত্রা ৬+৬+অপূর্ণমাত্রা ৪

(প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

—এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। ৬ মাত্রার পর্ব।

ঘ) 'সেই তিমিরে' নাটকে নারীস্বাধীনতায় বিশ্বাসী আধুনিক স্বাহা স্বামীগৃহ ত্যাগ করে অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বসবাস শুরু করলে স্বাহার স্বামী তার বন্ধু অতনুর সহায়তায় 'স্বামী-সংরক্ষণ সংসদ' গড়ে তোলে। সেই সভায় সভ্যরা যে উদ্বোধনী সংগীতটি পরিবেশন করে তার মধ্য দিয়ে তাদের মনের একান্ত কথাগুলি প্রকাশ পেয়েছে। সংগীতে শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কৌতুক-সৃষ্টি করেছেন—

চল প্রিয়াহারা/চল — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
মুছে ফেল আঁখি/জল — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
ভাবনা রাখিয়া/দে — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ১
উনুন জ্বালাবে/কে? — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ১
বুকের পাঁজর/জ্বালায়ে রাঁধিব— — মাত্রা ৬+৬
ভাত ডাল অম/বল — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
চল প্রিয়াহারা/চল — মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২

(চতুর্থ দৃশ্য)

—এটি ৬ মাত্রার পর্ব বিশিষ্ট মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সংগীত।

সংগীতের সুরে গল্প বলা

'মাটির ঘর' নাটকে উৎপল ও ছন্দা গানের মধ্য দিয়ে একটি প্রেমকাহিনী বর্ণনা করছে। এর মাধ্যমে উভয়ের হৃদয়ের কথাও ব্যক্ত হয়েছে। সংগীতের মাঝে গদ্য সংলাপ ব্যবহার করে বৈচিত্র্য-সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর ফলে সংগীতটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে—

উৎপল ॥ দীঘল দীঘির/ধারে— মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ২
রাখাল ছেলে/বাজায় বাঁশী/আপন মনে/বসে মাত্রা ৪+৪+৪+ অপূর্ণমাত্রা ২
এমন সময়/ওপার থেকে/জল ভরিবার/ছলে মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২
গাঁয়ের মেয়ে/ডাক দিয়ে যায়/তারে মাত্রা ৪+৪+অপূর্ণমাত্রা২
ছন্দা ॥ সাংঘাতিক মেয়ে তো! সে হতভাগী দেখতে কেমন?
উৎপল॥ সোনার বরণ/কন্যা সে যে/মেঘের বরণ/চুল মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ১
ঠোঁট দুটি তার/রাঙা বরণ/ফুলের সম/তুল। মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ১
দীঘল দীঘির/ধারে— মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ২
কালো চোখের/আলো ফেলে/তাকায় বারে/বারে। মাত্রা ৪+৪+৪ অপূর্ণমাত্রা ২
ছন্দা ॥ তখন সময়টা কী?
উৎপল ॥ সময় তখন/সন্ধ্যা হবো/হবো—। মাত্রা ৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২
আকাশ জুড়ে/চলছে তখন/আলো-ছায়ার/খেলা মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২
এমন সময়/ঘর ভোলানো/গাঁয়ের মেয়ের/ডাকে মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২
রাখাল ছেলে/পার হল ঐ/পারে মাত্রা ৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২
ছন্দা ॥ পার হ'য়ে এসে রাখাল কী বল্লে?
উৎপল ॥ রাখাল ছেলে/বললে আমি/বাঁশীর সুরে/বাঁকি মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২
আমায় ডাকলে/কেন সখি,/আমায় ডাকলে/কেন? মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২
কী চাও তুমি/বলো— মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ২
জবাব দিতে/গাঁয়ের মেয়ের/নয়ন ছলো/ছলো। মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২
ছন্দা ॥ পোড়ামুখী গাঁয়ের মেয়ের শুধু নয়নই ছলো ছলো হ'ল
—মুখে কিছু বললে না?
উৎপল ॥ কী বললে তুমি বলতে পারো?
ছন্দা ॥ গাঁয়ের মেয়ে/বললে আমার/মনে আছে/আশা
মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২
তোমার কাছে/মিলবে ভাল/বাসা। মাত্রা ৪+৪+ অপূর্ণমাত্রা ২
—ইত্যাদি।

(তৃতীয় দৃশ্য)

এটি স্বরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত। প্রতিটি পর্ব ৪ মাত্রার।

এই সংগীতটি ভাটিয়ালী, পূরবী এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য রাগের মিশ্রণে রচিত। এটি Story-music— এখানে গানের মধ্য দিয়ে একটি কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে। বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে এ ধরণের সংগীতের ব্যবহার বিধায়ক-ই সর্বপ্রথম শুরু করেন।[২৫]

পরিবেশ সৃষ্টিকারী সংগীত

ক) 'বিশবছর আগে' নাটকে একটি মহলা কক্ষের পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার জন্য একটি নৃত্যসহযোগে সংগীত পরিবেশিত হয়েছে। দুটি তরুণী মহলাকক্ষে এই নৃত্য ও সংগীত চর্চা করছে,—

হাঁসি মুখের/বাঁসি ফুলে/ভুঁলবো না গো/ভুঁলবো না। মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ৩
এঁমন করে/তোঁমায় নিয়ে/মঁরণ দোলায়/দুঁলবো না। মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ৩
আঁর তো কভু/চাঁদের রাতে মাত্রা ৪+৪
গাঁইবো না গান/তোঁমার সাথে মাত্রা ৪+৪
আঁর তো তোমার/ফুঁলের বনে/আঁকাশ-কুসুম/তুঁলবো না মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ৩
তোঁমার তরে/রাঁত্রি আমার/হোঁক না কেন/ঘুঁমহারা। মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ৩
তঁবু তোমার/ভোঁর গগনে/জাঁগবো না আর/শুঁকতারা। মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ৩
হঁয়ত তখন/আঁখির কোণে মাত্রা ৪+৪
ঝঁরবে ব্যথা/সঁঙ্গোপনে মাত্রা ৪+৪
হঁয়ত তখন/ডাকবে তবু/মঁনের দুয়ার/খুঁলবো না। মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ৩

(চতুর্থ দৃশ্য)

—এখানে স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রতিটি পর্বে ৪ মাত্রা রয়েছে।

খ) 'কুহকিনী' নাটকে প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম সংগীতটির মধ্য দিয়ে একটি পরিবেশ রচিত হয়েছে। কামরূপ প্রদেশের কিছু বালিকা এই সংগীতটি গেয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের ছোঁয়া মানুষের মনকে যে দুলিয়ে দেয় নিম্নলিখিত সংগীতটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ,—

যৌবন/গান গাও/যৌবন/গান —মাত্রা ৪+৪+৪—অপূর্ণমাত্রা ২
যৌবনে/মধুকর/গুঞ্জরে/তান মাত্রা৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২
গাও যৌ/বন গান। মাত্রা ৪+৪
প্রান্তরে/কান্তারে/কান্ত এ/লো মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ১
কুঞ্চিত/কুন্তলে/কুন্দ দে/লো মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ১
অরণ্যে/নবীনের/চলে অভি/যান। মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২
পুষ্পিতা/বনে বনে/ছন্দ লা/গে মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ১
যেন কোন/বিরহিনী/বাসর জা/গে মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ১
মিলনের/শিহরণে/ভাঙ্গে অভি/মান মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২

(প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

—এটি ৪ মাত্রার পর্ব বিশিষ্ট মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

এখানে যৌবন (যউবন) শব্দটি সর্বত্র ৪ মাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে।

উচ্ছ্বাসময় ভাবপ্রকাশক্ষম সংগীত

'তাইতো' নাটকের উপসংহারে প্রকৃত কাহিনী প্রকাশিত হবার পর সংশয়াচ্ছন্ন সমরের মনের কুয়াশা কেটে গেলে পরিবারের সকলে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সংগীতের মাধ্যমে সমরের স্ত্রী মল্লিকা ও মল্লিকার বান্ধবী মালবিকা তাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করেছে। সংগীত পরিবেশনের দ্বারা তারা এক আনন্দঘন পরিবেশেরও সৃষ্টি করেছে।

তাঁই তো : —অপূর্ণমাত্রা ২
কুঁয়াশা যে/কেঁটে গেছে মাত্রা ৪+৪
মেঁঘ আর নাই তো। মাত্রা ৪
তাঁই তো : অপূর্ণমাত্রা ২
বাঁহিরে যা/ছাঁ ছিল হুল/ও মধু মাত্রা ৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ৩
অন্তর হ'লো/সেঁ যে মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ২
পরাণ-বধূ মাত্রা৪
সবটা না পে/লে তবু কি/ছুঁ কিছু পাই/তোঁ ; মাত্রা ৪+৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ১
তাঁই তো ; অপূর্ণমাত্রা ২
দেঁখা হ'লে/পঁথে যারা মাত্রা ৪+৪
খাঁদ্য খাদক মাত্রা ৪
সংসারে প/দেঁ পদে মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ৩
তাঁহাদের মি/লনের শেষ গান/গাঁইতো। মাত্রা ৪+৪+অপূর্ণমাত্রা ২
তাঁই তো : অপূর্ণমাত্রা ২

(তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

—এটি ৪ মাত্রার পর্ববিশিষ্ট স্বরবৃত্ত ছন্দের উপর রচিত। এখানে তাই, নাই, পাই, গাই—এই চারটি শব্দে যৌগিক অক্ষর (আ+ই) থাকায় প্রত্যেকটির মাত্রা সংখ্যা ১।

সংগীতের মাধ্যমে ইঙ্গিতময় সংবাদ পরিবেশন

'অতএব' নাটকে প্রেমিক সুমিত্র দূর থেকে সংগীতের মাধ্যমে তার প্রেমিকা অমিতাকে ইঙ্গিতপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করছে। সংগীতটি হালকা চালের। সংগীতের ভাবাও তদ্রূপ এবং দর্শকমনে তা কৌতুকের সৃষ্টি করে,—

(আমি) যাইনি যাইনি/গো— মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ১
যেতে সে পারিনি/প্রিয়া মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
কুমীরের মুখে/কেমনে রাখিয়া/যাব মাত্রা ৬+৬+অপূর্ণমাত্রা ২
আপন হৃদয়/দিয়া মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
(আমি) যাইনি— অপূর্ণমাত্রা ৩
ভাল যে বেসেছি/সে তো নয় খেলা মাত্রা ৬+৬
পন পুরীতে/ভাসায়েছি ভেলা— মাত্রা ৬+৬

আজ রাতে তুমি/ঘুমায়োনা সখি	মাত্রা ৬+৬
যাব যে তোমারে/নিয়া—	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
(আমি) যাইনি যাইনি/গো	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ১
যেতে যে পারিনি/প্রিয়া	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
হাঙরের মুখে/কেমন রাখিয়া/যাব—	মাত্রা ৬+৬অপূর্ণমাত্রা ২
আপন হৃদয়/দিয়া।	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
(আমি) যাইনি—	অপূর্ণমাত্রা ৩
আমার অমিতা/তুমি যে মনের/মিতা	মাত্রা ৬+৬+অপূর্ণমাত্রা ২
আমি তব রাম/তুমি যে আমার/সীতা	মাত্রা ৬+৬+অপূর্ণমাত্রা ২
রাত তিনটেয়/নেমে	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
বাগানের কাছে/থেমে	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
ডানদিকে চেয়ে/দেখিবে আমারে	মাত্রা ৬+৬
ভালরূপে নির/খিয়া।	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
দোলু হেমন্ত/—পাবে না অন্ত	মাত্রা ৬+৬
নরক অবধি/গিয়া	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২
যেতে যে পারিনি/প্রিয়া—	মাত্রা ৬+অপূর্ণমাত্রা ২

(দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)

—এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, এর প্রতিটি পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৬। এখানে প্রথম, পঞ্চম, দশম, চতুর্দশ পংক্তির 'আমি' ২ মাত্রা বিশিষ্ট অতিমাত্রিক পর্ব।

বিধায়কের থিয়েটারী নাটকের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় সংগীত

বিধায়ক 'অন্ধদেবতা', 'তোমার পতাকা', 'মন্দাক্রান্তা/জয়-পরাজয় 'ব্যতীত আলোচ্য প্রত্যেকটি নাটকে সংগীতের ব্যবহার করেছেন। সংগীত-ব্যবহৃত নাটকগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় নিম্নলিখিত কয়েকটি নাটকের একটি, দুটি ব্যতীত সব সংগীত-ই সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

মেঘমুক্তি :

'মেঘসঞ্চার' অংশে বিজনের" দিবসে যবে আঁধার হবে বিদায় বেদনায়" গানটি নাট্যকাহিনীর কোন প্রয়োজন সাধন করেনি।

মালা রায় :

তৃতীয় দৃশ্যে মিঃ সেনের কন্যা বেণুর জন্মতিথি উৎসব অংশটি নাট্যকাহিনী অগ্রগতির সহায়ক হয়নি সুতরাং সেই উৎসবে গীত বেণু ও তার রূপমুগ্ধ অসিতের যুগল গান—" গত বছর আষাঢ় মাসে বাদল ধারার মাঝে......"— প্রয়োজনহীন হয়ে পড়েছে।

কুহকিনী :

দ্বিতীয় দৃশ্যে শীলার "পাহাড়তলীর ঝর্ণা ধারায়......" সংগীতটি অপ্রযুক্ত হয়েছে কারণ প্রথম দৃশ্যে রত্নার সামনে গাওয়া" জীবন নদীর স্রোতে ভেসে চলি নিশিদিন" সংগীতটিতে অনুরূপ ভাব রয়েছে।

রক্তের ডাক :

তৃতীয় অঙ্কে শতাব্দীর ভক্ত লেমিয়র গীত সংগীত— "পথিক যে তোর প্রাণের দুয়ারে এলো"— নাট্যভাবের সহায়ক হয়নি।

তাইতো :

দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যের ভবশঙ্কর, তাঁর স্ত্রী নিস্তারিনী ও তাঁদের নাতনী পটী নাট্য কাহিনীর ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হওয়ায় পটীর নৃত্যের সঙ্গে মল্লিকার গানটি—" আজ নিরালায় বনের মাঝে" —প্রয়োজনহীন।

॥ যাত্রা-নাটকে সংগীত ॥

'রাষ্ট্রবিপ্লব' লোকনাট্যে মনের ভাব গভীরতর ভাবে প্রকাশ করার জন্য গদ্য সংলাপে দীনু পাগল যে কথা বলেছে সেই একই বিষয় সংগীতের মাধ্যমে সে ব্যক্ত করেছে—

দীনু ॥ জোরে—আরো জোরে—আরো জোরে বল—

গোপালদাদার জয়। সেই চীৎকারে ঈশ্বরের আসন টলে উঠুক, জাতির বধির কানে সেই জয়ধ্বনি গিয়ে আঘাত করুক। তবেই হবে জয়।

অমৃত ॥ ঠিক, ঠিক বলেছ দীনু।

দীনু ॥ হবে জয়,/হবে জয়,/জয় হবে। —মাত্রা ৪+৪+৪
এই মোহ/আবরণ/ক্ষয় হবে॥ মাত্রা ৪+৪+৪
চীৎকার/ক'রে বল/—জয় হোক মাত্রা ৪+৪+৪
ঘরে ঘরে/লোক নির/ভয় হোক মাত্রা ৪+৪+৪
তবেই তো/মহাপাপ/লয় হবে॥ মাত্রা ৪+৪+৪

(প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

—৪ মাত্রার পর্ববিশিষ্ট মাত্রাবৃত্ত ছন্দ অবলম্বনে এটি রচিত হয়েছে।

বিবেকের সংগীত

(১) 'সুরা নারী সিংহাসন' যাত্রা-নাটকে দীপঙ্কর নামে এক পাগল গান গেয়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করে। দীপঙ্করকে এখানে বিবেক বলা যায়,—

ঐমন ক'রে/নয়রে পাগল মাত্রা ৪+৪
ঐমন ক'রে/নয় ৪+অপূর্ণমাত্রা ১
হয় না তর/বারির ধারে মাত্রা ৪+৪
পোকা মাকড়/ক্ষয়। মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ১
ঐমন ক'রে/নয়। মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ১
আগুন যখন/আহার মাগে মাত্রা ৪+৪
পতঙ্গ সে/আপনি জাগে মাত্রা ৪+৪
তাইতে আগুন/দ্বিগুণ জ্বলে মাত্রা ৪+৪
জয় আগুনের/জয়। মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ১

এই যে রাতের/আঁধার কালো মাত্রা ৪+৪
তার ওপারে/আছেই আলো মাত্রা ৪+৪
সেই আলোরই/জয়ধ্বনি মাত্রা ৪+৪
উঠুক ভুবন/ময়। মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ১
অমন ক'রে/নয়। মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ১

—এটি স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ৪ মাত্রার পর্ব।

(২) 'রাষ্ট্রবিপ্লব'-এ দীনুপাগল গান গেয়ে মানুষকে কখনো সাবধান করেছে, কখনো বিপদের সময় সাহস জুগিয়েছে। দীনু উক্ত নাটকে বিবেকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে,—

(ওরে) আকাশে যে/মেঘ করেছে -মাত্রা ৪+৪
কাল বোশেখীর/ঝড়, মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ১
(আসে) কালবোশেখীর/ঝড়। মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ১
থাকতে সময়/ওরে নেয়ে মাত্রা ৪+৪
নাও-কে নোঙর/কর; মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ১
(আসে) কাল বোশেখীর/ঝড় ॥ মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ১
ওপরে তুই/দ্যাখ না চেয়ে মাত্রা ৪+৪
কী কালো মেঘ/আকাশ ছেয়ে মাত্রা ৪+৪
এই বেলা তুই/নৌকাটাবে মাত্রা ৪+৪
ডাঙায় তুলে/ধব। মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ১
(আসে) কাল বোশেখীর/ঝড়॥ মাত্রা ৪+অপূর্ণমাত্রা ১

(দ্বিতীয় অঙ্ক। তৃতীয় দৃশ্য)

—এটি স্বরবৃত্ত ছন্দ ও ৪ মাত্রার পর্ব বিশিষ্ট সংগীত।

প্রথম পংক্তির 'ওরে' এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ পংক্তির 'আসে' ২ মাত্রার অতিপর্ব।

(৩) 'ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্র' যাত্রা-নাটকে 'ভৈরব' চরিত্রটি বিবেকের মত মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে সংশয়াচ্ছন্ন গিরিশচন্দ্রের মনে ভক্তির ভাব জাগানোর চেষ্টা করেছেন—

(যদি তোর) আঁধার ঘরে/নয়ন ঝরে মাত্রা ৪+৪
ডাক্ না মাকে— মাত্রা ৪
(ভোলা মন) ডাক্ না মাকে। মাত্রা ৪
(খুলে ফ্যাল) জীবন-ভরা/বিফল-করা মাত্রা ৪+৪
ঢাকনাটাকে। মাত্রা ৪
(ওরে তুই) ডাক্ না মাকে ॥ মাত্রা ৪

(প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)

—এটি ৪ মাত্রার পর্ব বিশিষ্ট স্বরবৃত্ত ছন্দের সংগীত।

প্রথম পংক্তির 'যদি তোর', তৃতীয় পংক্তির 'ভোলা মন', চতুর্থ পংক্তির 'খুলে ফ্যাল', ষষ্ঠ পংক্তির 'ওরে তুই' ৩ মাত্রা বিশিষ্ট অতিপর্ব।

বিধায়কের চারটি যাত্রা নাটকেই সংগীত সুপ্রযুক্ত হয়েছে। কোথাও সংগীত অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক হয়নি।

সূত্র পরিচিত

1. .....words ... are the body of the play ;

—The Art of the Theatre, The First Dialogue, E. Gordon Craig, Collected in 'The Theory of the Modern Stage' edited by Eric Bentley, P. 113, London, 1976.

2. ....the words .. are valueless unless they serve to drive the action forward.

—Theory and Technique of Playwriting and Screenwriting, John Howard Lawson, P. 288, New York, 1949.

3. The Thought of the personages is shown in everything to be effected by their language.... .

—Aristotle, On the Art of Poetry, Translated by Ingram Bywater, P 66, Delhi. 1987

4. A play is its dialogue ......

—The Anatomy of Drama, Marjorie Boulton, P 97, London, 1960.

5. The Psychology of Thinking, Oleg Tikhomirov, –P 163, Moscow, 1984.

6. The Art of Dramatic Writing, Lajos Egri, P. 50, London, 1950

7. ......exact rightness of length characterises the speeches of all the first-rate playwrights.

—The Life of Drama, Eric Russell Bentley, P. 79, London Methuen, 1966

8. ......they desire to explain their own doings and influence others.

—Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, S. H. Butcher, P. 342, New Delhi, 1974.

9. A Play is written by someone who wishes to do nothing but talk for an audience.......

—The Elements of Drama, J. L. Styan, P. 75, Cambridge University Press, 1960.

10. It achieved the most powerful and moving effect by the highly untraditional methods of extreme simplicity and economy of language—a kind of literary cubism.

—Ibsen, Michael Meyer, P. 477, Great Britain, 1974.

11. The new dialogue should be flexible and precise, and convey the tone and feeling of character's individuality.

—Modern Drama in Theory and Practice I, Realism and Naturalism, J. L. Styan, P 10, Cambridge University Press, 1981

১২. একালের নাট্য কলা প্রসঙ্গে (শারদীয় স্বদেশ), ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ২০২ কলিকাতা, ১৩৯৫

১৩. ধীরোদ্ধতে ধীরললিতে ধীরোদাত্তে তথৈব চ।
ধীরপ্রশান্তে চ তথা পাঠ্যং যোজং তু সংস্কৃতম্ ॥
... ...
পরিব্রাণ্মুনিশাক্যেষু চৌক্ষেষু, শ্রোত্রিযেষু চ।
দ্বিজা যে চৈব লিঙ্গস্থাঃ সংস্কৃতং তেষু যোজয়েৎ ॥
... ...
রাজ্ঞ্যাশ্চ গণিকায়াশ্চ শিল্পকার্যাস্তথৈব চ।
কার্যাবস্থান্তরকৃতং যোজ্যং পাঠ্যন্ত সংস্কৃতম্ ॥
—নাট্য শাস্ত্র, ভরত, শ্লোক সংখ্যা সংখ্যা-৩১, ৩৬, ৩৭, অষ্টাদশ অধ্যায়।

১৪. মাগধ্যবন্তিজা প্রাচ্যা শৌরসেন্যর্ধমাগধী।
বাহ্লীকা দাক্ষিণাত্যা চ সপ্ত ভাষা : প্রকীর্তিতা : ॥
—নাট্য শাস্ত্র, ভরত, শ্লোক সংখ্যা ৪৭, অষ্টাদশ অধ্যায়

১৫. মাগধী তু নরেন্দ্রাণামন্ত : পুরনিবাসিনাম্।
চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্ধমাগধী ॥
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্তানামপ্যবন্তিজা।
নায়িকানাং সখীনাং চ শৌরসেন্য বিরোধিনী ॥
যৌধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যা চ দীব্যতাম্।
বাহ্লীকভাষোদীচ্যানাং খসানাং চ স্বদেশজা।
—নাট্যশাস্ত্র, ভরত, শ্লোক সংখ্যা-৪৯-৫১, অষ্টাদশ অধ্যায়।

১৬. ভূষণাক্ষবসঙ্ঘাতৌ শোভোদাহরণে তথা।

.... লেশশ্চ সংক্ষোভো .... ॥
জ্ঞেয়া হ্যনুক্তসিদ্ধিশ্চ .... ।
—নাট্যশাস্ত্র, ভরত, শ্লোক সংখ্যা ১-৫, সপ্তদশ অধ্যায়

১৭. শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা সমাধিমাধুর্যমোজঃ পদসৌকুমার্যম্।
অর্থস্য চ ব্যক্তিরুদারতা চ কান্তিশ্চ কাব্যস্য গুণাদশৈতে ॥
—নাট্যশাস্ত্র, ভরত, শ্লোক সংখ্যা-৯৫, সপ্তদশ অধ্যায়

১৮. বিস্ময়ক্রোধদুঃখার্তিবশাদেকোহপি ভাষতে।
হৃদয়স্থং বচো যত্তু তদাত্মগতমিষ্যতে॥
— নাট্যশাস্ত্র, ভরত, শ্লোক সংখ্যা-৮৪ (খ) ৮৭ (ক), ষড়বিংশ অধ্যায়

১৯. নাটক লেখার মূল সূত্র. ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ১৩৮, কলিকাতা, ১৯৫৯

২০. রক্তকরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খন্ড, পৃ. ৩৮৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭৬

২১. বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৫৯৭, কলিকাতা, ১৯৭২

২২. কাব্যালোক (প্রথম খন্ড), সুধীরকমার দাশগুপ্ত, পৃ. ৫৮৪, কলিকাতা, ১৩৫২

২৩. মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য: থিয়েটার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, সম্পাদনা দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, পৃ. ৬৫, কলিকাতা, ১৯৮৭

২৪. কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বর্তমান গবেষকের সাক্ষাৎকার, কলিকাতা, ১৯৮১ সাল

২৫. 'দীঘল দীঘির ধারে.....গানটি সে সময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। ....গানটি হল Story Music ...বাংলা থিয়েটারে এর আগে এ ধরণের গান ব্যবহৃত হয়নি। গানটি ভাটিয়ালী, পূরবী ও সেইসঙ্গে অন্যান্য রাগের মিশ্রণে রচিত।"
—অভিনেতা ও সঙ্গীতশিল্পী তারা ভট্টাচার্য (তারা ভট্টাচার্যের সঙ্গে বর্তমান গবেষকের সাক্ষাৎকার, কলিকাতা, ১৯৮৯)

২৬. অলঙ্কার চন্দ্রিকা— শ্যামাপদ চক্রবর্তী, কলিকাতা, ১৯৮৮

২৭. ছন্দ পরিক্রমা— প্রবোধ চন্দ্র সেন, কলিকাতা, ১৯৭৭

২৮. স্বর ও বাক্‌রতি — ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৮৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

একাঙ্ক নাটক

বর্তমান যুগে একাঙ্ক নাটক পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশে স্বমহিমায় বিরাজ করছে। ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকারখানা প্রসারিত হতে থাকে। গ্রামের লোক সেইকারণে শহরে এসে ভিড় জমায়। গ্রামের শান্ত, ধীর পরিবেশ থেকে মানুষ কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে এসে পড়ে। মানুষ দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত পরিবেশ ত্যাগ করে নূতনভাবে সংসার রচনা করতে শুরু করে। পূর্বজীবনের পরিবর্তন অনুভূত হয়, মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয়, মানুষ নূতনভাবে জীবন সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করে। এই নূতন জীবনধারার প্রভাবে নাট্যকাররা একাঙ্ক রচনায় বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ কারণেই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মূলতঃ একাঙ্ক নাটক প্রদর্শনের জন্য ইউরোপে Repertory Theatre গড়ে ওঠে।

অবশ্য মধ্যযুগে ইউরোপে Morality ও Mystery Play-তে একাঙ্কের রূপ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে পঞ্চদশ শতকে রচিত Everyman পালা উল্লেখযোগ্য। Chester Cycle, York Cycle, Wakefield Cycle-এর Liturgical Play-এর মধ্যে অনেক সময় একাঙ্ক পরিবেশিত হত।[১] সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর Interlude Play ও Pantomime Play-র মধ্যেও একাঙ্কের উপস্থিতি লক্ষণীয়। পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয়ের পূর্বে Curtain raiser বা অভিনয় শেষে After piece-রূপে এই ধরণের নাটককে কখনো মঞ্চে উপস্থাপিত করা হত। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যানচেষ্টারে Repertory থিয়েটারের প্রচলন হয়। এর পূর্বে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'Abbey Theatre' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লিভারপুল শহরে 'Repertory Play House' তৈরী হয়। বার্মিংহাম শহরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই এ ধরণের থিয়েটার জন্ম নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিভিন্ন সংস্থার (লন্ডনে British Drama League, Scottish Community Drama Association, Welsh Drama League, North Irish Drama League, আমেরিকার Federal Theatre Project—) বিশেষ প্রচেষ্টায় একাঙ্ক নাটক বিস্তৃত আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

একাঙ্ক নাটকের গঠনরীতি আলোচনা করলে দেখা যায়, এটি পূর্ণাঙ্গ নাটক থেকে স্বতন্ত্র। উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্যের মত এদেরও পার্থক্য রয়েছে। ছোটগল্প উপন্যাসের খণ্ডরূপ নয়, এটি ক্ষুদ্র পরিসরে নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ ঘটনা, বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ করে একটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একাঙ্ক নাটকও পূর্ণাঙ্গ নাটকের ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়। এটি দ্বন্দ্বসংঘাতযুক্ত কিছু সময়ের ঘটনাকে পরিবেশনের মাধ্যমে একটি নিটোল কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত দেয়।[২]

ইউরোপের বিখ্যাত একাঙ্ক নাটকের (যেমন, Lady Gregory (1859-1932)-এর 'The Rising of the Moon' (1907), Norman Mckinnel-এর 'The Bishop's Candlesticks' (Originally produced at the Duke of York's Theatre on August 24, 1901), John Millington Synge-এর 'Riders to the Sea'-প্রভৃতি) দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, একাঙ্ক নাটকে Aristotle কথিত Three Unity অর্থাৎ Unity of action, Unity of time, Unity of place- (এই ঐক্যত্রয়ের কথা তিনি পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রসঙ্গে বলেছেন) বজায় রাখতে হলেও এটি-ই এর শেষ কথা নয়।

আদি মধ্য অন্ত্য সমন্বিত একটি ঘটনা নিয়েই একাঙ্ক নাট্যকাহিনী গড়ে ওঠে।[৩] এ ধরণের নাটকে ঘটনা বা চরিত্রের বিস্তৃতি থাকে না। শুধু একটিমাত্র ঘটনা (a single episode) বা বিশেষ অবস্থা (a single situation) অবলম্বনে একাঙ্ক নাটক রচিত হয়। সুতরাং এখানে একটিমাত্র বৃত্ত থাকবে, উপবৃত্ত থাকবে না। অনেক নাট্যকার একাঙ্ক নাটকে একটি বক্তব্য বা ভাব উপস্থাপিত করলেও সেই ভাব প্রকাশের জন্য নানা ঘটনার সমাবেশ ঘটান। এর ফলে নাটকের ভাব-সংহতি (Unity of idea) ব্যাহত হয়। অবশ্য এক বা একাধিক চরিত্রদ্বারা ঘটনাগুলি বর্ণিত হলে (reported) এই ভাবসংহতি বিনষ্ট হয় না। কিন্তু ঘটনাগুলি সরাসরি মঞ্চে প্রদর্শিত হলে এটি ঘটনাবহুল একাঙ্ক নাটকের (episodic one-act play) রূপ নেবে। এগুলি সার্থক একাঙ্ক নাটকের শ্রেণীভুক্ত নয়।

গভীর ও হালকা উভয় বিষয় অবলম্বনে একাঙ্কের নাট্যকাহিনী গড়ে উঠতে পারে। উচ্চভাব সম্পন্ন চিন্তাসমৃদ্ধ নাট্যঘটনা একাঙ্কের প্রতিপাদ্য বিষয় হতে পারে, আবার ব্যঙ্গরসাত্মক, কৌতুকমূলক ঘটনা, প্রহসন প্রভৃতি তরল বিষয় মূলক রচনা এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব।[৪]

একাঙ্ক নাটকে একটিমাত্র দৃশ্য (set) থাকবে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, একাঙ্ক অর্থ একটি অঙ্কে সমাপ্ত নাট্যকাহিনী নয়। অনেক সময় একটি অঙ্কে অনেক দৃশ্য থাকতে পারে এবং দৃশ্যে বিভক্ত হলেই স্থানগত ঐক্য রক্ষিত হবে না। শুধু তাই নয় এরফলে নাট্য-ঐক্য ('dramatic unity') বিনষ্ট হবে।[৫] সুতরাং বহুদৃশ্য সমন্বিত এক অঙ্কের নাটককে বিশেষ অর্থে একাঙ্ক বলা যায় না, এখানে একটি অঙ্ক বলতে একটি মাত্র দৃশ্যে রচিত একটি অঙ্ককেই বোঝানো হয়েছে। তবে স্থানগত ঐক্য বলতে একটি স্থানে অভিনয়ের ওপর গুরুত্ব দিলেও সেই স্থান সংলগ্ন অংশকে একই স্থানের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন, একটি ঘর ও সেই ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখা উঠোন বা বারান্দা যা একই সংযোগে যুক্ত। এ জাতীয় নাটকে ঘটনা সংক্ষিপ্ত হয় বলে ঘটনার বিশেষ বিস্তৃতি দেখানো সম্ভব হয় না এবং চরিত্রের বিস্তৃত ক্রমবিকাশ দেখানোর সুযোগও কম। ঘটনার প্রায় চূড়ান্ত পর্যায় থেকে একাঙ্ক নাটকের শুরু। ফলে এই নাটকের আরম্ভ এমন হওয়া উচিত যার ফলে উক্ত নাটকের প্রথম ঘটনার অন্তরালে অনেক ঘটনা ঘটে যাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ কারণে এখানে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রারম্ভিক ঘটনা উপস্থাপিত করা এবং নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ততা ('utmost economy')

রক্ষা করা প্রয়োজন।[৬] প্রকৃতপক্ষে একাঙ্ক নাটকে প্রত্যেকটি দৃশ্যের মধ্যে একটি অখন্ড নাট্য ঘটনায় দ্বন্দ্বসংঘাত, চরম মুহূর্ত ও পরিণতি দেখিয়ে একে রসসমৃদ্ধ করে তুলতে হয়।[৭]

একাঙ্ক নাটকে কালসীমা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিস্তৃতকালে বিধৃত ঘটনা অধিকাংশ সময় সংহত অখন্ডরূপ লাভ না করায় একাঙ্ক নাটকে প্রার্থিত ফললাভ সম্ভব হয় না। একটিমাত্র দৃশ্যে নাট্যকাহিনী সমাপ্ত হয় বলে স্বল্পসময়কালীন ঘটনা পরিবেশিত হয়। পরিমিত সময়ে কাহিনী পরিবেশিত না হলে নাট্যঘটনা তীব্রতা হারাবে, তার দ্রুতগতিময়তা ব্যাহত হবে, সর্বোপরি এর সামগ্রিক ঐক্য বিঘ্নিত হয়ে ঘনবদ্ধ রসসৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং ঘটনা সংক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে কালগত সংহতি রক্ষা করা এ ধরণের নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ।[৮]

একাঙ্ক নাটকে একটি দৃশ্যযুক্ত স্বল্পকালীন অখন্ড ঘটনা থাকায় এর চরিত্র সংখ্যাও হয় অত্যন্ত সীমিত। যে কোন একাঙ্ক নাটকে দুটি অথবা তিনটি বিশিষ্ট চরিত্র থাকবে। তার সঙ্গে একটি অথবা দুটি অপ্রধান চরিত্র থাকা বাঞ্ছনীয়।[৯]

এ ধরণের নাটকে শুরু থেকে তীব্রভাবে নাট্যদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। পূর্ণাঙ্গ নাটকের মত একাঙ্ক নাটকেও এই নাট্যদ্বন্দ্ব চরিত্রের ত্রিমাত্রিক দিক (Three Dimension—Sociology, Physiology, Psychology) প্রকাশ করে, চরিত্রের বিচিত্র রহস্যঘন জটিলতাপূর্ণ বিভিন্নরূপ উদ্ঘাটিত করে।

একাঙ্ক নাটকে অত্যন্ত সচেতন ও সংযতভাবে সংলাপের ব্যবহার করতে হয়। স্পষ্ট, ঋজু, তীক্ষ্ণ সংলাপ এ ধরণের নাটকে প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট একাঙ্ক নাটকে প্রথম সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের মূল ঘটনা আভাসিত হয়ে থাকে। স্বল্পসময়ে নাটকের মূলভাব, চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তকে ফুটিয়ে তোলা এ ধরণের নাটকের সংলাপের বৈশিষ্ট্য।

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টপূর্ব যুগে নাট্যকার ভাস একাঙ্ক নাটক রচনা করেন। তাঁর পাঁচটি একাঙ্কের নাম-- 'মধ্যমব্যায়োগঃ', 'দূতবাক্যম্', 'দূতঘটোৎকচম্', 'কর্ণভারম্' ও 'উরুভঙ্গম্'। এর মধ্যে 'মধ্যমব্যায়োগ:' ও 'উরুভঙ্গম্' ব্যায়োগ শ্রেণীভুক্ত। এ ধরণের রচনায় কোন বিখ্যাত ব্যক্তি নায়ক হবেন, স্ত্রী চরিত্রের সংখ্যা স্বল্প ও একদিনের ঘটনা বর্ণিত হবে; এছাড়া রাজর্ষি, যুদ্ধ, নিযুদ্ধ, ধর্ষণ ও সংঘর্ষ থাকবে।[১০] 'দূতবাক্যম্' বীথী জাতীয়। বীথীতে দুই অথবা কখনো এক ব্যক্তি অভিনয় করে, এখানে অধম, মধ্যম, উত্তম —এই তিনশ্রেণীর চরিত্র থাকবে, এটি সর্বরসলক্ষণযুক্ত ও ত্রয়োদশ অঙ্গযুক্ত হবে।[১১] 'দূতঘটোৎকচম্' ও 'কর্ণভারম্' উৎসৃষ্টিকাঙ্ক। এর বিষয়বস্তু প্রসিদ্ধ, কখনো অপ্রসিদ্ধ হতে পারে, এটি দিব্যপুরুষবর্জিত, এখানে অন্য ধরণের পুরুষ থাকবে। করুণরস, যুদ্ধ, তীব্র প্রহার, স্ত্রীলোকের ভীষণ বিলাপ, নির্বেদযুক্ত লোকের কথা ও নানাপ্রকার ব্যাকুলতা এর মধ্যে দৃষ্ট হবে, এটি সাত্ত্বতী, আরভটী ও কৈশিকীহীন হবে।[১২]

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত 'চতুর্ভাণী'র অন্তর্গত চারটি ভাণ একাঙ্কের লক্ষণযুক্ত। ভাণ এক ব্যক্তি কর্তৃক অভিনীত হয়। এই অভিনয় বিধি দু-ধরণের— নিজের

অনুভূতি প্রকাশক ও অন্যব্যক্তি সম্পর্কিত বর্ণনামূলক। এই নাটক ধূর্ত ও বীট দ্বারা প্রবুক্ত। নানাপ্রকার অবস্থা বর্ণনা ও বিভিন্ন ধরণের কার্যকলাপ নিয়ে এটি রচিত হয়।[১৩] এই চারটি ভাণের নাম— শূদ্রক রচিত 'পদ্মপ্রাভৃতকম্' ঈশ্বরদত্ত রচিত' ধূর্তবিটসংবাদ :', বররুচি রচিত "উভয়াভিসারিকা', শ্যামিলক রচিত 'পাদতাড়িতকম্'।

চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য দর্পণঃ' গ্রন্থে নানাপ্রকার একাঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকেও একাঙ্ক রচিত হয়েছে। যেমন, বামনভট্টের 'শৃঙ্গারভূষণম্'। এ সব একাঙ্ক আলোচনা করলে দেখা যায়, এখানে ঘটনা-স্থান-কাল-ঐক্য রক্ষা করা হয়েছে।

বাংলা একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'ভারতমাতা' (অভিনয়-১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩, ন্যাশানাল থিয়েটার) একাঙ্কটি রচনা করেন।[১৪] এ প্রসঙ্গে বলা যায়, সে সময় হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় চেতনা কলকাতার শিক্ষিত জনমানসকে আন্দোলিত করেছিল তারই প্রবাহ সাধারণ রঙ্গালয়ে এসে পৌঁছয় এবং 'ভারতমাতা'য় সেই চেতনার প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।[১৫]

এরপর রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) রচিত 'দ্বাদশ গোপাল' (প্রথম প্রকাশ ১২৮৫) একাঙ্ক নাটকটি (প্রহসন শ্রেণীর) স্মরণীয়। নাট্যকার উক্ত নাটককে 'একাঙ্কাঙ্গ' নামে বিশেষিত করেছেন।[১৬] গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'ভোটমঙ্গল' (ন্যাশানাল থিয়েটার, ১৮৮২, হাস্য রসাত্মক) একাঙ্ক শ্রেণীভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিদায় অভিশাপ' (১৩০১), 'কাহিনী' গ্রন্থের (১৩০৬) অন্তর্গত 'গান্ধারীর আবেদন' (১৩০৪), 'সতী' (১৩০৪), 'নবকবাস' (১৩০৪) একাঙ্ক নাটকের পর্যায়ে পড়ে। তাঁর 'কাহিনী' গ্রন্থের 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' (১৩০৬) কে বাংলার বিশিষ্ট একাঙ্ক নাটক হিসেবে গণ্য করা যায়। এছাড়া তাঁর 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থের (১৩১৪) 'বিনি পয়সার ভোজ' (১৩০০), 'স্বর্গীয় প্রহসন' (১৩০১) একাঙ্ক নাটকের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রথম প্রহসনটি 'ভাণ' (একোক্তি মূলক রচনা) শ্রেণীভুক্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম' (১৯১১) একাঙ্ক নাটকের পর্যায়ে পড়ে। সুধাকৃষ্ণ বাগচি সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকায় ১৩২১ সন, পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'প্রেমের স্বপন' নাটকটি একাঙ্ক নাট্য সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

পরবর্তীকালে একাঙ্ক রচয়িতার ক্ষেত্রে মন্মথ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সুদীর্ঘকালব্যাপী অজস্র একাঙ্ক নাটক রচনা করে গেছেন। তিনি দু'শর ওপর একাঙ্ক রচনা করেন। তাঁর প্রথম একাঙ্ক 'মুক্তির ডাক' (পূর্বনাম 'অম্বা') হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়।

বিধায়কও কয়েকটি একাঙ্ক নাটক রচনা করেন। বর্তমান অধ্যায়ে তাঁর মঞ্চে অভিনীত একাঙ্ক নাটকের আলোচনায় প্রবেশ করছি।

তাহার নামটি রঞ্জনা

(প্রথম অভিনয়: ২ ডিসেম্বর, ১৯৬২, রঙমহল)

বেতারে প্রথম প্রচার: ৩০ নভেম্বর, ১৯৬২

এই নাটকটি Holworthy Hall ও Robert Middlemass-এর 'The Valiant' (1921)-এর অনুপ্রেরণায় রচিত।[১৭] নাট্যকার বলেছেন— "একটি বিদেশী কাহিনীর অনুপ্রেরণায় এই নাটক লিখিত।"

কাহিনীটি এইরূপ— দীর্ঘদিন গৃহ থেকে পলাতক Joseph Antony Paris নামে এক যুবক বিশেষ কারণে এক ব্যক্তিকে খুন করে James Dyke ছদ্মনামে পুলিশের কাছে ধরা দিলে বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হয়। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সে নিজের প্রকৃত পরিচয় জানায় না। এমনকি ফাঁসির দিন বহুদূর থেকে আগত তার ছোটবোন Josephine Paris-কেও আত্মপরিচয় দানে বিরত থাকে। Josephineও দীর্ঘদিনের অদর্শনে দাদাকে চিনতে না পেরে ফিরে যায়।

সিদ্ধান্তবাক্য : মানুষ জ্ঞাতসারে আঘাত দিয়ে প্রিয়জনকে মানসিক যন্ত্রণায় কাতর করে তুলতে চায় না।

কথাবস্তু : বিশ্বাসঘাতক বন্ধু কিষণচাঁদকে হত্যা করে অম্বুজাক্ষ মজুমদার নামে এক যুবক পুলিশের কাছে ধরা দিলে তার মৃত্যু দন্ডাদেশ হয়। তীব্র মানসিক আঘাত থেকে প্রিয়জনকে অব্যাহতি দেবার জন্য সে আত্মসমর্পণকালে ছদ্মনাম (কৌশিক গুপ্ত) ব্যবহার করে এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেই বিষয়ে অবিচল থাকে।

নামকরণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষণিকা' (১৩০৭) কাব্যগ্রন্থের 'একগাঁয়ে' কবিতার অংশবিশেষ অবলম্বনে উক্ত নাটকের নামকরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উক্ত কবিতার চার পংক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে—
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

যুগপ্রভাব : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সমগ্রদেশব্যাপী যে অর্থনৈতিক টানা পোড়েন, বেকারীত্ব, চরিত্রের নৈতিক অবনতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যুগের সেই অবক্ষয়ের দিকটি উক্ত নাটকে বিধৃত।

গঠনরীতি :—

ক) ঘটনা সংযোজন : বহরমপুর জেলে মাত্র দুই ঘণ্টাপর খুনী আসামী যুবক কৌশিক গুপ্তর ফাঁসি হবে। ভদ্র ও স্বল্পবাক্ যুবকটির জন্য জেলের প্রৌঢ় পুলিশ অফিসার বিরাজমোহন সরকারের হৃদয়ের মধ্যে একটি কোমল স্থান রয়েছে। জেলের পন্ডিত কাশীনাথ আগমবাগীশও তার প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল। উভয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে জানা যায়, কৌশিক প্রায় সাতমাস জেলে রয়েছে। এর মধ্যে এক প্রকাশকের অনুরোধে সে তার জীবনকাহিনী লিখে পাঠালে প্রকাশক গ্রন্থস্বত্ব বাবদ দুই হাজার টাকা তাকে পাঠিয়ে দেন। সে প্রকাশক ব্যতীত অন্য কাউকে তার জীবনকথা বলতে স্বীকৃত হয়নি। ফাঁসির দিন কৌশিক তার বন্ধু-হত্যার পশ্চাদ্‌কাহিনী শুনিয়ে বিরাজমোহন ও কাশীনাথের দীর্ঘদিনের কৌতূহলের অবসান ঘটায়। সে জানায়, সে তার প্রেমিকাকে বন্ধু কিষণচাঁদের তত্ত্বাবধানে রেখে কিছুদিনের জন্য পাটনায় যায়। ফিরে এসে জানতে পারে, কিষণচাঁদ মেয়েটির শ্লীলতাহানি ঘটিয়ে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছে। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে কৌশিক বন্ধুকে হত্যা করে ও হত্যাপরাধের সাজা পাওয়ার জন্য পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সেই সময় জেল সুপারের বিশেষ অনুমতিতে শিলিগুড়ির অঞ্জনা গ্রাম থেকে রঞ্জনা মজুমদার নামে এক তরুণী কৌশিকের সঙ্গে দেখা করতে আসে। দুজনের নিভৃত আলাপে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কৌশিকই তরুণীর দীর্ঘদিন পূর্বে চাকরীর সন্ধানে পলাতক দাদা অম্বুজাক্ষ মজুমদার। সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করতে ভালবাসত এবং রোজ রাতে রবীন্দ্রনাথের 'এক গাঁয়ে' কবিতা শুনিয়ে রঞ্জনাকে ঘুম পাড়াত। সে অর্থোপার্জনের আশায় মা ও প্রিয় ছোটবোনকে ত্যাগ করে মাত্র ষোল বছর বয়সে গ্রাম থেকে শহরে আসে। কিন্তু আদর্শবাদী অম্বুজাক্ষ সৎ উপায়ে অর্থোপার্জনে ব্যর্থ হয় ও অসাফল্যের গ্লানিতে সে পরিবারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখে না। এদিকে প্রেমঘটিত ব্যাপারে সে এক হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে কিন্তু সেই নিষ্ঠুর সত্য প্রকাশ করে মা ও বোনকে চরম আঘাত দিতে না চাওয়ায় সে রঞ্জনার কাছেও তার প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখে এবং নিজেকে অম্বুজাক্ষের বন্ধু বলে পরিচয় দেয়। দীর্ঘদিনের অদর্শনজাত অনিশ্চয়তার জন্য রঞ্জনাও কেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। সে ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় এবং যাওয়ার পূর্বে কৌশিকের বিশেষ অনুরোধে প্রকাশকের কাছ থেকে পাওয়া

তার দুই হাজার টাকা গ্রহণ করে। রঞ্জনা চলে গেলে কৌশিক ফাঁসি মঞ্চের দিকে এগিয়ে যায়— চলতে চলতে সে তার ও ছোটবোন রঞ্জনার প্রিয় কবিতা 'এক গাঁয়ে' কবিতাটি আবৃত্তি করতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'The Valiant'-এর ছায়া অবলম্বনে সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী 'আশংসা' (১৩৬৫) নামে একটি একাঙ্ক লেখেন। এই নাটকে দেখানো হয়েছে, প্রতুল নামে এক আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক কালোবাজারী ভেজাল ওষুধের চোরাকারবারী ও দুশ্চরিত্র খুসীবাবুকে হত্যা করে সুনীল ছদ্মনামে পুলিশের কাছে ধরা দিলে বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হয় ও সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে আত্মপরিচয় উদ্ঘাটন করে না। এইভাবে তার ফাঁসির দিনে জেলে আগত ছোটবোন বিপাশাকে হতাশ করে। বিষণ্ণ ব্যথিত বিপাশা ফিরে যায়। প্রতুল ফাঁসির জন্য প্রস্তুত হয়।

মূল নাটকে (The Valiant) Joseph Antony / James Dyke নিজের প্রকৃত পরিচয়, হত্যার কারণ ও নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে কিছুই জানায়নি। শুধু Father Daly-র বারংবার অনুরোধে সে বলেছে—

".......The man deserved to be killed; he was n't fit to live. It was my duty to kill him, and I did it "

বিধায়ক 'তাহার নামটি রঞ্জনা' নাটকে হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে একটি প্রেমকাহিনীর অবতারণা করেছেন। অন্যদিকে সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী রাজনৈতিক তথা সামাজিক ঘটনা চিত্রিত করেছেন। তিনি তাঁর নাটক (আশংসা) সম্পর্কে বলেছেন—

"এই নাটকে একটি রাজনৈতিক theory আলোচনা করা হয়েছে। ..."[১৮]

খ) গঠনরীতিতে ঐক্যত্রয় : উপরিউক্ত নাট্য-ঘটনা আলোচনা করলে একাঙ্ক নাট্যগঠনের ত্রি-ঐক্য লক্ষ্য করা যায়—

ঘটনা-ঐক্য : এই নাটকের একটি মাত্র বৃত্ত। কৌশিক ওরফে অম্বুজাক্ষের চাকুরীর চেষ্টায় গৃহত্যাগ, অর্থোপার্জনের ব্যর্থতায় মা ও ছোটবোনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হওয়া, বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে হত্যা করে ছদ্মনামে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কৌশিকের ফাঁসির দিন বোন রঞ্জনার তার কাছে আগমন, বোনের কাছে তার মিথ্যা পরিচয় দান ও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া— এটিই নাটকের আধিকারিক বৃত্ত। কোন উপকাহিনী না থাকায় এখানে ঘটনাগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

কাল-ঐক্য : এই নাটকটির কাহিনীর সময়কাল দুই ঘন্টা। সুতরাং কাল-ঐক্য রক্ষিত হয়েছে।

স্থান-ঐক্য : জেলের অফিস ঘরে সমগ্র নাট্যঘটনা সংঘটিত হওয়ায় এখানে স্থান-ঐক্য বজায় রয়েছে।

চরিত্র-চিত্রণ :—

প্রধান চরিত্র :

কৌশিক গুপ্ত ওরফে অম্বুজাক্ষ মজুমদার বর্তমান নাটকের প্রধান চরিত্র। চরিত্রলিপিতে নাট্যকার এইভাবে কৌশিকের পরিচয় দিয়েছেন—

"**যুবক**।। ফাঁসির আসামী। সুন্দর স্বাস্থ্য, মুখখানিও সুন্দর। সমস্ত মুখে একটি নিষ্পাপতার প্রকাশ। কথা বলে শাণিত ভঙ্গীতে। উদ্ধত নয়।"

অম্বুজাক্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। সে সৎ, দৃঢ়চেতা। তাই সে দীর্ঘদিন অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ব্যর্থ হযেও অসাধুতার আশ্রয় নেয়নি। এই মানসিকতার জন্যই সে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে ক্ষমা করতে পারেনি, তাকে হত্যা করে তার চবম শাস্তি দিয়েছে।

তার মধ্যে একটা বেপরোয়াভাব রয়েছে। সেই কারণে সে মাত্র ষোল বছর বয়সে রোজগারের চেষ্টায় বাডী থেকে পলায়ন করে শহরে চলে আসে। কিষণচাঁদ হত্যার মধ্যে তার সেই বেপরোভাবই লক্ষ্য করা যায়। সে ভীরুতাকে কোর্নাদন প্রশ্রয় দেয়নি। 'The valiant' নাটকেব James Dyke ও অকুতোভয় ছিল। তার বিশেষ প্রিয় ছিল 'William Shakespeare'-এর 'Julius Caesar' নাটকের নিম্নলিখিত অংশটি—

Cowards die many times before their death
The Valiant never taste of death but once.
—Julius Caesar, Act-2, Scene-2.

সে ছিল বেকার যুবক। অর্থ উপার্জনে ব্যর্থ অম্বুজাক্ষ আত্মগ্লানিতে মা ও প্রিয়বোনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছে ও বেকারীত্বের যন্ত্রণা প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করেছে।

মা ও ছোটবোন ছিল অম্বুজাক্ষের সবচেয়ে প্রাণের লোক, প্রিয়জন। তাদের সুখী করতে সে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে। সে জানত, তার মা ও বোন রঞ্জনা তার পথ চেয়ে বসে আছে, তার সততা ও ন্যাযনিষ্ঠার জন্য তারা গর্ববোধ করে। সে তাই কোনদিন তার প্রিয়জনকে আঘাত দিয়ে চায়নি। কিন্তু তার দ্বারা যখন অবাঞ্ছিত হত্যাকান্ড সংঘটিত হল তখন সে তাদের নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইল না— ছদ্মনাম গ্রহণ করল। এইভাবে অম্বুজাক্ষর যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয় কৌশিক নামের অন্তরালে সান্ত্বনার পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছে।

তার মধ্যে ছিল একটি অনমনীয় মনোভাব। তাই কিষণচাঁদকে হত্যা করে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে কোনদিন আত্মপক্ষ সমর্থন করেনি—

বিরাজমোহন : "কোর্টে দাঁড়িয়ে ও আত্মপক্ষ তো সমর্থন করলই না, উপরন্তু ক্রমাগত বলে গেল,—আমি খুন করেছি কিষণচাঁদকে। বিচার করে যে দণ্ড হয় দিন।" (পৃ. ১১)

এমন কি মৃত্যু দন্ডাদেশ জেনেও সে একবারের জন্য প্রাণভিক্ষা চায়নি।

তার মধ্যে কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গে সুকোমল বৃত্তিও লক্ষ্য করা যায়। আর রয়েছে পরোপকার স্পৃহা, সহানুভূতিশীলতা। সেই কারণে সে পিতৃমাতৃহীন একটি বিপন্ন মেয়েকে উদ্ধার করে তাকে স্ত্রীর সম্মান দিতে চেয়েছিল—"সে আমার বাগদত্তা। মেয়েটির বাপ মা কেউ ছিল না, তাকে কলকাতার পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।" (পৃ. ১৯) তার সুকোমল বৃত্তির অন্য একটি পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্র কবিতা-প্রীতির মধ্য দিয়ে। গ্রামে থাকাকালীন সে সর্বদা রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তি করত,—

রঞ্জনা ॥ ....."দাদা রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করত দিনরাত। রবীন্দ্রনাথের লেখা এত ভালবাসত যে গাঁয়ের লোকে ওকে 'রবি পাগলা' বলত।" (পৃ. ৩০)

প্রবল ইচ্ছাশক্তি (will)-র জন্য অম্বুজাক্ষ সক্রিয় চরিত্র হয়ে উঠেছে এবং নিজের মতাদর্শানুসারে চলেছে। কোন প্রবলশক্তি তাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি। অম্বুজাক্ষ উভযমুখী (ambivert) চরিত্র।

অহম্ (ego) বোধ অম্বুজাক্ষকে নিঃসঙ্গ ও দৃঢ়মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল।

সহযোগী চরিত্র : বিরাজমোহন সরকার, পন্ডিত আগমবাগীশ, বঞ্জনা মজুমদার।

সংলাপ :—

সংলাপের মাধ্যমে অতীতের ঘটনা প্রকাশ :

কৌশিক কি কারণে তার বন্ধু কিষণচাঁদকে হত্যা করেছিল সেই অতীত ঘটনা নিম্নলিখিত সংলাপের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে,—

কৌশিক ॥ যে কথা বিচারককে বলিনি, আজ বলছি সে কথা। আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। কিষণচাঁদ ছিল আমার পরমবন্ধু। সাতদিনের জন্যে আমি পাটনা গিয়েছিলাম। কিষণচাঁদকে বলে গিয়েছিলাম—ওকে দেখাশোনা করতে। ফিরে এসে দেখলাম, কিষণচাঁদ মেয়েটিকে বিয়ে করেছে। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করতেই সে কাঁদতে কাঁদতে বললো, কিষণচাঁদ তাকে অজ্ঞান করে—তার সর্বনাশ করে, তারপর বিয়ে করেছে। অথচ কিষণচাঁদ জানতো সে আমার বাগদত্তা। .....বন্ধুর সঙ্গে বেইমানী করার শাস্তি আমি কিষণচাঁদকে দিয়েছি। (পৃ. ১৮-১৯)

কাব্যধর্মী গদ্য সংলাপ :

অম্বুজাক্ষ । কৌশিক বোন রঞ্জনার হাতে তার উপার্জিত দুই হাজার টাকা তুলে দিয়ে যে সংলাপটি বলেছিল নিম্নে তার একাংশ তুলে ধরা হল। এই সংলাপটি কাব্যময়—

"...... এই দিয়ে তুমি দুটি হার গড়াবে। একটি মায়ের, একটি তোমার। মায়ের লকেটে লেখা থাকবে তাঁর ছেলের নাম—অম্বুজ। তোমার লকেটে লেখা থাকবে তোমার দাদার নাম—কৌশিক। সেই দিকে তাকালেই তোমার

মনে পড়বে তোমার এই খুনী দাদার কথা। ভাইফোঁটার দিনে যদি তোমার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও তার ওপর পড়ে, তবে সেই জলের ফোঁটা আমার কপালে নিশ্চয় জ্বল্ জ্বল্ করবে।"(পৃ. ৪৫)

সরীসৃপ

(প্রথম অভিনয় : ১৯৬২, বিশ্বরূপা)

সিদ্ধান্ত বাক্য : একদা-খ্যাত শিল্পীর লোকবিস্মৃতির অন্তরালবর্তী হওয়া গভীর বেদনাদায়ক।

কথাবস্তু : মনোমোহন থিয়েটারের এক ভগ্নগৃহে প্রায় তিনমাসকালব্যাপী বসবাসকারী, স্বজন কর্তৃক প্রবঞ্চিত, নিঃস্ব, অতীতের বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী সারদাসুন্দরী ও মঞ্চাভিনেতা নিকুঞ্জ নাগ একদিন সন্ধ্যায় তাঁদের স্বর্ণোজ্জ্বল পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন। কারণ পরদিন ভোরে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের নির্দেশে প্রেক্ষাগৃহটি ধূলিসাৎ হবে। সেই রাতে এক চোর (নোংরা), এক ধর্ষিতা মেয়ে (চাঁপা), এক অসুস্থ ভিখিরিও সেখানে আশ্রয় নেয়। কয়েক ঘন্টা পর ভিখিরিটির মৃত্যু ঘটে, মৃত্যুর পূর্বে সে তার সঞ্চিত অর্থ সারদাসুন্দরীকে দিয়ে যায়। পরদিন ভোরে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের লোক এলে সারদাসুন্দরী ভিখিরি প্রদত্ত অর্থ নিয়ে নূতনভাবে জীবন শুরু করার আশায় সকলকে সঙ্গে করে পথে বেরিয়ে পড়েন।

নামকরণ : সরীসৃপ যেমন নির্দিষ্ট বাসস্থান না থাকায় ভাঙা দেওয়ালের ফাকে কোন গর্তে বসবাস করে, সেইরূপ এই নাটকের অভিনেত্রী সারদাসুন্দরী ও অভিনেতা নিকুঞ্জ নাগ অর্থাভাবে কোন স্থায়ী বাসগৃহের ব্যবস্থা করতে না পারায় ধ্বংসপ্রায় মনোমোহন থিয়েটারের বিবরসদৃশ ভগ্নগৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই প্রেক্ষাগৃহ ভাঙার সময় হলে তাঁরা আবার বসবাসের উদ্দেশ্যে অন্যত্র যাত্রা করলেন। তাঁদের এই জীবনধারা অবলম্বনে নাট্যকাহিনী গড়ে ওঠায় উক্ত নাটকের নামকরণ হয়েছে 'সরীসৃপ'। নাটকে সারদাসুন্দরীর উক্তির মধ্যে নামকরণের ইঙ্গিত মেলে—

"....আমরা———আমরা সরীসৃপ। এটা জানা জায়গা। ভালই ছিলাম এতকাল। আশ্রয় ভেঙে দিলেন আবার একটা গর্তটর্ত খুঁজে নিয়ে ঠিক ঢুকে পড়বো আমারা।"
(পৃ. ৪৬, সরীসৃপ, চতুষ্পর্ণা, ১৩৭৩)

যুগপ্রভাব : ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট মনোমোহন থিয়েটার ভেঙ্গে রাস্তা নির্মাণ করে (যে স্থানে বিডন স্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এভিন্যু মিলিত হয়েছে)। সে সময়ের পটভূমিকায় 'সরীসৃপ' নাটকের কাহিনী রচিত হয়েছে।

গঠনরীতি ॥

ক) ঘটনা সংযোজন : ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট রাস্তার প্রয়োজনে মনোমোহন থিয়েটার ভাঙতে শুরু করেছে। তবে বর্তমানে কিছুদিনের জন্য ভাঙার কাজ বন্ধ আছে। এক সন্ধ্যায় প্রেক্ষাগৃহ সংলগ্ন ঘরটিতে এক বৃদ্ধাকে বসে থাকতে দেখা যায়। তিনি অতীতের বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী সারদাসুন্দরী। কিছুক্ষণ পর এক বৃদ্ধ এলেন। উনি বিগতদিনের মঞ্চাভিনেতা নিকুঞ্জ নাগ। তিনি এসে বললেন, পরদিন ভোর থেকে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের লোক এসে মনোমোহন থিয়েটার সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলবে। উভয়ের আলোচনর মাধ্যমে জানা যায়, তাঁরা তিনমাস সতেরো দিন সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। উভযই আপনজন কর্তৃক বিতাড়িত। নিঃসন্তান সারদাসুন্দরী একটি কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেকে মানুষ করে, তার বিয়ে দিয়ে যথাসর্বস্ব তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পরিণামে নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় বর্তমান প্রেক্ষাগৃহে আশ্রয় নিতে হয়েছে। নিকুঞ্জ নাগের ইতিহাস প্রায় অনুরূপ। তাঁর দুইপুত্র ও স্ত্রী তাঁকে বিতাড়িত করেছে। সেদিন তাঁদের কাছে আধখানা মাত্র পাঁউরুটি আছে, সেটি-ই উভয়কে ভাগ করে খেতে হবে। এ ধরণের অর্ধাহার, কখনো কখনো অনাহার তাঁদের প্রায়ই হয়ে থাকে। দুজনের কেঁই সেই পাঁউরুটি স্পর্শ করলেন না। দুজন চুপ করে বসে আছেন—কিছুক্ষণ পর সারদাসুন্দরী স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন। তাঁর একদা অভিনীত 'রিজিয়া' নাটকের রিজিয়া ব্যক্তিয়ারের অভিনয়াংশ মনে পড়ে। রিজিয়া চরিত্রে তাঁর অভিনয় দেখে তাঁকে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মুগ্ধ হয়ে আশীর্বাদ করার কথা নিকুঞ্জকে বললেন। তারপর তিনি দুঃখ করে বললেন, বাঙালী জাতির গৌরব মনোমোহন থিয়েটারকে রক্ষা করা সকলের কর্তব্য ছিল কিন্তু কেউ সে ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন না।

তাঁদের কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ দরজায় করাঘাত শোনা গেল। নিকুঞ্জ দরজা খুললে ক্ষতবিক্ষত উনিশ কুড়ি বছরের এক যুবক দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতে বলে। সে তাঁদের জানায়, সে চোর; একটি বাড়ী থেকে ঘড়ি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ায় প্রহার লাভ হয়েছে এবং সে কোনক্রমে পালিয়ে এসেছে। সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল। সে কিছু খাবার চাইলে সারদাসুন্দরী সেই পাঁউরুটি তাকে খেতে দিলেন। নোংরা (সেই যুবকটির নাম) তাঁর এরূপ ব্যবহারে অভিভূত হয়ে তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করে। সারদাসুন্দরীর সহানুভূতিভরা কথা শুনে সে বলে, তার মা বাবা নেই, ছোটবেলা থেকে এক ওস্তাদের অধীনে চুরি, পকেটকাটার কাজ করছে; কয়েকবার জেলও খেটেছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। প্রত্যেকে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সকলেই খিদেয় কষ্ট পাচ্ছেন বোঝা গেল। কিছুক্ষণ পর নোংরা মরীয়া হয়ে খাবারের খোঁজে বাইরে গেল।

সারদাসুন্দরী এবং নিকুঞ্জ আবার অতীতের কথার মধ্যে ডুবে গেলেন। হঠাৎ দুজনে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন, শতচ্ছিন্ন পোষাক পরা এক বৃদ্ধ ভিখিরি ছেঁড়া মাদুর ও ময়লা বালিশ নিয়ে ঘরে ঢুকছে। ভিখিরিটি জানায়, সে অসুস্থ, বাইরে ভীষণ ঠান্ডা পড়ায় সে ঘরের মধ্যে চলে এসেছে। তারপর সে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। হঠাৎ সে উঠে বলে, পঞ্চাশ বছর ধরে সে ভিক্ষে করে যে পয়সা জমিয়েছে তার একটা পয়সাও খরচা করেনি, এঁটো খাবার খেয়েই বেঁচে আছে। তার একমাত্র সাধ ছিল, সেই অর্থ দিয়ে গঙ্গার ধারে একটা কুঁড়েঘর করে থাকবে। কিন্তু সে ইচ্ছা বোধহয অপূর্ণই থেকে গেল। এই কথা বলে সে আবার শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সে জেগে ওঠে এবং চীৎকার করে বলে, তার মনে হচ্ছে, তার শীঘ্র মৃত্যু হবে। যদি তাব মৃত্যু হয় তবে তার সঞ্চিত অর্থ (একত্রিশ টাকা কম দুই হাজার টাকা) সারদাসুন্দরী যেন গ্রহণ করেন। সারদাসুন্দবী ডাক্তার ডাকতে চাইলে সে ঘোরতর আপত্তি জানায। তারপর সে শুয়ে পড়ে।

নিকুঞ্জ চোখ বোজেন। সারদাসুন্দরী খাটিয়ায় বসে সামনের দিকে চেয়ে থাকেন—চোখের সামনে তাঁর পুরোনো দিনের অভিনয়ের ছবি ফুটে ওঠে, ধীরে ধীরে তাঁর চোখ জলে ভরে ওঠে, এক সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। হঠাৎ দরজায় করাঘাত হতে থাকে। তিনি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলে একটি বছর ষোল বয়সের সুন্দরী তরুণী ঝড়ের গতিতে ঘরে প্রবেশ করে। মেয়েটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মেয়েটি যে পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছে তা তাকে দেখামাত্রই উপলব্ধি করা যায়। চোখে মুখে জল দিলে তার জ্ঞান ফিরে আসে। সে (চাঁপা) জানান, তার মামা অর্থের লোভে তাকে পাড়ার সুখন মস্তানের কাছে বিক্রি করেছে। সে কোনক্রমে সুখনের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। সারদাসুন্দরী তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন, মেয়েটি কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে নোংরা এক ঠোঙা খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে। সারদাসুন্দরী সকলকে খাবার ভাগ করে দিলেন, কেবল বৃদ্ধ উঠল না, খেল না। খাওয়া শেষ হলে সকলে শুয়ে পড়ে।

সকাল হয়েছে। সারদাসুন্দরী একে একে সকলকে ডেকে তুললেন। বৃদ্ধকে ডাকতে গিয়ে তাঁর কেমন সন্দেহ হয়; নিকুঞ্জ পরীক্ষা করে বললেন, বৃদ্ধ অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে। সারদাসুন্দরী স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি পূর্ব কথামত বৃদ্ধের সঞ্চিত অর্থ বালিশের ভেতর থেকে বের করে নিলেন। এদিকে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের লোক এসে বাড়ী ভাঙতে শুরু করেছে। সারদাসুন্দরী নোংরাকে বললেন, সে যদি চুরি ছেড়ে ব্যবসা করে (এজন্য তাকে তিনি দুশ টাকা দেবেন), চাঁপাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেয় তবে তিনি নোংরাকে তাঁর পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবেন। নোংরা সানন্দে সে প্রস্তাবে রাজী হয়। সারদাসুন্দরী ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের এক অফিসারকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে অনুরোধ করেন, তিনি যেন সেই অর্থে গঙ্গার ধারে মৃত বৃদ্ধ ভিখিরির সৎকারের ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

খ) গঠনরীতিতে ঐক্যত্রয় : 'সরীসৃপ' নাটকে একাঙ্ক নাট্য গঠনরীতির ত্রয়ী ঐক্য রক্ষিত হয়েছে।

ঘটনা-ঐক্য : এই নাটকে একটি মাত্র বৃত্ত রয়েছে, উপবৃত্ত নেই। পালিত পুত্র কর্তৃক প্রবঞ্চিত অতীতের প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী বৃদ্ধা সারদাসুন্দরীর সমসাময়িক মঞ্চাভিনেতা স্ত্রী পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত নিকুঞ্জ নাগের সঙ্গে ভগ্ন মনোমোহন থিয়েটারে অবস্থান, গৌরবময় অতীত দিনের কথা মনে করে তাঁর গভীর বেদনাবোধ, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট মঞ্চগৃহটি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলে সে স্থান পরিত্যাগ—এই বিষয় নিয়ে নাট্যকাহিনী গড়ে ওঠায় ঘটনা-ঐক্য রক্ষিত হয়েছে।

কাল-ঐক্য : কয়েক ঘণ্টার (একদিন সন্ধ্যা থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত) কাহিনী এখানে বিধৃত হওয়ায় কালগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

স্থান-ঐক্য : মনোমোহন থিয়েটারের একটি ভগ্নগৃহে সমগ্র নাট্য ঘটনা সম্পন্ন হওয়ায় এখানে স্থান-ঐক্য পাওয়া যায়।

চরিত্র-চিত্রণ ।।

কেন্দ্রীয় চরিত্র : সারদাসুন্দরী উক্ত নাটকের প্রধান চরিত্র।

সারদাসুন্দরী বিগত দিনের খ্যাতনামা মঞ্চাভিনেত্রী, একসময় প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেছেন। তিনি মনোমোহন মঞ্চেও অনেক সাড়া জাগানো অভিনয় করেছেন; গিরিশ ঘোষের সঙ্গেও কিছু নাটকে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন (সারদাসুন্দরী। 'পাঁচ সাতখানা বই করেছি')। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি মঞ্চ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন।[১১] বর্তমানে তিনি বৃদ্ধা, পালিত পুত্র কর্তৃক প্রবঞ্চিতা নিঃস্ব নারী। কিন্তু সে বঞ্চনা তাঁকে বোধহয় ততটা মুহ্যমান করতে পারেনি। তাঁর বেদনা হৃদয়ের অনেক গভীরে। এ ব্যথা, এ যন্ত্রণা হয়তো দু'একজন বুঝতে পারেন। তিনি একদিন অভিনয়ে দর্শকদের অভিভূত, মুগ্ধ করেছিলেন। তাদের মুগ্ধতাবোধ তাঁকে এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকে পৌঁছে দিত। বর্তমানে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত নন বলে সেই দর্শকের একজনকেও তিনি কাছে পান না। তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাঁর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাই তিনি মনে মনে নিঃসঙ্গ, ভীষণ একা। বর্তমানে অধিকাংশ সময় স্মৃতি রোমন্থন করেন, আবার কখনো কখনো অতীতের সোনালী দিনের মধ্যে হারিয়ে যান। সেই সময় তাঁর মনে পড়ে যায় বিভিন্ন অভিনয় রজনীর খন্ড খন্ড অংশ। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সেই মোহময় স্বপ্ন জড়ানো জগৎ থেকে তিনি কঠোর বাস্তবের সামনে এসে পড়েন। তখন তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাসে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে, এক বিষাদময়তায় চারিদিক ভরে যায়,—

> "ভারী অদ্ভুত লাগে ভাবতে, নিকুঞ্জ? এই তো সেই মনোমোহন থিয়েটারের অডিটোরিয়াম; স্তব্ধ, শূন্য, নির্জন। কে বলবে আজ—যে এখানে আগে হাজার বাতি জ্বলতো। আজো এর শূন্যে—বোবা হয়ে, বন্দী হয়ে আছে—গিরিশবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু, অমরবাবু, চুনীবাবু, তারাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, কুসুমকুমারী, বড় সুশীলা, দানীবাবু, ভুনীবাবুর কণ্ঠ। এইতো সেদিনও ইন্দু গান গেয়ে পাগল করে দিয়ে গেছে মানুষকে। ......সবশেষ! কাল সকাল থেকে রোলার চলবে আবার।"
>
> (পৃ. ৭)

নারীসুলভ কোমলতা, স্নেহশীলতা সারদাসুন্দরীকে বিশেষ সৌন্দর্য দান করেছে। পালিত পুত্রের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েও তাঁর মধ্যে স্নেহধারা শুকিয়ে যায়নি। চোর নোংরা যখন তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করল তখন তাঁর মধ্যে আবার মাতৃত্ববোধ জেগে উঠল। অত্যাচারিতা চাঁপাকেও তিনি পরম মমতায় কাছে টেনে নিলেন। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

"ভয় নেই তোমার। .....আমার কাছ থেকে কেউ তোমায় নিয়ে যেতে পারবে না। শোও ; ঘুমোও ! লক্ষ্মী মা আমার, একটু ঘুমিয়ে নিলে অনেকটা ভাল বোধ করবে কাল সকালে।" (পৃ. ৩৯)

শেষ পর্যন্ত চাঁপাকে গৃহবধূর মর্যাদা দেবার জন্য তাকে বিবাহ করতে নোংরাকে আদেশ দিলেন। নারীকে এরূপ সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তাঁর উচ্চমানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃদ্ধ অসুস্থ ভিখিরির প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শনে তাঁর মমতাময়ী রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

গৌরবময় অতীত কালের গতিতে বর্তমান অবক্ষয়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে নিজের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যেমন গুমরে গুমরে কেঁদে মরে এককালের খ্যাতনামা অভিনেত্রী সারদাসুন্দরী বৃদ্ধবয়সে তাঁর করুণ পরিণতিতে যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করেছেন।

বিশেষ সহযোগী চরিত্র : নিকুঞ্জ নাগকে সারদাসুন্দরীর বিশেষ সহযোগী চরিত্ররূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

নিকুঞ্জ মঞ্চাভিনেতা। এক সময় তিনি গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখর প্রমুখ বিখ্যাত অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। 'রিজিয়া' নাটকে বক্তিয়ার-এর ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। সেই নাটকের নামভূমিকায় ছিলেন সারদাসুন্দরী। স্ত্রী পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত নিঃস্ব নিকুঞ্জ সারদাসুন্দরীর সঙ্গে মনোমোহন থিয়েটারের ভগ্নগৃহে বসবাস করছেন। তিনি সারদাসুন্দরীকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁর ব্যথা অনুভব করেন। মাঝে মাঝে স্মৃতির দুঃসহভারে তিনি ক্লিষ্ট হয়ে পড়েন। তবে তিনি নিষ্ঠুর বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের বর্তমান দুরবস্থায় কেউ যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে না তা তিনি ভালো করেই জানেন। কিন্তু সেজন্য তাঁরা যে কাউকে কিছু বলতে পারবেন না সে কঠিন সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন—

"কথা বলবার দিন তো ফুরিয়ে গেছে আমাদের ম্যাডাম! এবার শোনার দিন এলো। যখন কথা বলবার দিন ছিল, তখন এইখানে, এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলেছি। আমি বলেছি, তুমি বলেছ, আর হাজার হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে শুনেছে।"

(পৃ. ৯)

—নানা রঙে ভরা পুরোনো দিনের সঙ্গে বিবর্ণ বর্তমানের পার্থক্য তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন। তাই তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘনিঃশ্বাস, মুখে ফুটে ওঠে খেদোক্তি। নিকুঞ্জর বিভিন্ন অভিব্যক্তি সারদাসুন্দরীর গভীর হৃদয়বেদনা উপলব্ধির সহায়ক হয়ে উঠেছে।

নেপথ্য চরিত্র : চোর নোংরার পশ্চাদ্ধবনকারী কিছু ব্যক্তি মঞ্চের বাইরে থেকে নিম্নলিখিত সংলাপের মাধ্যমে তাদের মানসিক ভাবনাকে প্রকাশ করেছে। এরা মঞ্চে উপস্থিত না হয়ে বাইরে অবস্থান করে তাদের ভূমিকা পালন করায় এদের নেপথ্য চরিত্ররূপে অভিহিত করা যায়।

—তোকে বললাম খ্যাঁদা—ব্যাটাকে শক্ত করে ধরে রাখ্। তোর আবার সিগারেট খাবার বাই উঠলো। নে, এখন যত পারিস সিগারেট খা।

—আমি কি জানি যে শালা সাপের মত ফস্ করে কোন্ গর্তে গিয়ে ঢুকে পড়বে?

—আরে এখানে যে একটা ঘর দেখতে পাচ্ছি। এটা তো ভাঙেনি এখনো! ডেকে দেখবো নাকি কেউ আছে কিনা?

(ম্যাডাম চট্ করে উঠে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলেন। ঘর অন্ধকারে ভরে গেল)

—ওরে বাবা! আর ডেকে দরকার নেই। এটা মনোমোহন থিয়েটার। ভূতের আড্ডা।

—ভূতের আড্ডা মানে, যত এ্যাক্টর এ্যাকট্রেস মরেছে, সব—

(নিকুঞ্জ দেশলাই জ্বেলে আবার মোমবাতি ধরালেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে শোনা গেল—)

—ওরে পালিয়ে আয়। দেখছিস নে ঘরের মধ্যে একবার আলো জ্বলছে আর নিবছে। ওরে বাবা!

(অনেকগুলো পলায়মান পায়ের শব্দ শোনা গেল) (পৃ. ১৫)

সংলাপ —

অপ্রকাশিত অতীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রকাশ:

সারদাসুন্দরী নিকুঞ্জের কাছে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছেন। তাঁর সংলাপের মাধ্যমে অতীতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা দর্শকের সামনে যেন প্রতিভাত হচ্ছে,—

"কত কথাই যে মনে পড়ে। একদিন প্লে'র পর ঘরে বসে বিশ্রাম করছি—এমন সময় পাঁচী এসে বললে—গিরিশবাবু এসেছেন। ঘরে ঢুকলেন। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে প্রণাম করলাম। অনেকক্ষণ চুপ করে মুখের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন—সারদা, আজ তোমার অভিনয় দেখে মনে হল—তুমিই বোধ হয় দিল্লীতে রিজিয়া হয়ে জন্মেছিলে......।" পৃ. ১১

অন্যত্র নিকুঞ্জ সারদাসুন্দরীকে বলছেন—

"ম্যাডাম, তোমার মনে আছে, সেই একবার এখানে প্লে ভেঙ্গে যাওয়ার পর কী কান্ড হয়েছিল? (ম্যাডাম চাইলেন) আরে, সেই যে বাইরে খুব জল ঝড় হচ্ছিল। অডিয়েন্স বললে—এই দুর্যোগে বাড়ী যাব কী করে আমরা? তখন মুস্তফী সাহেব তারাকে ডেকে বললেন—তারাসুন্দরী, এস আমরা নতুন কিছু করি। এই বলে ড্রপ তুলে দিয়ে অর্ধেন্দু মুস্তফী, তারাসুন্দরী আর গিরিশ বাবু তিনজনে মুখে মুখে বানিয়ে নাটক অভিনয় করে যেতে লাগলেন। পঞ্চাশ মিনিট। পঞ্চাশ মিনিট পরে বৃষ্টি কমলো। তখন ড্রপ পড়লো আবার। ওঃ! কী স্বর্ণযুগই গেছে থিয়েটারের।" (পৃ. ২৩-২৪)

সঙ্গীত :

'সরীসৃপ' নাটকে একটিমাত্র সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে এবং সেটি মঞ্চের অন্তরাল থেকে শোনানো হয়েছে। সঙ্গীতটির মধ্য দিয়ে সারদাসুন্দরী ও ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের অফিসারের মানসিকতার রূপটি ফুটে উঠেছে—

(কেউ) শীতল জলদে / হেরে অশনির / জ্বালা। মাত্রা ৬+৬+অপূর্ণমাত্রা ২

(কেউ) মুঞ্জরিয়া তো/লে তার শুষ্ক / কুঞ্জ বীথি। মাত্রা ৬+৬অপূর্ণমাত্রা ৫

(হেরে) কমল মৃণালে / কেউ কাঁটা কেহ / কমল,— মাত্রা ৬+৬অপূর্ণমাত্রা ৩

(কেউ) ফুল দলি চলে, / কেউ মালা গাঁথে / নিতি। মাত্রা ৬+৬অপূর্ণমাত্রা ২

—এটি কলাবৃত্ত ছন্দের সংগীত। প্রতিটি পর্ব ৬ মাত্রার। এখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির 'কেউ' এবং তৃতীয় পংক্তির 'হেরে' ২ মাত্রার অতিপর্ব।

উক্ত নাটকে মোট বারটি চরিত্র রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি চরিত্র (মাতাল, চোরেব পশ্চাদ্ধাবনকারী দুইজন যুবক) মঞ্চের অন্তরালের।

'সরীসৃপ' নাটক প্রসঙ্গে 'সূত্রধার' বলেন—

".......সরীসৃপ আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এক নিখুঁত কাব্যধর্মী একাঙ্ক, যা বাংলা নাট্য সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনের মর্যাদা পাবে।"[১১]

নিবেদয়ামি

(প্রথম অভিনয় : ১৯৬২, বিশ্বরূপা)

সিদ্ধান্ত বাক্য : দেশপ্রেমিকরাই দেশের বিপদের দিনে বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে।

কথাবস্তু : চীন আক্রমণে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে নূতন করে স্বদেশ চেতনা দেখা দেয়। অসংখ্য যুবকের মত গ্রামের ছেলে সুজন সীমান্ত যুদ্ধে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে কলকাতায় যাত্রা করে। সুজনের বন্ধু প্রবীর প্রথমে যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক হলেও পরে ভ্রাতুষ্পুত্রী রীণার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে সামরিক শিক্ষা গ্রহণে রাজী হয়। যাত্রাকালে সুজনের যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত বোন অতসী নিজের হাতে বোনা পুলওভার প্রবীরকে পরিয়ে দেয়।

নামকরণ : দেশরক্ষার কাজে নিজেকে নিবেদন করার কথা বর্ণিত হওয়ায় উক্ত নাটকের নামকরণ করা হয়েছে 'নিবেদয়ামি'।

যুগপ্রভাব : ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের পটভূমিকায় এই নাটক লিখিত হয়েছে।

গঠনরীতি :—

ক) ঘটনা সংযোজন : চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য দলে দলে যুবক সামরিক শিক্ষা নিতে শুরু করেছে। বিলেপুর মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড়দের হাজিরাবাবু বর্তমানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অপূর্ব চক্রবর্তীর দুইপুত্র বিজন, সুজন, বড়পুত্রবধূ সুরমা ও কন্যা অতসী—সকলেই স্বদেশ ভাবনায় উদ্দীপিত।

দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত অতসী বাইরের ঘরের খাটে শুয়ে শুয়ে কাশছে। হঠাৎ সম্মিলিত 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি শুনে সে জানালার কাছে ছুটে যায়। বাড়ীর সামনে পাড়ার মুখুজ্জে কাকাকে দেখতে পেয়ে সে 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি দানকারী ছেলেদের সম্পর্কে জানতে চায়। মুখুজ্জে কাকা জানান, ওরা সামরিক শিক্ষা নিতে কলকাতায় যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বড় ভাই বিজন অফিস থেকে বাড়ী ফিরে অসুস্থ অতসীর হাতে একটি রেডিও দেয়। অতসী যাতে শুয়ে শুয়ে গান, বক্তৃতা, নাটক বিশেষতঃ যুদ্ধের খবর শুনতে পায় সেজন্য সে রেডিওটি কিনে আনে। অতসী রেডিও খুলে দেয়, রেডিওতে দেশাত্মবোধক গান বেজে ওঠে। ইতোমধ্যে সুজন ও তার বন্ধু প্রবীর ঘরে প্রবেশ করে। প্রবীর মন্তব্য করে, রেডিওতে শুধু যুদ্ধের খবর ব্যতীত অন্য কোন বিষয় নেই এবং তার মতে, বিদেশী আক্রমণে দেশের এমন কিছু সর্বনাশ হয়নি যে তার জন্য দেশবাসী সকলকে প্রাণদান করতে হবে। প্রবীরের মন্তব্যে স্বদেশ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ সুজন ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ীর ভেতর চলে যায়।

সেই সময় গ্রামের ভুবন ডাক্তার সেখানে উপস্থিত হন। তিনি প্রবীরের কথা শুনে তাকে তিরস্কার করে বলেন, দেশের দুর্দিনে যারা প্রবীরের মত আত্মসুখসর্বস্ব তারা দেশের শত্রু। অতসী এ কথার প্রতিবাদ করলে প্রবীর বলে, সে মনের দিক থেকে কোন তাগিদ অনুভব না করায় যুদ্ধে যোগদান করতে রাজী নয় সুতরাং সে ভুবন ডাক্তারের দেওয়া অপবাদ মাথায় করে নিচ্ছে। প্রবীর চলে যায়। অতসী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ভুবন ডাক্তার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, প্রবীর দেশ সম্পর্কে যে ধরণের মন্তব্য করেছে তাতে তাকে বিশ্বাস করা যায় না; সে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। অতসী সে কথা শুনে আর্তনাদ করে বলে ওঠে, প্রবীর দেশদ্রোহী নয়। ভুবন ডাক্তার বলেন, অতসীর কথা সত্য প্রমাণিত হলে তাঁর মত আর কেউ খুশি হবেন না।

ভুবন ডাক্তার চলে যাবার পর সুজন সামরিক শিক্ষা লাভের আশায় কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার জন্য সকলের কাছ থেকে বিদায় নেয়। সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে অতসী কিছুক্ষণ পর একটি সমাপ্তপ্রায় পুলওভার বের করে দ্রুত হাতে শেষ করে ফেলে। ঠিক সেই সময় বন্ধ দরজায় আঘাত পড়ে। দরজা খুলে দিতেই প্রবীর ছুটে ঘরে আসে। সে জানায়, সে তার চার বছরের ভ্রাতুষ্পুত্রী রীণার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে তার পূর্বমত পরিবর্তন করে সামরিক শিক্ষা নিতে কলকাতায় চলেছে। সে কথা শুনে গভীর আনন্দে অতসীর মন ভরে যায়। সে বলে, সে গোপনে তার একটি সোনার দুল বিক্রী করে উল কিনেছে ও অসুখের মধ্যে সকলের নিষেধ সত্ত্বেও লুকিয়ে পুলওভারটি প্রবীরের জন্য তৈরী করেছে। সে ভেবেছিল, প্রবীর সামরিক শিক্ষায় যোগদান করলে

যাত্রাকালে পুলওভারটি তাকে সে উপহার দেবে। প্রবীর প্রথমে যেতে অস্বীকার করায় সে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিল কিন্তু এখন তার দুঃখ নেই। প্রবীর অতসীর দেওয়া পুলওভারটি পরে। অতসী গর্বভরে তাকে বিদায় দেয়। দূরে ছেলেদের জয়ধ্বনি শোনা যায়। অতসী কাশতে কাশতে রক্তবমি করে। এক মুহূর্তে সে হাতের দিকে তাকায়। কিন্তু পর মুহূর্তে জানালার কাছে ছুটে গিয়ে রক্তামাখা হাত নেড়ে বলে ওঠে—জয়হিন্দ্। দূর থেকে প্রতিধ্বনি এল—জয়হিন্দ্।

(খ) গঠন রীতিতে ঐক্যত্রয় ।।

ঘটনা-ঐক্য : এখানে একটি মূল কাহিনী রয়েছে। চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হলে সুজন, প্রবীরের মত দেশের যুবশক্তি কিভাবে দেশ রক্ষার কাজে এগিয়ে আসে এই বিষয় নিয়ে নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। এখানে কোন উপকাহিনী না থাকায় ঘটনা-ঐক্য ব্যাহত হয়নি।

কাল-ঐক্য : কয়েক ঘন্টার ঘটনা বর্ণনা করে নাট্যকার কালগত ঐক্য রক্ষা করেছেন।

স্থান-ঐক্য : অপূর্ব কুমার চক্রবর্তীর বাইরের ঘরে সমগ্র নাট্যঘটনা সংঘটিত হওয়ায় স্থানগত ঐক্য লঙ্ঘিত হয়নি।

চরিত্র চিত্রণ ।

এই নাটকের অতসী, সুজন, বিজন, অপূর্ববাবু, সুরমা, ভুবন ডাক্তার, রীণা ও প্রবীর—এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের নানারূপ লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন চরিত্র (সুজন ও প্রবীর) প্রত্যক্ষভাবে দেশরক্ষার কাজে এগিয়ে গেছে, আবার কেউ কেউ (অতসী, বিজন, অপূর্ববাবু, সুরমা, ভুবন ডাক্তার, রীণা) যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও অন্যান্যদের অনুপ্রাণিত করেছে। তবে এদের মধ্যে অতসী চরিত্র দর্শকদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অতসী যক্ষ্মারোগগ্রস্ত। কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ তার মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তাই অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সে তার সাধ্যানুযায়ী একটি পুলওভার বোনে (তার কানের একটি দুল গোপনে বিক্রি করে সে পুলওভারের উল কিনেছিল)। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল তার দাদা সুজনের বন্ধু প্রবীর যেদিন সামরিক শিক্ষা নিতে কলকাতায় যাবে সেদিন সে তাকে সেটি উপহার দেবে। তাই প্রবীর যখন সামরিক শিক্ষাগ্রহণ করতে অস্বীকার করে তখন সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর প্রবীর তার মত পরিবর্তন করে কলকাতায় যেতে প্রস্তুত হলে অতসীর মন থেকে দুঃখের ভার নেমে যায়। আনন্দে তার বুক ভরে ওঠে। গভীর সুখে বলে ওঠে

"ওই অত অসুখের মধ্যেও রাত জেগে জেগে সক্কলকে লুকিয়ে ওই সোয়েটার আমি বুনেছি। আজই শেষ করেছি ....মনে মনে ভেবেছিলাম—তুমি যেদিন ট্রেনিং-এ যাবে সেদিন এটি তোমায় পরিয়ে দেবো। ভুবনকাকা যখন বললে—তুমি যাবে না, যেতে পারো না, তাইতো তখন অত কেঁদেছিলাম। ভগবান আমার সে কান্না শুনেছেন। নাও পারো।" (চতুষ্পর্ণা, পৃ. ১১২)

সে সেই সঙ্গে প্রবীরকে আশার বাণী শোনায়—

"এমনি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বোনের তৈরী সোয়েটারে যদি আমাদের সীমান্তের বীর ভাইদের গা ঢাকা থাকে—তবে সাধ্য কি শত্রুদের, সে গায়ে একটিও গুলি বেঁধায়।" (পৃ. ১১৩)

শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও অতসী তার সাধ্যমত কাজ করে দেশের প্রতি যে গভীর ভালবাসার পরিচয় দিয়েছে সেই কারণে চরিত্রটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

নেপথ্য চরিত্র ॥

নাটকের শুরুতে লক্ষ্য করা যায়, কিছু চরিত্র মঞ্চের বাইরে 'জয়হিন্দ্' 'বন্দেমাতরম্' বলছে। নাটক সমাপ্তিকালে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ ছেলেদের জয়ধ্বনি শোনা যায় মঞ্চের অন্তরালে। এরা নেপথ্য চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

সংলাপ ॥

কাব্যধর্মী সংলাপ : সামরিক শিক্ষার্থী প্রবীরের যাত্রাকালে অতসী নিজের হাতে বোনা পুলওভার তাকে পরিয়ে দিয়ে উদ্ধৃত সংলাপটি বলেছিল। সংলাপটি কাব্যময়।

"আঃ। কি শান্তি যে পাচ্ছি আজ মনে হচ্ছে এইমাত্র যেন পুজো করে উঠলাম। আমায় ভায়ের পুজো—বীরের পুজো।....." (পৃ. ১১৩)

আবেগময় বক্তৃতাধর্মী সংলাপ

ভুবন ডাক্তার অতসীকে ভারতবর্ষের মূলনীতি স্বরূপ ব্যাখ্যা করার সময় আবেগ ভরে নিম্নলিখিত সংলাপ উচ্চারণ করেন—

"যুদ্ধ ভারতের ধর্ম নয় মা। ভারতের ধর্ম শান্তি। তার ধ্যান শান্তি, ধারণা শান্তি, জ্ঞান শান্তি, কর্ম শান্তি। অন্তরে এই শান্তির অক্ষয়মন্ত্র আছে বলেই সে পৃথিবীর মানুষকে ডেকে বলতে পেরেছে "তোমরা অমৃতের পুত্র"। কিন্তু মা, আমাদের এই শান্তিপ্রিয়তাকে প্রতিবেশী পাকিস্তান ও চীন ভীরুতা বলে মনে করলো। তারা চেষ্টা করলো আমাদের জাতীয় সংহতি নষ্ট করে দেবার। কিন্তু তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর একটি ডাকে দেশের ৪৫ কোটি মানুষ এক সঙ্গে তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে। তাইতো আজ আমাদের এই যুদ্ধসাজ। ভারত তাই আজ এগিয়ে চলেছে পাক-চীনকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে যে ঘুমন্ত বাঘকে অতর্কিতে আঘাত করে তাকে শুধু চমকে দেওয়া যায়, কিন্তু কাবু করা যায় না। ভারতের অন্তর বৈরাগ্যের রঙে রাঙানো, কিন্তু হাতে তার ইন্দ্রের বজ্র। সেই বজ্র দিয়ে যখন সে শত্রুনিধন করবে, তখনও আত্মা তার ডাকবে ভগবান তথাগতকে—শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য, করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।" (পৃ. ১০৫)

সংগীত ॥

(১) নাটকটি দেশাত্মবোধক হওয়ায় জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এখানে সংগীতের ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, রেডিওতে নিম্নলিখিত সংগীতগুলি শোনানো হয়েছে—

(ক) জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি,
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ;
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ! (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

(খ) হে ভৈরব শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহ
সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ....

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(২) নাটকে দেশপ্রেমিক ছেলেরা সংগীতের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছে—

(ক) বল বল বল সবে, শত বীণা বেণু রবে।
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
... ...

(অতুলপ্রসাদ সেন)

(খ) ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহন দীপ্ত
বিষয় বিষ-বিকার জীর্ণ দীর্ণ অপরিতৃপ্ত ....
... ...
শান্ত হে মুক্ত হে .....

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

উক্ত নাটকে কোন অপ্রয়োজনীয় সংগীত ব্যবহৃত হয়নি।

'নবেদযামি' নাটকের চরিত্র সংখ্যা আট। এছাড়া নাটকে মাঝে মাঝে নেপথ্যে সমবেত যুবকদের দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশিত হয়েছে।

সূত্র পরিচিতি

১. একাঙ্ক নাটক প্রসংগে, ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ১৮১
—স্বদেশ, পূজা সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৯৬
সম্পাদক : কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক

২. The writer of the One-act play will so condense and so handle his material that both the Beginning and the End will most effectively bring out and emphasize the significance of the critical moment.
—The Technique of the one-act play, Benjamin Roland Lewis, P. 143, Boston, 1918.

৩. ....it is best to consider a plot as having a Beginning, a Middle and an End. —Ibid, P. 123.

৪. ..... the method used may vary greatly from, tragedy to farce, ... —Nine Modern Plays, John Hampden.
P. 223, London, First Published November 1926, Reprinted 37 times.

৫. The division of a one-act play into two or more scenes is risky..... It ...breakes dramatic unity.
—Theatre and Stage, Ed. Harold Downs, P. 296, London, 1951

৬. Dealing with a single episode or situation and having no space to show the development of character in action, it is necessarily much more climatic in structure and demands therefore great skill in exposition of circumstance and personality and the utmost economy throughout.

—Introduction, Twenty Four One Act Plays, Selected by John Hampden, P. 6, London, 1962.

৭. ....a single theme can be presented, developed, and brought to a climax with the minimum of material and the maximum of dramatic effect.

—One act plays of To-day, First series, J. W. Marriot, P. 5, London, 1924

৮. a one act play represents a single, uninterrupted action which takes place in a relatively short period of time.

—The One Act Play-A Laboratory For Drama, J. J Green. P. 12, New York, 1969

৯. ....the dramatist .... will not have more than two or three main characters with a supernumerary or two.

—The Technique of the One act Play, B. R. Lewis, P. 211, Boston, 1918

১০. ব্যায়োগস্তু বিধিজ্ঞৈ : কর্তব্য : খ্যাতনায়কশরীর : ।
অল্পস্ত্রীজনযুক্তস্ত্বেকাহকৃতস্তথা চৈব ॥

রাজর্ষি নায়কনিবদ্ধ : ।
যুদ্ধনিযুদ্ধাঘর্ষণশঙ্খর্ষশ্চাপি কর্তব্য : ॥

—নাট্যশাস্ত্র, ভরত, শ্লোক সংখ্যা ৯০-৯২, বিংশ অধ্যায়

১১. বীথী স্যাদেকাঙ্কা দ্বিপাত্রহার্যা তথৈকহার্যা বা।
অধমোত্তমমধ্যাভির্যুক্তা স্যাৎ প্রকৃতিভিস্তিসৃভিঃ ॥
সর্বরসলক্ষণাঢ্যা হ্যঙ্গৈস্ত্রয়োদশভিঃ।

—নাট্যশাস্ত্র, ভরত, শ্লোকসংখ্যা ১১২-১১৩, বিংশ অধ্যায়।

১২. প্রখ্যাতবস্তুবিষয়স্তুপ্রখ্যাতঃ কদাচিদেব স্যাৎ।
দিব্যপুরুষৈর্বিযুক্তঃ শেষৈরন্যৈর্ভবেৎপুংভিঃ ॥
করুণরসপ্রায়কৃতো নিবৃত্তযুদ্ধোদ্ধতপ্রহারশ্চ।

স্ত্রীপরিদেবনবহুলো নির্বেদভাষিতশ্চৈব॥
নানাব্যাকুলচেষ্টঃ সাত্ত্বত্যারভটীকৈশিকীহীনঃ।

—নাট্য শাস্ত্র, ভরত, শ্লোকসংখ্যা- ৯৪-৯৬, বিংশ অধ্যায়

১৩. আত্মানুভূতশংসী পরসংশ্রিতবর্ণনাবিশেষস্তু।
দ্বিবিধাশ্রয়ো হি ভাণো বিজ্ঞেয়স্ত্বেকহার্যশ্চ॥

ধূর্তবিটসংপ্রযোজ্যো নানাবস্থান্তরাত্মকশ্চৈব।
একাঙ্কো বহুচেষ্টঃ সততং কার্যো বুধৈর্ভাণঃ॥

-নাট্যশাস্ত্র, ভরত, শ্লোকসংখ্যা ১০৮-১১০, বিংশ অধ্যায়

১৪. "পর সপ্তাহে ন্যাশনার থিয়েটারে 'জামাই বারিকে'র পুনরভিনয় হয় ও ইহার পর 'ভারতমাতা' নামক একটি রূপক নাট্যের (mask) একটি দৃশ্য প্রদর্শিত হয়। ইহা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। এই অভিনয়ের বর্ণনা আমরা ২০ ফেব্রুযারী তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' পাই—

"......উহা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইযাছিলেন। কোন অভিনয়ে পঞ্চশতাধিক লোকের ১৫ মিনিট কাল পর্যন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তাম্ভিত ভাব আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই।......"

—বঙ্গীয় নাট্য শালা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৭০ বিশ্বভারতী, ১৯৭৭

১৫. সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব হইতে কলিকাতায় জাতীয় আন্দোলন হিন্দুমেলাকে উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষিত জনসাধারণের চিত্তকে উৎসুক করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অল্পকাল মধ্যে এই "ন্যাশনাল" ঢেউ রঙ্গালয় অবধি পৌঁছিল। তাহার প্রথম প্রকাশ দেখা গেল কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র রূপক দৃশ্য 'ভারতমাতা'য় (১৮৭৩)।

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড), সপ্তম সংস্করণ, সুকুমার সেন, পৃ. ২৮৯, কলিকাতা, ১৩৮৬

১৬. রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ), চতুর্থ সংস্করণ, ১৮৯২ প্রকাশকঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

১৭. The valiant, Holworthy Hall and Robert Middlemass, selected for 'Thirty famous One-Act Plays'-Edited by Bennett Cerf and Van H. cartmell, New York, 1943.

১৮. সকাল সন্ধ্যার নাটক—ভূমিকাঃ সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, কলকাতা, ১৩৬৫

১৯. আনন্দবাজার পত্রিকা ৭ জুন, ১৯৬২

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

নাট্যপ্রয়োগরীতি

নাট্যকার, প্রয়োগবিদ্ ও অভিনেতা---এই ত্রিব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু সমন্বয়ে একটি নাটক মঞ্চসাফল্য লাভ করে। নাট্যকার নাটক রচনা করেন, প্রয়োগকর্তা অর্থাৎ পরিচালক নানা কলাকৌশল প্রযোগ করে অভিনেতার মাধ্যমে সেই নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শক মনে রস-সৃষ্টি করেন। এঁদের মধ্যে প্রয়োগবিদের দায়িত্ব ও কৃতিত্ব অনেক বেশি। কারণ নাটকের মূলভাব উপলব্ধি করে সেই ভাবানুযাযী বিভিন্ন অভিনয়শিল্পীকে চালনা করে নাট্য-কাহিনী পরিস্ফুট করা তাঁর কাজ।

প্রযোগবিদ্‌কে একাধারে সাহিত্য-বোদ্ধা ও নাট্য অঙ্গের বিভিন্ন দিক (দৃশ্যবিন্যাস (set), আলোক-পরিকল্পনা (light), ধ্বনি (sound), সঙ্গীত (music) অঙ্গ রচনা (make up), অলঙ্করণ (costume and ornaments), অভিনয (acting) বিষযে বিশেষজ্ঞ হতে হয।[১] অবশ্য নাট্য প্রযোজনাকালে অভিনয ব্যতীত প্রত্যেকটি বিভাগ অভিজ্ঞ ব্যক্তিব দাযিত্বে অর্পিত হয় এবং প্রযোগকর্তা সব বিভাগেব মধ্যে সংযোগসাধন করে সমগ্র বিষয়টি পবিচালনা করেন।

পূর্বে পবিচালকের এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। সে সময় ছিল 'straight theatre'। অভিনেতাবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নির্দেশে অভিনয করতেন না। সোজাসুজি অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকমনে রসোদ্বোধনের চেষ্টা করতেন। দলের প্রধান অভিনেতাই অন্যান্যদের অভিনয সম্পর্কে কিছু কিছু উপদেশ দিতেন এবং তিনি সব বিষয়ে প্রাধান্য পেতেন। তিনি মুখ্যত অভিনয ও সঙ্গে সঙ্গে সামান্য নির্দেশনাব কাজ করতেন। তাঁকে Motion Master বলা হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে জার্মানির Duke of Saxe-Meiningen পরিচালনা রীতির ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। এই রীতিতে পরিচালক সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেলেন।[২] বর্তমান নাট্যপ্রয়োগে এই ধারা গৃহীত হয়েছে। তিনি ১৮৭৪ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ইউরোপ-জার্মানি, রাশিয়া, বেলজিয়াম, লন্ডন, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, অষ্ট্রিয়া, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে William Shakespeare, Jean-Baptiste Poquelin Moliere, Johann Christoph Friedrich Von Schiller ও অন্যান্য নাট্যকারের নাটক পরিচালনা করে নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে নূতন দিগন্তের উন্মোচন করেন। তিনি পূর্বের তারকারীতি (Star system, অর্থাৎ যেখানে একজন দুইজন অভিনয় শিল্পীর প্রাধান্য) তুলে দিয়ে সম্মিলিত অভিনয় (ensemble acting) রীতির প্রবর্তন করেন। এর ফলে সৃষ্ট হয় Triangular theatre। এ ধরণের থিয়েটারে শুধু বিশিষ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রী নন, প্রত্যেকটি ছোট বড় অভিনেতা-অভিনেত্রী সমান গুরুত্ব পেলেন। এক্ষেত্রে পরিচালক বিভিন্ন নাট্য-অঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে অভিনয়শিল্পীর সাহায্যে একটি নাটককে মঞ্চে উপস্থাপিত করে দর্শকমনে রসের আস্বাদ দিতে চেষ্টা করেন।[৩]

পরিচালকের সাহিত্যজ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। নাট্যকার নাটক রচনা করেন। সেই নাটকের মূল বক্তব্য, অন্তর্নিহিত রস উপলব্ধি করতে না পারলে তিনি কখনই একটি নাটককে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবেন না। নাটকটি বিচার বিশ্লেষণ করে তার গভীরে পৌঁছতে না পারলে পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

নাট্য পরিচালনার দ্বিতীয় স্তর, নাট্য-অঙ্গ সম্পর্কে গভীরজ্ঞান। যে কোন শিল্পকলাক্ষেত্রে কলাকৌশলগত দক্ষতার বিশেষ ভূমিকা আছে। এর প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন। থিয়েটারশিল্প ক্ষেত্রে এ কথাটি বিশেষভাবে সত্য।[৪] নাটককে বহুমুখী শিল্পকলা বলা হয়। বিবিধ কলার সমন্বয়ে এটি গড়ে ওঠে। এটি শুধুমাত্র নাট্যবস্তু, অভিনয়, দৃশ্যসজ্জা, আলোনিক্ষেপ অথবা নৃত্য-কলা নয়। নাট্যভাষা, নাট্যক্রিয়া, রঙরেখাপূর্ণ দৃশ্য ও আলো এবং ছন্দোময় নৃত্যের সুষম মিলনে নাট্যশিল্পকলার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই শিল্পে নাট্যভাষা হচ্ছে এর অবয়ব, নাট্য-ক্রিয়ার অভিনয় এর জীবনীশক্তি, রঙরেখা দৃশ্য ও আলো এর হৃদয়স্বরূপ, ছন্দ নৃত্য এর সত্তা। তাই একটি নাটক প্রয়োগ করার পূর্বে প্রয়োগকর্তার ললিতকলার বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এজন্য তাঁকে সাধনা করতে হয়। এটি সহজসাধ্য কাজ নয়। স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এই সাধনায় মগ্ন হতে পারেন ও সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। সেই কারণে নাট্য পরিচালনাকালে পরিচালককে নাটকের বিভিন্ন দিকের কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয়।[৫]

নাট্য অঙ্গের মধ্যে প্রথমেই দৃশ্যবিন্যাসের কথা বলা যেতে পারে। নাটকটির শ্রেণী অনুসারে (অর্থাৎ ক্লাসিক, রোমান্টিক, বাস্তববাদী, রূপক, সাংকেতিক, প্রকাশবাদী, রীতিবাদী, এপিকরীতি, অ্যাবসার্ডরীতি, ব্রেখ্‌টীয় রীতি প্রভৃতি) দৃশ্য রচনা করতে হয়।

মূলতঃ তিনটি বিষয়ের কথা চিন্তা করে আলো-পরিকল্পনা করা হয়—অভিনয় শিল্পীকে দর্শকের সামনে দর্শনীয় করে তোলা, দৃশ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে প্রাধান্য দেওয়া ও অভিনেতার মেজাজ (mood) গড়ে তুলতে সাহায্য করা।[৬] আলো রচনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে আলো যেন মঞ্চে স্থিত চরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, পশ্চাদ্‌পটের রঙ যেন যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। নাট্যকাহিনীতে উল্লেখ্য সময় (যেমন, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত ইত্যাদি), আবহাওয়া আলো ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।[৭] তেমনি স্থান সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে হবে। যেমন, অভিনয়ের স্থানটি ঘরের বাইরে না ঘরের ভিতরে। আবার ঘরের ভিতরে হলে সে ঘরটি বসার ঘর না শোবার ঘর অথবা রান্না ঘর—সে বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘরের বাইরে হলে ঘরের তুলনায় আলো বেশি হবে আবার ঘরের ভেতর হলে সেই আলোর সূত্র কোথায় তা জানতে হবে। দরজা জানালা, ঘরের বৈদ্যুতিক আলো, লণ্ঠন, প্রদীপ, মোমবাতি—এগুলির মধ্যে কোনটি বিবেচনা করতে হবে। আবার শোবার ঘরের তুলনায় বাইরের ঘরের আলো উজ্জ্বল হওয়া বাঞ্ছনীয়, উৎসবগৃহে উৎসবের আমেজ ফুটিয়ে তোলার জন্য সাধারণগৃহ অপেক্ষা অধিক আলো দেখাতে হয়। এ সব স্মরণে রেখে আলোর প্রয়োগ করতে হয়। এ ছাড়া চরিত্রের মেজাজ ও মানসিকতা প্রকাশের জন্য mood-light-এর ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) মনের বিশেষভাব প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটকে সর্বপ্রথম 'mood light' ব্যবহার করেন।[৮]

এইভাবে সার্থক আলোক ব্যবহার নাটকের অন্তরঙ্গ সুরকে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে।[৯] এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, নাট্য প্রয়োজনকে অতিক্রম করে অকারণে নানাধরণের কৌশল প্রদর্শনের কাজে আলো ব্যবহৃত হলে নাটকের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। নাট্যকাহিনী ও চরিত্র ব্যাখ্যা করা, তাদের সহায়তার উদ্দেশ্যেই আলোর ব্যবহার করা প্রয়োজন।

অঙ্গরচনার ক্ষেত্রে বয়স গাত্রবর্ণের কথা চিন্তা করতে হয়। আবার মুখমন্ডলের কোন ত্রুটি থাকলে সেটি ঢাকার ব্যবস্থা করা দরকার। শুধুমাত্র মুখমন্ডলের প্রসাধন নয়, তার সঙ্গে ঘাড ও হাত প্রযোজনে পাযে রঙ দিতে হয। অভিনেতা বা অভিনেত্রীর গায়ের রঙ দেখে প্রথমে রঙের ভিত্তি (foundation) তৈরী করে নিতে হয়, এরপব অঙ্গরচনা করতে হয। অঙ্গরচনার মধ্য দিয়ে নাট্য চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন।[১০]

অলঙ্করণ করার সময় নাটকের বিষয়বস্তুর কথা প্রথমে চিন্তা করতে হবে। নাটকটি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক অথবা সামাজিক—সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখে তার উপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে হয়। পৌরাণিক ঐতিহাসিক আবার কখনো কখনো সামাজিক নাটকে প্রয়োজনে অস্ত্র ব্যবহারের রীতি আছে। অস্ত্র ব্যবহারের সময় এটি চরিত্র ও পরিবেশের উপযোগী কিনা সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে অস্ত্রটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠলেই নাট্য প্রয়োগে এর সার্থকতা।[১১] যুগকাল, দেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে অলঙ্করণ করা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি যুগের নির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও প্রতিচ্ছবি রয়েছে, অলঙ্করণের মধ্য দিয়ে যুগের সেই রূপটি ফুটিয়ে তুলতে হয়। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন কাহিনীকে অবলম্বন করে নাটক রচিত হলে সেই নাটকের চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই যুগের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে হবে, সেইরূপ বিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধেব নাট্যচরিত্রের সঙ্গে একই যুগের শেষার্ধের নাট্যচরিত্রের পার্থক্য স্বাভাবিকভাবে এসে পড়বে।[১২] দেশ ও প্রদেশের পার্থক্য চরিত্রের অলঙ্করণের মধ্যে পরিস্ফুট করতে হয়। এছাড়া পদমর্যাদা ও শ্রেণীভেদে অলঙ্করণ পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। যেমন, রাজা, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, ধনী, দরিদ্র, চাষী, শ্রমিক, অধ্যাপক, কেরানী, উচ্চপদস্থ অফিসার—পোষাকের মধ্য দিয়ে যেন তাদের বাহ্যিক রূপটি ধরা পড়ে। আবার পরিস্থিতি অনুসারে চরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদ নির্ধারিত হয়। কোন ব্যক্তি যে পোষাকে বিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত হবেন তিনি নিশ্চয় অনুরূপ পোষাকে শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হবেন না। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, পোষাক নির্বাচনের সময় রঙের (colour) কথা স্মরণে রাখতে হবে। এমন রঙের পোষাক ব্যবহার করা দরকার যার মাধ্যমে অভিনেতার অভিনীত চরিত্রের অনেকটা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।[১৩] পোষাক পরিচ্ছদ এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যেন অভিনেতা অভিনেত্রী মঞ্চে চলাফেরার সময় অসুবিধাবোধ না করেন। মাঝে মাঝে সুসম পোষাক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দলগত ঐক্য ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয় এবং অনেক সময় পরস্পরবিরোধী চরিত্রের রূপটি ফুটিয়ে তুলতে হয় উভয়ের পোষাক পরিচ্ছেদের প্রবল বৈপরীত্য-সৃষ্টির মাধ্যমে। সুতরাং চরিত্রের স্বভাব, পরিস্থিতি ও নাটকের বক্তব্য প্রকাশে পোষাক পরিচ্ছেদের বিশেষ ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না।[১৪]

নাটকে কাহিনীর প্রয়োজনানুসারে গীত ও নৃত্য আসতে পারে। নাট্য প্রযোজনার সময় আবহ-সংগীত (atmosphere music) ব্যবহৃত হয়। সেই সঙ্গে চরিত্রের মানসিকতা

অনুসরণ করে mood music রচিত হয়। নাটকে এ ধরণের সঙ্গীতের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এটি নাটকের মূলভাবকে দর্শকমনে অনুপ্রবিষ্ট করতে অনেকখানি সহায়তা করে—অনেক অনুচ্চারিত কথা এ ধরণের সঙ্গীতের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়।

প্রয়োগকর্তাকে পঞ্চাঙ্গ অভিনয়রীতির ক্ষেত্রে পাঁচটি মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। এগুলি হল—চরিত্র-বিন্যাস (composition), চিত্রায়ণ (picturization) গতি (movement), ছন্দ-স্পন্দন (rhythm), সংলাপহীন মঞ্চ-ক্রিয়া (pantomimic dramatization) একে বলে পঞ্চাঙ্গ অভিনয়রীতি।

চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে গুরুত্ব লঘুত্ব বজায় রেখে অভিনেতা অভিনেত্রীকে মঞ্চে সুসমঞ্জসভাবে সংস্থাপন করাকে চরিত্রবিন্যাস বলে। এরমধ্য দিয়ে পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্যসৃষ্টি হয়।[১৫] এজন্য প্রয়োজনানুসারে চরিত্রগুলিকে বিভিন্নভাবে, ·নান্তরে (যেমন, বৃত্তাকারে, অর্ধবৃত্তাকারে, ত্রিকোণ আকারে, সমান্তরালভাবে, নিয়মিত অথবা অনিয়মিত পংক্তিতে, সারিবদ্ধভাবে ইত্যাদি) উপস্থিত করা যেতে পারে।

অভিনেতা অভিনেত্রী মঞ্চে বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানাধরণের যে চিত্র ফুটিয়ে তোলেন তাকে চিত্রায়ন বলে। এখানে মানসিক অবস্থা অনুসারে চরিত্র সংস্থাপিত হয়। সংলাপব্যতীত চরিত্রের অবস্থান দ্বারাই নাট্য চরিত্রের পরস্পরের প্রতি আবেগময় মনোভাব ও নাটকের পরিস্থিতি দর্শকদের হৃদয়গম্য হয়।[১৬]

অভিনয়ের সময় নানাধরণের অঙ্গ সঞ্চালন অর্থাৎ ওঠা-বসা, হাঁটা-চলা, ঘুরে দাঁড়ান, লাফিয়ে ওঠা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মঞ্চে গতির সৃষ্টি করা হয়।[১৭] নাটকের সংলাপ, পরিস্থিতি ও চরিত্রের মানসিকতা অনুসারে এই গতি কখনো সবল (strong) আবার কখনো দুর্বল (weak) হয়। সামনে এগিয়ে যাওয়া, নীচু জায়গা থেকে উঁচুতে ওঠা, বসা থেকে ওঠা প্রভৃতি সবল গতির উদাহরণ। দূরে চলে যাওয়া, উঁচু হাত নীচু করা, পিছিয়ে যাওয়া প্রভৃতি দুর্বল গতির পর্যায়ে পড়ে।

কণ্ঠবাচনভঙ্গি, গতিভঙ্গি ও নানারূপ অভিব্যক্তির মাধ্যমে মঞ্চে নাট্য চরিত্রের প্রকৃতি, বয়স, শারীরিক-মানসিক অবস্থার অনুরূপ আচরণ ফুটিয়ে তোলাকে ছন্দ-স্পন্দন বলে। নাটকের মূলভাব, পরিস্থিতি, স্থানকাল চরিত্র সংলাপ অবলম্বনে ছন্দ-স্পন্দন সৃষ্ট হয়।[১৮] নাটকের অঙ্কের সঙ্গে অঙ্কের, দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্যের, সংলাপের সঙ্গে সংলাপের, শব্দের সঙ্গে শব্দের সম্পর্কসাধন, নাট্যগঠন ও নাট্যসংগতি প্রভৃতির মধ্যেও এই ছন্দ-স্পন্দন থাকে।[১৯] ছন্দ-স্পন্দনের সঙ্গে গতিক্রমের (tempo) যোগসূত্র রয়েছে। নাটকের গতির প্রকৃতি বিলম্বিত, মধ্য অথবা দ্রুত হতে পারে। Tragedy-র গতি বিলম্বিত, Farce-এর গতি দ্রুত। আবার দুর্বল চরিত্রের গতি বিলম্বিত, বৃদ্ধের মন্থর, যুবকের দ্রুত ও সাধারণ কাজকর্মের গতি মধ্য লয়ের। এছাড়া নাটকের বিষয়বস্তু, দৃশ্য, আলো, অলঙ্করণ, অভিনয়ের মধ্যে একই ছন্দ-স্পন্দন থাকা প্রয়োজন।[২০]

সংলাপ ব্যতীত নানা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা নাট্যক্রিয়া সম্পন্ন করাকে সংলাপহীন মঞ্চক্রিয়া বলে। একে business ও বলা হয়। সংলাপহীন মুখজ অভিব্যক্তি (facial expression), দৈহিক অঙ্গভঙ্গী (Gesture), চেষ্টাকৃত প্রকাশভঙ্গি (posture), হস্তসঞ্চালন, শরীর

সংস্থাপন ও গতিময়তার মধ্য দিয়ে এটি সম্পন্ন হয়।[২১] যেমন, খাবার খাওয়া, বিছানা পাতা, চিঠিলেখা, দরজা জানালা খোলা ও বন্ধ করা, টেলিফোন ডায়াল করা ও টেলিফোন ধরা প্রভৃতির ভঙ্গি করা। এর সঙ্গে মানসিক অনুভূতি, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও সংলাপহীন বিভিন্ন অভিব্যক্তি এবং অঙ্গভঙ্গী এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

নাটকে অভিনেতার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তিনি নাটকের মূলভাব ও পরিচালকের নাটক সম্বন্ধীয় চিন্তাভাবনাকে অভিনয়ের মাধ্যমে রূপায়িত করেন। অভিনয় দ্বারা দর্শককুলকে অভিভূত ও সম্মোহিত করতে পারলেই একজন অভিনেতা সার্থক হয়ে ওঠেন। এজন্য তাঁকে নাট্যঘটনা, চরিত্র ও ঘটনা-চরিত্রেব পারস্পবিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ভাবতে হয়, চরিত্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করতে হয়। অনেক অ-দেখা, না-শোনা বিযয তিনি কল্পনার দ্বারা এমনভাবে পরিবেশন করবেন যা বিশ্বাসযোগ্য, আকর্ষণীয় ও বাস্তবসদৃশ হয়ে রস-সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।[২২] প্রকৃতপক্ষে একজন সু-অভিনেতা শুধুমাত্র পরিচালক নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করবেন না, তিনি নিজের সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি, রসবোধের দ্বারা নাট্যচরিত্রের মধ্যে নূতন মাত্রা সংযোজন করতে পারেন। অভিনেতাকে মানব চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া দরকার। মানুষের সমগ্ররূপকে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলতে হবে। মানুষের নানাদিক—দৈহিক, মানসিক ও আবেগমূলক দিকগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।[২৩] অভিনেতা তাঁর অভিনয় শিল্প দ্বারা দর্শকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন। নাট্যবস্তুর মূল বক্তব্য সুন্দরভাবে প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি দর্শককে নাট্যরস আস্বাদনে সহায়তা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি দর্শকের কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁর অভিনয় হয়ে ওঠে সৃষ্টিধর্মী এবং অভিনেতা হয়ে দাঁড়ান সৃষ্টিকর্তা।[২৪]

পবিচালক একটা নাটকের মহলা শুরু করার পূর্বে অভিনয়শিল্পী নির্বাচন করেন। নির্বাচিত শিল্পী যেন নাট্যোল্লেখিত চরিত্রের অনুরূপ হন, অন্তত সেই চরিত্রের নিকটবর্তী হন। সেজন্য শিল্পীর বয়স, অবয়ব, কণ্ঠস্বর, উচ্চারণভঙ্গী, কল্পনাশক্তি, বিবিধ আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা, অভিনয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা—এসব বিষয়ে পরিচালক দৃষ্টি দেন। সেই সঙ্গে অভিনেতা কিভাবে মঞ্চে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবেন সে বিষয়ও অভিনেতাকে আয়ত্ত করতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, অভিনেতাকে মঞ্চ-উদ্দীপক সব রকমের কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হবে।[২৫]

অভিনেতা বিশেষত প্রধান অভিনেতাকে দৈহিক সৌন্দর্য (অবশ্য নাট্যকাহিনী অনুসারে অসুন্দর বা দৈহিক ত্রুটি সম্পন্ন ব্যক্তি কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে পারে) ও সুকণ্ঠের অধিকারী হওয়া দরকার। কণ্ঠস্বরের সার্থক ব্যবহার ও বাচনভঙ্গির ওপর অভিনেতার নৈপুণ্য নির্ভর করে। অভিনেতা তাঁর সুকণ্ঠ ও আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গীর সাহায্যে দর্শকদের সহজে অভিভূত করতে পারেন। অন্যদিকে কণ্ঠস্বরে ও বাচনভঙ্গিতে দুর্বলতা থাকলে সেই অভিনেতা নানাগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোনদিন উচ্চস্তরের অভিনেতার সম্মান অর্জন করতে পারবেন না।[২৬] অভিনেতাকে শুধুমাত্র সুকণ্ঠের অধিকারী হলে চলবে না কণ্ঠস্বরকে নানাভাবে ব্যবহার করার জন্য তার শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। যেসব নাটকে পদ্যসংলাপ ও অলঙ্কৃত সংলাপ থাকে (পুরোনো অনেক নাটক এই শ্রেণীভুক্ত) সেই সংলাপে অভিনয়ের সময় নিজেকে বিশেষভাবে তৈরী না করলে সেখানে অতি-অভিনয় (over acting)

অথবা অভিনয়ে খামতি (under acting) থাকার সম্ভাবনা থাকে। পদ্য সংলাপে অভিনয়কালে ভাষার ধ্বনি সঙ্গীত, ছন্দের সুর লয় তাল, সংলাপের চিত্রকল্প ও অন্তর্নিহিত ভাবকে কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয়। সেইসঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার অভিনয় যেন সুরেলা না হয়ে কথ্য ভাষার স্বাভাবিকতা বজায় রাখে। অলঙ্কৃত সংলাপেও ধ্বনিমাধুর্য ও স্পষ্ট উচ্চারণের দিকে দৃষ্টি রেখে স্বাভাবিকতা রক্ষা করতে হয়। স্পষ্ট উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শব্দের মূল ভাব, অন্তর্নিহিত সত্তা পরিস্ফুট হয়[২৭] ও সেই সঙ্গে নাটকের নিহিতার্থ দর্শক অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেন। সহজ সাধারণ সংলাপের ক্ষেত্রে কথ্য ভঙ্গি প্রকাশিত হবে। তিন ধরণের সংলাপেব যে কোনটিতে অভিনয় করতে হলে অভিনেতাকে সে বিষয়ে শিক্ষা নিতে হবে এবং অভ্যাস করতে হবে।

অভিনেতা তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে নাট্যচরিত্র রূপায়ণে সচেষ্ট হবেন কিন্তু বাস্তব জীবনের রূপ সে চরিত্রে প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি এমন কিছু ভাবনা পরিবেশন করবেন যার দ্বারা বাস্তব জীবন-অতিরিক্ত কিছু নাট্যচরিত্রের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে।[২৮]

এরপর আসে মহলা পরিচালনা। মহলা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালক কতকগুলি বিশেষ নিয়মের মধ্য দিয়ে চলেন। মহলাকে reading rehearsal (সে সময় পরিচালক নাটকের মূল বক্তব্য, নাট্যসংঘাত, বিভিন্ন চরিত্র ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন), Blocking rehearsal (এই মহলায় অভিনয়শিল্পীকে মঞ্চের নানাস্থানে নানাভাবে দাঁড়ানো ও জিনিসপত্রসমেত মঞ্চে চলাফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়), developing rehearsal (দৃশ্য ও মঞ্চের নানা সরঞ্জামের সঙ্গে মহলা দেওয়া হয়) Run through rehearsal (নাটকের সামগ্রিক ঐক্য, তার নানা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মহলা করানো হয়, এ সময় মূলতঃ অভিনেতার ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা হয়), Polishing rehearsal (এই মহলায় সব রকম ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা চলে), Technical rehearsal (দৃশ্য, আলো, সঙ্গীত, ধ্বনিসহ মহলা), Dress rehearsal (এই শেষ পর্যায়ে সমস্ত নাট্য অঙ্গসহ মহলা হয়)-এ ভাগ করা যেতে পারে। এইরীতি অনুসরণ করলে মহলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় ও নাটকটি সার্থকভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়।

সুতরাং পরিচালককে একাধারে শিক্ষক, শিল্পী, লেখক ও শাসক হতে হবে।[২৯] তিনি তাঁর শিল্পী মনোভাব নিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিশেষ নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করবেন। প্রয়োজনে তিনি লেখনী ধারণ করে, অভিনয়শিল্পীদের অভিনয় নৈপুণ্য দেখানোর সুযোগ দিয়ে, কখনো কখনো তাঁদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও কল্পনা শক্তিকে ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে নাটককে আরো আকর্ষণীয় ও দৃষ্টি-নন্দন করে তুলতে পারেন। কোন বিশিষ্ট মালাকার যেমন নিজের রুচিবোধ, কল্পনাশক্তি, শ্রম ও সাধনার দ্বারা বিচিত্র রঙের ফুলের সমাহারে একটি মালঞ্চকে মনোরম করে তুলে সৃষ্টির আনন্দ লাভ করেন, একজন সার্থক পরিচালকও তেমনি সূক্ষ্মকলাবোধ, সাধনা ও অধ্যাবসায় লব্ধ নানা কলাকৌশল প্রয়োগে থিয়েটার মঞ্চকে রমনীয় ও নয়নতৃপ্তিদায়ক করে তোলেন ও অনুরূপ আনন্দ লাভ করেন।[৩০]

পূর্বে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হত। থিয়েটারের আকৃতি, অভিনয় নৈপুণ্য ও প্রয়োগ রীতির বিশিষ্টতার ওপর এই সম্পর্ক নির্ভর করে। গ্রীসের

প্রথমযুগে, ইংল্যান্ডে এলিজাবেথের যুগে গ্লোব থিয়েটারের অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সে সময় অঙ্কিত দৃশ্যাদির ব্যবহার না থাকায় অভিনেতার অনেক স্বাধীনতা ছিল। তাঁরা সহজগতিতে মঞ্চে চলাফেরা করে, আপন কলানৈপুণ্য গুণে দর্শকের অনেক কাছাকাছি আসতে পারতেন। এই appron stage-এ অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে 'imaginative and intimate relationship' গড়ে উঠত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে Proscenium arch ও পর্দার ব্যবহার শুরু হলে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে পূর্ব সম্পর্ক কিছুটা ক্ষুন্ন হল, যদিও সে সময় appron stage ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিত্রিত দৃশ্য সংস্থাপন বিশেষ গুরুত্ব পেল। অবশ্য সে সময়ও অভিনয়ের সময় মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ আলোকিত থাকত। ফলে সেই সময় অভিনেতা দর্শকদের দেখতে পেতেন এবং দর্শককে তাঁর সহযোগী মনে হত। উনবিংশ শতাব্দীতে মঞ্চে আলোর ব্যবহার (প্রথমে গ্যাসের আলো, পরে বৈদ্যুতিক আলো) শুরু হয় ও আলোক শিল্পে নানা কলা-কৌশল সংযোজিত হয়। সে সময় প্রেক্ষাগৃহের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয় ও মঞ্চের আলোয় অভিনয় চলে। এর ফলে অভিনেতা দর্শকদের দেখতে না পাওয়ায একটা ব্যবধান অনুভব করতে থাকেন। সে সময় দর্শক অভিনেতার অভিনয়ের শুধু পর্যবেক্ষক, অংশীদার নন। এইভাবে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান শুরু হয়। Konstantin Sergeevich Stanislawski (1863-1938) Bertolt Brecht (1898-1956) প্রমুখ নাট্য বিশেষজ্ঞ নানাপ্রকার রীতির সৃষ্টি করলেও পূর্বের সেই নৈকট্য ফিরে এল না। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশে Open air Theatre ও আমাদের দেশের যাত্রার মধ্যে থিয়েটারের তুলনায় দর্শক ও অভিনেতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। যাত্রার অভিনয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকুল্যের প্রতি নির্ভর করায় কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।"[৩১]

খ্রীষ্টপূর্ব যুগে আবির্ভূত ভরতের পূর্বে নাট্য প্রয়োগরীতি সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা পৃথিবীর কেউ করেছেন বলে শোনা যায় না।[৩২] নাট্য প্রয়োগে অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভরত কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ উচ্চারণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়া তিনি বলেছেন, অভিনয়শিল্পীর বিভিন্ন কলায় অধিকার থাকতে হবে; শিক্ষা, ভাবাবেগ, অনুভূতি, মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এর সঙ্গে শিল্পীর মঞ্চভীতিহীনতা অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণ বলে বিবেচিত হবে।

চরিত্রের ভূমিকা অনুযায়ী অঙ্গরচনা ও অলংকরণের কথাও নাট্যশাস্ত্রে আছে। দেশ, কাল ও বয়সের কথা স্মরণে রেখে বিভিন্ন মৌলিক রং ও উপবর্ণ ব্যবহারের নির্দেশ এই শাস্ত্রে পাওয়া যায়। অলংকরণের ক্ষেত্রে পাদুকা, শিরোভূষণ, উত্তরবাস, অধোবাস, বস্ত্র-অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বিভিন্ন ঋতু বোঝাবার জন্য বিভিন্ন হস্তমুদ্রা ও দেহভঙ্গি, নানাদ্রব্যের ব্যবহার ও পশুপাখির ডাকসহ নেপথ্যধ্বনি প্রয়োগের কথা আছে।

সে সময় আলোর ব্যবহার সম্ভব ছিল না। তাই বিভিন্ন সময় (সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা ইত্যাদি) রৌদ্রদগ্ধ দুপুর, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি প্রভৃতি বোঝাবার জন্য শির, হস্ত ও দৃষ্টি-ক্রিয়াসহ 'চিত্রাভিনয়' এর কথা বলা হয়েছে। সেজন্য সংযুক্ত, অসংযুক্ত, নৃত্ত-হস্তের চৌষট্টি মুদ্রার ব্যবহার সম্পর্কে অভিনয় শিল্পীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয় ছিল।

মঞ্চের পশ্চাতে প্রবেশ প্রস্থানের জন্য দুটি দরজা থাকত। কিন্তু সে সময় দৃশ্য সজ্জা (set)-এর ব্যবহার ছিল না। নগর, উদ্যান, গৃহ, আশ্রম, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি বোঝাতে 'কক্ষাবিভাগ' (zonal division) রীতি প্রচলিত ছিল। সেই রীতি অনুযায়ী অভিনয়শিল্পী রঙ্গপীঠে (stage) নানাভাবে পরিক্রমণ করে সে সব স্থান বোঝাতেন। এ বিষয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে —

কক্ষাবিভাগো নির্দেশ্যো বঙ্গপীঠপাবক্রমাৎ।
পরিক্রমেণ রঙ্গস্য কক্ষা হ্যন্যা বিধীয়তে॥ ৩
কক্ষাবিভাগে জ্ঞেয়ানি গৃহাণি নগরাণি চ।
উদ্যানারামসরিত আশ্রমা অটবী তথা॥ ৪
পৃথিবী সাগরাশ্চৈব ত্রৈলোক্যং সচরাচবম্।
বর্ষাণি সপ্ত দ্বীপাশ্চ পর্বতা বিবিধাস্তথা॥ ৫
অলোকশ্চৈব লোকশ্চ রসাতলমথাপি চ।
দৈত্যনাগালয়শ্চৈব গৃহাণি চ বনানি চ॥ ৬
নগরে বা বনে বাপি বর্ষে বা পর্বতেহপি বা।
যত্র বার্তা প্রবর্তেত তত্র কক্ষাং প্রবর্তয়েৎ॥ ৭ (৩৩)

যাত্রা-নাটকের প্রয়োগরীতি

প্রয়োগের দিক থেকে থিয়েটারী নাটকের সঙ্গে যাত্রা-নাটকের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। থিয়েটারী নাটকে দৃশ্যসজ্জা ও আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে। সেই বিষয়ে নাট্যকার কখনো বিস্তৃতভাবে আবার কখনো সংক্ষিপ্ত আকারে নাটকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। দৃশ্যরচয়িতা ও আলোকশিল্পী সেই নির্দেশ অনুসারে এবং সেই সঙ্গে নিজস্ব চিন্তাভাবনা যোজনা করে সেই দুটি বিষয় প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু যাত্রা নাটকে এ ধরণের কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। সেখানে দৃশ্য ব্যতীত নাটক মঞ্চস্থ হয় এবং উজ্জ্বল আলোতে অভিনয় হওয়ায় আলোক—নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন থাকে না। অভিনয়শিল্পী বর্ণনামূলক সংলাপের মাধ্যমে দৃশ্য ও দৃশ্যের স্থানকাল দর্শকদের জ্ঞাত করান।

পূর্বে থিয়েটারী নাটকে ঐকতান বাদনরীতির প্রচলন ছিল। সে সময় অবশ্য সব নাটকের প্রতিটি অংকের পরই ঐকতান বাদন ছিল না। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী রচিত 'সীতা' (১৯২৪) মঞ্চস্থকালে ঐকতান বাদনরীতি

তুলে দেন। যাত্রা-নাটকে কিন্তু শুরু থেকেই প্রতিটি অংকের শেষে ঐকতান বাদনের নির্দেশ ছিল। প্রতিটি পালা শুরু হওয়ার কথা জ্ঞাপন করা, আসরের কলরব স্তব্ধ করা, অভিনোপযোগী পরিবেশ সৃষ্ট করার জন্য যাত্রা-নাটকে ঐকতান বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়।

যাত্রা-নাটকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঐকতানেব পর নৃত্যগীতের উল্লেখ করা যেতে পারে। লোকনাট্যে নৃত্য গীত অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ। থিয়েটারী নাটকে নাট্য কাহিনীর প্রয়োজন ব্যতীত এটি ব্যবহৃত হয না। অন্যপক্ষে অসংখ্য দর্শকেব কথা বিবেচনা করে যাত্রা-নাটকে নৃত্য ও গীতের ব্যবস্থা কবা হয। অনেক সময় আবেগমলক সংলাপ বিপুল সংখ্যক দর্শকের কানে পৌঁছয না, সেজন্য সেই সংলাপেব বক্তব্যকে সংগীতের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার রীতি লোকনাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গান সংলাপের আবেগ বাড়িয়ে দেয। তাই দূরবর্তী শ্রোতার কানে তা সহজেই পৌঁছে যায়। তাছাড়া যাত্রাকেতো একসময় যাত্রাগানই বলা হত।

বিধায়কের নাটকের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য

নাট্যকাব বিধাযক তাঁর নাটকে বাস্তবরীতিসম্মত দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। পেশাদাবী থিয়েটারে সাধারণতঃ এই রীতিই গৃহীত হয়ে থাকে। এর সঙ্গে আলো (light) ও ধ্বনি (sound) প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন সময় (সকাল সন্ধ্যা দুপুর ইত্যাদি), কাল (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত ইত্যাদি)-এর উল্লেখ কবেছেন এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ, পরিমণ্ডল বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হল—

'মাটির ঘর' নাটকের প্রথম দৃশ্য :

> "একখানি সজ্জিত কক্ষ। কক্ষের দেওয়ালে একটি গাঢ সবুজ বর্ণের বাল্‌ব লাগান বাতি জ্বলিতেছে। ঘরের সমস্ত বস্তুই এই আলোতে দেখাইতেছে আবছা ও রহস্যময়। একপাশে একখানি খাটে নেটেব মশারিটি ফেলা রহিযাছে। খাটেব কাছে জানালাটি অর্ধ উন্মুক্ত.......। রাত্রি প্রায বারোটা। বাহিরে ঘন দুর্যোগের বিপুল বর্ষণ চলিতেছে। খোলা জানালা দিয়া তাহার আংশিক ভযাবহতা ভিতরে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নিস্তব্ধ ঘর ভরিয়া শুধু অবিশ্রাম বৃষ্টিধারার ঝম্ ঝম্ শব্দ।"

প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এই নাটকের ষষ্ঠ দৃশ্যটি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা দাবী করতে পারে। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্যকার- পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত স্মৃতিচারণে বলেন—"মাটির ঘর নাটকের..... ষষ্ঠ দৃশ্যটি দীর্ঘদিন স্মরণে রাখার মত। মঞ্চে দেখানো হচ্ছে, ঘরের জানালা ভেদ করে দূরে সিমলা পাহাড়ের সৌন্দর্য। অস্তগামী সূর্যের রঙে সেই পাহাড় ও চারপাশের গাছপালা আবির রাঙা হয়ে উঠেছে। সেই রঙের প্রতিফলন ঘটেছে ঘরে। সব কিছু মিলিয়ে দৃশ্যটি হয়েছিল অপরূপ।"[৩৮] নাট্যকার ষষ্ঠ দৃশ্যটি এভাবে বর্ণনা করেছেন—

"সিমলায় কল্যাণের বাড়ী। শয়ন কক্ষ সংলগ্ন বসিবার ঘর। আধুনিক সজ্জায় ঘরখানি সজ্জিত। চেয়ারে, টেবিলে, ছবিতে ও আসবাব পত্রে সর্বত্রই গৃহস্বামীর উচ্চশ্রেণীর

রুচিবোধের পরিচয় প্রচ্ছন্ন। জানালা দিয়া দেখা যায়—সিমলা শৈলের দিগন্তব্যাপী সুগম্ভীর মৌনতা।

দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল—সূর্য অস্ত যাইতেছে। তাহার রক্তিমাভা জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নীরস কাঠের বস্তুকেও রঙীন করিয়া তুলিয়াছে। পিছনের পাহাড ও গাছপালার রং লাল।"

সুতরাং নাট্যকার বর্ণিত দৃশ্য সজ্জা-ই নাটকের প্রয়োগে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'বিশ বছর আগে'র প্রথম দৃশ্য :

"দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল, মঞ্চের উপর সন্ধ্যা ঘনাইতেছে। সেই অস্পষ্ট আলোতে পিছনে একটি পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। সদর দরজাটা জীর্ণ, তাহার উপর ততোধিক জীর্ণ একখানি 'ভাড়া দেওয়া যাইবে' লেখা পিচবোর্ড ঝুলিতেছে। বাড়ীখানা একটি বাগানের মধ্যে অবস্থিত। বাড়ির গা ঘিরিয়া মেহেদীর বেড়া......

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া মঞ্চে গভীর রাত্রি নামিল। ঝিঁ ঝিঁ ডাক শোনা গেল এবং এখানে সেখানে জোনাকি জ্বলিতে লাগিল।"

'এন্টনী কবিয়াল' নাটকের নিম্নলিখিত বর্ণনার মধ্যে একটি হলঘরের পরিবেশ ফুটে উঠেছে—

"একটি করিডোর। মঞ্চের ডাইনে বামে পথ। দর্শকের দিক থেকে ডানদিকের কোণে বড় দরজা, হলঘরের। তার মধ্যে নাচ গান চলছে। লোকজন, সাহেবমেম, কালা আদমী উর্দিপরা বেয়ারা যাতায়াত করছে। কিছু হয় ওই ঘর থেকে বেরোচ্ছে কিছু ঘরে গিযে ঢুকছে। মধুর একটি নাচের বাজনা শোনা যাচ্ছে। হলঘরের দরজা খোলা হচ্ছে যখন তখনই লোকজনের হাসি গল্প বাজনা জোরে শোনা যায় দরজা বন্ধ হয়ে গেলে শুধু মৃদু মৃদু শোনা যায়। করিডোরের মাঝখানে জানলা। বাইরে গভীর অন্ধকার রাত। লক্ষ্য করলে মাঝে মাঝে জোনাকি জ্বলাও দেখা যায়। অনেক দূর থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে এল—সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়ীটার কোন ঘর থেকে ঘড়িতে টং..টং ক'রে রাত বারোটা বাজার শব্দ ভেসে আসতে লাগলো।" (প্রথম দৃশ্য)

'রক্তের ডাক' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের শুরুতে কলকাতার একটি সুসজ্জিত ঘরের বর্ণনা রয়েছে—

"কলিকাতা। শুভেশের বাড়ীর সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম, ঘরের পিছনে বারান্দা দিয়ে দূরে কয়েকখানি বড় বড় বাড়ী, উন্নত শীর্ষ গাছের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ঘরের আসবাবপত্র সমস্তই আধুনিক রুচির পরিচায়ক। দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল একটি যুবক বসিয়া একমনে কী একখানা চিঠি টাইপ করিতেছে। পাশের জানালা দিয়া সকালবেলার সূর্যকিরণ আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়াছে।"

ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ব্যবহার

'বিশ বছর আগে' নাটকে নাট্য ঘটনা পরিবেশনের ক্ষেত্রে দ্রুততা আনয়নের জন্য নাট্যকার ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ব্যবহারের কথা বলেছেন—

"মঞ্চ ঘুরিতে ঘুরিতে দোতলায় একটি জরাজীর্ণ ড্রয়িং রুমে আসিয়া থামিল।"

(দ্বিতীয় দৃশ্য) ইত্যাদি।

'flash back' রীতি

পূর্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) উল্লেখ করা হয়েছে বিধায়ক 'বিশ বছর আগে' নাটকে 'Flash back' রীতি গ্রহণ করেছেন। এটি বাংলা নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে নূতন সংযোজন।

আলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'shadow' ব্যবহার

আলোকশিল্পে Shadow ব্যবহার একটি বিশেষ রীতি। ব্যক্তির মনের ভাব ফুটিয়ে তুলতে বিধায়ক 'রক্তের ডাক' নাটকে Shadow ব্যবহারের কথা বলেছেন।

উক্ত নাটকে পূর্বকৃত অন্যায় আচরণের জন্য শুভেশের মানসিক জগতে একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নাট্যকার লিখছেন—

শুভেশ ॥ ......যত মেয়ে আমার কাছে এসেছে, তাদের কেউ বলতে পারবে না, আমি তাদের অবহেলা করে অনিষ্ট করেছি—আমি কোনদিন—

(এই কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের উপর ভাসিয়া উঠিল, নমিতার ছবি। সর্বাঙ্গ তার কালো কাপড়ে আবৃত, শুধু মুখ ও তার হাত দুটি খোলা, সেই হাতের বন্ধনে রহিয়াছে একটি সদ্যজাত শিশু। নমিতার মাথায় চোট লাগিয়াছে, সেখান হইতে একটি রক্তের ধারা, তাহার ম্লান হাসিমাখা মুখখানির উপর দিয়া, কালো কাপড় বাহিয়া নবজাত শিশুর মাথায় পড়িতেছে। ভয়ে শুভেশের চোখ বড় হইয়া উঠিল, সে স্থির দৃষ্টিতে সেই ছবির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর চাহিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল)

শুভেশ ॥ উঃ

(পঞ্চম অংক)

multiple set-এর ব্যবহার

'দ্বিধা নাটকে দেখা যায়, মঞ্চকে দুভাগে বিভক্ত করে কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। যখন যে অংশে অভিনয় হয় তখন সেই অংশে আলো জ্বলে ওঠে, অন্য অংশ অন্ধকার থাকে। আবার কখনো কখনো প্রয়োজনানুসারে দুটি অংশ আলোকিত হয়।

এই multiple set-এর ব্যবহার ইউরোপে মধ্যযুগে mystery নাটকে পাওয়া যায়। সেখানে সজ্জিত মঞ্চের সারি (series of decorated platforms) অর্ধবৃত্তাকারে আবার কখনো বৃত্তাকারে দেখানো হতো। প্রতিটি অংশ একটি নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র স্থানের প্রতিনিধিত্ব করত।[৩৫]

film-এ যেমন continuity রাখার জন্য একটির পর একটি চিত্র দেখানো হয় এই নাটকেও সেইরূপ একাদিক্রমে কাহিনী পরিবেশনের জন্য zonal light-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আলো জ্বলা ও নেভার ভেতর দিয়ে মুহূর্তমধ্যে মঞ্চে অভিনীত দৃশ্যগুলি দর্শকের সামনে প্রকাশিত হওয়ার ফলে নাটকের মধ্যে চলচ্চিত্রের একটা আমেজ এসে পড়েছে।

এ বিষয়ে নাট্যকার নির্দেশ দিয়েছেন—

"পুরো মঞ্চটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। একটি পুরুষের ঘর, আর একটি নারীর। কক্ষ সজ্জায় ও আসবাব পত্রে যেন পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র মালিকানা বোঝা যায়।

কখনো কখনো দুটি ঘরেই এক সঙ্গে আলো জ্বালা থাকবে যখন একই সঙ্গে দুটি ঘরে অভিনয় হবে। অথবা যে ঘরে অভিনয় হবে— সেই ঘরে আলো জ্বলবে, অন্যটি থাকবে অন্ধকার। উত্তর কোলকাতা ও দক্ষিণ কোলকাতার রুচির ভিন্নতা যেন কক্ষ সজ্জা থেকে বোঝা যায়।"

অবশ্য এর আগে বিধায়ক রচিত 'লগ্ন' (বিশ্বরূপা, ১৯৬৩) নাটকে এ ধরণের আঙ্গিক গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে মঞ্চকে চারটি অংশে ভাগ করা হয় এবং চারটি অংশে চাররকম দৃশ্য অভিনীত হয়। যে অংশে অভিনয় হয় শুধু সেই স্থানটিতে আলো জ্বলে ওঠে।[৩৬]

কিন্তু নাটকটি মুদ্রিত না হওয়ায় বর্তমান নিবন্ধে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হল না।

নাট্য প্রয়োজনে মাইক্রোফোনের বিশেষ ব্যবহার

বিধায়ক কিছু নাটকে চরিত্রের মনের কথা দর্শকদের শোনাবার জন্য মঞ্চের বাইরে (off-stage) মাইক্রোফোন ব্যবহারের কথা বলেছেন। মঞ্চে সেই চরিত্র এই অবস্থায় নির্বাক হয়ে থাকেন এবং দর্শক মাইক্রোফোনের মাধ্যমে তাঁর অন্তরের বিশেষভাব প্রকাশক্ষম সংলাপ শুনতে পান। বিধায়কই প্রথম এই রীতি বাংলা নাটকে আনয়ন করেন।[৩৭]

নীচে একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

'খবর বলছি' নাটকে অধ্যাপক বরেন মিত্র বাস্তুহারা সুন্দরী যুবতী দীপাকে আশ্রয় দিলে তাঁর স্ত্রী অরুন্ধতী বিরক্তি ও আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বরেন স্ত্রীকে যে কথাই বলুন না কেন তাঁর অন্তরে তখন অন্যভাবনা কাজ করছিল—

অরুন্ধতী ॥ ....কেন তুমি এ আপদ এনে ঘরে ঢোকালে? ......তুমি জেনে শুনে ইচ্ছে ক'রে এরকম একটা জলজ্যান্ত আগুনকে পথ থেকে কুড়িয়ে আনলে কেন?

প্রোঃ মিত্র ॥ এইজন্য আনলুম অরু যে কোন হনুমান যদি আগুনের টুকরোটিকে নিজের লেজের সঙ্গে বেঁধে নেয়— তাহলে অচিরাৎ একটি অগ্নিকাণ্ড ঘটবে।

মিসেস ॥ তাতে তোমার কি ? তোমার ঘর তো পুড়তো না।

প্রোঃ মিত্র ॥ তা পুড়তো না। কিন্তু আমার যুক্তি অন্যের ঘরই বা পুড়বে কেন ?

মাইক ॥ তুমি মিথ্যে কথা বলছো বরেন মিত্র। দীপাকে দেখামাত্র তোমার মনে যে ঢেউ উঠেছে তার দোলায় কি তুমি দুলছো না ? নারীর রূপ সেতো চিরন্তনী প্রকৃতির মতো। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সে তার রূপ রস গন্ধ বর্ণের ডালা সাজিয়ে নিয়ে প্রতীক্ষারতা—যৌবন নিকুঞ্জে অনন্ত পথিকের পদধ্বনির আশায়, —তাকে যদি তুমি আমন্ত্রণ করে এনেই থাকো তোমার বাড়ীতে, তাতে তো অন্যায় কিছু করোনি বরেন মিত্র। (দ্বিতীয় অংক। প্রথম দৃশ্য)

সমগ্র নাটকে একটি বিরতি প্রথা

পূর্বে নাটকের মধ্যে কয়েকবার বিরতির ব্যবস্থা ছিল। বিধায়ক নাটককে দ্রুতগতি ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য 'বিশ বছর আগে' নাটকে মাত্র একবার (ষষ্ঠ দৃশ্যের পর) বিরতি প্রথা প্রযোগ করেন। বাংলা নাটকের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি এই বিষয়টিরও প্রবর্তক।[৩৮]

ক্ষুধা ॥

'ক্ষুধা' অত্যন্ত মঞ্চ-সফল নাটক। এই নাটক সম্পর্কে দেবনারায়ণ গুপ্ত বলেন—"প্রযোগ নৈপুণ্যে ও দলগত অভিনয়ে নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।"[৩৯]

সূত্র পরিচিতি

1. The director brings out, subdues, accents, develops, brings all together, keeps all the parts in proportion, guides every player in the upward progress toward the climactic moments
—The Stage in Action, Samuel Seldem, P. 158
London, 1962

2. The director became all-important,......
—World Drama, Allerdyce Nicoll, P. 507, London, 1959

3. থিয়েটারে অভিনেতা, দর্শক, পরিচালক, ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, আই. এন. টি. সি. রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকপত্র, কলিকাতা, ১৯৮১

4. There is no art that does not demand virtuosity. There is no final measure for the fullness of this virtuosity.........
This necessity for the acquirement of experience and craftsmanship is especially apparent in the art of the theatre.
—My life in Art, Konstantin Stanislavsky, Translated by J. J. Robbins, P. 570, London, 1980

5. The art of the Theatre.....is devided up into so many crafts ....acting, scene, costume, lighting, carpentering, singing, dancing etc...... the reform of the Art of the Theatre is possible to those men alone who have studied and practised all the crafts of the theatre.

—On the Art of the Theatre, Edward Gordon Craig, P 177, London, 1957

6. Lighting serves three primary purposes in the Theatre –as it makes the actors visible to the audience (b) it selects and emphasizes dominant element in the scene, (c) it assists in the creation of the mood.

—Producing the Play, John Gassner, P. P. 242-243, New York, 1st published 1941

7. Lighting can indicate such things as the time of day, the weather

—Play Production, Henning Nelms, P. 224, New York, 1958

৪. "বাংলা থিয়েটারে আগে মুড লাইটের (mood light) ব্যবহার ছিল না। 'বিসর্জন' নাটকের প্রথম দৃশ্যে শিশির কুমার সর্বপ্রথম মুডলাইট ব্যবহার করে দেখালেন যে, আলোকসম্পাতের সঙ্গে মঞ্চে নাটকের ক্রিয়ার ও পাত্র পাত্রীর ভাবপ্রকাশের গভীর সম্পর্ক আছে।"

—শিশির কুমার ও বাংলা থিয়েটার, মণি বাগচী, পৃ. ১৮৪, কলিকাতা, ১৯৬০

9. Light ..... merveloush accompanies the intimate meaning of a dramatic work.

—Behind the Fourth wall, Andre Antoine—taken from 'Directors on Directing: A Source Book of the Modern Theatre,' Edited by Toby Cole and Helen Krich Chinoy, 4th Impression, P. 98, London, 1973.

10. নাটক—সাহিত্যে ও মঞ্চে, 'ও থিয়েটার' নাট্য পত্রিকা থেকে গৃহীত, ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৮১, প্রকাশক : সঞ্জয় গুহঠাকুরতা, কলিকাতা, ১৯৮৩, অক্টোবর

11. ....We must choose a weapon that is in keeping with such a character, since that weapon is essentially part of that character.

—Weapons in the Theatre, Arthur Wise, P. 5, London, First published 1968

12. Every period....has a very definite outline and silhouett...... . It is this essential shape which gives a stage costume its period flavour.

—Dressing the Play, Norah Lambourne, P. 11, The Studio Publication, London, New York, 1st published, 1953.

13. Colour is like music—fully infinite tones and supertones of meaning and symbolism. It will speak alone in the entry..... . It has a great deal to say and you must be able to hear it...... . Colour must be used in contrast and harmony.

—Theatre and Stage, Harold Downs, P. 59, London, 1951

14. .....the Costume should actively express the nature of the character, the situation and the play.

—Play production, Henning Nelms, P. 224, New York 1958.

15. Composition is the rational arrangement of people in a stagegroup through the use of emphasis, stability, sequence and balance to achieve an instinctively satisfying clarity and beauty.

--Fundamentals of Play Directions, Alexander Dean, Lawrence Carra, P 107, Holt, Rinehurt and Winston. Inc. Third Edition, 1974

16. Picturisation..... is the placing of the characters in a locale that suggests their mental and emotional attitudes towards one another so at the dramatic nature of the situation will be conveyed to an audience without the use of dialogue or movement—Ibid, P. 172

17. Movement .... is the stage picture in action. It comprises the moments of picturization in their everchanging aspects.

—Ibid, P. 191

18. Each play has a fundamental rhythm that ca be determined by the kind of play; the nature of the situation, the dialogue, the characters, the locale and the atmosphere. Ibid, P. 233.

19. স্বর ও বাক্-রীতি, ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৬১, কলিকাতা, ১৯৮৪

20. Pantomimic is action without words. By actin is meant a sequence of facial expressions, gestures, hand operations and body positions and movements..... —Ibid, P. 255

—Fundamentals of play directions, Alexander Dean, Lawrence Carra P. 255, Holt, Rinehurt and Winston. Inc. Third Edition, 1974.

21. ......the scene designer, lighting designer, costume designer, director and actors.... must be sensitive to rhythm (the play-wright's rhythm) and must use rhythm in their respective arts.

—Rhythm in Drama, Kathleen George, P. 14, University of Pittsburgh Press, 1980.

22. Moreover some people especially artists are able not only to remember and reproduce things they have seen and heard in real life, but they can also do the same with unseen and unheard things in their own imagination.

—An Actor Prepares, K. Stanislavsky, Geoffrey Bles, P. 169, First Published 1937, Reprinted 1942.. 1973.

23. The actor creates the whole length of a human soul's life on the stage everytime he creates a part. This human soul must be visible in all its aspects, physical, mental and emotional.

—Acting, The First Six Lessons, Richard Boleslavsky, P. 77, London 2nd Impression, 1962.

24. The actor stimulates his audience's leap of imagination by his performance... The work of the actor is therefore uniquely creative

—Drama, Stage and Audience, J. L. Styan, P. 143, Cambridge University Press, 1975, 1st Publication.

25. .....an actor must learn how to look and see on the stage, and how to respond to his surroundings. He must, in short, know how to use all the stimuli of the stage.

—Stanislavsky, David Magarhack, taken from 'The Theory of The Modern Stage', Edited by Eric Bentley, P. 254, London, 1976

26. The foremost of the actor's skills is the use of voice and speech.

—Directing in the Theatre, Hugh Morrison, P. 56, London,

27. The accent is a pointing finger. It singles out the keyword in a phrase or measure. In the word thus underscored we shall find the soul, the inner essence, the high point of the subtext.

—Building a character, Konstantin Stanislavsky, P. 149, London, 3rd Publication, 1965.

28. ......the actor must impersonate characters other than himself because it is no real art to play oneself.

—The Length and Depth of Acting, Edwin Duerr, P. P. 269-270, Holt, Rinehart and Winston Inc. 1962.

29. The true director comprises within his own person a director-teacher, a director-artist, a director-writer, a director-administrator.

—Creative work with the Actor, A Discussion on Directing, Konstantin Stanislavsky, taken from 'Directors on Directing, Edited by Toby Cole and Helen Krich Chinoy, P. 109.

30. He is not a dictator, a traffic-warder or a builder .... he is more a gardener.

—Acting and Stage craft, Derek Bowskiee, P. 266, London, First Edition, 1973.

31. রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র প্রবন্ধ, পৃ. ৪৫১, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৭৪
32. ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রয়োগ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ. ৭২১, বেতার জগৎ, ৫৪ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, কলিকাতা, ১৯৮৩
33. নাট্যশাস্ত্র, ভরত—শ্লোক সংখ্যা-৩-৭, চতুর্দশ অধ্যায়
34. দেবনারায়ণ গুপ্তের সঙ্গে বর্তমান গবেষকের সাক্ষাৎকার, কলিকাতা, ৮/৪/৮৯
35. For the presentation of their pieces they followed, and expanded, the stage principles established by the liturgical drama, setting up a series of decorated platforms, now named 'mansions', before the audience in a straight line, in a semicircle, or, as in Cornwall, in a circle. Each mansion represented a distinct and seperate locality,.....

    —World Drama, Allardyce Nicoll, —P. 152, London, 1959.
36. বর্তমান গবেষকের সঙ্গে নাট্যকারের সাক্ষাৎকার, ২/৯/৮১
37. মাইকের সাহায্যে চরিত্রের মনের কথা দর্শককে জানানোর প্রথা তিনিই প্রথম তাঁর 'ছাব্বিশে জানুয়ারী' নাটকে পরীক্ষা করেন।

    —'কান্নাহাসির পালা' নাট্যগ্রন্থে নাট্যকার পরিচিতি, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৬০
38. I) "বাংলা নাটকে নিঃসন্দেহে 'বিশ বছর আগে' ফ্ল্যাশ ব্যাক প্রথা ও সমগ্র নাটকে একটি বিরতি-প্রথার প্রবর্তক।"

    —বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)— ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৮৯, কলিকাতা, ১৯৬১

    II) "এই নাটকে প্রথম ফ্ল্যাশব্যাক ও একটি বিরতি-প্রথার প্রবর্তন করি।"

    —নাট্যকারের সঙ্গে বর্তমান গবেষকের সাক্ষাৎকার, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮১
39. একশো বছরের নাট্য-প্রসঙ্গ : দেবনারায়ণ গুপ্ত, কলিকাতা, ১৩৮৯

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

বিধায়কের নাটকের কলাকুশলীর নাম

মেঘমুক্তি

বিধায়ক উক্ত গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন বিশিষ্ট নাট্যামোদী ও শিল্পরসিক বিদ্যাধর মল্লিক মহাশয়কে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার লিখিত বক্তব্য তুলে ধরা হল—

শ্রীযুক্ত বিদ্যাধর মল্লিক

বন্ধুবরেষু—

প্রিয় বন্ধু,

একদা এক শুভ-প্রভাতে তোমাতে আমাতে দেখা। অজস্র প্রার্থীর মাঝখান থেকে আমাকেই তুমি খুঁজে নিয়ে নাট্যকারের সিংহাসনে বসালে। সে আমার দুরূহ সৌভাগ্য। আমার জন্য কী পরিশ্রম আর ত্যাগ স্বীকার ক'রে তুমি এনে দিলে মান, সম্মান, খ্যাতি আর প্রতিপত্তি আমার জীবনে, —অসাধ্য সাধনের সেই অলক্ষ্য-ইতিহাস আর কেউ না জানুক, আমি জানি। তারজন্য তোমার প্রতি আমার অনুরাগ আর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। 'মেঘমুক্তি' তোমারই— একে তুমিই নাও। তুমি আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছ। 'মেঘমুক্তি' হোক্ আমাদের সেই বন্ধুত্বের রাখীবন্ধন।

সখ্য-গর্বিত
বিধায়ক

প্রযোজনা	:	রঘুনাথ মল্লিক
ব্যবস্থাপনা	:	বিদ্যাধর মল্লিক
পরিচালনা	:	যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী
সুর-সংযোজনা	:	তুলসী লাহিড়ী
নৃত্য পরিচালনা	:	ললিত গোস্বামী
মঞ্চাধ্যক্ষতা	:	পূর্ণ দে (এঃ)

॥ চরিত্র ও শিল্পী ॥

চরিত্র		শিল্পী
প্রফেসর অতুল ঘোষ	প্রদ্যোতের দাদুর বন্ধু	যোগেশ চৌধুরী
প্রদ্যোত বসু	ধনী যুবক (উকিল)	রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বপন রায়	প্রদ্যোতের বন্ধু বিলেত ফেরত ডাক্তার	সন্তোষ সিংহ

চরিত্র		শিল্পী
প্রণব গুপ্ত	প্রদ্যোতের বন্ধু	বেচু সিংহ
বিজয় সেন	প্রদ্যোতের বয়ঃকনিষ্ঠ বন্ধু	জহর গাঙ্গুলী
যতীন	চাকর	যতীন দাস
অণিমা বসু	প্রদ্যোতের স্ত্রী	সুহাসিনী
গীতা রায়	জনৈক অধ্যাপক-কন্যা	রাণীবালা
অপর্ণা রায়	স্বপনের স্ত্রী	পদ্মাবতী
বেবী ঘোষ	অতুলবাবুর নাতনী	উমা দেবী
আরতি সরকার	পাড়ার মেয়ে	সাবিত্রী দেবী

মাটির ঘর

নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে এইভাবে,—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত অমর ঘোষ

শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

'মাটির ঘর'কে তোমরাই ক'রে তুলেছো বাসযোগ্য। একে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে তোমরা যে পরিশ্রম করেছো, তা' চিরদিন আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখবো।

তাই এই প্রকাশের পূত-মুহূর্তে তোমাদের পাঁচজনকে আমি স্মরণ করলাম। জানি, একটি মাত্র ফুল দিয়ে পঞ্চ-দেবতাকে তুষ্ট করা যায় না, তবু এই নিয়ে তোমরা খুসি হও।

স্নেহধন্য

বিধায়ক

স্বত্বাধিকারী	সিটি এনটারটেনার্স
প্রযোজনা ও অধ্যক্ষতা	প্রভাত সিংহ
নাট্য পরিচালনা	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
দৃশ্যপট	মণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু)
সঙ্গীত	বিধায়ক ভট্টাচার্য ও কমলারাণী মিত্র
সুরশিল্পী	অনাদি দস্তিদার
সঙ্গীত শিক্ষক	হরিদাস মুখোপাধ্যায়

॥ চরিত্রলিপি ও শিল্পী ॥

চরিত্র		শিল্পী
সত্যপ্রসন্ন	উচ্চমধ্যবিত্ত গৃহস্থ	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
তন্দ্রা	বড় মেয়ে	পদ্মাবতী
নন্দা	মেজ মেয়ে	ঊষা দেবী
ছন্দা	ছোট মেয়ে	শান্তি গুপ্তা·
কল্যাণ	বড় জামাই	প্রভাত সিংহ
চঞ্চল	মেজ জামাই	সিধু গাঙ্গুলী
অলক	তন্দ্রার বন্ধু	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
উৎপল	ছন্দার সহপাঠী	তারা ভট্টাচার্য
অঞ্জনা	চঞ্চলের দিদি	বেলারাণী
ডাক্তার	ডাক্তার	হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
অশোক	সিমলায় কল্যাণের প্রতিবেশী যুবক	গিরিজা সাধু
শঙ্কর	সত্যপ্রসন্নর ভৃত্য	বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী (পরে) আশু বসু (এঃ)
ঠাকুর	সিমলায় কল্যাণের পাচক	তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়
চাকর (সিমলা)	কল্যাণের চাকর	কালাচাঁদ দাস
স্কুল কলেজের মেয়েরা		রেণুবালা, কিশোরীবালা, রাণীবালা (ঝুমরী), সন্ধ্যা ঘোষ, রেখা দত্ত, রাণীবালা

বিশ বছর আগে

নাটকটির উৎসর্গ পত্র :
শ্রীযুক্ত সুস্থির কুমার বসু
জামসেদপুর

সুস্থিরদা—

আজীবন লৌহ-দানবের দাসত্ব ক'রে আজও তুমি সুন্দরের পূজারী। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে জীবনের অবকাশ মুহূর্তগুলি ভ'রে রেখেছ নাট্যরস সুধায়। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে নাট্যানুরাগ সঞ্চার কামনায় যে দাম তোমাকে দিতে হয়েছে, আর কেউ না জানুক—সে কথা আমি জানি, তাই তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধার শেষ নেই।

তুমি আমাকে ভালবাসো, আমার লেখা তোমার ভাল লাগে, তাই 'বিশ বছর আগে' আমি তোমাকেই দিলাম।

তোমার স্নেহের
বিধায়ক

পরিবেশক	:	সিটি এন্টারটেনার্স
পরিচালক	:	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রযোজক	:	প্রভাত সিংহ
গীতিকার	:	বিধায়ক ভট্টাচার্য, কমলারাণী মিত্র
সুরশিল্পী	:	অনিল বাগচী
নৃত্য শিল্পী	:	ব্রজবল্লভ পাল
মঞ্চ শিল্পী	:	মণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু)
আবহ সঙ্গীত	:	রঙমহল যন্ত্রীসঙ্ঘ

॥ চরিত্র ও রূপশিল্পী ॥

চরিত্র		রূপশিল্পী
প্রদীপ	জমিদার	ভূমেন রায়
দীপক	অভিনেতা	প্রভাত সিংহ
তমসা	শিক্ষিতা তরুণী	শান্তি গুপ্তা
মনীষা	অভিনেত্রী	পদ্মাবতী
তন্বী	মনীষার বোন	উষা দেবী
বনলতা	প্রদীপের স্ত্রী	জ্যোতির্ময়ী
হেনা	নৃত্যগীত পটিয়সী অভিনেত্রী	ফিরোজাবালা
বীণা	ঐ	রাণীবালা
তরলিকা	পরিস্থিতি অনুসারে পরিচয় পরিবর্তনে অভ্যস্তা	বেলারাণী
দুঃখদহন	বনলতার ম্যানেজার	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
প্রকাশ	থিয়েটারের ম্যানেজার	সিধু গাঙ্গুলী
যদুপতি	বনলতার দাদাশ্বশুর	হীরালাল চট্টোপাধ্যায়
অটল	প্রদীপের জীর্ণ বাগানবাড়ীর ভৃত্য	ভাস্কর দেব
মনোহর	প্রদীপের মোসাহেব	তারাকুমার ভট্টাচার্য
সরমা	বনলতার প্রতিবেশিনী	রেণুবালা
নরেশ	অভিনেতা	ভানু চট্টোপাধ্যায়
সনাতন	ঐ	আশু বসু (এঃ)

চরিত্র		রূপশিল্পী
গোপাল	ঐ	গোপাল মুখোপাধ্যায় পরে বিপিন বসু
অভয়	ঐ	গিরিজা সাধু
রতন	তমসার ভৃত্য	কালাচাঁদ দাস
নিতাই	যদুপতির ভৃত্য	বিপিন বসু
প্রদীপের অন্যান্য		কানু চট্টোপাধ্যায়
মোসাহেব		গোপাল নন্দী
অন্যান্য অভিনেতা		কানু চট্টোপাধ্যায়
		অনিল দাস
		হিমাংশু পাল

মালা রায়

নাটকটি উৎসর্গীকৃত হয়েছে,—
মহাশয় শ্রীযুক্ত অমর নাথ ঘোষ
শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু।

স্বত্বাধিকারী	:	বি. এম. সিংহ
প্রযোজক	:	সিটি এনটারটেনার্স
নাট্য পরিচালনা	:	নরেশ চন্দ্র মিত্র
দৃশ্য পট	:	মণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু)
সঙ্গীত	:	বিধায়ক ভট্টাচার্য, কমলারাণী মিত্র
সুরশিল্পী	:	ধীরেন দাস
নৃত্য শিল্পী	:	ব্রজবল্লভ পাল
অসি ও ছোরা খেলা শিক্ষক	:	মতিলাল সেনগুপ্ত
আলোকশিল্পী	:	খগেন্দ্রনাথ দে
		সুশীল কুমার দে
		শচীন্দ্রনাথ ভৌমিক

॥ চরিত্র ও অভিনয় শিল্পী ॥

চরিত্র		অভিনয় শিল্পী
মিঃ সেন	জমিদার ও সাহিত্যিক	নরেশ মিত্র
অবিনাশ	মিঃ সেনের ম্যানেজার	রবীন্দ্রমোহন রায়
সুবিনয়	মালার স্বামী	গিরিজা সাধু

চরিত্র		অভিনয় শিল্পী
অপরূপ	জমিদার ও সুবিনয়ের বন্ধু	ভূমেন রায়
বিজন	অপরূপের মাসতুতো ভাই	সিধু গাঙ্গুলী
অসিত	বেণুর বন্ধু	ধীরেন দাস
সমীর		শম্ভু মিত্র
বিমান		ভানু চট্টোপাধ্যায়
জনার্দন		আশু বোস (এঃ)
বন্ধুগণ		গোপাল নন্দী, গোপী দে, নেপাল চন্দ্র বসু
সরোজ	মিঃ সেনের কর্মচারী	বিপিন বসু
সর্দার	বেদের সর্দার	পূর্ণ দাস
মদন	মালার চাকর	কালাচাঁদ দাস
মিসেস সেন	মিঃ সেনের স্ত্রী	ঊষাবতী
মালা	মিঃ সেনের ভাগ্নী বলে পরিচিত	শান্তি গুপ্তা
মায়া	বেদেনী	পদ্মাবতী
সন্ধ্যা	অপরূপের স্ত্রী	ঊষা দেবী
লীনা	বেণুর বান্ধবী	জোতির্ময়ী
বেণু	মিঃ সেনের কন্যা	ছায়া দেবী
মতি	সন্ধ্যার পরিচারিকা	আঙ্গুরবালা
কাজল	বেদেনী	রাণীবালা

কুহকিনী

এই নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে এইভাবে,—

পরম কল্যাণবর

শ্রীমান বিমলারঞ্জন ভট্টাচার্য

পরম কল্যাণীয়া

শ্রীমতী মায়া দেবী

নিরাপদদীর্ঘজীবেষু

আশীর্বাদক

বড়দা

পরিবেশক	:	মিনার্ভা কর্তৃপক্ষ
পরিচালক	:	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গীতিকার	:	অখিল নিয়োগী, কমলারাণী মিত্র, ধীরেন দাস
	:	ধীরেন দাস

নৃত্যশিল্পী : ব্রজবল্লভ পাল
মঞ্চ শিল্পী : মহম্মদ জান
আলোকশিল্পী : ভোলানাথ বসাক, ওহিয়ার রহমান

চরিত্র		শিল্পী
বিপ্রদেব	কামরূপ রাজ্যের পুরোহিত	সুশীল ঘোষ
সোমদেব	ঐ শিষ্য	প্রফুল্ল দাস (হাজুবাবু)
	কাঞ্চীরাজ্যের রাজকুমার	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
অজয়	ঐ কনিষ্ঠভ্রাতা	গোপাল চট্টোপাধ্যায়
মন্ত্রী	কাঞ্চীর মন্ত্রী	উল্লেখ নেই
সুন্দর	জয়ন্তর সহচর	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
কুশল		সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
সোমেন	বিভিন্ন রাজ্যের	পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়
দেবতোষ	রাজকুমারগণ	রোজারিও (এঃ)
বরুণ		অমৃতলাল রায়
বজ্রসেন	কামরূপ রাজ্যের সেনাপতি	দুর্গাদাস সান্যাল
প্রতিহারী	কাঞ্চীর প্রতিহারী	অনয় দাস
নীলমাধব	কামরূপ রাজ্যের অধিবাসী	জীবন মুখোপাধ্যায়
ঘোষক	কাঞ্চীরাজ্যের ঘোষক	তুলসী পাল
কাঞ্চীরাজ্যের সৈন্যগণ		তুলসী পাল, পুলিন পাল, মণি মিত্র, যোগেন রায়, বৈদ্যনাথ, অমূল্য মিত্র, রেবতী দত্ত।
কামরূপ রাজ্যের সৈনগণ		বাবুলাল শর্মা, সুরেশ সাহা,
পৌরজন (কাঞ্চীরাজ্যের)		চুনী দত্ত সন্তোষ শীল, অমৃত রায়, পরেশ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
রত্না	কামরূপের রাণী	শেফালিকা (পুতুল)
লীলা	রত্নার সহচরী	হরিমতী
সুমিত্রা	জয়ন্তর ভগ্নী	অপর্ণা দাস
মাধবী	নীলমাধবের স্ত্রী	গীতা দেবী
নর্তকীগণ (কামরূপ ও কাঞ্চীরাজ্যের)		রেণুকা, প্রভা, সুশীলা, রাধা (১), রাধা (২), রেবা, মুক্তো, ইন্দু, পটল, ইলা, কমলা, আন্না।

রক্তের ডাক

নাটকটি যেভাবে উৎসর্গ করা হয়েছে নিম্নে তা প্রদত্ত হল,—

বর্ত্তমান বাঙ্‌লার
অত্যুগ্র আধুনকতাবিলাসী
অভিভাবক ও তরুণ-তরুণীর হাতে—

শ্রী বিধায়ক ভট্টাচার্য

পরিচালক	:	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রযোজক	:	যামিনী মিত্র
গীতশিল্পী	:	শৈলেন রায়
সুরশিল্পী	:	তুলসী লাহিড়ী
নৃত্য শিল্পী	:	সমর ঘোষ
মঞ্চ শিল্পী	:	মণীন্দ্রনাথ দাস
আবহ সঙ্গীত	:	অমিয় ভট্টাচার্য
নৃত্য শিক্ষক	:	রাজকুমার মেনারিক

চরিত্র		শিল্পী
শুভেশ চৌধুরী	জমিদার	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
অবনী	ম্যানেজার	জহর গঙ্গোপাধ্যায়
শরৎ	বুলুর স্বামী	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
গণেশ	গ্রাম্য গেজেট	আশু বোস
বিকাশ	টাইপিষ্ট	সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়
হরিয়া	শুভেশের ভৃত্য	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
মিঃ পিনাকী ঘোষ	ফিল্ম ডাইরেক্টর	শান্তি ভট্টাচার্য
অনাথ সুর	সুর শিল্পী	জিতেন গঙ্গোপাধ্যায়
অমিয়	কবি	নীতীশ মুখোপাধ্যায়
পরাণ মন্ডল	শুভেশের প্রজা	গোপাল মুখোপাধ্যায়
রাম সিং	দারোয়ান	নেপাল বোস
গিরিধারী		বিপিন বসু
রিক্সাওয়ালা		সহদেব গঙ্গোপাধ্যায়
বেয়ারা		বীরেন দাস
চাকর	শতাব্দীর বাড়ীর চাকর	যতীন দে
বুলু (শতাব্দী)	শরতের স্ত্রী	সরযূবালা পরে শান্তি গুপ্তা
বিরজা	বলুর শাশুড়ী	গিরিবালা

চরিত্র		শিল্পী
বিনোদবালা	বুলুর ননদ	পদ্মাবতী
মিসেস মজুমদার		হরিমতী
নমিতা	শুভেশের বান্ধবী	শেফালিকা (পুতুল)
রমা	ঐ	রেণুকা রায়
রেবা	ঐ	লীলা দেবী
রূপলেখা		রূপলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়
বেলা	নাচের মেয়েরা	বেলা
প্রতিভা		প্রতিভা

তাইতো

'তাইতো' নাটকের উৎসর্গপত্র :

বর্তমান নাট্যমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট এবং বিপ্রদাসের বিজয়ী পরিচালক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী

—করকমলেষু।

ভাই বিশুদা,

ছায়াছবির প্রয়োজনে আজ যখন আমাকে বাধ্য হ'য়েই নাট্যমঞ্চ থেকে দূরে সরে যেতে হচ্ছে— যখন ইচ্ছে থাকলেও আমি নাট্যভারতীর সেবা করতে পারছিনে, সেই সময় আকস্মিক-আত্মীয়তার অন্তরঙ্গতায় আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে আমাকে দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে 'বিপ্রদাস' এবং তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে 'তাইতো' 'লিখিয়ে নিয়েছ'। তোমার ওপর রেগে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লিখেছি, কাজেই এর ভালোমন্দর দায়িত্ব আমার নয়— তোমার, অতএব এ বইও তোমার।

সখ্য-গর্বিত বিধায়ক

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য "এই নাটকের পরিবর্ধন, পরিবর্তন ও দৃশ্য সংস্থাপন সম্বন্ধে সস্নেহ সাহায্য এবং উপদেশ দান করেছেন লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী।"

পরিচালনা	:	বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
সুর সৃষ্টি ও সংগীত পরিচালনা	:	রঞ্জিত রায়
সহকারী সংগীত পরিচালনা	:	রতন দাঁ
দৃশ্য শিল্পী	:	মহম্মদ জান

চরিত্র		শিল্পী
জীবনময়	কিঞ্চিৎ কৃপণ ধনী	শৈলেন চৌধুরী
দীননাথ	বাজার সরকার এবং ভৃত্য	রঞ্জিত রায়
সমর	হঠাৎ বড়লোক	মিহির ভট্টাচার্য
সমীর	এক যুবক	উল্লেখ নেই
সুহাস	সমরের বন্ধু	কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
পল্লব	জীবনময়ের পুত্র	মাষ্টার তপনকুমার মিত্র
সুরেশ	সমরের ম্যানেজার	বিপিন মুখোপাধ্যায়
ভবশঙ্কর	পার্টির দাদু	প্রবোধ দত্ত
বিরুপাক্ষ বটব্যাল	নিখিল ভারত ধনভার লাঘব সমিতির প্রতিষ্ঠাতা	বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
মাতাল		আদিত্য ঘোষ
চতুর্থ পক্ষীয় বৃদ্ধ		দুর্গা সান্যাল
তরুণ		গণেশ শর্মা
শিষ দেওয়া তরুণ		ফাল্গুনী ভট্টাচার্য
মল্লিকা	জীবনময়ের বড় মেয়ে	মলিনা দেবী
বল্লিকা	জীবনময়ের ছোট মেয়ে	রেবা দেবী
মালবিকা	মল্লিকার বান্ধবী	রাজলক্ষ্মী (ছোট)
মিসেস ঢোল	বয়স্কা আধুনিকা	নিভাননী
↑. স্তারিণী	ভবশঙ্করের নিস্তারকর্ত্রী	আশা দেবী
বকুলিকা	নিস্তারের নাতনী	তারকবালা
মুখরা নারী	বিরূপপাক্ষের বিচিত্র টার্গেট	সরলা দেবী (বেঁকি)
বসুন্ধরা	বসুন্ধরার মত মূক	মণিকা দেবী
মাতালের স্ত্রী		লাবণ্য দেবী
চতুর্থপক্ষীয় বৃদ্ধের স্ত্রী		নমিতা দেবী
সিনেমার দর্শকগণ		বিমল, মনোরঞ্জন, কার্তিক, দুর্গা, পুরু, গণেশ ও মাধব
গাঁঠ কাটা-দ্বয়		মণি ও সত্যেন
বরের বন্ধুগণ		অবনী, নকুল, কার্তিক, বীরেন
দুষমন সিং		নকুল দত্ত
চানাচুরওয়ালা		ননীগোপাল
ঘুগনীওয়ালা		জীবন

তেরশো পঞ্চাশ

নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে

শ্রীমার

শ্রীচরণকমলে—
জ্বালো ধ্যানের আঁধারে তব চরণ দু'টি
আজ জ্ঞানের আলোতে কালো উঠুক ফুটি।
তামসের তমসার
করভোর, খোল দ্বার
নব অরুণ-সোনায় প্রাণ ভরুক মুঠি
আজ জ্ঞানের আলোতে কালো উঠুক ফুটি।

সত্যের ছোঁয়া দাও—মিথ্যাবে কর দূর
নিত্যেরে কর বুকে আনন্দে ভরপূর।
চরণের বরণের
জীবনের মরণের
সব কাজ এক হোক, পড়ুক লুটি—
তুমি ধ্যানের আঁধারে জ্বালো চরণ দুটি।

প্রণতঃ
বিধায়ক

নাটকটি সম্পর্কে নাট্যকার ভূমিকায় বলেছেন,—

"এই নাটকখানি যখন রচিত হয় এবং প্রথম মঞ্চস্থ হয়, তখন কোলকাতায় 'নবান্ন' কিম্বা ঐ জাতীয় কোন নাটক প্রদর্শিত হয়নি, অথবা '১৩৫০' নামে কোন নাটক, উপন্যাস বা গল্পের বই বাজারে প্রকাশিত হয়নি। বহু প্রশ্নের উত্তরে কথাটি আমাকে বাধ্য হ'য়ে জানাতে হ'ল।"

পরিচালনা : বিধায়ক ভট্টাচার্য

চরিত্র		অভিনয় শিল্পী
তারিণী মণ্ডল	ময়না গাঁয়ের এক সম্পন্ন চাষী	ফণী রায়
শিবু	তারিণীর পুত্র	পশুপতি কুণ্ডু
দীনবন্ধু চক্রবর্তী	তারিণীর প্রতিবেশী	জীবন মুখোপাধ্যায় পরে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
দারোগা	গ্রামের দারোগা	দেবী মুখোপাধ্যায় পরে রামচন্দ্র চৌধুরী
মানব	ভবপুরে জমিদারপুত্র	ধীরাজ ভট্টাচার্য

চরিত্র		অভিনয় শিল্পী
সুবিমল	ময়না গাঁয়ের জমিদার	বেচু সিংহ/শৈলেন চৌধুরী/বিভূতি গাঙ্গুলী (ফিল্ম)
রবীন	সুবিমলের বন্ধু	মন্টু
মাতাল		দেবী মুখোপাধ্যায়/বেচু সিংহ
বৃদ্ধ ভিক্ষুক		তাক/বিভতি গাঙ্গুলী (ছোট)
ভিক্ষুক		বিভূতি গাঙ্গুলী (ছোট)
মণিমোহন	এক লম্পট সুযোগ-সন্ধানী যুবক	বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায, নৃপতি চট্টোপাধ্যায
গৌরী	তাবিণীব কন্যা	বেণুকা বায
ললিতা	এক বৈষ্ণবী	রাজলক্ষ্মী (বড়)
শেলী	সুবিমলের বোন	মমতা/মলিনা/বন্দনা
লুসি	শেলীর বান্ধবী	আশাপূর্ণা
মিলি	ঐ	অমিতা বসু

খবর বলছি

পরিচালনা : বিধায়ক ভট্টাচার্য

চরিত্র		শিল্পী
চন্দ্রমোহন	পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু	বিধায়ক ভট্টাচার্য
প্রফেসর বরেন মিত্র	এক সহৃদয় ব্যক্তি	জহর গাঙ্গুলী
অনুপম	বরেন মিত্রর শ্যালক	সিধু গাঙ্গুলী
দীপা	চন্দ্রমোহনের কন্যা	প্রমীলা ত্রিবেদী
অরুন্ধতী	বরেন মিত্রর স্ত্রী	অঞ্জলি রায়
নমামি	বরেন মিত্রর কন্যা	মুকুল জ্যোতি
শিপ্রা	এক সুযোগসন্ধানী মহিলা	বেলারাণী
খুসীর মা	এক বাস্তুহারা মহিলা	ইরা চক্রবর্তী

অন্ধদেবতা

নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে নিম্নলিখিত ভাবে,—

'একত্রিকা' নাট্যসংস্থার সভ্য ও সভ্যাবৃন্দের হাতে,
এবং 'একত্রিকা'র ক্রমোন্নতিতে যাঁরা গর্বিত,
যাঁরা দুঃখিত, বিমর্ষ ও ঈর্ষান্বিত—
তাঁদের সবাইকে 'অন্ধদেবতা' উৎসর্গ করলাম।

বিধায়ক ভট্টাচার্য

উক্ত নাটকের শিল্পী তালিকা পাওয়া যায়নি। নাটকটি যখন পরবর্তীকালে (১৩৭১) মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় সেই গ্রন্থের ভূমিকায় নাট্যকার একজন শিল্পীর নামোল্লেখ করেন। তিনি হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। ইনি লতার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

সেই তিমিরে

উৎসর্গীকরণ—
শিশির কুমার ইন্‌স্টিট্যুটের
পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক
অনুগ্রাহক
এবং
আমাদের সেই প্রিয়তম বন্ধুবর্গ
যাঁরা আজও আছেন
আর
যাঁরা নেই
তাঁদের সকলকেই স্মরণে রেখে
এই নাটক উৎসর্গিত হ'ল।

পরিচালনা : বিধায়ক ভট্টাচার্য

চরিত্র		শিল্পী
আনন্দ	শিপ্রার দাদু	দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়
অতনু	রুদ্রেশ্বরের বন্ধু	প্রথম রজনীতে তারা ভট্টাচার্য পরে মিহির ভট্টাচার্য

চরিত্র		শিল্পী
রুদ্রেশ্বর	স্বাহার স্বামী	সুশীল রায়
স্বাহা	রুদ্রেশ্বরের স্ত্রী ও জাগরণী সম্মিলনীর সম্পাদিকা	বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
শিপ্রা	জাগরণী সম্মিলনীর সভা-নেত্রী	ঝর্ণা দেবী
নিস্তার	দাসী	প্রভা দেবী

পিতাপুত্র

নাটকটির উৎসর্গপত্র :

প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত

সুহৃদ্বরেষু

মহেন্দ্রবাবু,

কত কথাই যে শুনেছি আপনার সংগে পরিচিত হবার পূর্বে। কিন্তু আজ হৃদয়ের কাছাকাছি এসে দেখছি— মিথ্যাভাষণের ঘূর্ণাবর্ত চলে আপনাকে কেন্দ্র ক'রে। নিজে নাট্যকার হ'য়ে— অন্য নাট্যকারকে যে একই ঘরে জায়গা দেয়— তার মহত্ত্ব প্রথম স্তরের। 'পিতাপুত্র' আপনারই বিপুল পরিশ্রমে প্রস্তুত। তাই যে নাটক আপনার আর আমার মধ্যে রাখী-বন্ধনের কাজ করেছে, সে নাটক আপনাকেই উৎসর্গ করলাম।

সখ্য গর্বিত

শ্রী বিধায়ক ভট্টাচার্য

পরিচালনা	:	মহেন্দ্র গুপ্ত
সুর	:	দুর্গা সেন
নৃত্য	:	প্রীতিধারা
গীতিকার	:	রমেন চৌধুরী
আলোক সম্পাত	:	কাশী পাল
মঞ্চ	:	শিবু ঘোষ

চরিত্র		শিল্পী
মিঃ ভি. ভি. মুখার্জী	অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার	দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রদীপ্ত ব্যানার্জী	অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার	মহেন্দ্র গুপ্ত
সমীর	প্রদীপ্ত ব্যানার্জীর পুত্র	সিধু গাঙ্গুলী

চরিত্র		শিল্পী
সুশীল	গুপ্ত সমিতির সভ্য	সত্য পাঠক
অজিত	,,	নির্মল ভট্টাচার্য
পরেশ	,,	ফাল্গুনী ভট্টাচার্য
রমেন	,,	শান্তি চক্রবর্তী
শ্যামল	,,	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
গৌরীশঙ্কর	পীরপুরের জমিদারের পুত্র	মন্টু গাঙ্গুলী
হরবিলাস	পীরপুরের জমিদার	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
গোবর্দ্ধন	সুদখোর বৈষ্ণব	রাধারমন পাল
কিশোর	ঐ নাতি	মাধুরী মুখার্জী
খোকন	হরবিলাসের নাতি	ভারতী
সুধাংশু	পুলিশ অফিসার	ভূপেন চৌধুরী
মধু	হরবিলাসের চাকর	বলাই গরাই
গৌর	কণার চাকর	কমল দাস
বনমালী সোম	মণিকার অতিথি	নীলরতন ভট্টাচার্য
বেয়ারা		বিদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায়
মহেশ্বর ছাজ্‌লানী	মণিকার অতিথি	তারক দাস
পাঁচু গোঁসাই	মণিকার মামা	পশুপতি কুণ্ডু
পটকা	পাঁচু গোঁসাই-এর ভৃত্য	মিলন দত্ত
পুলিশ অফিসার		প্রকাশ ঘোষ
কনস্টেবলদ্বয়		মণীন্দ্র ঘোষ, মদন বন্দ্যোপাধ্যায়
বিনতি	ভি. ভি. মুখার্জীর কন্যা	বনানী চৌধুরী পরে সুদীপ্তা রায়
মীনা	গুপ্ত সমিতির সহনেত্রী	গীতশ্রী দেবী
দীপালি	গুপ্তসমিতির সভ্যা	সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মণিকা	ব্যারিষ্টার দুহিতা	প্রীতিধারা মুখার্জী
কণা	মণিকার বান্ধবী	ছন্দাদেবী
সরমা	হরবিলাসের পুত্রবধূ	শেফালী সরকার
মিসেস সারকারা	মণিকার বাড়ীর অতিথি	বীণা দেবী

ক্ষুধা

নাটকটি নিম্নলিখিতভাবে উৎসর্গ করা হয়েছে,—

শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর সরকার

ও

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সরকারকে

তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অকুণ্ঠ প্রচেষ্টা, অদম্য মঞ্চপ্রীতি এবং নির্ভীক প্রগতিবাদী মনের জন্য 'ক্ষুধা' উৎসর্গ করলাম।

নাট্যকার

পরিচালনা	নরেশ চন্দ্র মিত্র
সহযোগী	কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগীত	নচিকেতা ঘোষ
আলো	তাপস সেন
দৃশ্যপট	আর. আর. সিণ্ডে

চরিত্র		শিল্পী
স্বদেশ	ভাগ্যবিড়ম্বিত শিক্ষিত যুবক	কালী ব্যানার্জী, পরে তমাল লাহিড়ী
গজেন	,,	তরুণ চট্টোপাধ্যায়
রমেন	,,	বসন্ত চৌধুরী, পরে অসিত বরণ
জগৎ চৌধুরী	জীবনসংগ্রামে বিধ্বস্ত তেজস্বীবৃদ্ধ	কানু বন্দ্যোপাধ্যায় পরে, নরেশ মিত্র
বাবুয়া	জগৎবাবুর নাতি	শ্রীমান দীপক
গগন গড়াই	ভূতপূর্ব অধ্যাপক	বিধায়ক ভট্টাচার্য, পরে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামলাল	ধনী ব্যক্তি	সন্তোষ সিংহ
ডাক্তার		বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
দীননাথ	পত্নীব্রত স্বামী	নবদ্বীপ হালদার
মহেশ	উচ্চ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ	জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
প্রাণকান্ত	বাড়ীওয়ালার সরকার	কল্যাণ বসু
মিঃ বাইশ	ক্ষুধাসন্ধানী স্ফীতকায় ব্যক্তি	মণি শ্রীমানী
ঘুগনীওয়ালা		কান্তি দত্ত
খুড়োমশায়		সুনীল দত্ত
সুধাংশু	শ্যামলালের কর্মচারী	সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
অজিত	শ্যামলালের কর্মচারী	দেবেশ লাহিড়ী
মানস	সুযোগসন্ধানী, অর্থলোভী যুবক	দ্বিজু ভাওয়াল, পরে কমল চ্যাটার্জী
সহঃ ডাক্তার		লালু মুখার্জী
বিধু বেয়ারা		গোবিন্দ মুখার্জী
এমপ্লয়মেন্ট প্রৌঢ়		বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র		শিল্পী
বেয়ারা		সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
গগনের ভাগ্নে		প্রদীপ ঘোষ
প্রভা	জগৎবাবুর পুত্রবধূ	শান্তি গুপ্তা অনুপস্থিতিতে, বনানী চৌধুরী
মানবী	প্রভার কন্যা	তপতী ঘোষ
নিরালা	আধুনিকা	আরতি দাস, পরে জয়শ্রী সেন
অনসূয়া	শ্যামলালের কন্যা	শিখারাণী বাগ পরে আরতি দাস
পট্টাই	ভিখিরি মেয়ে	রেখা দত্ত, পরে মীরা হাজরা
মলিনা	দীননাথের স্ত্রী	সুব্রতা সেন
নার্স		মায়া ঘোষ
নেপথ্য গায়িকা		ঝর্ণা দেবী

তোমার পতাকা

উক্ত নাটক উৎসর্গ করা হয়েছে এইভাবে,—

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীযুক্ত অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সেদিন ও এদিনের সুযোগ্য সহকর্মীবৃন্দের প্রতি—

শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীতি, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে—
সংকট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো।

বিনীত
বিধায়ক ভট্টাচার্য

পরিচালনা : বিধায়ক ভট্টাচার্য

অনুকূল বিশ্বাসের চরিত্র রূপায়ণে— কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্দাক্রান্তা/জয়-পরাজয়

এই নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে নাট্যকার বিমল রায়কে,—
যে আমার চোখের সামনে
ধীরে ধীরে নাট্যকার হ'য়ে ফুটে
উঠলো, পরিচিতি পেল, প্রতিষ্ঠা
পেল, সেই আমার পরম স্নেহভাজন
নাট্যকার বিমল রায়কে—

বিধায়ক ভট্টাচার্য

পরিচালনা	:	রমেশ মুখোপাধ্যায়
নাট্য শিক্ষা	:	সন্তোষ সিংহ
আলোক বিচিত্রা	:	অমর দাস
রূপসজ্জা	:	দেবীবাবু
স্বরগ্রহণ, ক্ষেপণ, আবহ শব্দ সংগীত	:	নুটুবাবু

চরিত্র		শিল্পী
সৌমিত্র	পাবলিক থিয়েটারের ডিরেক্টর	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায
নীলাদ্রি	সৌমিত্রর বন্ধু	অলোক মুখোপাধ্যায়
শেখর	সৌমিত্রর বন্ধু ও ডাক্তার	রমেশ মুখোপাধ্যায়
বিনোদ	সৌমিত্রর চাকর	সুনীল ভট্টাচার্য
অশোক	মঞ্চের নায়ক	রথীন দাশগুপ্ত
সুধাকণ্ঠ	নাট্যশিল্পী	তারাপদ সাউ
অনুপম	অভিনয় শিক্ষার্থী	বীতশোক ভট্টাচার্য
মণিময়	একজন ভদ্রলোক	সুধাংশু/দীপেন তপন।
প্রফুল্ল	শেখরের কম্পাউন্ডার	গৌরাঙ্গ সরকার
সুনন্দ	সৌমিত্রর সহকারী	কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত
মিঃ শর্মা	থিয়েটারের মালিক	ব্রজবল্লভ রায়
শ্রীনাথ	থিয়েটারের ম্যানেজার	বিধায়ক ভট্টাচার্য
মন্দাকিনী	সৌমিত্রর স্ত্রী	রুবী ভট্টাচার্য
অম্বালিকা	মন্দাকিনীর বোন	বনানী ভট্টাচার্য
কণিকা	মঞ্চের নায়িকা	শিপ্রা রায়
বাসবী	মণিময়ের স্ত্রী	কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

অতএব

বিধায়ক নাটকটি উৎসর্গ করেছেন,-

শ্রী জহর রায়

শ্রী হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী নলিন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু

পরিচালনা : জহর রায়

চরিত্র		শিল্পী
দোলগোবিন্দ	বিরাট ধনী	জহর রায়
সুমিত্র	দোলগোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র	অজয় গাঙ্গুলী
অনন্ত	ছিটগ্রস্ত প্রৌঢ়	হরিধন মুখোপাধ্যায়
চিতু	দোলগোবিন্দের সেক্রেটারী	অজিত চট্টোপাধ্যায়
কালাচাঁদ	সুমিত্রর বন্ধু	মৃণাল মুখোপাধ্যায়
হোটেল ম্যানেজার		মিন্টু চক্রবর্তী
অমিতা	সুমিত্রর প্রেমিকা	দীপিকা দাস
নয়ন	অমিতার মাসতুত বোন	সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
হেমাঙ্গিনী	অমিতার মাসী	সরযূবালা

এন্টনী কবিয়াল

নাট্যকার নাটকটি উৎসর্গ করেছেন,—

শ্রীমতী কেতকী দত্ত

শ্রীমান মদন দত্ত

শ্রীকর চতুষ্টয়েষু

নান্দিকের নিবেদনে

প্রযোজিকা

কেতকী দত্ত

সুর শিল্পী

অনিল বাগচী

মঞ্চ কল্পনা ও আলো

তাপস সেন

দৃশ্য স্থপতি

সুরেশ দত্ত

।। নাটকের চরিত্র ও চরিত্রকার ।।

ভোলাময়রা	প্রখ্যাত কবিয়াল	জহর গাঙ্গুলী
মামাবাবু	এন্টনীর প্রেরণাদাতা	বিধায়ক ভট্টাচার্য
ভজহরি	এন্টনীর বাল্যবন্ধু	কালীপদ চক্রবর্তী
জয়গোপাল	সৌদামিনীর কাকা	তরুণ মিত্র
জন	লিশুার রূপমুগ্ধ	পরিমল সেন
ত্রিলোচন	এন্টনীর বাল্যবন্ধু	তরুণ ঘোষাল
শিশির	পাড়াতুত ভাগ্নে	সমরকুমার
ডিসুজা	লিশুার বাবা	দেবব্রত দে
গোঁসাইজী	শ্রীরামপুরের গোঁসাইজী	জয়নারায়ণ ব্যানার্জী
কাশীকান্ত		নিখিল বোস
	কুটিল ব্যক্তি	
উমাকান্ত		গৌর গাঙ্গুলী
প্রসন্ন	উদার ব্রাহ্মণ	শীতেশ চক্রবর্তী
ক্ষেত্র		প্রদীপ ব্যানার্জী
	পাড়াতুত ভাগ্নে	
অনাদি		নীতীশ চৌধুরী
বিশু	এন্টনীর চাকর	বিশু পাল
কেষ্ট ঢুলী	কবিয়ালের ঢুলী	বরেন দাশ
লিশুা	এন্টনীর প্রতি অনুরক্তা	কল্যাণী ঘোষ
দাইমা	সৌদামিনীর পাড়ার দাইমা	সীতা মুখার্জী
তরঙ্গিনী	জয়গোপালের স্ত্রী	সাধনা রায়চৌধুরী
সৌদামিনী		কেতকী দত্ত
এন্টনী		সবিতাব্রত দত্ত (রূপকার)
এন্টনী ও ভোলাময়রার দলের দোয়ার—		কালী চক্রবর্তী, তরুণ ঘোষাল, অমিয় কর ও গণেশ শর্মা

দ্বিধা

নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে বিনয়েন্দ্র সিংহকে,—

যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার ফলে এই নাটক শীশমহলে অভিনীত হয় সেই শ্রী বিনয়েন্দ্র সিংহকে (বিনু ভাই) অজস্র স্নেহ আর কল্যাণ কামনা সহ এই নাটক উৎসর্গ করলাম।

বিধায়ক দা

প্রযোজক : অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা : বিধায়ক ভট্টাচার্য

নাট্য চরিত্র		অভিনয় শিল্পী
সাগর	ডাক্তারী ফেল করা যুবক	অসীমকুমার
প্রিয়ব্রত	রত্নার ছোড়দা	তরুণকুমার
বিভাস	রত্নার ঊর্ধ্বতন অফিসার	ভানু চট্টোপাধ্যায়
অবিনাশ	রত্নার স্বামী	অসিতবরণ
রত্না	ভাগ্য বিড়ম্বিতা নারী	তৃপ্তি মিত্র
সীতা	সাগরের প্রতি আকৃষ্টা নারী	বনানী ভট্টাচার্য

সুরা-নারী-সিংহাসন

এই নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে তারাপদ সাউকে,—

যিনি অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থা থেকে সত্যনিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের মূলধনে আজ শিল্পপতিত্বে উত্তীর্ণ হ'য়েছেন, যাঁর সমগ্রসত্তা নাটকের তপস্যায় নিত্যসমাহিত, সেই অগ্রজোপম সুহৃদ সঙ্গীত-রত্নাকর শ্রীতারাপদ সাউকে নাট্যকারের প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ এই নাটক উৎসর্গীকৃত হ'ল।

পরিচালনা : গোপাল চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র		শিল্পী
দ্বিতীয় মহীপাল	(গৌড়ের অত্যাচারী রাজা)	গোপাল চট্টোপাধ্যায়
রামপাল	(দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা)	তপনকুমার
ন্যায়রত্ন	(সাহসী যুবক ও রামপালের দেহরক্ষী)	অনাদি চক্রবর্তী

রাষ্ট্রবিপ্লব

নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে,
অগ্রজ সাহিত্যিক— শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীচরণেষু

প্রণতঃ
বিধায়ক

পরিচালনা : স্বপন কুমার
গোপালদেবের ভূমিকায় : স্বপনকুমার

মাইকেল মধুসূদন

পরিচালনা ও নামভূমিকায় : স্বপনকুমার

কাল-ভৈরব/ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্র

পরিচালনা ও নামভূমিকার : পঞ্চু সেন

তাহার নামটি রঞ্জনা

এই নাটকের চরিত্র সংখ্যা পাঁচটি। প্রথম রজনীতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের নাম—

রঞ্জনা	:	বনানী ভট্টাচার্য
কৌশিক	:	দীপক সাঁতরা
বিরাজ	:	গৌর মুখোপাধ্যায়
পণ্ডিত	:	নিমাই রায়
প্রহরী	:	অভিনয় শিল্পীর নাম পাওয়া যায় নি।

উক্ত নাটকটি আকাশবাণীতে অভিনীত (৩০ নভেম্বর, ১৯৬২) হয়েছিল। অভিনয়ে ছিলেন—

রঞ্জনা	:	তৃপ্তি মিত্র
কৌশিক	:	শম্ভু মিত্র

প্রযোজনা—অতুল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সরীসৃপ

পরিবেশনা : 'বৈশাখী' নাট্যসংস্থা

পরিচালনা : কমল চট্টোপাধ্যায়

'সরীসৃপ' নাটকটি আকাশবাণীতে ১৯৭৭ সালে ১১ ডিসেম্বর অভিনীত হয়। এটি আকাশবাণীর অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নাটক প্রতিযোগিতায় আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় ও বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ নাটক বলে বিবেচিত হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন—

সারদাসুন্দরী : সরযূবালা

নিকুঞ্জ : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিখিরি : কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

নোংরা : জগন্নাথ বসু

প্রযোজনা— জগন্নাথ বসু

বর্তমান নাটকটি কলিকাতা দূরদর্শনে ১৯৮৭ সালে প্রদর্শিত হয়।

পরিচালনায় ও সারদাসুন্দরীর ভূমিকায় : তৃপ্তি মিত্র

নিবেদেয়ামি

পরিবেশনা : একত্রিকা

পরিচালনা : বিধায়ক ভট্টাচার্য

পরিশিষ্ট—খ

বিধায়ক ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী :

নাট্যকার অভিনেতা পরিচালক বিধায়ক ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ৭ ফেব্রুয়ারী, মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের (পূর্বনাম বালুচর) ভট্টপাড়ায়। পিতা হরিচরণ ভট্টাচার্য, মাতা সত্যবতী দেবী। তাঁর প্রকৃত নাম বগলারঞ্জন; পরবর্তীকালে সাহিত্যিক জীবনে তিনি বিধায়ক নাম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন কনৌজী মিশ্র ব্রাহ্মণ। যজমানি এঁদের পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি।

বিধায়কের শিক্ষা শুরু হয় স্থানীয় বিদ্যালয়ে। তবে পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা বাইরের বই পড়ার দিকে তাঁর আগ্রহ বেশী ছিল। তিনি খুব অল্প বয়স থেকে কবিতা, ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন।

তাঁর পিতার 'বালুচর নাট্য সমাজ' ও 'ভারতীয় নাট্য সমাজ' নামে দুটি সখের নাটকের দল ছিল। তিনি সু-অভিনেতা ছিলেন। প্রখ্যাত অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিনয় ক্ষমতা দেখে তাঁকে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু বিধায়কের পিতামহ রাজী না হওয়ায় সেটি সম্ভব হয়নি। পিতা অভিনেতা হলেও কিশোর বিধায়কের কোন অভিনয় দেখার অধিকার ছিল না। একদিন সকলের অগোচরে তিনি 'রিজিয়া' পালা দেখতে যান। বক্তিয়ারের ভূমিকায় পিতার অভিনয় দেখে মুগ্ধ বিধায়ক সেই মুহূর্তে স্থির করেন, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে অভিনেতা হবেন। একটু বড় হয়ে পিতার অজান্তে সখের থিয়েটারে যোগ দেন। সেখানে তিনি মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। পরবর্তীকালে তিনি শৌখিন থিয়েটারে মাঝে মাঝে মহিলা চরিত্রে রূপদান করেছেন। যেমন, 'সেই তিমিরে' নাটকে সন্ধ্যাতারা, 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে হেলেন প্রমুখ চরিত্র। তবে চলচ্চিত্রে ও পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে উনি পুরুষ চরিত্রাভিনেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

তাঁর পড়াশুনা সুষ্ঠুভাবে হয়নি। অসুস্থ হয়ে পড়ায় দীর্ঘকাল স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। ইতোমধ্যে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫ জুন তাঁর বিবাহ হয়, কন্যা দ্বাদশবর্ষীয়া মৃণালিনী দেবী। দ্বিরাগমনের সময় কলকাতায় শ্বশুরালয়ে এলে স্ত্রীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা আশুতোষ ভট্টাচার্য (তিনিও নাট্যকার) তাঁকে মুর্শিদাবাদে ফিরে যেতে না দিয়ে টালা হাইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। তিনি সে স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর কলেজে ভর্তি হলেও সংসারের চাপে তাঁকে পড়াশুনা ত্যাগ করতে হয়।

ইতোমধ্যে তিনি 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'গল্পলহরী'তে ছোটগল্প লিখছেন। সে সময় সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল তারকাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এঁদের মধ্যে ডঃ পশুপতি ভট্টাচার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগার 'শিশিরকুমার ইনষ্টিট্যুট'-এ সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য ইস্যুয়িং অফিসার রূপে তিনি নিযুক্ত হন। বই পড়ার নেশা ছিলই,

এলেন বই-এর জগতে। সেখানে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা আসতেন। উনি সাগ্রহে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতেন। কিছুদিন পর অনিল ভট্টাচার্যের সঙ্গে রচনা করেন 'অতি আধুনিক' ও 'পুনর্মূষিকোভব' নামে দুটি নাটক। নাটকদুটি শিশিরকুমার ইন্সটিট্যুট-এ মঞ্চস্থ হয়। 'পুনর্মূষিকোভব' নাটকটি পরবর্তীকালে 'সেই তিমিরে' নামে রঙমহলে অভিনীত হয়।

এ দুটি নাটকের মঞ্চ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি স্বতন্ত্রভাবে লেখেন 'মেঘমুক্তি'। 'মেঘমুক্তি' তাঁর জীবনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই প্রথম তাঁর নাটক পেশাদারী মঞ্চে (রঙমহল) অভিনীত হওয়ার জন্য মনোনীত হয়। পেশাদারী মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমার ইন্সটিট্যুটের কাজে তিনি ইস্তফা দেন। এরপর তাঁর এগিয়ে চলার ইতিহাস। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি উদ্দামগতিতে নাটক, চলচ্চিত্রের কাহিনী, উপন্যাসের নাট্যরূপ, চিত্রনাট্য লিখে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ সুবিধামত মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় ও পরিচালনা করেছেন।

তাঁর অভিনয় সম্পর্কে 'নবকল্লোল' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়—

"আমরা প্রথমে তাঁকে রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করতে দেখি, কালিকা রঙ্গমঞ্চে, 'খেলাঘর' নাটকে অসীমের ভূমিকায়। পার্টটা এমন কিছু ছিল না, অথচ এই ছোট্ট ভূমিকাতেও তিনি দর্শকের মনে ছাপ রাখতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীযবার তাঁকে আমরা দেখি রঙমহলে- 'খবর বলছি' নাটকে একেবারে নায়কের ভূমিকায়। অদ্ভুত অভিনয় তিনি দেখিয়ে ছিলেন তখন।

'ডাউন ট্রেনে' নরেন পালের ভূমিকায় তিনি চতুর্থবার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। এই অভিনয়ে তিনি অদ্ভুত হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। যতক্ষণ তিনি মঞ্চে থাকেন, ততক্ষণ তিনি সমস্ত দর্শকের দৃষ্টি টেনে রাখেন তাঁর ওপর।"

নবকল্লোল,—শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন, কলিকাতা, ১৩৬৭

সুন্দর সুমিষ্ট নাট্য সংলাপের জন্য নাট্যজগতে তিনি 'মধু সংলাপী বিধায়ক' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নাটক রঙমহল, মিনার্ভা, কালিকা, শ্রীরঙ্গম, বিশ্বরূপা, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, শীশমহলে অভিনীত হয়েছে। তিনি সুদীর্ঘকাল আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একজন সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে সেখানে প্রথম প্রবেশের সুযোগ পান (তিনি কিছুদিন কাজী নজরুল ইসলামের কাছে গানের তালিম নিয়েছিলেন)। এরপর তিনি বেতার নাট্য, অভিনয়, আলোচনা প্রভৃতি বিষয়দ্বারা 'বেতার জগৎ'কে সমৃদ্ধ করেছেন।

মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের বিষয় ব্যতীত তিনি অজস্র উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি বহু পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'যশোধর মিশ্র' ছদ্মনামে তিনি কিছু সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের অনুবাদ করেন। যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হলে প্রথম দিন থেকে বিজ্ঞাপন বিভাগে নিযুক্ত হন। কিন্তু নাট্যজগতের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ায় তিন বৎসর কয়েকমাস কাজ করে পদত্যাগ করেন। তিনি দুবার আত্মজীবনী লেখা শুরু করেছিলেন— 'পূর্বাচলের পানে তাকাই' এবং 'ফিরে চাই'। 'সাহিত্য' পত্রিকায় এগুলি ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এরপর এ ব্যাপারে উৎসাহবোধ করেননি।

বগলারঞ্জন কবে থেকে বিধায়ক হলেন সেও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উনি ১৯৩২ সালে 'উন্মোচন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকার উদ্বোধনী সংখ্যা

নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে যান ও তাঁকে প্রণাম করে বলেন, বগলারঞ্জন তাঁর পিতৃদত্ত নাম, কিন্তু সাহিত্যিক জীবনে বিধায়ক নাম গ্রহণ করা তাঁর একান্ত ইচ্ছা। সেকথা শুনে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন—

'বেশ তো, বিধায়ক হবে, বিধান দেবে, বিধান দেওয়াই তো তোমাদের বংশের রীতি।"

এরপর সাহিত্য জগতে তিনি 'বিধায়ক' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

সত্তর দশকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রফেসর ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের বিশেষ চেষ্টায় ও অনুরোধে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশকালীন (পার্ট টাইম) অধ্যাপকরূপে তিনি যোগদান করেন। সেখানে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে 'ব্যবহারিক নাট্য রচনা' বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। প্রায় চার বছর কাজ করার পর অসুস্থতার জন্য ইস্তফা দেন।

বিধায়ক কখনো স্থির হয়ে কিছু করতে পারেননি। অর্থনৈতিক সমস্যা এর একটি বড় কারণ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি নাটকের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন। তাঁর ভাষায়—

"নাটক আমি ভালবাসি, এই ভালোবাসার টানেই মঞ্চ, অভিনেতা— এদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিলাম এবং নিজেকে যথাসাধ্য উৎসর্গ করেছি নাটক রচনায়।"

বিধায়ক ষাটের দশকের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একসময় সেই অসুস্থতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছয় যে ধীরে ধীরে সব কিছু থেকে তাঁকে দূরে সরে আসতে হয়। জীবনের শেষপ্রান্তে স্ত্রী বিয়োগের পর বই তাঁর প্রিয় সঙ্গী ছিল— বই তাঁর নিঃসঙ্গ মনকে অনেকটা ভরে রেখেছিল। দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ নভেম্বর নাট্যকারের দেহাবসান হয়। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচপুত্র (বিনায়ক, বীতশোক, বিমোহন, বিশোভন, বিমোচন) তিন কন্যা (বল্লরী, বিদিশা, বনানী) এবং পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রীকে রেখে যান।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, মিষ্টভাষী, বন্ধু-বৎসল ও স্নেহময় পিতা। তাঁর স্বজনপ্রীতি ছিল সুবিদিত। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর পুত্রকন্যা ও নিকট আত্মীয়দের গভীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজস্ব বাড়ীর নাম রেখেছিলেন 'মাটির ঘর'। সেই গৃহ সকলের ভালবাসা, সৌহার্দ্য, প্রীতির মিলনে সত্যই আদর্শগৃহে পরিণত হয়েছিল। তাঁর জীবনের এটিই বোধহয় সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

॥ বিধায়কের কর্মময় জীবনের রূপরেখা ॥

পৈত্রিক নিবাস— জিয়াগঞ্জ

নিজস্ব নিবাস— 'মাটির ঘর'

১৬২/১, বারুইপাড়া লেন,

কলিকাতা- ৩৫

ছদ্মনাম— যশোধর মিশ্র, মানস দাস, কল্পনা চক্রবর্তী (এই নামে কিছু চলচ্চিত্র-সঙ্গীত লিখেছেন)

পুরস্কার :

ক) ১৯৬০-৬১ সালে বিশ্ববাণী নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনে 'সাহিত্য মহাস্নাতক' উপাধি লাভ।

খ) ১৯৬৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত 'সুধাংশুবালা পুরস্কার।'

গ) বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৭৯ ৮০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শতবার্ষিকী পুরস্কার'।

ঘ) ১৯৮৫-৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আকাদেমি (নৃত্য নাট্য সঙ্গীত চারুশিল্প) কর্তৃক দেয় 'আকাদেমি পুরস্কার'।

ঙ) এ ছাড়া ভাটপাড়া থেকে 'মধুসংলাপী' উপাধি, ১৯৬২ সালে 'মঞ্চমুগ্ধ' সংস্থা কর্তৃক 'মঞ্চমুগ্ধ পুরস্কার' লাভ।

বিধায়ক মঞ্চ :

লোকান্তরিত নাট্যকার বিধায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ শহরে 'শ্রীপৎ সিং কলেজ'-এ 'বিধায়ক মঞ্চ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারী এই মঞ্চের উদ্বোধন হয়।

পত্রিকা :

I) উন্মোচন পত্রিকা- যুগ্মসম্পাদক (১৯৩২-৩৫), প্রচ্ছদ- যামিনী রায়।

II) প্রবাসী, ভারতবর্ষ, গল্পলহরী, দীপালি, রূপমঞ্চ, সচিত্র ভারত, রূপাঞ্জলি, চিত্রিতা, রূপলেখা, উল্টোরথ, সিনেমাজগৎ, নতুন খবর, নবকল্লোল, রোমাঞ্চ, ছবিওয়ালা, রূপায়ণ, মঞ্চরূপা ও অন্যান্য পত্রিকায় ছোটগল্প, উপন্যাস ও চলচ্চিত্র- বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন।

॥ মৌলিক নাটক ॥

ক) থিয়েটারী নাটক—

নাটক	রঙ্গমঞ্চ	প্রথম অভিনয় কাল
মেঘমুক্তি	রঙমহল	১৯৩৮
মাটির ঘর	রঙমহল	১৯৩৯
বিশ বছর আগে	রঙমহল	১৯৩৯
মালা রায়	রঙমহল	১৯৪০
কুহকিনী	মিনার্ভা	১৯৪১
রক্তের ডাক	রঙমহল	১৯৪১
তাইতো	শ্রীরঙ্গম্	১৯৪৪

নাটক	রঙ্গমঞ্চ	প্রথম অভিনয় কাল
তেরশো পঞ্চাশ	রঙমহল	১৯৪৪
খবর বলছি	রঙমহল	১৯৫০
অন্ধদেবতা	রঙমহল	১৯৫২
সেই তিমিরে	রঙমহল	১৯৫২
পিতাপুত্র	মিনার্ভা	১৯৫৫
ক্ষুধা	বিশ্বরূপা	১৯৬৪
তোমার পতাকা	রঙমহল	১৯৬২
মন্দাক্রান্ত/জয় পরাজয়	মিনার্ভা	১৯৬৫
অতএব	রঙমহল	১৯৬৬
এন্টনী কবিয়াল	কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ	১৯৬৬
দ্বিধা	শীশমহল	১৯৬৮

খ) যাত্রা নাটক—

যাত্রা নাটক	সংস্থার নাম	প্রথম প্রকাশ কাল
সুরা নারী সিংহাসন	গণেশ অপেরা	১৩৭৩
রাষ্ট্রবিপ্লব	নবরঞ্জন অপেরা	১৩৭৫
মাইকেল মধুসূদন	নবরঞ্জন অপেবা	১৩৭৫
কালভৈরব/ভক্ত-ভৈরব-গিরিশচন্দ্র	নিউ আর্য অপেরা	১৩৭৬

গ) একাঙ্ক নাটক—

নাটক	রঙ্গমঞ্চ	প্রথম অভিনয় কাল
তাহার নামটি রঞ্জনা	রঙমহল	১৯৬২
সরীসৃপ	বিশ্বরূপা	১৯৬২
নিবেদয়ামি	বিশ্বরূপা	১৯৬২

অভিনীত-মুদ্রিত অথচ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য থিয়েটারী পূর্ণাঙ্গ নাটক :

চিরন্তনী	মিনার্ভা	ডঃ বাসুকি নাগের মধ্যে দ্বৈতসত্তার (ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড) রূপ নিয়ে বর্ণিত কাহিনী।
তুমি আর আমি	রঙমহল	অভিনয়ের জন্য মহলায় উপস্থিত অতি আধুনিক সমাজের নানাধরণের মানুষ ও তাদের আচরিত বিচিত্র রীতিনীতি অবলম্বনে শ্লেষধর্মী নাটক।

নাট্যকার ও নাট্যকার কন্যা বিদিশ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ ও গ্রন্থের ভিত্তিতে কিছু তথ্য :

থিয়েটারী নাটক : --

২৬ জানুয়ারী	কালিকা থিয়েটার	দেশাত্মবোধক নাটক
খেলাঘব	কালিকা থিয়েটার	Luigi Pirandello (1867-1936) -এর 'Six characters in search of an Author (1921) নাটকের আদর্শে রচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, পরেশ ধর এবং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত উক্ত নাটকের অনুসরণে যথাক্রমে 'শুধু ছাযা' ও 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' নাটক রচনা করেন।
লগ্ন	বিশ্বরূপা ১৯৬৩	একদাখ্যাত বর্তমানে বৃদ্ধ ও অসুস্থ অভিনেতার (আচার্য বলে যিনি সর্ব পরিচিত) বর্তমান জীবনের সঙ্গে দ্বন্দ্বসংঘাতের কাহিনী বর্ণিত। এই নাটক মঞ্চে অভিনয়ের সময় মঞ্চকে চারটি ভাগে ভাগ করা হত। যে অংশে অভিনয় হত সেই অংশটিতে আলো জ্বলে উঠত।
নটী বিনোদনী	কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ ১৯৬৯	অভিনেত্রী বিনোদিনীর জীবনী অবলম্বনে লিখিত।

যাত্রা নাটক :

আকাশ অনেক বড়

সূর্য-পুত্র কর্ণ

· বিদ্যাসুন্দর

চরমাধবী

রাজা রামমোহন

কলঙ্কী চাঁদ (রাজা শশাঙ্কর জীবন ও কার্যকলাপ নিয়ে রচিত)

অনভিনীত মুদ্রিত নাটক—

I) থিয়েটারী নাটক :

খেলা— 'বিশ্বরূপা মার্কারী' পত্রিকায় ১৯৬০-৬১ সালে প্রকাশিত।

II) একাঙ্ক নাটক :

উজান যাত্রা— ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিত কুমার ঘোষ সম্পাদিত 'একাংক সঞ্চয়ন' (১৯৬০) গ্রন্থে প্রকাশিত। এই নাটকটি পরবর্তীকালে ১৩৭৩ সনে 'চতুষ্পর্ণা' গ্রন্থেও প্রকাশিত হয়। 'উজান যাত্রা'য় কালগত ঐক্য রক্ষিত হয়নি (প্রথম ঘটনার পর একমাস পরের ঘটনা বর্ণিত)।

কান্না হাসি— 'কান্না হাসির পালা' গ্রন্থে 'কান্না' 'হাসি' নামে দুটি নাটক ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়।

'কান্না' নাটকটি ১৩৭৩ সনে 'চতুষ্পর্ণা' গ্রন্থে সংযোজিত হয়। 'কান্নায়' গঠনগত ত্রি-ঐক্য রয়েছে।

'হাসি'তে কালগত ঐক্য নেই (কয়েকদিনের ঘটনা বর্ণিত) এবং স্থানগত ঐক্যের অভাব (একটি বাড়ীর একতলা ও দোতলার মধ্যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে) লক্ষ্য করা যায়।

অনভিনীত অমুদ্রিত নাটকের পাণ্ডুলিপি :

শাপমোচন— রাবণের তিনটি জন্ম-কাহিনী এ নাটকের বিষয়বস্তু।

নাট্যরূপ :

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বিপ্রদাস (শ্রীরঙ্গম)
বৈকুণ্ঠের উইল (কালিকা)
মেজদিদি (কালিকা)
অরক্ষণীয়া (রঙমহল)
পণ্ডিতমশাই (রঙমহল)
বিরাজবৌ (শীশমহল)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

ক) বৌঠাকুরাণীর হাট (যশোধর মিশ্র ছদ্মনামে লিখেছেন, বিশ্বরূপায় অভিনেতৃ সংঘ কর্তৃক এটি অভিনীত হয়)

খ) নিষ্কৃতি কবিতা— রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে 'বহুরূপী' পত্রিকায় প্রকাশিত।

ভারতচন্দ্র— বিদ্যাসুন্দর (শীশমহল)

রাজা ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়— অচলপ্রেম (কালিকা)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়— অমাবস্যার গান (মহাজাতি সদন)

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়— রত্নদীপ (রঙমহল)

অনুরূপা দেবী— অন্নপূর্ণার মন্দির (মিনার্ভা)

যাযাবর— জনান্তিক (বিশ্বরূপা) 'যশোধর মিশ্র' ছদ্মনামে লিখিত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—বার ঘর এক উঠান (রঙমহল) ঐ

প্রবোধ কুমার সান্যাল—শ্যামলীর স্বপ্ন (রঙমহল)

শঙ্কর- - চৌরঙ্গী (রঙমহল)

ব্রজেন দে— যাত্রা নাটক 'বাঙালী'-র নাট্যরূপ 'লালপাঞ্জা' (রঙমহল)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত— উত্তর ফাল্গুনী (রঙমহল)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র— চেনামহল (রঙমহল)

রাজকুমার মৈত্র— রাজবাপ্পা (রঙমহল)

অবধূত— 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এর নাট্যরূপ 'দুঃখের অধিকার'। এটি বিশ্বরূপায় অভিনীত হয়।

বেতার নাট্য

I) মৌলিক নাটক-- কৃষ্ণাতিথির চাঁদ

জীবনজুয়া—বেতারের রজত জয়ন্তী বর্ষে (১৯৫৩) সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসবে প্রথম স্থানাধিকারী নাটক।

রাহুর প্রেম

মৃগতৃষ্ণা

গ্রীণরুম

মিলনতীর্থ

ডাক দিয়ে যাই

তাহার নামটি রঞ্জনা

সরীসৃপ—এটি অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে নাটক প্রতিযোগিতায় আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় ও বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ নাটক বলে বিবেচিত হয়।

সে

মন্দাক্রান্তা

বসন্ত বনের হরিণী

II) বেতার নাট্যরূপ— বহ্নিশিখা (গজেন্দ্র কুমার মিত্র)

রাধা (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিচারক (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

রাজকন্যার স্বয়ম্বর (মনোজ বসু)

সীমা স্বর্গ (শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়)

আঁধারে আলো (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বহ্নিকন্যা (গজেন্দ্র কুমার মিত্র)

দেবী চৌধুরাণী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বিধায়ক পরিচালিত নাটক :

লেখক

তেরশো পঞ্চাশ (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
খবর বলছি (ঐ)
সেই তিমিরে (ঐ)
দ্বিধা (ঐ)
ডাউন ট্রেন (সলিল সেন)
কর্ণার্জুন (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)
শ্যামলীর স্বপ্ন (প্রবোধ সান্যাল)
রাজবাপ্পা (রাজকুমার মৈত্র)
লালপাঞ্জা (ব্রজেন দে)

বিধায়ক অভিনীত নাটক :—

লেখক

খেলাঘর (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
খবর বলছি (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
ডাউন ট্রেন (নাটক- সলিল সেন, সম্পাদনা- বিধায়ক ভট্টাচার্য)
ক্ষুধা (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
মন্দাক্রান্তা/জয়-পরাজয় (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
এন্টনী কবিয়াল (বিধায়ক ভট্টাচার্য)

বিধায়ক রচিত চলচ্চিত্র কাহিনী :—

মাটির ঘর
বিশ বছর আগে
রক্তের ডাক
অন্ধদেবতা
কা তব কান্তা
অসমাপ্ত
ঢুলি
পৃথিবী আমারে চায়
খেলাভাঙ্গার খেলা
অবাক পৃথিবী
কৃষ্ণাকাবেরী

ক্ষুধা
নতুন তীর্থ
ডাক দিয়ে যাই
দেয়া নেয়া

কাহিনীর চিত্রনাট্য রূপ :—

গৃহলক্ষ্মী
মাতৃহারা
তীর ও তরঙ্গ (সুকৃতি সেন)
বড়দিদি (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
রাজা সাজা
স্বর্গমর্ত্য
যুগ দেবতা (তারকনাথ মুখোপাধ্যায়)
পরভৃতিকা (সীতা দেবী)
ওগো শুনছো
ভ্রান্তিবিলাস (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)
অসমাপ্ত (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
কা তব কান্তা (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
অন্ধদেবতা (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
পৃথিবী আমারে চায় (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
খেলা ভাঙ্গার খেলা (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
অবাক পৃথিবী (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
কৃষ্ণাকাবেরী (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
ক্ষুধা (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
নতুন তীর্থ (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
দেয়া নেয়া (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
দুষ্টু প্রজাপতি (বিধায়ক ভট্টাচার্য)
পথে হল দেখা
হাইহিল

চলচ্চিত্রে অতিরিক্ত সংলাপ

মহাকবি গিরিশচন্দ্র
ভ্রান্তিবিলাস
পহলা আদমী (হিন্দী চলচ্চিত্র)
ধূলার ধরণী
দো দুনী চার (ভ্রান্তিবিলাসের হিন্দী চলচ্চিত্ররূপ)

বিধায়ক অভিনীত চলচ্চিত্র

গাঁয়েব মেয়ে (গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত) : কবির ভূমিকা
অবশেষে (পরিচালনা- মৃণাল সেন) উকিলের ভূমিকা
উত্তর মেঘ (পরিচালনা- জীবন মুখোপাধ্যায়) উকিলের ভূমিকা
দাদাঠাকুর (পরিচালনা- সুধীর মুখোপাধ্যায়) মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারের ভাই এর ভূমিকা
ভ্রান্তিবিলাস (পরিচালনা- মানু সেন) স্যাকরা বসুপ্রিয়র ভূমিকা
পৃথিবী আমারে চায় (পরিচালনা- নীরেন লাহিড়ী) পুরোহিতের ভূমিকায়
দেয়া নেয়া (পরিচালনা- সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ভৃত্যের ভূমিকায়
অবাক পৃথিবী (পরিচালনা বিশু চক্রবর্তী) দোকানদারের ভূমিকায়
দোলগোবিন্দের কড়চা (পরিচালনা- সারথী) লক্ষ্মীর কাকা
ক্ষুধা (পরিচালনা- পঞ্চ রত্ন) গগন গড়াই-এর ভূমিকা

উপন্যাস :

বৃদ্ধ বিধাতা
ওগো পুষ্পধনু
সমীরণ সেন
শ্রী সমীরণ সেন
কা তব কান্তা
দিনগত
দেহপট
রাত্রি যাদের দিন
বসন্ত বনের হরিণী
ঢুলী
ডোম
চাকা ঘুরছে
এই দেহ এই দাহ
সীমার সীমান্ত
বুমেরাং
ময়ূর মহল
রামধনুর রঙ
কাক কালো কোকিল কালো
কৃষ্ণাতিথির চাঁদ
এই করেছ ভাল
দিন যায় রাত যায়
প্রবেশ নিষেধ
ভালবাসা
মাইয়া
রাধা মধুরা আধা মধুরা,
খেলা ভাঙার খেলা
পৃথিবী আমারে চায়
চলচ্চিত্ত
অমরেশ চন্দ্রাহত হল

অনুবাদ :

অজানিতার চিঠি--S. Zing -এর 'A letter from an unknown Woman' গ্রন্থের অনুবাদ।

কিশোর সাহিত্য :

নাটক

অমরেশ— (কেন্দ্রীয় চরিত্র অমরেশ। তাকে ঘিরে নানাকাহিনী গড়ে উঠেছে। অমরেশ কাহিনী বিভিন্ন শিরোনামে রচিত)

(দেব সাহিত্য কুটীর-এর পূজাবার্ষিকীতে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে প্রকাশিত। অমরেশ চরিত্রটি নাট্যকারের অত্যন্ত প্রিয়। এ সম্পর্কে নাট্যকার বলেছেন-- "অমরেশ আমার বড় প্রিয় চরিত্র। আমারই আর একটি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে এই চরিত্রে।"

জাগোরে ধীরে— ছেলেদের অভিনয়ের জন্য লিখিত

ঝাঁসীর রাণী— মেয়েদের অভিনয়ের জন্য লিখিত

মাটির ঘর— মেয়েদের অভিনয়ের জন্য লিখিত

বিশ বছর আগে— ছেলেদের অভিনয়ের জন্য লিখিত

বাপরে বাপ বা ফস্কা গেরো—

রাজপথ— ছেলেদের অভিনয়ের জন্য লিখিত

বিশ্ববিবেক— বিবেকানন্দ জীবনী অবলম্বনে রচিত

শ্রীরামকৃষ্ণ— শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে রচিত

পরিশিষ্ট—গ

বিধায়ক সম্পর্কে তৎকালীন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যানুরাগীর (গবেষকের সঙেগ সাক্ষাৎকার ভিত্তিতে) অভিমত :

সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের অন্যতম শিষ্য, পেশাদারী থিয়েটারেব বিশিষ্ট অভিনেতা)—-

বিধায়কের অনেক নাটক স্টেজে অভিনীত হয়েছে। ওঁর মাটির ঘর, ক্ষুধা, বিশ বছর আগে-— এগুলোর খুব নাম হয়। খুব চলেও থিয়েটারে। বিধায়কবাবু তাঁর নাটকে অনেক সময় ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় করতেন। .....উনি অভিনয় বুঝতেন, অভিনয় শিক্ষা দিতে পারতেন এবং অভিনয করতেও পাবতেন।

মহেন্দ্র গুপ্ত- (নাট্যকার- পরিচালক- অভিনেতা)

বিধাযকের বচনার সবচেয়ে লক্ষণীয বিষয হল সংলাপ। এত মিষ্টি সংলাপ সমসামযিক কোন নাট্যকাবেব লেখায দেখা যায় না। .....সংলাপের ক্ষেত্রে সে যুগে বিধাযক ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

বিদ্যাধর মল্লিক (নাট্যানুরাগী ও প্রযোজক)

রঙমহলে সে সময় প্রতি শনি, রবি ও ছুটির দিনে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বামী-স্ত্রী' নাটকের অভিনয় চলছে। শুরু হল এর সঙ্গে প্রতি বৃহস্পতিবার বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মেঘমুক্তি'। 'মেঘমুক্তি' ছিল হাসির নাটক। এটি সকলে খুব পছন্দ করেছিল। কেননা, সে সময কেবল বৃহস্পতিবার অভিনয় করে নাটক জমানো খুবই শক্ত ব্যাপার ছিল। শুধুমাত্র সপ্তাহে একদিন নাটক করে এর আগে আর কোন নাটক এত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

তারা কুমার ভট্টাচার্য (অভিনেতা ও সংগীত শিল্পী)

আমি বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' নাটকে উৎপলের ভূমিকায় অভিনয় করি। সেই নাটকে ছন্দা ও উৎপলের একত্রে গাওয়া "দীঘল দীঘির ধারে....." গানটি সে সময় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। গানটি হল story music। অর্থাৎ গানের মধ্য দিয়ে একটি কাহিনী বলা হচ্ছে। গানের মাঝে মাঝে সংলাপ জুড়ে দেওয়ায় সেটি খুব আকর্ষণীয় হয়েছিল। বাংলা থিয়েটারে এর আগে এ ধরণের গান ব্যবহৃত হয়নি।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Agamemnon—Aeschylus

2. Aristotle Horace, Longinus, Classical Literary Criticism
—Translated by T. S. Dorsch.

3. Aristotle: On the Art of Poetry—Translated by Ingram Bywater.

4. Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art—Translated by S. H Butcher.

5. Ajax—Sophocles.

6. The Analysis of Play construction and Dramatic Principles
—William Thompson Price

7. The Art of Dramatic Writing: Its Basis in the Creative Interpretation—Lajos Egri.

8. The Anatomy of Drama —Marjorie Boulton

9. Acting, The First Six Lessons —Richard Boleslavsky

10. An Actor Prepares—Constantin Stanislavsky, Geoffrey Bles

11 Acting and Stage Craft —Derek Bowskiee

12. Ancient India —R. C. Majumdar.

-B-

13. The Bishop's Candlesticks —Norman Mckinnel

14. Building a character —Constantin Stanislavsky.

15. Bengal Discovered —Gopen Datta

-C-

16. Characters and the Conduct of Life —W. Mcdugal

17. Concentrated Property in a Few Hands —Karl Marx on Colonialism and Modernization—Eidted by Shalomo Avineri.

18. Collected Essays on Economic Problems of India—Edited by Himansu Roy.

-D-

19. Dimension of poverty and progress in India—A Dualistic Approach —G.P. Mishra.

20. Drama, Stage and Audience—J. L. Styan

21. A Doll's House—Henrik Ibsen.

22. Directing in the Theatre—Hugh Morrison.

23. Directors on Directing: A source Book of the Modern Theatre—Edited by Toby Cole and Helen Krich Chinoy.

24. Dressing the Play—Norah Lambourne

-E

25. Electra—Sophocles

26. The Elements of Drama— J. L. Styan

27. An Enemy of the People—Henrik Ibsen

28. Elements of Psychology : Normal and Abnormal -V. K. Kothurkar, L. B. Harolikar.

29. The Ego and the Id—Sigmund Freud.

-F-

30. Fundamentals of Play Directions—Alexander Dean, Lawrence Carra.

31. The Fundamentals of Psychology—Benjamin Dum Ville

32. Freud and the Post Freudians— Edited by J. A. C. Brown.

33. Femininity as Alienation—Ann Foreman.

-G-

34. Greek Drama For Everyman—F. L. Lucus

35. Ghosts—Henrik Ibsen

36. Hamlet, Prince of Denmark—William Shakespeare

37. The heart of Man—Erich Fromm

38. How the Mind works—David Cox

39. History of Modern Bengal—R. C. Majumdar

40. Hository of Bengal (vol-I)-(D.U.) R. C. Majumdar
41. Hostory of Freedom Movement (vol-3)- R. C Majumdar
42. The History of India, From the Earliest Times to the Present Day—Michael Edwards

-I-

43. Introduction. Twenty Four One act Plays—Selected by John Hampden
44. Introduction to Psychology—Norman L. Munn
45. The Individual and his religion—Gordon W. Allport
46. Ibsen—Michael Mayer
47. Ibsen, The Master Builder and other Plays—Una Ellis Fermor
48. Inhibition, Sympton and Anxiety—Sigmund Freud
49. The Interpretation of Dreams—Sigmund Freud
50 Indian Economy Its Nature and Problems —Alok Ghosh
51. Indian Economics, An Introduction —A. N. Agarwala
52. An Introduction to the Study of Literature —William Henry Hudson
53. India's Fight for Freedom (second Eidtion) —Sardul Singh Caveeshar

-K-

54. King Lear —William Shakespeare

-L-

55. The Life of Drama —Eric Russels Bentley
56. Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar—Edited by Hariram Gupta

-M-

57. Macbeth. —William Shakespeare
58. My life in Art —Constantin Stanislavsky
59. Modern Drama in Theory and Practice I, Realism and Naturalism —J. L. Styan

60. The Mind and its working —C.E.M. Joad
61. Masters of the Drama —John Gassner
62. Mind in Action —C. H. Whitely

-N

63. Nine Modern Plays (Ed) —John Hampden
64. Normal And Abnormal Psychology —J Earnest Nicole

-O-

65. OEdipus Tyrannus —Sophocles
66. Orestes -Euripides
67. One act plays of Today (First series) J W Marriot
68. The One Act Play A Laboratory for Drama J J Green
69. On the Art of the Theatre --Edward Gordon Craig
70. Othello, The Moor of Venice —William Shakespeare

P

71. Prometheus Bound -- AEschylus
72. Play Production - Henning Nelms
73. Producing the Play —John Gassner
74. Psychology of Personal and Social Adjustment —Henry Clay Lindgren
75. Psychology : The Science of Behavior —Robert L. Issacson, Max L. Hull and Milton L. Blum.
76. Psychology of Personal and Social Adjustment (2nd Edition) —Henry Clay Lindgren
77. Psycho-analysis and the Drama —Smith Ely Jelliffe and Louise Brink
78. The Psychology of Thinking —Oleg Tikhomirov
79. Play Making—a Mannual of Craftsmanship —William Archer
80. The Play's the Thing --Lawrence Langner
81. Prices in India —A. K. Sur
82. Political Involvement of India's Trade Unions —N. Pattabhi Raman.

-R-

83. The Rising of the Moon —Lady Gregory
84. Rhythm in Drama —Kathlean George

-S-

85 The Stage in Action —Samuel Seldem
86. Shakespeare's comic Theory —A. T. Nelson
87. Shakespearean Tragedy —A C. Bradley
88 Suicide in different clultures—Edited by Norman K L. Farberow
89 Shakespeare and his Plays —H. M. Burton
90. Socialism and Gandhism —Dr B. Pattabhi Seetaramayya
91. Students' Fight for Freedom —Amarendranath Roy
92. Studies in Asian Social Development (No-I) Edited by Ratna Datta, P. C. Johshi
93. Some Fundamentals of the Indian Problems —Dr. Pattabhi Sitaramayya
94. Studies in Indian Social Polity —Bhupendranath Datta
95. The Spirit of Tragedy —H. J Muller
96. Studies in Psychology —A. V. Petrovsky
97. Studies in Ancient India —Pravatansu Maity

-T-

98. The Trogan Women —Euripides
99. The Theory of Drama —Allardyce Nicoll
100. The Technique of Drama —Dr. Gustav Freytag
101. Tragic Drama in Aeschylus, Sophocles and Shakespeare, An Essay —Lewis Campbell
102. Theory and Technique of play writing and screenwriting —John Howard Lawson.
103. Tragedy —F. L. Lucus
104. The Theatre Essays of Arther Miller—Edited by Robert A. Martin

105 The Theory of the modern Stage—Edited by Eric Bentley
106 Theatre and Stage Edited—by Harold Downs
107. Thirty Famous One-Act Plays— Eidted by Bennett Cerf and Van H. Cartmell
108. The Technique of the One act Play —Benjamin Roland Lewis

V

109. The Valiant—Holworthy Hall and Robert Middlemass

W

110 The Wild Duck —Henrik Ibsen
111 World Drama —Allardyce Nicoll
112 Women in Transition —Judith M Bordwick
113 Weapons in the Theatre —Arthur Wise

-অ-

১১৪. অভিষেক—ভাস
১১৫. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—কালিদাস
১১৬. অচলায়তন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১১৭. অমৃত অতীত—মন্মথ রায়
১১৮. অলঙ্কার চন্দ্রিকা—শ্যামাপদ চক্রবর্তী

-উ-

১১৯. আশংসা—সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী
১২০. উত্তরামচরিতম্— ভবভূতি
১২১. উভয়াভিসারিকা—বররুচি

-ঊ-

১২২. উরুভঙ্গম্—ভাস

-এ-

১২৩. একেই কি বলে সভ্যতা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
১২৪. একশো বছরের নাট্যপ্রসঙ্গ—দেবনারায়ণ গুপ্ত

-ক-

১২৫. কর্ণভারম্—ভাস
১২৬. কৃষ্ণকুমারী নাটক—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
১২৭. কবিশ্রী মধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার
১২৮. কাব্যালোক (প্রথম খন্ড) — সুধীরকুমার দাশগুপ্ত
১২৯. কার্লমার্কস —মন্মথ রায়
১৩০. কর্ণকুন্তী সংবাদ —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১. ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু—প্রফুল্ল কুমার সরকার

-গ-

১৩২. গান্ধারীর আবেদন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩৩. গিরিশ রচনাবলী (১ম খন্ড) সম্পাদনা ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য ও ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়

-চ-

১৩৪. চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

-ছ

১৩৫. ছন্দপরিক্রমা—প্রবোধ চন্দ্র সেন

-জ-

১৩৬. জনা—গিরিশ চন্দ্র ঘোষ
১৩৭. ডাকঘর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

-দ-

১৩৮. দূত-বাক্যম্—ভাস
১৩৯. দূত ঘটোৎকচম্—ভাস
১৪০. দ্বাদশ গোপাল—রাজকৃষ্ণ রায়
১৪১. দাঁড়াও পথিকবর—উৎপল দত্ত

-ধ-

১৪২. ধূর্তবিট সংবাদ---ঈশ্বর দত্ত

-ন-

১৪৩. নাট্যশাস্ত্র—ভরত
১৪৪. নরনারায়ণ—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
১৪৫. নূরজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
১৪৬. নাটক লেখার মূলসূত্র---ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য
১৪৭. নাট্যচিন্তা : শিল্প জিজ্ঞাসা—দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪৮. নরকবাস---রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

-প

১৪৯. প্রবোধ চন্দ্রোদয়ম্—কৃষ্ণ মিশ্র
১৫০. পদ্মপ্রাভৃতকম্—শূদ্রক
১৫১. পাদতাড়িতকম্—শ্যামিলক
১৫২. পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫৩. প্রফুল্ল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
১৫৪. প্রাচীন কবিওয়ালার গান—প্রফুল্ল পাল
১৫৫. পুনর্জন্ম—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
১৫৬. প্রেমের স্বপন—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

-ব-

১৫৭. বেণী সংহারম্—ভট্টনারায়ণ
১৫৮. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
১৫৯. বলিদান—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
১৬০. বিসর্জন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৬১. বিনয় সরকারের বৈঠকে—হরিদাস মুখোপাধ্যায়
১৬২. বাংলাদেশের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড)—রমেশ চন্দ্র মজুমদার
১৬৩. বিপ্লবের পথে বাঙালী নারী—হরিদাস মুখোপাধ্যায়
১৬৪. বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড) সুকুমার সেন

১৬৫. বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা— অজিত কুমার ঘোষ
১৬৬. বঙ্গীয় নাট্যশালা —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৭. বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়
১৬৮. বনফুল রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)— বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
১৬৯. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
১৭০. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭১. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্যায়) —ভূদেব চৌধুরী
১৭২. বাংলা নাটকের ইতিহাস— ডঃ অজিত কুমার ঘোষ
১৭৩. বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
১৭৪. বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ : প্রথব পর্ব—সুশীলা মন্ডল
১৭৫. বিদায় অভিশাপ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৭৬. বিনি পয়সার ভোজ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

-ভ-

১৭৭. ভারতেব ইতিহাস কথা (প্রথম খন্ড)— ডঃ কিরণ চন্দ্র চৌধুরী
১৭৮. ভারতমাতা — কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭৯. ভোটমঙ্গল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ম

১৮০. মধ্যমব্যায়োগ—ভাস
১৮১. মালবিকাগ্নিমিত্র—কালিদাস
১৮২. মালতীমাধব—ভবভূতি
১৮৩. মৃচ্ছকটিকম্—শূদ্রক
১৮৪. মালিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৫. মুক্তধারা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৬. মুক্তিসংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস—চারুবিকাশ দত্ত
১৮৭. মধুসূদন রচনাবলী—সুরেশচন্দ্র মৈত্র
১৮৮. মেবার পতন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
১৮৯. মুক্তির ডাক—মন্মথ রায়
১৯০. মাইকেল—মহেন্দ্র গুপ্ত
১৯১. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু
১৯২. মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য : নাটক ও অনান্য প্রসঙ্গ—সম্পাদনা : দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

-র-

১৯৩. রত্নাবলী—শ্রীহর্ষ
১৯৪. রাজা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯৫. রক্তকরবী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯৬. রথের রশি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯৭. রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খন্ড)—বিশ্বভারতী প্রকাশন
১৯৮. রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চদশ খন্ড)—বিশ্বভারতী প্রকাশন
১৯৯. শৃঙ্গার ভূষণম্—বামনভট্ট
২০০. শর্মিষ্ঠা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
২০১. শারেদাৎসব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২০২. শ্রীমধুসূদন—বনফুল
২০৩. শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী—স্বামী তেজসানন্দ
২০৪. শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম
২০৫. স্বপ্নবাসবদত্তা—ভাস
২০৬. সাহিত্য দর্পণঃ—বিশ্বনাথ কবিরাজ
২০৭. স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী—কমলা দাশগুপ্ত
২০৮. সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
২০৯. সিরাজদ্দৌলা—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
২১০. স্বর ও বাক্‌রীতি—ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
২১১. সতী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১২. স্বর্গীয় প্রহসন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২১৩. সকাল সন্ধ্যার নাটক—সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী

-পত্র পত্রিকা-

১. আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক)
২. আই. এন. টি. সি. রিক্রিয়েশন ক্লাব স্মারক পত্রিকা
৩. এপিক থিয়েটার
৪. ও থিয়েটার থিয়েটার
৫. জাহ্নবী
৬. নবকল্লোল
৭. বেতার জগৎ
৮. মাতৃভূমি
৯. যুগান্তর পত্রিকা (দৈনিক)
১০. রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা
১১. রণন
১২. স্বদেশ
১৩. দেশ পত্রিকা

নির্দেশিকা